মেঘমাত্রিক

বুকমার্ক

৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট । কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ আগষ্ট ১৯৬৩

প্রকাশক

প্রদীপ বসু

বুকমার্ক

৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট

কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক

নবদ্বীপ বসাক

পাবলিসিটি কনসার্ন

৩ মধু গুপ্ত লেন

কলকাতা-৭০০ ০১২

প্রচ্ছদ

গৌতম বসু

মধুময় পৃথিবীর কথানক

বিষ্ণু বসু

এমনি করেই বোধ হয় লেখাটি শুরু করা যায়। 'আমরা বড় হয়ে থাকরি মাল্লাকে বহু গল্পে আবিষ্কার করতে থাকি, দারুণ সে সব, আলোচিত, প্রশংসিত, সমাদৃত। থাকরি মাল্লা গল্পের একটি ধারা হয়ে উঠেছে। যদিও থাকরিদা এসব জানত না—'

এ পর্যন্ত এসে থামতে হয়। থামতে হয় শুধু যে 'গল্পের একটি ধারা হয়ে ওঠা'র বাহিকতায় তা নয়, থাকরিদাও মধুময়ের কাছে কী এবং কতটুকু হয়ে উঠেছে তারই খননের প্রত্যাশায়। আসলে গল্পের ধারা কীভাবে গড়ে ওঠে, ঘটে তার বিস্তৃতি অথবা সঙ্কোচন, তার তরিকা সতর্ক লেখককে সর্বদাই তাড়িত করে। যে কোনো শিল্পকর্মে একই সঙ্গে চলতে থাকে গড়া ও ভাঙা। গড়ার মধ্যে ভাঙা, আবার ভাঙার মধ্যে গড়া। শিল্পীর নিজের সঙ্গে সমাজের সঙ্গে বাইরে ও ভেতরে এ নিরন্তর বোঝাপড়া সৃষ্টির বুনন ও প্রত্যাখ্যানের জটিলতা প্রতিটি শিল্পীকে স্বতন্ত্র করে তোলে। সব শিল্পীর মতোই কোনো লেখকও এ দ্বান্দ্বিকতাকে এড়িয়ে চলতে পারেন না। গল্পসৃষ্টির প্রথম প্রহর থেকে গল্প নির্মাণ ও গল্প প্রত্যাখ্যানের টানাপোড়েন চলে আসছে। নির্মাণ ও প্রত্যাখ্যানের বিশিষ্টতাই কোনো লেখককে নিজস্বতা তৈরি করতে সাহায্য করে। পৃথিবীর প্রাচীনতম কল্পকথা থেকে শুরু করে অধুনাতন যাদুবাস্তবতার বিস্তার এ পরিক্রমারই ধারাবাহিকতা প্রমাণ করে আসছে।

একালের এক অগ্রগণ্য কবি লিখেছিলেন, 'মানব প্রজাতি খুব বেশী বাস্তবতা বহন করতে পারে না।' অথচ সাহিত্য, শুধু সাহিত্যই বা কেন, সব শিল্পই তো মনুষ্য প্রজাতি ও তার বাস্তবতাকে নিয়েই। তবে কিনা বাস্তবের ধরনটি কোন রূপশিল্পীর কাছে কোন ধরনের চেহারা নিয়ে ধরা দেবে, তার গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যান আলিঙ্গন করবে কোন্ দ্বান্দ্বিকতাকে এ চ্যালেঞ্জ নিয়েই তো নির্মিত হতে থাকে সাহিত্য। কোনো কথানক তথা আখ্যান তো বটেই, এমনকি কবিতা ও নাটককেও আয়ত্ত করতে হয় বাস্তবতারই বিবিধ বিন্যাসকে, তা যতই কেননা তির্যক অথবা রহস্যময় হোক।

মধুময় পাল যখন লেখেন 'প্রাচীন অসিখেলা', 'অস্ত্রপ্রণীত', 'কাকবেলা' অথবা 'শবযান ও মোতিসুন্দরী' তার কাছে প্রতিটি রচনাই হয়ে ওঠে এমনই এক একটি চ্যালেঞ্জ। আমরা উৎচেতন হয়ে অপেক্ষা করি, লক্ষ করতে চেষ্টা করি আমাদের চেনা বাস্তবকে তিনি মোকাবিলা করছেন কীভাবে, তাঁর শৈলী আলিঙ্গন করছে কোন ধরনের বিশিষ্টতাকে। কথানক রচনার নানা প্রস্থান ও পদ্ধতি মধুময়ের কাছে অজানা নয় নিশ্চয়ই, তাঁর লেখায় প্রতীচ্য ও প্রাচ্যের বিবিধ ধারার স্বীকরণ আমাদের নজর এড়ায় না কখনোই, তবু তার মধ্যে দিয়েও তিনি উৎকীর্ণ করে চলেন কোন পৃথকত্ব তার মৌল অভিব্যক্তি আমাদের ভাবাতে বাধ্য করে। অবশ্য এ আনুগত্যও বহু সময়েই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় তাঁর কাছে। গত পঞ্চাশ বছর ধরে সময় আমাদের চেতনার উপর বয়ন করে চলেছে কত ধরনের প্রত্যক্ষতার স্তর। তিনি তাদের স্বীকার করেই

নির্মাণ করতে চেয়েছেন প্রকরণের এক পৃথক প্রজাতি। অর্ধশতকব্যাপী রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবিধ জিজ্ঞাসাকে তিনি ধরতে চান মনুষ্যত্বের মহত্ত্বে ও কলুষতার মধ্য দিয়ে। দেশভাগ থেকে উৎপন্ন সমস্যা, আমাদের আলোড়িত সময়ের উৎক্ষেপ, যুক্তি ও আবেগের স্তর বিন্যাস তাঁর লেখায় আবর্ত তুলে ক্রমাগত এগিয়ে চলে এবং আমাদের করে তোলে হতাশ বিষণ্ণ ক্রুদ্ধ ও অ ্যার্থক।

ধরা যাক 'শবযান ও মোতিসুন্দরী' গল্পটিকে। মোতিসুন্দরী একদা রূপসী ছিল, ছিল রূপোপজীবিনীও। দৈনন্দিনতাকে নানাভাবে মোকাবিলা করে এখন সে শবযানের আরোহী। সে যাত্রাপথেও মোতিসুন্দরীর অজস্র প্রশ্ন। অবশেষে সবকিছু ছাপিয়ে 'দুঃসহ স্তব্ধতায় চাকার শব্দই একমাত্র আশ্রয় হয়। এটা তো স্পষ্ট, মোতিবুড়িকে খুনের দায় সে নিয়েছে। ভাঙা ঘরে থাকলে বুড়ি বাঁচতেও পারত। তখনও তো মরেনি। সেই শূন্যতায় স্তব্ধতায় অপরাধময়তায় রমণীকণ্ঠের উচ্ছল হাসি আদিগনকে স্তম্ভিত করে। হাসিটা যেন অনেক দূর থেকে তার ঠিক পেছনে দাঁড়াল। আদিগন ফিরে দেখে ভ্যানে বসে এক আশ্চর্য যুবতী। দুর্গার মতো জগদ্ধাত্রীর মতো তার রূপ নয়! তবু অপরূপা। এ রূপের ছায়া আদিগন বহুবার দেখেছে। এ রূপের বর্ণনা সে জানে না এতটাই চেনা। যুবতী হাসছে। ভালোবাসার হাসি। যুবতী বলল, আদিগন তুমি কী চাও? তোমার একটা চাওয়া মেটাতে পারি। কিন্তু কী নেবে আদিগন। 'অথবা মধুময়ই বা বিধাতার মতো মোতিসুন্দরীর মারফত কী দিতে পারেন আদিগনকে! অথবা নিজেকে। শবযানের উপর বিষণ্ণ যাত্রাপথে যুবতীর মুখে ভালোবাসার হাসি রূপকে অপরূপ ও স্বতন্ত্র করে তোলে, প্রত্যাশা ও প্রত্যাখ্যান একই সঙ্গে ফলবান হয়ে ওঠে। অথবা 'প্রাচীন অসিখেলা', সম্পর্কের তির্যকতার মধ্যে নির্মিত হয় যে-যৌনতা তাকে ধরা যায় কি কোনো চেনা আদলে? অথচ তা কি খুব অচেনাই থাকে? 'কাকবেলা' নিয়েই বা কি বলা যায়! আমাদের নিভৃতি কি বিস্তৃতি পেতে পাবে এমনই বিবিক্তিতে। বলা সহজ নয়। একারণেই বুঝি মধুময় সমকালের ব্যঞ্জনাকে খুঁজে পান মধ্যযুগের গোপীচন্দ্রের গানে। আমাদের মধ্যেও বিদ্যুচ্চমকের মতো উদ্ভাসিত হয়—

'রাত্রি করে ঝিকিমিকি কোকিলা করে রাও।
শ্বেতকাক বলে রাত্রি প্রভাও প্রভাও ॥'

সমকাল চিরকাল হয়ে উঠল। এখানেই মধুময়ের কৃৎকৌশল।

কিন্তু এসব রচনা অন্তর্ভুক্ত হবে কোন্ শ্রেণীর সারণিতে। সারা পৃথিবী প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করছে জীবন ও চেতনার বিন্যাসে বিচিত্রতার প্রতিফলন। আসলে গল্প উপন্যাসেই বা কেন, সাহিত্যেরই তো কোনো সংজ্ঞা হয় না। একটি সীমাবদ্ধ সূত্রকে কখনোই প্রয়োগ করা চলে না সর্বাধিক শিল্পকর্মের উপর। মধুময় অত্যন্ত সচেতন থেকে এ বিষয়ে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি নিজেকে দাঁড় করিয়েছেন।

'রাত্রির পরিধি' কি কোনো কেন্দ্রকে আকর্ষণ করছে! দিদিমার গোলারুটি ভাজা, চিনিদিদিমার সিন্দুকবাড়ি বা মেঘবাড়ি থেকে পশ্চিমবঙ্গের থানা থানায় তখন তৈরি হচ্ছে 'হিস্ট্রি অব টরচার'

ফারাও টু ফুয়েরার-এর পরিবর্ধিত সংস্করণ' পর্যন্ত তার সঞ্চরণ কত সহজেই না প্রকাশ পায়। এবং এ আবর্তে দোলা কাকিমার মতো অনেকে আকর্ষিত হতে থাকে। কবিতা থেকে যৌনতা অথবা যৌনতার কাব্যকেও তিনি অনুভব করেন নিজের মতো করে। জীবনযাপনের প্রাত্যহিক গ্লানি থেকে বিস্ফোরিত হয়ে কল্পনা চিন্তার নির্দিষ্টতাকে এড়িয়ে যেতে চায় তার আখ্যান।

এযাবৎকাল প্রকাশিত মধুময়ের সব গল্পের মধ্যে লক্ষ করা যায় একটি অখণ্ড প্রবহমানতা। জীবনের অজস্র অভিজ্ঞতাকে তিনি জড়ো করেন, কিন্তু তাদের স্থাপন করেন সময়ের প্রাতিসাম্যে। তাই তারা পৃথক হয়েও সংলগ্ন। সংলগ্ন হয়েও স্বতন্ত্র। নমুনা হিশেবে 'রাত্রির পরিধি-র উল্লেখ করা যেতে পারে। এ বইতে দশ অথবা এগারোটি কাহিনীতে নানামহলের প্রতিভাস থাকলেও তাদের মধ্যে অন্তর্লীন একটি একান্নবর্তিতা পাঠকদের কাছে অলক্ষ থাকে না। 'বিহান' নামক সত্তাটি, যে নামের প্রতি মোহ রয়েছে স্বয়ং লেখকেরই, শৈশব থেকে যৌবন এমনকি প্রায় প্রৌঢ়ত্বেও পৌঁছে যেতে থাকে নিগূঢ় অভিজ্ঞতাসমূহের সমীকরণ ঘটিয়ে। প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে বিনুনি বুনতে বুনতে তিনি চলেন, তাই তাঁর কাছে যে একই প্রকৃতি যেন কত প্রকৃতি, একই মেয়ে কত রকমের মেয়ে, একই বাস্তবতার কত ধরনের রূপান্তর। ক্ষতচিহ্নলাঞ্ছিত আমাদের রূঢ় দৈনন্দিন জীবন তাই যেন অনিবার্যভাবেই কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে পড়তে চায়। জলের মতো একা একা ঘুরে ঘুরে চলতে গিয়ে যেন তাকান মধুময় ও তাঁর সৃজিত চরিত্রসমূহ। সে একই সঙ্গে কখনো বিহান কখনো বাসব কখনো শোভন।

এ কথাগুলি মাথায় রেখে মধুময় নির্বাচন করেছেন প্রকাশের এক অস্পষ্ট ভঙ্গি যা চেতনা ও অবচেতনকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে। সুররিয়ালিষ্ট চিত্রশিল্পী যেমন একই ক্যানভাসের মধ্যে স্পর্শ করেন বাস্তবের বহুস্তরতাকে, প্রকৃতি মানুষ চিন্তা অনুভব একসঙ্গে গলে মিশে যায় স্পষ্টরূপ থেকে ব্যঞ্জনাময় রূপকল্পে, মধুময় সে দুরূহতাকে ধরতে চান ভাষার শরীরে।

কিন্তু এখানেই বোধ করি থেকে যায় কিছু সংশয়। পদ্ধতির এ কৃৎকৌশলের মধ্যে উঁকি মারতে থাকে যেন খানিক অনুবর্তনের অভ্যাস। অথচ পাঠক হিসেবে আমরা তো চাইতেই পারি কোনো সমর্থ লেখক ছাড়িয়ে যাবেন নিজেকেই। একবার নয়, বারবার। স্বরচিত আবর্তের কাছে আত্মসমর্পণ সর্বদা নিরাপদ নাও হতে পারে। মধুময় নিশ্চয়ই তা জানেন।

আসলে মধুময়ের লেখায় প্রায়শই প্রশ্রয় পায় একটি বিপ্রতীপের বিন্যাস। দৈনন্দিনতাকে তিনি নিয়ে যেতে চান লোকোত্তরে, আবার মেঘসঞ্চরণ থেকে অনায়াসে চলে আসেন লোকায়তের সীমানায়। তাই তার বাক্‌ প্রতিমায় মূর্ত হয়ে উঠতে থাকে আশ্চর্য এক রহস্যময় বাতাবরণ। তাঁর যে-কোনো গল্পের মধ্যেই আমরা পেয়ে যাই মধুময়ের শিল্পধারণা ও সৃজনের এক ব্যতিক্রমী সমন্বয়কে।

'অন্তর্জলি'র নিখিল কারক। তার অনুভবে অনায়াসে ধরা পড়ে তুচ্ছ দৈনন্দিন পরিপার্শ্বের কাছে বিশ্বের অনুরূপ। 'জানালা দরজা বন্ধ থাকায় লাইব্রেরি ঘরে ভ্যাপসা গন্ধ জমে আছে। নিখিল জানালা খুলে দিল। বাইরে বৃষ্টি ও হাওয়ার বৃন্দাবন। এই জানালা দিয়ে দূরের আকাশে কালো মেঘের স্ট্রিট কর্ণার বা মামড়ির মতো মেঘের উড়ে যাওয়া, বা দুপুরের পাখির ডাকে

সন্ন্যাস বা সামন্ত-স্মৃতির মতো প্রান্তরেখার দিনমান কতকাল দেখেছে সে'—প্রতিটি শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে, বাক্যগঠনের মধ্য দিয়ে একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দূরত্ব তৈরি হয়। তার অনুষঙ্গ ফলবান হয়ে ওঠে যত্ননির্মিত রূপকান্তিতে। আমাদের পরিচিত পৃথিবীর শব্দ গন্ধ স্পর্শের অনুভব থেকে বিচ্ছুরিত হতে থাকে শরীরী প্রতিমা যার অনুভবে পাঠককুলও ক্রমাগত হতে থাকেন ফলবান। কথানকের মূল শক্তি যে কথাই মধুময় তা জানেন। তাই কথাকে কতটা শাণিত ও সমৃদ্ধ করে তোলা যেতে পারে প্রমাণ তিনি রেখে যান প্রতি পরতে। তার মানে এই নয় যে তিনি সুযোগ পেলেই কান ফেরান কোকিলের দিকে। বাইরে তিনি অবশ্য তাকান প্রায়শই, কিন্তু যোগাসনে রুদ্ধ মহেশ্বরের মতো করে নয়। তাই 'যাত্রী' পড়তেপড়তে একটা বেদনায় উপনীত হয় নিখিল কারক। 'আবিশ্ব স্বপ্নের দেশটা ভেঙে খান খান হয়ে গেল। পৃথিবীর ইতিহাসে এতবড় পতন নেই। যে পতন ভূগোল বা অর্থনীতি বা অস্ত্রশক্তির মাপে ধরা যাবে না। যৌথ স্বপ্নের যদি কোনো মাপ থাকে, ধরা যেতে পারে। এটুকু ভেবেই নিখিল গুটিয়ে যায়। দু হাজার টাকার কৃপার পাত্র যৌথ স্বপ্ন মারাচ্ছে।' ব্যক্তি থেকে বিশ্বে, বিশ্ব থেকে ব্যক্তিতে অবিরত চলাচল মধুময়কে নিরন্তর তাড়না করে। এবং তার থেকেই বোধ করি নির্মিত হয় মধুময়ের নিজেকে নিজের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যানের প্রক্রিয়া। বিষয়টি নিয়ে একটু ভাবনার অবকাশ আছে।

মধুময়ের সঙ্গে গল্পের পথে চলতে গিয়ে মনে হয় তিনি ক্রমে অত্যন্ত নির্জনতায় নিজেকে প্রোথিত করেছেন। জীবনানন্দের মতো তিনি পথ হেঁটে চলেছেন, একা। তাঁকে মনে হতে থাকে নিঃসঙ্গ, বিবিক্ত। তিনি প্রকৃতির মধ্যে নিমজ্জিত, জাগতিক বাস্তবতার সঙ্গে যেন যোগ নেই। কিন্তু তা মাত্র কিছু সময়ের জন্যই। অচিরেই পরিপার্শ্ব তাঁকে আক্রমণ করে সামগ্রিক কলুষ নিয়ে। তিনি ক্রমে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে থাকেন। তখনই ঘটে যায় নিঃশব্দ বিস্ফোরণ। 'উড়ালি বিরালি হাওয়া ঝড় হচ্ছে, বুঝল পরমার্থ, ততক্ষণে ছড়ানো ফুলরাশি উঠোন থেকে বাগান থেকে সরে সরে কোণে কোণে অন্ধকারে জড়োসড়ো হয়েছে। সে চেয়ার ছেড়ে উঠে বারান্দা থেকে নিজে আকাশ খুঁজে দেখল, তেমনই নক্ষত্রখচিত, মেঘ নেই। তার বাসনা, 'নির্মাল্য যেন আর না আসে।' কেননা পরমার্থ যেন জানে নির্মাল্য তার সম্পর্কে কী ভাবে। নির্মাল্যের ভাবনার একটুকরো পাঠক খানিক আগেই কিছুটা পেয়েছেন—'জমিদারবাড়ির ছেলেদের নিয়ে এককালে তোমরা বিস্তর আমড়াগাছি করেছ। ফিউডাল সিস্টেমখারাপ, অথচ জমিদার পুত্ররা আদর্শস্থানীয়। সেই জমিদার পুত্র যদি মস্কোটস্কো নিয়ে ভাবত, বামপন্থীদের মধ্যে তার সে কী হ্যালো, মনে পড়ে? পারিবারিক ঐতিহ্যের নামে তোমরা সেই ফিউডাল সিস্টেমকেই জিতিয়ে দিয়েছ। সামাজিক ঐতিহ্য খোঁজোনি। চাষাভুষোর বিদ্যেবুদ্ধিতে আস্থা রাখোনি।' (অলীকসন্ধ্যা)। মধুময় যেন নিয়মের মধ্যেই দুটি সত্তাকে মুখোমুখি করে, যেন দুটি পক্ষেই ঝুঁকে পড়তে চাইছেন। কিন্তু তবু তাঁর পক্ষপাত আড়ালে থাকছে না। আড়াল খুঁজতে তিনি চানও না। এটাই বুঝি তাঁর প্রত্যাখ্যান।

১. অন্তর্জলি

অন্তর্জলি

জলের জাগরণ দেখছিল নিখিল কারক। স্কুলের মাঠে মাথা তুলছে জল। চারদিক রুদ্ধ বলে সবাই যখন মাথা নিচু করে থাকে, মেনে নিতে থাকে, মেনে নেওয়াটাই অভ্যাস হতে থাকে, গ্যাস চেম্বারে গণহত্যার মতো অমানবিকতা মেনে নেয়, কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বিবেকী মানুষজনের নিঃশব্দ এলিমিনেশন মেনে নেয়, কাটমানি খাওয়া লোকের মুখে সততার বাক্‌তাল্লা মেনে নেয়, মেনে নেয় ইতরতার ঈশ্বরত্ব, জল জেগে ওঠে। অশাসনীয় স্পর্ধায় নিজেকে গভীর গভীরতর করে সব সোশ্যাল পোলিটিক্যাল অ্যাকাডেমিক রংবাজদের দিকে ভুরু নাচায়।

জলের জাগরণের এই ছবি বা, বলা ভালো, ভাবনা নিখিল কারক পায় ক্লাস নাইনের ছাত্র কালীসাধন সাহার খাতা থেকে। একেবারেই বেপরোয়া বেযাদপ নয়, পাতি দুষ্টুমিরও রেকর্ড নেই, লাস্ট পিরিয়ড হয়ে গেলে ক্লাসঘরের ফ্যান অফ্ করে বেরোয় বলে একবার হেডস্যারের সরস্বতী পুজোর ভাষণে প্রশংসা পেয়েছে যে, সেই কালীসাধন, যে কিনা স্কুল থেকে ঘুঙির খাল পেরিয়ে ছুটিপুরে বাড়ির পথে একা একা হাঁটতে হাঁটতে অবন ঠাকুরের 'নালক' মুখস্থ করেছে, সেই কালীসাধন সাহা, বাজারের চালওলা হরিসাধন সাহার ছেলে 'বর্ষার একটি সকাল' বিষয়ক রচনায় লিখেছে, 'স্কুলের মাঠে জল এতটাই মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে যে সকলেই অবাক। জল সর্বদা নিম্নগামী নয়। সেদিন ভোরে পাড়ার মানুষ দেখল, স্কুলের মাঠে জলের মাথা অনেক উঁচু। আকাশে তখন বেশি কালো নেই। এটা সাহস যে অন্ধকারে ঠাহর করার অসুবিধা কেটেছে। আমাদের ঘরবাড়ি জলের পথ বন্ধ করেছে বলেই তো রাগের মতো জল জমেছে। ....' পড়তে পড়তে নিখিল অবাক হচ্ছিল। ছেলেটা বুঝে লিখেছে? নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছে? জলের মাথা তুলে দাঁড়ানো নিজে দেখেছে? নাকি কারও শেখানো বা কোথাও পড়া? শেষ দুটি বাক্য গেঁথে গেল নিখিল কারকের মাথায়। যেভাবে সে একদা ভালো লেখা ও বলার সংকলন তৈরি করেছে নিজের ভেতর। 'আমরা জলকে তাড়ানোর আয়োজন করেছি বহু ভাবে। জল আমাদের উৎখাত করবে না তো? বর্ষার সকালে স্কুলের মাঠের সামনে দাঁড়িয়ে ভয় হল।' নিখিল বিশ্বাস করতে চায়, এটা কালীসাধনের লেখা, এটা ক্লাস নাইনের ছেলের ভয়। যে ছেলের

বেঁচে থাকার পক্ষে ঘরবাড়ি মা বাবা অপরিহার্য, যে ছেলে বেঁচে থাকার স্বপ্ন পেয়েছে, যে ছেলে সমাজে কিছু মাতব্বরের দৌরাত্ম্য দেখছে। নিখিলও এমনই ভয় পায়, যদিও পাশ কাটিয়ে বেঁচে-বর্তে থাকার ঘাঁতঘোঁত সে শিখে ফেলেছে। কালীসাধন ঘুঙির খালে জলস্রোত দেখে, ডিভিসি-র ছাড়া জলে ছুটিপুরে বন্যা দেখে, বানের জলের নীচে ফসলের শ্রমের আকাঙ্ক্ষার শবরাশি দেখে। কিন্তু সেসবে সে ভয় পায় না। ভয় পেল স্কুলের মাঠে জমা জলে। নিখিল ভয় পেলেও ভয়ের কথা লিখতে পারে না। ভয়ের কথা লেখায় ভয় আছে। নিখিলের মতো আরও অনেকেই ভয় পায়। তাদের কথাই লিখেছে কালীসাধন।

লেখাটা যে কালীসাধনেরই মন ও মাথার অক্ষরমালা সেটা বিশ্বাস করতে এভাবে যুক্তি সাজায় নিখিল কারক □ চালাক-চড়িন্দর লেখক হলে জলকে অবতার বানিয়ে, মুক্তিদাতা-টাতা বানিয়ে, বৈষম্যবিনাশী সমাজসুষমা সঞ্চারী ভাবমূর্তি গড়ে, দুষ্টের দমন শিষ্টের পালনে যুগে যুগে সম্ভবামির ভাব-সম্প্রসারণ দিয়ে শেষ হত। তা হয়নি। বরং ভয়ের কথা বলা হয়েছে। □ লেখাটা এভাবেও শেষ হতে পারত যে, কতিপয় দুরাত্মাকে পরাস্ত করে মানবসমাজ জলকে মুক্তি দিয়েছে, জলের প্রবাহের পথ খুলে দিয়েছে লক্ষ লক্ষ ভগীরথ, মৃত দেশ দেশিকতা উজ্জীবিত করতে করতে প্রবাহিত হয়েছে জল এবং এই আশাবাদী উপসংহারের একটা ভবিষ্যৎ আছে যা লেখককে অর্থ-যশ দিয়ে থাকে। ভয়ের কথা তা দেয় না। □ ভয়ের কথা লেখার পরিণাম ভয়ংকর সব বিপদ ডেকে আনা। যেমন, লেখকের মানসিক সুস্থতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার পরমর্শ দেওয়া হতে পারে। তার ধোপা-নাপিত বন্ধের ফিসফিস সার্কুলার জারি হতে পারে। যেমন, লেখককে গণতন্ত্র-বিরোধী সমাজবাদ-বিরোধী বলা শুধু নয়, মৌলবাদী চক্রের পাণ্ডা বা ভাড়াটে কলমচি বলে চিহ্নিত করা হতে পারে। সুতবাং ভয়ের কথা সেভাবে না লেখাই এখনকার অভ্যাস। কিন্তু এখানে সেই অভ্যাসের ছায়া নেই। □ বন্যায় যে ভয় থাকে, ফসল ধ্বংসে যে ভয় থাকে, জলবন্দি মানুষের যে ভয় থাকে, বন্যাজনিত মৃত্যু ও পচনের কারণে রোগবিস্তারের যে ভয় থাকে, সেসব খবরের কাগজে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, একে ওকে বাঁচিয়ে, ওকে তাকে ফাঁসিয়ে কোন খেলা যে খেলব কখন জেনে লেখা-টেখা হয়। কালীসাধনে সেসবের ছাপ নেই। □ কালীসাধন লিখতেই পারত, যেভাবে সবাই লেখে, যেভাবে সব পুস্তকে থাকে, যে, বছরে ছয় ঋতু ...... গ্রীষ্মের দগ্ধ মাটি বর্ষার জলধারায় সিঞ্চিত হয় ...... কী অপূর্ব দৃশ্য .... আকাশ ঢেকেছে মেঘে ...... হাওয়ায় দোলে বর্ষণ-ধোয়া সবুজ ...... তাই তো কবি বলেছেন ..... তবে বর্ষার গ্রামাঞ্চলে রোগের প্রকোপ বাড়ে .... এরকম এক বর্ষার সকালে পুকুর ভরে আছে জলে, জলে আকাশের ছায়া ভাসে, ভেজা মাটির গন্ধ আসে ইত্যাদি প্রভৃতি বা একটু অন্যরকম, গরিব মানুষের ঘরে জল পড়ে জল নড়ে। কালীসাধন লেখেনি।

কালীসাধন যা লিখল তার মূল্যায়ন কীভাবে করবে নিখিল কারক!

৩. অন্তর্জলি

স্পষ্ট মনে আছে, সেদিন শনিবার ছিল। মাঝখানে একটা সি এল মেরে দিলে টানা সাতদিনের ছুটিধারার মধ্যে ফ্যাকড়ার মতো আপদের মতো শনিবার। হেডস্যারটা লাইনের নয়। স্কুলের ফাউন্ডেশন ডে বা স্পোর্টস্ ডে বা কারও একটা বার্থ-ডে-র ছুটি এগিয়ে এনে অ্যাড্জাস্ট করার প্রস্তাব দিয়েছিল দুই শিক্ষক নেতা। হেডস্যার মানেননি। 'সে কী করে হয়? স্পোর্টস্ হবে সেই শীতে, এখনই তার ছুটি দেওয়া যায় কীভাবে? স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবস পাল্টানো যায়? কোনো মনীষীর জন্মদিন পাল্টানো যায়? লোকে শুনলে হাসাহাসি করবে যে! না না, সে হয় না।' 'মালটা পাঁড় কংগ্রেসি। জোত-জমি হাতছাড়া হওয়ার রাগ পুষে রেখেছে। শিক্ষকসমাজের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা ছাঁটাই করে শোধ তুলছে। কাকে ধরে মালটা হেডু হয়ে এল! নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ির ফাঁক তালে এভাবেই বিরোধীরা ঢুকে পড়ে। ফ্যাকড়ার মতো আপদের মতো শনিবারটা জেগেছিল। স্কুল খোলা ছিল। অবশ্য বেশির ভাগ ছাত্র ও শিক্ষক অনুপস্থিত। হেডস্যারের নির্দেশে ক্লাস নাইনের ছেলেদের সেকেন্ড পিরিয়ডটা যাহোক করে এনগেজড্ রাখতে হল নিখিল কারককে। অফিসিয়ালি সেভেনের ওপর কোনো ক্লাসে ঢোকা তার নিষিদ্ধ ছিল বছর পাঁচেক আগেও। সহকর্মীরা এক মিটিংয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, যেহেতু শ্রীনিখিল কারক বি টি বা বি এড করে নাই, যেহেতু তাঁহাকে পূর্ণ সময়ের শিক্ষক পদে নিয়োগ করা সম্ভব নয়, যেহেতু তিনি পূর্ণ বেতনও পান না, সেইহেতু তিনি স্কুলে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াইবেন। ভবিষ্যতে তাঁহার নিয়োগ বৈধ করাইতে এবং যাহাতে তিনি পূর্ণ সময়ের শিক্ষকের মর্যাদা ও পূর্ণ বেতন পাইবার অধিকারী হন তাহার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট থাকিবে। সিদ্ধান্তের পেছনে কিঞ্চিৎ রাজনীতি ছিল, তাকে সরিয়ে অন্য কাউকে ঢোকানোর আন্তর্জাতিক প্রয়াস ছিল, আন্তর্জাতিক কেননা যে প্রয়াসীরা সব সময় সব বিষয়ে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট স্থাপন করেন ও আন্তর্জাতিক তাৎপর্য তুলে ধরেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রয়াস সফল হয়নি, মানবিক কারণে নিখিল কারককে চিরস্থবির দু-হাজার টাকার বেতনে রেখে দেওয়া হয়েছে। ১২ হাজার — ১৪ হাজার — ১৬ হাজার বা তারও বেশি বেতনে যাদের কিছুই হয় না, কোনোক্রমে চলে, যারা অধিকতর উপার্জনের নানা পথ খোলা রাখে, তারাই শ্রীনিখিল কারকের ২ হাজার টাকা বেতনকে যথেষ্ট মানবিক মনে করে। এবং যেহেতু শিক্ষকরা স্কুলে লোড কমানোর ফন্দি আঁটেন, নিখিল ক্লাস নাইনে, ক্লাস টেনে ঢোকার মর্যাদা পায়। হেডস্যার বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদে বিশ্বাসী না হলেও এসব জানেন। তাই তিনি বলেন, যা হোক করে একটা পিরিয়ড এনগেজড্ রাখুন ছেলেদের। ক্লাসে ঢুকে নিখিল কারক 'বর্ষার একটি সকাল' নিয়ে দু-পাতা লিখতে বলে। ছেলেরা জানতে চায়, স্যার, রচনা তো? আমরা 'বর্ষাকাল' পড়েছি, বর্ষার সকাল পড়িনি। আমরা 'বাংলায় বর্ষা' পড়েছি, বর্ষার সকাল পড়িনি। আমরা 'বন্যা ও তার প্রতিকার' পড়েছি, বর্ষার সকাল পড়িনি। নিখিল বলে, বর্ষার কোনো সকাল তোমরা দেখনি? রাতভর বৃষ্টির জমা জল ভাঙোনি? বর্ষার গান শোনোনি?

বর্ষার কবিতা পড়োনি? কোনো ভোরে কি দেখোনি সারা আকাশ ছাতার মতো কালো হয়ে আছে? ভোরবেলা মাঠে জলে ভেজোনি? যা দেখেছো, যা মনে হয়েছে, তাই লেখো। যা মনে আছে, তাই লেখো। ভাবো, ভাবো।

তখন বৃষ্টি পড়ছিল।

সেদিন শনিবার ছিল। বিভাস এসেছিল। বেলা তিনটে নাগাদ। পাশেই একটা বাড়িতে ছাত্রদল নিয়ে বসার আগে সে স্কুলে আসে খোঁজখবর নিতে। সে জানত নিখিল লাইব্রেরিতে থাকে এ সময়।

একা বসে কী করছ?

বিভাস ভালোই জানে যে নিখিল কী করে।

বেরোবে না?

নিখিলের কোথাও যাওয়ার নেই, বিভাস জানে।

কোথায় যাবে?

নিখিল জিগ্যেস করে, তোমাদের কাজ যেন কবে?

২৪ তারিখ, সামনের শনিবার।

বিভাসের বাবা প্রয়াত হয়েছেন। তাই বিভাস ছুটি নিয়েছে। হবিষ্যি করতে হয়। নিষ্ঠাবান পরিবার। নিয়ম না মানলে আত্মীয়স্বজন বিরূপ হবে। যদিও বিভাসের বাবা অন্য কোথাও থাকতেন, এখানে ছেলের বাড়িতে কখনও এসেছেন কিনা কেউই জানে না, বাবার মৃত্যুতে বিভাস লম্বা ছুটি নিয়েছে. এটা নিয়ে টিচার্সরুমে কথা হয়েছে।

বিভাস বলে, ক্ষিতীশবাবু কখন গেলেন?

ঘণ্টাখানেক আগে।

পরশু একটা চিঠি দেব। ছুটি বাড়াতে হবে। বিভাস বলে।

অশৌচের পোশাক পরে আছে বিভাস।

নিখিল কিছু বলে না।

কেউ কিছু বলেছে।

আমাকে বলেনি।

আমি তো আর বেড়াতে যাব বলে ছুটি নিইনি। শ্যালিকার বিয়ে বা শাশুড়ির অসুস্থতার জন্য তো ছুটি নিইনি। বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। আমি বড় ছেলে। আমাকেই কাজ করতে হবে। আমাদের পরিবার পারলৌকিক কাজকর্মে বিশ্বাসী। পারিবারিক সংস্কারকে ধুস্ করে দেওয়া যায় না। মৃতকে শ্রদ্ধা জানানোর এটাও একটা রীতি। বাবা আমাদের জন্য কম করেননি। নিজেকে সব সুখ থেকে বঞ্চিত করে তিনি ভাইকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। আজ যে করে-কম্মে খাচ্ছি সে তো বাবার জন্যই। তা অত বলারই বা কী আছে। আমার ছুটি দরকার, নিয়েছি।

বিভাস থামে। দম নেয়। নিখিলকে এসব বলার মানে নেই, তবে দরকার হয়ত ছিল বিভাসেরই।

বসবে না? নিখিল বলে।

বিভাস কুশাসন পেতে চেয়ারে বসে। নিখিল দেখে, কুশাসনটা গড়পড়তা মাপের চেয়ে বড় এবং সুন্দর শোকের ডিজাইন। নিখিল খেয়াল করে, বিভাসের কোমরে সিল্কের কাপড়ের চওড়া কালো ফিতে, দামি টাইয়ের মতো চিকন, বোধহয় ধুতি সামাল দিতে বেল্টের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

বিভাস বলে, আমার কানে এসেছে। বাবা আমার কাছে থাকতেন না, অথচ বাবার মৃত্যুতে আমি লম্বা ছুটি নিয়েছি, এসব নিয়ে সহকর্মীরা হাসি-মস্করা করছে। বাবা আমার কাছে কেন থাকতেন না তা ওদের কাছে জবাবদিহি করতে হবে নাকি! আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে কথা বলার অধিকার কে দিল! যত সব অশিক্ষিত গেঁইয়া মোড়ল। জীবনেও ভাবিনি এরকম শুকনিদের সঙ্গে চাকরি করতে হবে। ভাগাড়ের জীবের স্বভাব কি পি এইচ ডি-তে পাল্টায়?

নিখিল কিছুই বলে না, কী বলবে। টিচার্সরুমের কথাবার্তা সবই পৌঁছেছে বিভাসের কাছে। নির্দিষ্টভাবে সে পি এইচ ডি করা একজনের কথা যখন বলল, তার মানে এই যে কেচ্ছার রিপোর্ট নামধাম সমেত বিভাসের কানে তুলে দেওয়া হয়েছে। যদিও স্কুলে দুজন পি এইচ ডি, তাতেও বুঝতে নিখিলের অসুবিধে হয় না। হয়তো দ্বিতীয় পি এইচ ডি-ই বিভাসকে এসব জানিয়েছে। হয়তো দ্বিতীয় পি এইচ ডি প্রথম পি এইচ ডি-র সঙ্গে মিলে টিচার্সরুমে বিভাসের ছুটি নিয়ে হাসি-মস্করা করেছিল।

বিভাস বলে, স্কুলের পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেছে।

কিছুদিন আগে এই বিভাসই বলেছিল, ক্ষিতীশবাবু স্কুলের পরিবেশ নষ্ট করার চক্রান্ত করেছিলেন। শিক্ষকসমাজের ঐক্য ভাঙার চক্রান্ত করেছিলেন। সেই চক্রান্ত আমরা ব্যর্থ করে দিয়েছি। দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত এই ঐক্য, এই সুস্থ চেতনা, এই গণতান্ত্রিক পরিবেশ নষ্ট করার চেষ্টা যিনি করবেন তাঁর হাত ভেঙে দেব। সেই দুই পি এইচ ডি-ও কত ভাবে না হেনস্থা করেছে হেডমাস্টার ক্ষিতীশ পালকে। ক্ষিতীশবাবুরা জরুরি অবস্থা সমর্থন করেছিলেন বলে ওঁদের নাকি বাপের ঠিক নেই। এসব মন্তব্য টিচার্সরুমে চিৎকার করে করা হয়েছে। ক্ষিতীশবাবু ওদের চোখে কখনও গান্ধীবাদী, কখনও সংশোধনবাদী। নিখিল হাসতে ভয় পায়।

আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সহকর্মীরা হাসি-মস্করা করবে, পরিবেশ এতটাই খারাপ হয়ে গেছে! বিভাস বেশ উত্তেজিত।

এই বিভাস বা বিভাসরাই নিখিলের সংবাদপত্র পড়া, বই পড়া, গান শোনা, সিনেমা-নাটক দেখা নিয়ে বিদ্রূপ করেছে। ওটা খবরের কাগজই নয়, গল্পের কাগজ। ওসব বই তো

মানুষকে সংগ্রামবিমুখ করার জন্য লেখা, প্রতিক্রিয়াশীল। ওসব সিনেমা-নাটক মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন। নিখিলের কার সঙ্গে মেশা উচিত নয় সেটাও বলে দিত বিভাসরা।

অশৌচের পোশাকে আমার টুইশন করা নিয়েও মজা মেরেছে ভাঁড়গুলো। ওরা কি বোঝে না, টুইশনির শর্তই এই যে মাঝপথে বন্ধ রাখা যায় না। হয় যে করেই হোক চালিয়ে যেতে হবে, নয় সরে যেতে হবে। শরীর খুব খারাপ হলেও ছাত্রদের পড়াতেই হবে। আমি দায়বদ্ধ। ওরা বোঝে। জেনে বুঝেই আমাকে নিয়ে তামাশা করেছে। আমারও দিন আসবে। চুগলিবাজি ভরে দেব।

বিভাস উঠে পড়ে। নিখিল জানে না, তার আজকের নীরবতা আগামীতে বিভাসদের ঐক্যবদ্ধ অগ্রযাত্রায় কী ভাষা পাবে। নিখিল জানে না পরিবেশ নষ্ট করার চক্রান্তের দায়ে পি-এইচ-ডি-রা কবে ও কীভাবে তাকে অপমান করবে। নীরবতা বড় অপরাধ।

বাইক স্টার্টের শব্দ হল। তখনও টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছিল।

কালীসাধনদের খাতা তখনও দেখা শুরু করেনি নিখিল কারক। স্কুল ছুটি হয় দুটোয়। বেশির ভাগ ছাত্রও আসেনি ছুটিধারার টানে পড়ে। কিন্তু নির্ধারিত সময় পর্যন্ত স্কুল চালালেন ক্ষিতীশবাবু। নিজে বেরোলেন আড়াইটে নাগাদ। নিখিলকে বলে গেলেন, 'বাইরে গেলে মেইন গেটের চাবি আপনার সঙ্গে রাখবেন। দরোয়ানের হাতে ছাড়বেন না। কাল সকালে কম্পিউটারের ক্লাস আছে। আমি দশটার মধ্যে চলে আসব। কালকের দিনটা চালিয়ে দিন। পরশু বাঘাল চলে আসবে।' বাঘাল কেয়ারটেকার। ছুটিধারায় সে-ও গেছে বীরভূমের বাড়িতে।

লাইব্রেরি খুলে নিখিল কারক খাতাগুলো চেয়ারের পেছনে শেল্‌ফে রেখে একবার ভাবল বিল্ডিংয়ের গেটে চাবি দিয়ে আসবে কি না। বাইরের গেট খোলা। দরোয়ানজি ঘরেই আছে। কোথাও গেলে বলে যাবে। দরোয়ানজি হাজির থাকতে বিল্ডিং গেটের তালা ভেতর থেকে বন্ধ করে দেওয়া দরোয়ানজিকে অসম্মান করা ভেবে সে চেয়ারে বসল। বাঘাল যেটা পারে, নিখিল সেটা পারে না। প্রয়োজন হলে স্কুল বিল্ডিংয়ে ঢুকতে পারবে না দরোয়ানজি? সেটা হয় না। অবশ্য বাইরে গেলে নিখিলকে তালা দিয়ে চাবি নিয়েই বেরোতে হবে, ক্ষিতীশবাবুর নির্দেশ। স্কুলে কম্পিউটার আসার পর বাঘালের গুরুত্ব বেড়েছে, দরোয়ানজিকে আর তেমন বিশ্বাস করা যাচ্ছে না।

জানালা দরজা বন্ধ থাকায় লাইব্রেরি ঘরে ভ্যাপসা গন্ধ জমে আছে। নিখিল জানালা খুলে দিল। বাইরে বৃষ্টি আর হাওয়ার বৃন্দাবন। এই জানালা দিয়ে দূরের আকাশে কালো মেঘের স্ট্রিট কর্নার বা মামড়ির মতো ময়লা মেঘের উড়ে যাওয়া, বা দুপুরের পাখির ডাকে সন্ন্যাস বা সামন্ত-স্মৃতির মতো প্রান্তবেলার দিনমান কতো কাল দেখেছে সে। এখন সব সুন্দর ঢেকেছে ফ্ল্যাটে। তবু স্কুলের মাঠটা আছে বলে এখনও কিছু বৃষ্টি মাটি পায়। নিখিল জানালার পাশ থেকে সরে আসে। খামোকা মন খারাপ করে কী লাভ। পকেট থেকে

বিল্ডিং গেটের চাবি বের করে ড্রয়ারে রাখে। চাবি মানে দায়িত্ব। পায়ের চেয়ে বড় মাপের চটির মতো টিপে ধরে চলতে হয়।

বাঘাল থাকলে চা বানানোর অনুরোধ করা যেত। চা হলে ভালো হত। কত ভালোই তো হয় না ভেবে নিখিল 'যাত্রী' পড়বে বলে মনস্থ করে। সৌরভ সেনের বইটা সোমবার ফেরত দিতে হবে। মাস দুয়েক হতে চলল অফিস লাইব্রেরি থেকে নিখিলকে এনে দিয়েছে সৌরভ। কপিটা আক্ষরিক অর্থেই ঝরা পাতার বান্ডিল। সামান্য অসতর্ক হলেই ভেঙে যাবে। ঝরে যাবে উড়ে যাবে যে-কোনো পৃষ্ঠা। কয়েকটা পৃষ্ঠা ভাঁজে ভেঙে খসে গেছে। একসময় বইটা নিশ্চয় বহু লোকে পড়েছে। এই জীর্ণতায় তার প্রমাণ আছে, প্রমাণ আছে অযত্নের, অবজ্ঞারও। আলো জ্বেলে, ঝোলা থেকে বইটা বের করে, চিহ্ন-দেওয়া পৃষ্ঠা খুলে পড়তে বসল নিখিল। বাঘাল নেই, চা হবে না ঠিকই, ব্যাঘাতও ঘটবে না।

'মস্কোয় শিশুদের থিয়েটারের কথা অনেক শুনেছিলুম, একদিন সুবাকে সঙ্গে নিয়ে সেই থিয়েটার দেখতে গেলুম। থিয়েটারের প্রধান পরিচালিকা নাটালিয়া সাট্‌স্‌ ও তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ হল। ছোট ছেলে-মেয়েতে ঘর ভর্তি। মস্কো থিয়েটারের প্রসিদ্ধ অভিনেতা-অভিনেত্রীরা শিশুদের জন্যে অভিনয় করছেন, দেখলুম শিশু-মনস্তত্ত্ববিদ শিক্ষকেরা শিশুদের মধ্যে বসে তাদের মনের ভাব লক্ষ করছেন। নাটকের কোন জায়গাটা তাদের মনে লাগেনি, তারা চুপ করে বসে আছে, কোন জায়গায় শিশুদের হাসিতে ঘর আলো হয়ে উঠেছে, শিশুদের মনের এই সব আলোছায়ার খেলা, তার প্রতিটি রেশ লিখে নিচ্ছেন শিক্ষকেরা। তারপর শিক্ষকেরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নাটকটিকে শিশুদের উপযোগী করে আবার বদল করছেন। এখানে অভিনয় দেখে ইস্কুলে ইস্কুলে সেই নাটকটির অভিনয় করবার জন্যে বাচ্চারা তোড়জোড় করে। শিক্ষকেরা তো উৎসাহ দেনই, থিয়েটারের পরিচালকেরাও ইস্কুলে ইস্কুলে গিয়ে বাচ্চাদের অভিনয় করতে শেখান, শিশুদের মনের মধ্যে কল্পনার যে জগৎ সেই জগতের নানা মহলের দরজা খুলতে গিয়ে তাঁরা দরজা ভেঙে বসেন না। পুস্‌কিনের লেখা 'রাবোচি বল্‌দা' (বোকা মজুর) আর অন্য একজনের লেখা 'বাঁদর ও তার বন্ধু' এই দুটি নাটকের অভিনয় দেখেছিলুম। পঁচিশ বছর হয়ে গেছে আজও শিশুদের হাসি আর হাতছানি কানে বাজছে।'

পড়তে পড়তে একটা বেদনায় উপনীত হয় নিখিল কারক। আবিশ্ব স্বপ্নের দেশটা ভেঙে খান খান হয়ে গেল। পৃথিবীর ইতিহাসে এত বড় পতন নেই। যে পতন ভূগোল বা অর্থনীতি বা অস্ত্রশক্তির মাপে ধরা যাবে না। যৌথ স্বপ্নের যদি কোনো মাপ থাকে, ধরা যেতে পারে। এটুকু ভেবেই নিখিল গুটিয়ে যায়। দু-হাজার টাকার কৃপার পাত্র যৌথ স্বপ্ন মারাচ্ছে! আগে নিজের নেংটি সামলা, কোটের খুঁত ধরবি পরে। তবু তার মনে হয়, দেশটা শেষ হয়ে গেল, কত লোক যে খেয়ে শেষ করল, আর ওই দেশের বই বাংলায় অনুবাদের ঠিকা নিয়ে মহার্ঘ এলাকায় পাঁচ-সাতটা ফ্ল্যাটের মালিক হল এক মার্কসবাদী, সোভিয়েতকে

শুষে খেল হাজার জোচ্চোর। তাই কি? নেতারা নয়? ইস্পাতের হাসিমুখ নিয়ে গদিতে অটুট থেকে যারা ক্রাইমকে লালন করেছে আর খুন করেছে মানুষের স্বাধীনতা, যারা যুক্তির চেয়ে জবরদস্তিকে মাননীয় করেছে ঢের বেশি, সেইসব নেতাকে আমরা কি জিন্দাবাদ বলিনি? সোভিয়েতের ঘাতকরা ছিল সোভিয়েতের মধ্যেই, তাই তো থাকে। সব ক্ষমতা আলটিমেটলি মানুষের শত্রু হতে বাধ্য। এটাই নিয়তি। তবু, একটি দেশকে ঘিরে পৃথিবীর এত বেশি মানুষ এর আগে কখনও স্বপ্ন দেখেছে কি? ধর্মের কথা বাদ দাও, ধর্মের ভিত মানুষের অসহায়তায়। ধর্ম স্বপ্ন নয়, সংস্কার। আমরা ধর্মের বিকল্প হিসেবে স্বপ্ন পেয়েছিলাম। সব ধরনের সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে সেই স্বপ্ন। সোভিয়েত ভাঙার ঢের ঢের আগে সেই স্বপ্নের মহাপতন ঘটে। সেই স্বপ্ন কি কোনোদিন সংস্কারে নেমে এসেছিল?

সেসময়ই পিতৃ বা মাতৃবিয়োগের অর্থাৎ উৎসহীন হওয়ার চিহ্ন অর্থাৎ হিন্দু আচারে অশৌচের পোশাকে বিভাস হাজরা লাইব্রেরিতে ঢুকেছিল।

সেই পোশাক নিখিলের ভাবনার প্রতীকী ছায়া হতে না হতেই বিভাস হাজরা হামদোর মতো চিৎকার করেছিল, ক্ষিতীশবাবু তালে ইস্কুল খোলা রাখলেন? শিক্ষকদের একটা সাধারণ আবেদনকে মর্যাদা দিলেন না? বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভাবলেন না? এটাকেই বলে অটোক্রাসি। ডেমোক্রাটিক সোসাইটিতে এ-ধরনের জীব .....। কে কে এসেছিল? বিশ্বাসঘাতকদের চিনে রাখতে হবে। তোমার কথা বলছি না। তুমি আর কী করতে পারো। এমনিতে স্টাফ নও, তার ওপর ....। তা একা বসে কী করছ?

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'যাত্রী' পড়তে পড়তে নিখিলের মধ্যে একটা মতাদর্শ, একটা বাস্তবতা, একটা স্বপ্ন নিয়ে যে বিদ্রোহ বা বেদনা বা বিলাপ, তা যত ছোট যত অকিঞ্চিৎকর হোক, আবার মর্মরিত হচ্ছিল, বিভাস তা তছনছ করে দিল 'অপারেশন সানশাইনে'র কায়দায়। শহর সূর্য-সমুজ্জ্বল করতে পাঁচ-সাতটা বিধায়ক মধ্যরাতে মোবাইল টু বুলডোজার টু প্যারা-মিলিটারির দানবদাপটে হকার উচ্ছেদ করেছিল, হাজার হাজার গুমটি ধূলিসাৎ করেছিল, গরিব-গুর্বোদের অন্নসংস্থানের নিরুপায় ব্যবস্থা লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিল, সে অপারেশন কারও কারও জন্য লাল টুকটুকে দিন এনে থাকতে পারে, আসলে তা অবশিষ্ট আলোর সম্ভাবনাও তছনছ করে দেয়। নিখিল বিভাসকে থামালেই পারত। কী হত তাতে? বিভাস হয়ত সরাসরি নিখিলকে আক্রমণ করত। আক্রমণকে ভয় পায় নিখিল? পায়। কেন? সে ভেবেছে, অনেক ভেবেছে, স্পষ্ট কোনো জবাব পায়নি। দু-হাজার টাকা মাসিক রোজগারের দীনতা কি তাকে গুটিয়ে রাখে? নাকি ওই রোজগারের অনতিক্রমনীয় অসম্মান? ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ৬০০ টাকা বেতনের ম্যাডামরা ঘণ্টায় ঘণ্টায় লিপস্টিক ঘষে টৈসুয়া ইংরেজিতে বুক চিতিয়ে ন্যাকামি করছে? তাদের তো কুণ্ঠা নেই। লাখ লাখ টাকা খরচ করে কম্পিউটার শেখা সোনার ছেলেরা মেয়েরা দু-আড়াই হাজার টাকা বেতনে যৌবন উৎসর্গ করছে! তাদের তো কুণ্ঠা নেই। মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্তের কথা বাদ দেওয়া গেল।

যারা বিদেশি গ্রান্টের টাকায় লবচবানি করে, যারা মানুষের দেওয়া করের টাকায় সুখে-সম্ভোগে থাকে, তাদের তো লজ্জা নেই, অসম্মান নেই! বরং তারা সবসময় আক্রমণাত্মক খেলে যায়। তাহলে নিখিল কারক এত গুটিয়ে থাকে কেন? যারা নীতি ও আদর্শের কথা বেশি বলে, তারাই নীতি ও আদর্শের বিরুদ্ধে সবচেয়ে আক্রমণাত্মক খেলে। বিভাস তাদেরই লোকায়ত সংস্করণ। নিখিল ইচ্ছে করলেই বিভাসকে এক কথায় বসিয়ে দিতে পারত: 'তোমার যেমন অন্য শিক্ষকদের সম্পর্কে ধারণা ভালো নয়, তোমার সম্পর্কেও অন্য শিক্ষকদের ধারণা ভালো নয়। ব্যাপারটা নিজেরাই মিটিয়ে নিতে পারো' বা 'বিশ্বাসঘাতকরা তো তোমাদের কাছাকাছিই থাকে। চিনতে অসুবিধে হওয়ায় কথা নয়।' না হয় একটু তপ্ত বাক্য বিনিময় হত, এবং সেটা হওয়া দরকার। কেন চুপচাপ থাকে নিখিল? ভয় পায়। কীসের ভয়? জানে না। সৌজন্য সহিষ্ণুতা দিয়ে ভয়কে এড়াতে চায়। একবার ভাবে, কী লাভ বলে, কিছুই হওয়ার নয়। অনেকবার ভাবে, তবু তো ওদের আসল মুখগুলো দেখার সুযোগ মেলে। আবার ভাবে, এসবের মধ্যেই তো থাকতে হবে, খামোকা বিবাদ করা কেন। আসলে ভয় পায়। এবং সে যে ভয় পায় তা স্বীকার করতেও ভয়। কেন এত ভয় পায়— ঘুরে ফিরে প্রশ্নটির মুখোমুখি হয়েছে সে কোটিবার, আরও হবে। পাখি যেমন মানুষকে ভয় পায়— ফিঙে দোয়েল ময়না বুলবুলি, এমনকী কাক চিল শকুন ও হরিণ ভয় পায়, ক্যাঙারু ভয় পায়, জেব্রা ভয় পায়— এমনকী সাপও। নিখিলও সেই প্রাণীদের দলে, সরে পড়ে, পালিয়ে যায়, উড়ে যায়, গর্তে লুকোয়। এক প্রখ্যাত ভাস্করের কথা মনে পড়ে নিখিলের। তাঁর ছেলেটি সেরিব্রাল পালসি। ত্রিশ-বত্রিশ বছরের ছেলের এখনও সব খেলা বাবার সঙ্গে— বাবার পিঠে চেপে ঘোড়সওয়ার হয়, বাবার হাত ধরে বাগানে ছোটে, তার ছুঁড়ে দেওয়া বল বাবাকেই কুড়িয়ে আনতে হবে। বাবার কাছেই তার সব আবদার— বাবার হাতে খাবে, বাবাকে জড়িয়ে ঘুমোবে। অন্য কারও কাছে সে যায় না, মানুষকে তার বড় ভয়। সেই ভাস্কর বলেছিলেন, আমি মারা গেলে ওর কী যে হবে? ও বিশ্বাস করে না ওকে আর কেউ ভালোবাসে। সবাই ওর কাছে ভয়। শুধু আমার সঙ্গেই ওর খেলা, আমাকে জড়িয়ে ওর বেঁচে থাকা, যেটুকু স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা ওর আছে তা আমাকে ঘিরে। আমি মারা গেলে .....। ভাস্করের সেই ছেলের মতো নিখিলও কি? এই সাদৃশ্যে পৌঁছে সে স্তম্ভিত হয়। কবে কোন আদর্শকে সে বিশ্বাস করেছিল, ভালোবেসেছিল, তাকে অবলম্বন করে সে বাঁচতে শিখেছিল, স্বপ্ন দেখেছিল, আদর্শের ছায়া জুড়ে ফেলেছিল জীবনের গতিপথ, সেই আদর্শের মৃত্যু দেখে নিখিলও কি সবকিছুকে ভয় পেতে থাকল, সরে যেতে থাকল, পালাতে থাকল? স্বপ্নের জায়গা জুড়ে ফেলল ভয়? স্বপ্ন ভেঙে ভেঙে ভয়ের জন্ম হতে থাকল? নিখিল কি সেই সেরিব্রাল পালসি? তার মন ও মস্তিষ্কের বিকাশ হয়নি?

ভেতর থেকে একটা অস্বস্তি নিখিলকে তাড়া করে। লাইব্রেরিতে থাকতে পারে না। মনে হয় বাইরে গেলে হাবিজাবি ভাবনার হাত থেকে রেহাই মিলতে পারে। সে লাইব্রেরির

দরজা বন্ধ করে। একেই বলে দায়িত্ব, স্কুল বিল্ডিংয়ের মেন গেটে দুটো তালা লাগিয়ে টেনে পরখ করে। স্কুলের মেন গেট ভেতর থেকে বন্ধ। দরোয়ানজির ঘরে উঁকি দেয়। কীভাবে সে বলে? গোটা স্কুল দরোয়ানজির পাহারায় থাকার কথা। এতদিন তাই ছিল। কম্পিউটার আসার পর কেন যে দরোয়ানজির কাজ ছেঁটে দিলেন ক্ষিতীশবাবু? ওর সম্পর্কে কিছু শুনেছেন কি? কেউ কি চুগলি করেছে? করতে পারে। দরোয়ানজি স্কুলের বহু যুগের লোক। যখন দেড়শো-দুশো টাকা পাওয়া যেত, তাও প্রতি মাসে নয়, বিল্ডিং বলতে ছিল চারটা পাকা ক্লাসরুম আর হেডমাস্টারের ঘর, বাকি সব দরমা আর টিনের, সেই থেকে দরোয়ানজি আছে। একবার নাকি দেশ থেকে বউ-বাচ্চাকে এনেছিল, মাস্টারমশাইরা পরিবেশ নষ্টের সম্ভাবনার অজুহাতে পরিবার বিদায়ে বাধ্য করে। স্কুলের নতুন বিশাল বিল্ডিং হয়েছে, ইট বালি সিমেন্ট লোহা পাহারা দিয়েছে দরোয়ানজি। এই স্কুল তার অহংকার। কত ছাত্রকে সে দেখেছে বড় হতে, পাস করে কলেজে পড়ে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হতে। এখনও দেখা হলে তারা দরোয়ানজিকে নমস্কার করে হেসে কথা বলে। কত মাস্টারকে কাঁচা বয়সে চাকরিতে ঢুকতে দেখেছে দরোয়নজি। তারাই হয়ত এই প্রবীণকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আর সহ্য করতে পারছে না, তার সততার সামনে দাঁড়াতে পারছে না। হয়ত দরোয়ানজির চোখ ওদের ধূর্ততা ধরে ফেলে। সাবেক মাস্টারমশাইদের সহজ সরল জীবনযাপন দেখে অভ্যস্ত চোখ একালের মাস্টারমশাইদের ঠাটবাট ধান্দা দেখে বিরক্ত সন্দিগ্ধ হয় হয়ত। সুতরাং দরোয়ানজিকে ছেঁটে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে মাস্টারমশাইদের সম্মান বাঁচে না। ক্ষিতীশবাবু কানে দেখার লোক নন এমনই নিখিলের বিশ্বাস। তবে ভালো প্রশাসক। তিনি জানেন কন্ট্রাডিক্শন কীভাবে হ্যান্ডল্ করতে হয়, কাকে কখন কাছের মানুষ করতে হয়। তাই বলে নিখিলকে বাঘালের বিকল্প করবেন? নিখিলের কোথাও যাওয়ার নেই বলে?

নিখিল দরোয়ানজির ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে নিচু গলায় ডাকল।

ভেতর থেকে জবাব এল, হাঁ। আপনি ঘুরে আসুন।

নিখিল বলে, শোনো, আমার একটু দেরি হতে পারে।

ঠিক আছে।

তুমি কি গেট এখন বন্ধ করবে?

থাক। আপনি ঘুরে আসুন। কোনো চিন্তা করবেন না। চাবি সাবধানে রাখবেন। আপনি যা ভুলো আছেন। হেডমাস্টার বলে গেলেন, নিখিলবাবুর কাছে চাবি আছে। খেয়াল রাখবে।

নিখিল কথা হারায়। কী বলবে? যাকে অবিশ্বাস করা তাকেই বিশ্বাসভাজন সম্পর্কে সতর্ক করে যাওয়া! চমৎকার! স্কুলের বাইরে বেরিয়ে নিখিল ভাবে, এটা কি ডাবল প্রোটেকশন? দুজনকেই বিশ্বাসী ভাবার ভান করা এবং দুজনকেই অবিশ্বাস করা? দুজনের

মধ্যে স্পষ্টত পাঁচিল তুলে দেওয়া? পরস্পরের প্রতিপক্ষ করে তোলা? নিখিল আবার ভাবে হয়ত এরকম নয়। ক্ষিতীশবাবুর বেরোনোর মুখে দরোয়ানজি হয়ত বিল্ডিংয়ের চাবির কথা জিগ্যেস করেছিল। বাঘাল নেই, লাইব্রেরিতে নিখিল আছে। সুতরাং জিগ্যেস করতেই পারে দরোয়ানজি। সে অধিকার তার আছে। সেটাই স্বাভাবিক।

তখনও বৃষ্টি পড়ছিল। যদিও টিপটিপ। ছাতাটা সঙ্গে থাকলে ভালো হত, মনে হয় নিখিলের।

স্কুলের খুব কাছে 'বিশ্বকর্মা জুয়েলার্স'-এর চারতলা বাড়ি হচ্ছে তেরপল-পলিথিন শিটের পর্দার আড়ালে। কেন এই আড়াল? কনস্ট্রাকশনের কাজ যেন আশপাশের লোকজনকে বিব্রত না করে, তাই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা? ইটের টুকরো পড়তে পারে, স্টোনচিপ পড়তে পারে, সিমেন্ট পড়তে পারে। অনেকেই সে রকম ভেবেছিল। নিখিলও ভেবেছিল। পরে জেনেছে, সবাই জেনেছে, ইল্লিগাল কনস্ট্রাকশন হচ্ছে, তাই। পুরসভা অনুমতি দেয়নি, কারণ জমি নিয়ে ডিসপিউট আছে, পুরনো যে বাড়িটা ভাঙা হয়েছে তার মালিকানা নিয়ে শরিকি বিবাদ আছে, পুরসভার বিধি মেনে ওপেন স্পেস রাখা হয়নি। কিন্তু কনস্ট্রাকশনের কথা কেউ জানে না, না পুরসভা, না পুলিস, না পার্টি, না পিপল্। কেউ কোনোদিন দেখেনি, শোনেনি। এতটাই ওপেন সিক্রেট। হাওড়া ব্রিজের কাছেই একটা কনস্ট্রাকশন নিয়ে একসময় খবরের কাগজে হইচই হয়েছিল। কখন ও কীভাবে তৈরি হল কেউই নাকি জানত না। অথচ ওটার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন পুরসভার মান্যগণ্যরা, পুলিসের পদস্থরা, সমাজের বিশিষ্টরা। পরে ব্যাপারটা চাপা পড়ে যায় এবং বাড়িটা লোকজনের সমীহ আদায় করে দাঁড়িয়ে আছে। 'বিশ্বকর্মা জুয়েলার্স'-এর নতুন বাড়িও অচিরেই সেই মর্যাদা পাবে, বিতর্কিত হওয়ার মর্যাদা, অশাসনীয় থাকার মর্যাদা।

সেদিন শনিবার ছিল।

'বিশ্বকর্মা জুয়েলার্স'-এর ভিজিটরস্ রুমে তখনই ভিড় দেখে নিখিল। শনিবার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা বাকসিদ্ধ পদ্মকুমারী বসে এখানে। জর্জ বুশ যে ইরাকে জিতবেই সে কথা নাকি রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে ইরাক প্রসঙ্গ ওঠার আগেই বলে দিয়েছিল পদ্মকুমারী। বুশকে সে নাকি ফ্যাক্স করেছিল। এসব নিয়ে কেউ কেউ ঠাট্টা করে, পদ্মকুমারীর ক্লায়েন্ট বাড়ে, চার্জ বাড়ে। জুয়েলার্স-এর মালিকের ব্যবসা প্রতিপত্তি বাড়ে।

ভট্চাজের চায়ের দোকানের দিকে এগোয় নিখিল। লিচুতলার মোড়ে পৌঁছে সুপার মার্কেটের সামনে দেখে বিশাল গার্ডেন আমব্রেলার নীচে শনিপুজোর এলাহি আয়োজন। ফুলে মালায় ধূপে দীপে জমজমাট ভক্তি শ্রদ্ধা। একটু দূরে ফুল-মালার অস্থায়ী দোকান লাগিয়েছে কেউ। পাশেই 'পবিত্র মিষ্টান্ন ভাণ্ডার' লেখা দু-ফুটের কাচের বাক্স নিয়ে এসেছে কেউ। ছাব্বিশ বছর আগে, তখন সুপার মার্কেট ছিল না, মহিম মুদির দোকান আর রাধেশ্যামের হিন্দু হোটেল ভেঙে আর নাবাল জমি ভরাট করে সুপার মার্কেট হয়েছে বছর চার-পাঁচ

হল, নিখিল এখানে এই শনিপুজোর ভিতে আন্তর্জাতিক প্রসিদ্ধ বামপন্থী জননেতার সভা শুনেছিল। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি তখন দক্ষিণপন্থী সন্ত্রাসের দুঃস্বপ্নে নির্জীব হয়ে আছে। সভা জনসাধারণকে শক্তি দেয়; উদ্দীপনা দেয়। অসাধারণ বলেছিলেন সেই বামপন্থী নেতা। আজ সেখানে জমজমাট শনিপুজো। বেশি দূর নয় অতীতে, খাদ্য সংকট নিয়ে, চিকিৎসা সংকট নিয়ে, বেকার সমস্যা নিয়ে, পুলিসি নির্যাতনের বিরুদ্ধে, শাসক দলের গুণ্ডামির বিরুদ্ধে, গণতন্ত্রের দাবিতে, মৌলিক অধিকারের দাবিতে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে ধিক্কার জানিয়ে, রাষ্ট্রপুঞ্জের ক্লীব ভূমিকার নিন্দা করে যেখানে যেখানে স্ট্রিট কর্নার হত, আজ সেই সব মোড়ে সমারোহে শনিপুজো হয়।

ভট্চাজের চায়ের দোকান থেকে ডাক আসে, নিখিলবাবু!

নিখিল কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে পড়া থেকে মনকে ফিরিয়ে আনে। কেমন আছেন ভট্চাজদা!

আপনি তো আমার দোকানে আসা ছেড়েই দিলেন।

হ্যাঁ। অনেকদিন এদিকে আসা হয়নি। আমবাগানের নতুন পথটা হওয়ায় ওদিক দিয়েই বাড়ি চলে যাই। এদিকে কমই আসা হয়।

বাড়ি করেছেন নাকি?

না না। গড়ের ধারে ঘরভাড়া নিয়েছি।

তাই বলুন। বাড়ি করার কী দরকার আপনার! একা মানুষ। বেশ কাটিয়ে গেলেন। সাধু-যোগীর মতো। লিকার দেব?

দিন।

চিনি?

স্বাভাবিক।

একা জীবন কাটানো কঠিন। চারপাশে এত লোভ লালসা। মনের জোর লাগে। আমাদের গ্রামে গিরিজা সান্যাল ছিলেন। স্বদেশি করা মানুষ। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এক-একজন স্বদেশি, কিছু মনে করবেন না, বিয়ে করেই পটাপট বাচ্চা পয়দা করেছে। অত যে সংযম, সব রাতারাতি বানে ভেসে গেল! স্বাধীনতার কী আনন্দ! তেনারাই পরে বাণী দেন, আমরা এই স্বাধীনতা চাইনি। তা গিরিজা সান্যাল বিয়ে-থা করেননি। গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান মানুষের সেবায়। পার্টির কাজে জেলা সদরে থাকেন মাঝে মাঝে। কংগ্রেস করেন, পরে মন্ত্রী হয়েছিলেন। বোঝার উপায় ছিল না যে উনি মন্ত্রী। ধরেন, বিস্কিট দেব? এইটা নেন। আমি বলছি, খেয়ে দেখেন। বিস্কিটে তো বিপ্লব হয়ে গেছে। গিরিজাবাবুর কথা বলছিলাম। উনি মন্ত্রী হলেন। এখনকার মন্ত্রীরা তো মহারাজা তোমারে সেলাম। কী বলি, আমার কথা কে-ই বা শোনে, চায়ের দোকান করে খাই, আমাদের এম এল এ-র কথাই ধরুন, অসূর্যম্পশ্যা নয় চাঁদের অমাবস্যা। গ্রামের বাড়ি থেকে সাইকেলে স্টেশনে যেতেন গিরিজাবাবু। একদিন স্টেশনে বসেই মরে গেলেন। টের পাওয়ার লোক ছিল না ধারে-কাছে। অনেক পরে জানল

যে, মরা মানুষটা মন্ত্রী। অথচ ওই লোকটা নাকি প্রচুর সম্পত্তি করেছে, মেয়েমানুষ রেখেছে বলে রটিয়েছে নিন্দুকরা।

আমার সঙ্গে আপনার গিরিজা সান্যালের মিল কোথায়? উনি বিয়ে করেননি, আমিও করিনি, তাই তো?

সেটা একটা কথা। বড় কথা হল, লোভ না করা। ভট্চাজ আরও কিছু বলে বোঝাতে যে, নির্লোভ মানুষ কল্‌কে পায় না।

নিখিল কারক ভট্চাজকে বলতেই পারত যে সে মোটেই নির্লোভ নয়, তার হয়নি, জীবনে যাকে দাঁড়ানো বলে সেটা সে পারেনি। বলে না, কী লাভ? শুধু বলে, গিরিজা সান্যালের কথা আপনি ও আপনার মতো মানুষরা মনে রেখেছেন। আমি মরে গেলে সৎকার সমিতিকেও কেউ খবর দেবে না।

কী যে বলেন! আপনার কত ভক্ত জানেন না। ছাত্রদের কথা আমার কানে আসে তো। বুঝি, ছাত্ররা আপনার জন্য দুঃখ করে।

কী করুণ অবস্থা নিখিলের। তার ব্যর্থতা নিয়ে ছাত্ররা আলোচনা করে, হয়ত অনুকম্পাও করে। ভট্চাজকে নিখিল প্রশ্ন করে, ওরা কি নিখিলস্যার বলে, না কারক-বিভক্তি?

ভট্চাজ থমকে যায়। তারপর বলে, নিজেকে অত ছোট ভাবেন কেন?

নিখিলের নাম 'কারক-বিভক্তি' দিয়েছে তার এক সহকর্মী। লাইব্রেরির বই দেওয়া-নেওয়া, পুরস্কারের বইয়ে নাম লেখা, পুরস্কার বিতরণী উৎসবে অতিথিদের নিয়ে আসা, সরস্বতী পুজোর মণ্ডপ সাজানো, ম্যাগাজিন ছাপাছাপিতে প্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করা ইত্যাদির বাইরে যেদিন তাকে সপ্তম শ্রেণীর ক্লাস নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হল, টিচার্স কাউন্সিলের সেই বৈঠকে এক সহকর্মী মন্তব্য করে, ও বোধ হয় বাংলা গ্রামার পড়াতে পারবে, যেমন কারক বিভক্তি, বাকিরা হর্ষোৎফুল্ল হয়েছিল। কেউ বলেছিল, সম্প্রদানে চতুর্থী। পেন্টাগনের খবরই ফাঁস হয়ে যায়, আর টিচার্স কাউন্সিল তো ঘরের কথা! মজা পেতে কাউন্সিলের এক মাতব্বর এই 'রুচিহীন' রসিকতার খবর দিয়েছে নিখিলকে।

ভট্চাজের চায়ের দোকান সেকালের দোকানের মতন, পল্লিচিত্রের স্কেচের মতন, গ্রামীণ দৃশ্যের সেটের মতন, এখনও টালির চাল, ইট-পাতা মেঝে, মামুলি কাঠের টেবিল-বেঞ্চে রয়ে গেছে এই কারণে যে কিছু লোক আজও গরিব-গরিব পরিবেশে আড্ডা দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, কিছু লোক মাটির কাছাকাছি থাকার সুযোগ ব্যবহার করে। না হলে কবেই বিশ্বায়নের সোনার কাঠি ভোল বদলে দিত। প্রস্তাব তো ছিলই। লাল্টুর কেক-বিস্কুটের দোকান মার্বেলে মুড়ে দিল ঠান্ডা জল। রামরতন ভুজোর দোকান চকাচক আলোয় হয়ে গেল 'লছমিরাম'। ভট্চাজের টার্গেট খদ্দের অন্যরকম বলেই দুঃস্থ-দুঃস্থ থেকে গেল। নিখিল এই পরিবেশ নিজের মতো মনে করে। এই পরিবেশে সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধিতা টু বিশ্বায়ন-বিরোধিতা বেশ জমে।

ফাঁকা দোকানে ভট্‌চাজ নিখিলের সঙ্গে আরও কথা বলে। নিখিলের তেমন কিছু বলার নেই, তবু ভালোই লাগে।

হঠাৎ হইহই করে দল বেঁধে ঢোকে যুবভারতী সঙ্ঘের কর্তাব্যক্তিরা। তারা ঈষৎ উত্তেজিত কোনো কারণে। একজন অন্যজনের কাণ্ডজ্ঞান নিয়ে এবং অন্যজন একজনের নীতিবোধ নিয়ে প্রশ্ন তোলায় কারণটা ধীরে ধীরে জানতে পারে নিখিল।

— দাশের বিরুদ্ধে ব্যাঙ্কের টাকা তছরুপের অভিযোগ আছে তো আমাদের কী? ওটা পুলিসের এলাকা, কোর্টের এলাকা! আমাদের সলিড় পেট্রন চাই। এত বড় প্রোগ্রাম। বিশ-পঁচিশ লাখ লাগবে। কে দেবে? পারবে তুমি জোটাতে? দাশকে এখন চাপ দিলেই টাকা বেরোবে। এটাই মওকা। মামলায় ফেঁসে কমজোরি আছে। আমাদের খুশি না করে ও বাঁচতে পারবে না।

— টাকা দরকার বলে একটা ক্রিমিনালকে ......

— ইয়েস। ক্রিমিনাল বলেই চিফ পেট্রন। আমাদের আরও ক্রিমিনাল চাই। তুমি প্রফেসর আনতে চাও, ভি সি আনতে চাও? কী হবে? রাবিশ! পারবে চারটে স্পনসর ধরে দিতে? দাশ পারে। ক্রাইম এখন বেস্ট রিসোর্স। ক্রাইমই এখন গ্ল্যামার। তুমি যদি না মানো তো অন্যের সুবিধে। সব কিছু মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে .....

বক্তা থেমে গেল। সবার চোখ নিখিলের দিকে।

ভট্‌চাজ নিখিলকে বলে, কখন উঠে যেতে বলেছি। বসেই আছেন। সবাই কী আর সাধে আপনাকে কেলানে কারক বলে! যান, এবার পাতলা হন।

রাগে মাথা ঝনঝন করে উঠেছিল নিখিলের। অসভ্য ইতর ভট্‌চাজকে খিস্তি করার ইচ্ছে হয়েছিল। সে বলতে পারত, তুই আমাকে উঠতে বলিসনি। আর বললেই বা উঠব কেন? আমি খদ্দের, চোর ডাকাত লাফাঙ্গা নই। ভদ্রভাবে কথা বলতে শিখিসনি? সে বলতেই পারত, তুই তো রেন্ডির বাচ্চা হয়ে গেছিস। বলে না। অপমান হজম করে নেয়। যুক্তি সাজায়, তার এখানে থাকার অধিকার নেই। কেউই চায় না সে থাকুক। সে অবাঞ্ছিত। জোর করে থাকা মানে আরও অপমান ডেকে আনা। ভট্‌চাজ যা বলেছে সেটা এখানে হাজির সবার মনোভাব! হয়ত অন্যভাবে তাকে তুলে দেওয়া যেত। সেটাও অপমান। সবাই মিলে তাকে বিদ্রূপ করতে পারত। সে প্রতিবাদ করত? কী হতও তাতে? সবাই মিলে তাকে রাস্তার হাজার লোকের সামনে তামাশার খোরাক করে তুলত। তার চেয়ে এটুকু অপমান ভালো। ভট্‌চাজ যে অভদ্র হয়েছে তা হয়ত বাধ্য হয়েই। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা সবাইকেই ভাবতে হয়।

নিখিল দোকান থেকে বেরিয়ে এল।

যুবভারতী সঙ্ঘের কর্তাব্যক্তিরা বলল, কী দরকার ছিল ফোটানোর। শুনলই বা। ওরা আর কথা বলে না। বলা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ভট্‌চাজ, তোমার সবেতেই বাড়াবাড়ি। আমরা তো সামাজিক কর্মসূচির কথা ভাবছি।

নিখিলের মনে হয়, তার নীতিবোধকে সম্মান দেয় ভট্‌চাজ, তাই সরিয়ে দিল।

দরোয়ানজি রান্নার তোড়জোড় করছে। নিখিল গেট বন্ধ করে লন পেরিয়ে স্কুল বাড়ির দিকে হাঁটছিল। মেঘে মেঘে সন্ধে নেমে এসেছে। বড় বৃষ্টির ভাব আকাশে। দরোয়ানজির ঘর থেকে ডাক এল, নিখিলবাবু, চা খেয়ে যান। জল গরম হয়ে গেল। বসুন। টুল টেনে নিন। তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন?

বাড়ি ফিরতে হবে। জোর বৃষ্টি আসছে। নিখিল দেখে, স্টোভ থেকে প্যান নামাল দরোয়ানজি। আটা মাখা হয়ে গেছে। তরকারি কাটা সারা। মটর ডাল ভেজানো আছে। শনিবার দরোয়ানজি বিকেলবেলা রাঁধে। কারণ, দু-চার রকম ভাজাভুজি করা যায়। খাওয়া তরিবৎ হয়। আমি তো ভেজটারিন আছি।

দ্রুত চা খেয়ে উঠে পড়তে চায় নিখিল। দরোয়ানজির কাছে বসার বিপদও কম নয়। হয়ত সেই বালিকা বধূর গল্প শুরু করবে যে কাঠবাদামের গাছ থেকে নেমে স্কুলবাড়ির দিকে হেঁটে যেত। বাড়িটা চৌধুরীবাবুদের ভিটা ছিল। বাচ্চা বউমাকে খুন করে গাছতলায় পুঁতে দিয়েছিল কোনো চৌধুরী। দরোয়ানজি ওকে চাঁদের আলোয় রাতভর হাঁটাহাঁটি করতে দেখেছে। কান্নাও শুনেছে। হয়ত বিভাসবাবু এখন মাসে পচাস হাজার টাকার টুইশন করছে বলে সাবেক মাস্টারদের ভুখা দিনগুলোর স্মরণসভা লাগিয়ে দেবে দরোয়ানজি। হয়ত দেশে তার আত্মীয়দের হাতে বউ-বাচ্চার লাথি-ঝাঁটা খাওয়ার কথা শরু করল। কিংবা, সবাই এস্টাপ হয়ে গেল, পারমিন হয়ে গেল, শুধু আপনারই কুছু হল না বলে সমবেদনা জানাতে শুরু করতে পারে।

'বৃষ্টি আসছে' বলে প্রায় ছুটে স্কুলবাড়িতে চলে আসে নিখিল। লাইব্রেরিতে বসে এতক্ষণে যেন কিছুটা নিরাপদ বোধ করে। 'যাত্রী' পড়তে ইচ্ছে করে না। ফের ক্ষুব্ধ আলোড়িত হতে পারে ভেবে। তার চেয়ে 'বর্ষার একটি সকাল' নিয়ে ছাত্রদের লেখাগুলো পড়ে ফেলা ভালো। সোমবার খাতা দিয়ে দেওয়া যাবে। খাতার জন্য ছাত্ররা তাগাদা দিচ্ছে ব্যাপারটা ভালো দেখায় না। তাছাড়া সে তো তাদের শিক্ষক নয়, গোঁজ মাত্র।

সবার লেখা প্রায় একইরকম। গ্রীষ্মের পরে আসে বর্ষা। শুষ্ক মাটি বারিধারায় সিক্ত হয়। কৃষকরা মনের আনন্দে কাজ করে। বাংলার প্রকৃতি অপরূপ সুন্দর হয়। অতিরিক্ত বর্ষণে বন্যা হয়। বন্যা আমাদের জীবনে দুর্যোগ ডেকে আনে। ইত্যাদি। কয়েকটি লেখায় একই উদ্ধৃতি আছে। বোঝা গেল, একই রচনা বই বা নোটের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। নিখিল মন্তব্য লিখল, 'ভালো', 'বেশ ভালো', 'বানান সম্পর্কে মনোযোগী হবে', 'সাধু-চলিত সংশোধন করো' এইসব।

কালীসাধনের খাতায় সে প্রথম আটকায়। খাতাটা সরিয়ে রাখে দু-বার পড়ে। সব খাতা দেখা শেষ করে আবার টেনে নেয় কালীসাধনের ভাবনা। স্কুলের মাঠে জমা জল দেখে যে ভয় পায় এবং ভয়ের কথা লেখে সে কে? খুঁজতে থাকে। পায় ছেলেটিকে। ঘুড়ির খাল

পেরিয়ে যে হাঁটতে হাঁটতে ছুটিপুরে যায়। যে নিখিলের কাছ থেকে বারবার 'নালক' নিয়েছে। যে ছেলেটিকে দেখেছে গঞ্জের বাজারে বাবার চালের দোকানে। সে-ই লিখেছে জল আমাদের উৎখাত করবে না তো, ভয় হয়? কোনো মন্তব্য লেখেনি নিখিল কারক। ভয়ে। ভয় পেয়েছে সে, যদি 'ভালো' লিখলে সহকর্মীরা এটাকেই ইস্যু করে তোলে।

সে রাতে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি হয়েছিল। জল জমল শুধু স্কুলের মাঠে নয়, সর্বত্র, শুধু নিচু জায়গা নয়, অনেক উঁচু জলের নীচে গেল। শ্বেতপদ্মের মতো ভোরে নিখিলের ঘুম ভাঙল। জানালার কাছে দাঁড়াল। দেখল দূর থেকে কালীসাধন আসছে। ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছিল ছেলেটি। গলা চিবুক নাক চোখ কান কপাল চুলের ভাঁজ সিঁথি আলোর নীচে তীক্ষ্ণ হচ্ছিল। জল দুলছিল, উঠছিল, নামছিল। জলের ওপর পা ফেলে ফেলে কালীসাধন চলে গেল। তার হাতে ছিল 'নালক'। নীল আকাশে সন্ন্যাসী রাজার উত্তরীয়র মতো উড়ছিল আলো। নিখিল ডাকল, কালীসাধন! জলে, অবশিষ্ট স্থলে, শূন্যে, বৃক্ষচূড়ে, ভাসমান সমূহ গেরস্থালির গায়ে সে ডাক আর্তনাদের মতো শোনালো। কালীসাধন শোনেনি। জলের ওপর সে হেঁটে গেল।

আজ স্কুলের মাঠে জলের জাগরণ দেখতে দেখতে নিখিলের ভেতর পুরনো অসুখের মতো জমা ক্ষোভ নিরাময়ের আশায় সংকেতে মুহূর্তের জন্য জ্বলে ওঠে। সে কালীসাধনকে খোঁজে। পায় না। চিৎকার করে ডাকে। কিন্তু কোথাও কোনো শব্দ হয় না। জলের অনেক নীচের, মাটির অনেক নীচের শব্দহীনতা উঠে এসেছে সামাজিক পৃথিবীতে। নিখিল দেখে, জল বিস্তৃত হচ্ছে, জল নয়, শবানুগমনের স্রোত, অনুগমনকারীরাও শব, ছড়িয়ে পড়ছে, নিজেও তারই মধ্যে, ভেসে চলেছে, 'দূরে দূরে, অনেক দূরে, বুকের কাছ থেকে, কোলের কাছ থেকে অনেক দূরে— চলে যাবার পথে, ছেড়ে যাবার পথে,' ক্রন্দনহীন নিষ্করুণ পথে।

যে দেশে কবির ঠোঁটে

মাথায় বৃষ্টির ঝাপটা লেগে ঘুম ভাঙল প্রিয়ব্রত গুণীর। জানালার দিকে বালিশের প্রান্ত ভিজেছে। জলের ছাট কিছুক্ষণ আসছে, যা সে টের পায়নি। মশারি তুলে হাত গলিয়ে জানালা টানার সময় তার চোখে পড়ল দূর প্রাচ্যে ছুটির বাঁশির মতো নীল আকাশ আর এইখানে ঝরঝর ঝরছে ভুষো মেঘ থেকে শিরীষ ছাতিম ও আম জাম পেয়ারার ছিন্ন সবুজে। জানালা বন্ধ না করে সে মশারি সরিয়ে জলধারার দিকে চেয়ে থাকে। শিরীষের ডালে হাওয়া নাচে, পেয়ারার ডালে আহ্লাদ। তার চোখ মুখ ভিজিয়ে দেয় ভাদ্রের ভোর। চুলের ফাঁকে গড়িয়ে যায় শান্তিস্বরূপ। জানালায় মাথা রেখে তাকিয়ে থাকতে ভালো লাগে। যেন এটাই সে চেয়েছিল।

সময় জানার কোনো ইচ্ছে ছিল না তার, উপযাচক হয়ে পাশের বাড়ির ঘড়ির ঘণ্টা আটবার বাজল। বেশ বিরক্তিকর। সময়ের ব্যবহার নিয়ে কোথাও জবাবদিহি নেই তার, স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে জবাবদিহির একটা আবছা জায়গা যেন তৈরির চেষ্টা হল। পাশের বাড়ির ঘড়ির বাজনা এই বৃষ্টিব সঙ্গে বড় বেমানান, এই রিমঝিম শব্দের গায়ে পেরেক ঠোকার মতো শত্রুতাপূর্ণ, এই ভিজে যেতে থাকার নরম রেণুসুখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া হৃদয়হীন হারমাদ। প্রিয়ব্রত জানালা থেকে মশারির ভেতর এসে বালিশে মাথা রেখে শুয়ে থাকল। চোখ বুজতে ইচ্ছে করছিল না, তবু চোখ বুজল। তার ঘুম নেই, তবু সে ঘুমোতে চাইল। ঘুমের খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে ঢুকে পড়ল অসাধারণ চারটি পংক্তিতে, যা আজ ছায়াবৃত ভোরে সে আবিষ্কার করেছে : 'নাক কান কেটে যদি কবিত্বকে খনা করে কেউ/ প্রকৃতির প্রতিশোধ বজ্র হয়ে নামে শালিধানে;/ অভাবের বাঘ আসে, ফেউ হাসে, বিড়ালীর মেউ / রাজার ভাঁড়ারে বসে প্রজাদের দুর্ভাগ্য বাখানে।'

আল মাহমুদের 'খনার বর্ণনা'র এই চারটি পংক্তি প্রিয়ব্রত আগেও পড়েছে। যতবার পড়েছে, প্রতিবারই মুগ্ধ হয়েছে। 'নারীর দেহের চেয়ে নম্য কিছু নেই পৃথিবীতে', 'খনা তো অনার্য কন্যা প্রকৃতির ঠোঁটকাটা কবি', 'নারী শক্তি, নারী স্বাহা, জ্ঞানীদের পিপাসার জল', 'ঋতুর বৈচিত্র্যে কাঁপে লীলাবতী খনার ধমনী'-র সামনে বহুবার দাঁড়ায়েছে, বহুতর অর্থে খনাকে ছুঁয়েছে। খনাকে নির্বাক করার নিষ্ঠুর কিংবদন্তি তার মাথার ভেতর অপরাজেয় প্রজ্ঞাপারমিতার মূর্তি আভাসিত করেছে।

কিন্তু আজ ভোরে অন্যরকম হল।

ভোরে ওঠার বাতিক নেই প্রিয়ব্রত গুণীর। ইদানীং মোটা ও থলথলে হয়ে যাচ্ছে দেখে দু-একজন পরিচিত বলেছে, সূর্য ওঠার আগে হাঁটুন। হেঁটে ঘাম ঝরান। মেদ ঝরে যাবে। আধিব্যাধির সম্ভাবনা কমবে। দুদিন সে কষ্টেসৃষ্টে উঠেছিল বটে, সে-এক এলাহি কাণ্ড, রাত করে ঘুমোনো চলবে না, দশটার মধ্যে শুয়ে পড়তে হবে, বড়জোর এগারোটা, খাওয়ার পর টি ভি দেখা চলবে না, খুব দরকার হলে রবীন্দ্রসঙ্গীত-শ্যামাসঙ্গীত চলতে পারে, অতুলপ্রসাদীও চলবে, তাও আধঘণ্টার ওপর নয়, নো স্মোকিং, নো ...., না না ওসব ল্যাঠা সময়ের ঢের আগে চুকে গেছে মহাশয়, হালকা লেখা পড়া যেতে পারে বিনোদনমূলক, ঠাকুরদেবতায় ভক্তি থাকলে নাম জপা যেতে পারে, মোদ্দা কথা ঘুমিয়ে পড়তে হবে, ঘুমে দেরি ও বিঘ্ন চলবে না, বিছানায় যাওয়ার আগে হাঁটু কনুই ঘাড় ভালো করে ভিজিয়ে নিন, ভেজা কাপড়ের ভেতরে যেভাবে পান মুড়ে রাখে সেভাবে শরীরকে ঘুমের জন্য তাজা রাখতে হবে—বিষণ্ণ শরীর ঘুমোতে জানে না, শেকড়ের মাটি ভিজিয়ে যেভাবে চারাগাছ সজীব রাখতে হয় সেভাবে ঘুমের চারাগাছ করে তুলতে হয়—শুকনো চারা পাতা খসিয়ে খসিয়ে ঘুম থেকে সরে যায়, এরপরও যদি জাগরণ যেতে না চায় তাহলে ভেড়া গুণতে হবে, নধরকান্তি কচি কচি ভেড়া লাফিয়ে ডিঙোচ্ছে বেড়া, এক-দুই-তিন-চার..., ভেড়া কেন—কেন নয় হরিণ—কেন নয় ক্যাঙারু—প্রশ্ন করো না, ঘুমোও, ভোরের অ্যালার্ম দিতে ভুলো না।

প্রথম দিন অ্যালার্মে জেগে উঠলেও বিছানা ছাড়তে পারেনি প্রিয়ব্রত। তার মনে হয়েছিল ঐ সময়েই ঘুম সবচেয়ে গাঢ়, সেখান থেকে নিজেকে ছাড়ানো অসম্ভব। ওই সময়েই সুখ সবচেয়ে ঘন, সেটা ছেড়ে যাওয়ার কোনো মানে নেই। দ্বিতীয় দিন সে উঠে এক-আধ মিনিট বসে চোখের পাতা টানতে টানতে আবার শুয়ে পড়ে আঃ কী আরামের মধ্যে। তৃতীয় দিন অনেক কসরত করে উঠেছিল বটে, বারান্দায় খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটির পর সবকিছু অর্থহীন মনে হয় তার। চতুর্থ দিন ঝট্ করে উঠে গোঁয়ারের মতো বেরিয়ে পড়ে পথে, আরও আট-দশজনকে হাঁটতে দেখে এবং সূর্য ওঠা দেখে ভালো লাগে। শরীর কিছু তরতাজা বোধ হয়। কিন্তু আটটার পর থেকে ঝিমুনি জড়ো হতে থাকে এবং অফিস যাওয়ার পথে ট্রেনে সে আর কিছুতেই নিজেকে যেন জাগিয়ে রাখতে পারে না। স্বাস্থ্যের লোভে সে পঞ্চম ভোরের জন্যও অ্যালার্ম দেয়। অ্যালার্ম ঠিকঠাক বেজেছিল। সে 'আজ নয়, কাল হবে' সিদ্ধান্ত নিয়ে মশারির বাইরে হাত নিয়ে অ্যালার্ম বন্ধ করে দেয়। ষষ্ঠ দিন একই ব্যাপার। সপ্তম দিন হয়ত অ্যালার্ম বাজেনি। তারপর সে 'কাল নয়, পরে হবে' ভেবে ঘড়ি দূরে সরিয়ে রেখেছে।

আজ যখন ঘুম ভাঙল, রাত নয়, ভোর নয়, পাটুলির প্রাচীন কম্বলের ওপারে আলোর মতো বিনিবিনি ভরসার অস্পষ্টতা, যেন এ সময়েই তার ওঠার কথা, এভাবেই সে উঠে

পড়ে। যেন ঘুমের অবশেষ নেই, রেশও নেই, এভাবেই সে পাশের ঘরে বইয়ের আলমারির সামনে দাঁড়ায়। যেন ঠিক এ-সময় তার খোঁজার কথা ছিল, এভাবেই সে আলমারির দরজা খুলে ফেলে এবং যেন স্বপ্নপ্রদত্ত, 'প্রেম প্রকৃতি দ্রোহ আর প্রার্থনার কবিতা' বের করে। গত রাতে প্রিয়ব্রত গুণী যে চিঠি লিখেছে, তার শিরোনাম এই বইয়ে আছে—ইঙ্গিত পেয়েছে ঘুমের মধ্যে। স্বপ্নাদ্যকথিকায় তার বিশ্বাস নেই, বিশ্বাসী হওয়ার মতো ঘটনা ঘটেনি। চিঠিটা লিখতে লিখতেই একটা দুরন্ত সম্ভাবনার উঁকি দেখছিল। কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারছিল না। তার পড়া কোনো কবিতায় শিরোনামটা আছে। কোন কবিতায়? এলোমেলো ঘাঁটাঘাঁটি শুরু হয়। একটু পরেই সে অনুমান করে, প্রিয় কোনো কবিতার শরীরে আছে। প্রিয় কবিতার সংখ্যাও তো ঢের। কাল মশারি টানানোর আগে পর্যন্ত সে জীবনানন্দের কবিতা তন্ন তন্ন খুঁজেছে। পায়নি। মাথা শান্ত হলে চেতনার কোনো অবতল ছুঁয়ে ফেললে মুহূর্তে দীপ্ত হয়েছিল 'খনার বর্ণনা' নামটি। স্বাভাবিক অবস্থায় মনে পড়ার কথা নয়, নিকট-সম্প্রতি সে কবিতাটি পড়েনি। একে যদি স্বপ্নে পাওয়া বলা যায়, তবে তাই।

বইটা বের করে সেখানেই দাঁড়িয়ে প্রিয়ব্রত সূচিপত্রর পৃষ্ঠাঙ্ক নির্দেশ মেনে কবিতায় পৌঁছে সামান্য এগোতেই পেয়ে যায় প্রার্থিত পংক্তি।

ঘটনা এই, গত সন্ধ্যায় প্রিয়ব্রত গুণী সেই খাতা নিয়ে বসেছিল। ১৯৮০ সালের ৯ সেপ্টেম্বর সে এই খাতার উদ্বোধন করে কলস এঁকে। যে কলসের শিরদাঁড়া আছে। টান টান বসে থাকা সুঠাম শরীর পেছন থেকে যেমন দেখায় অনেকটা সেইরকম। খাতাটার নাম রেখেছিল 'হাবিলজাবিল'। 'আবোলতাবোলে'র প্রভাব ছিল স্পষ্টত। হাবিজাবি অনেক কিছু লিখেছে সে তেইশ বছরে। কখনও খবরের কাগজ থেকে, কখনও বাজারি কেচ্ছা থেকে, কখনও কবিতার বই থেকে, কখনও নিজের মন খারাপ থেকে, চটে যাওয়া থেকে। মাথা মুণ্ডু নেই, ধারাবাহিকতা নেই, বস্তুত হাবিলজাবিল। কোন জেলে বন্দিদের অন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, মুসলিম নারীদের খোরপোষ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট কী রায় দিয়েছিল, কোন কোন দল জোট গড়েছিল ও ভেঙেছিল, পরিযায়ী পাখিরা বহু দূরের দেশ থেকে কীভাবে একই পথে বছর বছর উড়ে আসে, পাখি সমাজের আইনকানুন, ভাগ্যিস বিষধর সাপ বেশি নেই, জঙ্গিদের মদত দেয় রাজনৈতিক নেতারাই, গরম বাড়ছে বরফ গলছে, রেমব্রান্টের জীবন, এক সর্পিনী নারীর কাহিনি—এই সবের ফাঁকে ফাঁকে আছে হাবিলজাবিলের লেখকের বন্ধুরা কেন প্রতারক হয়, কার কাছ থেকে সন্‌জীদা খাতুনের সি ডি উপহার পেয়েছে সুখসাগর হিসেবে, ২৯ বছর পর কোন বন্ধু ২৯ বছর আগের অমলিন দিন ফিরিয়ে দেয়। খাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একটি পাতায় সে পেল, "Reference Hitler"। তারিখ নেই লেখার মাথায় বা শেষে। চিরকালীন বলেই কি সন-তারিখ চিহ্নিত করা হয়নি? লেখা আছে : ১৯৩৩ সালে গোটা জার্মানি জুড়ে জার্মান সাহিত্যিক ও

লেখকদের বই ও পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে দেওয়ার উৎসব হয়েছিল। ১৯৩৩ সালের ১৩ মে বার্লিন ইউনিভার্সিটির বাইরে প্রায় ৪০ হাজার লোকের সামনে ২৫ হাজার বই পুড়িয়ে ফেলা হয়। ৯ জন ফ্যাসিস্ত পুরোহিত একে একে এসে মন্ত্র পড়ে যজ্ঞাহুতির মতো আগুনের ওপর লেখকদের বই নিক্ষেপ করেন। চতুর্থ পুরোহিত নিক্ষেপ করেন সিগমুন্ড ফ্রয়েডের রচনা। সপ্তম পুরোহিত এরিখ মারিয়া রেমার্কের। ১৯৩৭ সালে এক জার্মান শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন হিটলার। হলঘরের একদিকে দর্শকদের জন্য ছিল 'ডিজেনারেট আর্ট'। অন্যদিকে 'হিটলারিয়ান আর্ট'। হিটলার বলেছিলেন. শিল্পীর অভিজ্ঞতা জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই। শিল্পের এই অধঃপতনকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। ফসলের ক্ষেত যদি তাঁদের নীল মনে হয়, বুঝতে হবে তাঁদের মাথা খারাপ, পাগলা গারদে যাওয়া উচিত। যদি এই নীল মনে হওয়া তাঁদের ভান হয়, তাহলে তাঁরা অপরাধী, জেলখানায় যাওয়া উচিত। জার্মানিতে এইসব পাগলের স্থান নেই। আমি তাঁদের দূর করে দেব। কঠিন শাস্তিও তাঁদের পেতে হবে।

এরই ঠিক পরের পাতায় আরেকটি সাল-তারিখহীন শিরোনামহীন লেখা : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর জার্মানি ও পোল্যান্ডের অস্‌চভিৎস্‌, ডাচাউ, বেলসেন-বার্গেন, বুফেনওয়াল্ড, ট্রেবলিঙ্কা ইত্যাদি জায়গায় নাৎসিদের কুখ্যাত কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে লক্ষ লক্ষ ইহুদির হত্যালীলার খবর যখন পাওয়া গেল, আশেপাশের গ্রাম ও শহরের জার্মানরা একবাক্যে বলতে লাগল, তারা এইসব ক্যাম্পের কথা জানতই না। হত্যার খবর তো দূরের কথা। এতটাই উদাসীন থাকে তারা? থাকতে হয়? থাকা যায়?

পাতা উড়িয়ে প্রিয়ব্রত গুণী সাদা পৃষ্ঠায় পৌঁছতে চায়। খুলে যায় কবিতা যা সে লেখার চেষ্টা করেছিল। জীবনে হয়ত সেই চতুর্থবার এবং কিছুই হয়নি যা, কতবার যে হেসেছে নিজের অসম্ভব বাসনার কথা ভেবে, যেটি লেখা বা না-লেখা হয়েছে মাস ছয়েক আগে তবু আরেকবার পড়তে ইচ্ছে করে: প্রাচীন খলিফা এক সারা রাত সরায়েছে থাম/ নিটোল গড়ন সেসব বিপুল প্রাচীন ও গুরুতর/ খলিফার নিখুঁত হাত যেহেতু অকিঞ্চিৎকর মানে তাহাদের/ পৃথিবীর প্রথম পোশাকের জন্ম আছে তার কর্মস্থলে/ আরো আরো পোষাক আঙরাখা বা ক্রুর পাগড়ি/ কিছু বা ক্লান্তিবশত দূরে দূরে নক্ষত্র হয়ে গেছে/ দিন আসে নাকো, খলিফা সরাতেছে ক্রমাগত থাম। পড়ে প্রিয়ব্রত আবার হাসল, কিন্তু মানে খুঁজে পেল না, যা ছ-মাস আগে ছিল, সেভাবে খুঁজতে ইচ্ছেও করে না আর।

প্রিয়ব্রত কলম বাগিয়ে বসে। কিছু একটা লেখার জন্য যে তাপ তার পাপক্ষয়ের অসহায় দৈনন্দিনেও ফুটন্ত জলের অস্থিরতা অসহনীয়তা তৈরি করে, তাকে মুক্তি দিতে হবে। বড্ড জ্বালায় যে! এ লেখা কোনোদিন কেউ পড়বে না, পাবেই না, নিজে যদি কখনও কখনও পড়ে, সে-ই হতে পারে একমাত্র পাঠক। লেখকের পাঠক থাকে, পাঠকের লেখক থাকে। পারস্পরিক একরকম বোঝাবুঝি থাকে। পাঠকের কী ভালো লাগে. লেখককে

জানতে হয়। লেখকের হাতে কী কী ভালো খোলে, পাঠককে জানতে হয়। প্রিয়ব্রত যেহেতু নিজেকে নিয়ে নিজের জন্য লেখে, নিজেই পড়ে।

বাইশ বছর আগে, হঠাৎই লিখতে বসেছিল প্রিয়ব্রত গুণী। লিখতে বসা বলতে যা বোঝায় হয়ত সেরকম নয়। সে যেখানে চাকরি করত, সেখানে তাকে কলম দিয়েই কাজ করতে হত, প্রশাসনের নিয়ম অনুযায়ী লম্বা লম্বা রিপোর্ট রেফারেন্স রিকমেন্ডেশন ইত্যাদি লেখা আর কী। সেসব লেখা একধরনের অভ্যাস। যত্ন নিলে বুদ্ধি খরচ করলে ভালো রিপোর্ট হয়, না হলে চলনসই, নিতান্ত নির্বোধ ছাড়া খারাপ রিপোর্ট লেখা সম্ভব নয়। লেখা বলতে কী বোঝায় তার কোনো ধারণা নেই প্রিয়ব্রত গুণীর। প্রিয়ব্রতর এক পুলিশ-বন্ধু বলেছিল, মানুষের দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা, মানুষের লোভ লালসা, মানুষের হিংসা বিদ্বেষ, মানুষের প্রেম ভালোবাসা আমরা যতটা জানি, আর কারও পক্ষে জানা সম্ভব নয়। অসার রিপোর্টে সেসব লেখা থাকে। সে রকম রিপোর্টও লিখতে পারেনি প্রিয়ব্রত।

কোনো একটা কারণে, নানারকম শোনা গিয়েছিল সেসময়, বাইশ বছর আগে, প্রিয়ব্রতর বিচারবুদ্ধি অন্যের ব্যাখ্যার মুখাপেক্ষী, স্বামী ভিন্ন নারীতে আসক্ত হওয়ার কারণে কিংবা কোনো আত্মীয়ের সঙ্গে স্বামীর অবৈধ সম্পর্ক থাকার কারণে কিংবা স্বামীর ব্যক্তিত্বের অভাবের কারণে অরুদিকে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে বাপের বাড়ি চলে আসতে হয়। ঘটনাটি পাড়ায় বেশ আলোচিত হতে থাকে। ঘটা করে বিয়ে হয়েছিল অরুদির। শিবতলার মাঠে মণ্ডপ বেঁধেছিল পাইওনিয়ার ডেকরেটার্স। ভোর থেকে সানাই ও রবীন্দ্রসঙ্গীত বেজেছিল। নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের গন্ধে গ্ল্যামারে পাড়া যেন রাজভবন। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই অরুদির এই বিপর্যয় স্বাভাবিকভাবেই অনেককে নাড়া দেয়, অনেকের খোরাক হয়। কিছুই না ভেবে প্রিয়ব্রত একটি মেয়ের বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি যাওয়া ও শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি ফেরার করুণ কাহিনি লিখে ফেলে। সে ইচ্ছে করে করুণ করেনি, অরুদি সম্পর্কে যতটুকু জানত তারই খানিকটা লিখেছিল সে। হয়ত সে কষ্ট পেয়েছিল অরুদির জন্য। তার মনে হল, লেখাটা ছাপানো দরকার। পাঠিয়ে দিল সংবাদপত্রের দপ্তরে। ছাপাও হল। কীভাবে যেন সে লিখে ফেলেছিল 'তাহাদের নিজেদের বাড়ি নাই।' প্রথম বন্ধনীতে পাঠকদের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন বলে চিঠিপত্রের স্তম্ভে সেটি ছাপা হয় 'তাহাদের নিজেদের বাড়ি নাই' শিরোনামেই। একটি চিঠি এত মানুষকে ছুঁতে পারে জেনে সে অবাক হল। সমর্থনসূচক চিঠির পর চিঠি ছাপা হতে থাকল আরও গভীর পর্যবেক্ষণে।

উৎসাহিত হয় প্রিয়ব্রত গুণী। চিঠিপত্র চেতনা প্রসারের মাধ্যম হতে পারে। সে লক্ষ করে, যা সে আগে বুর্জোয়া কাগজ বলে এড়িয়ে গেছে, এড়িয়ে যাওয়াই কর্তব্য বলে দাদারা শিখিয়েছে, সামাজিক বহু প্রসঙ্গ নিয়ে সেখানে অত্যন্ত জরুরি চিঠি নিয়মিত ছাপা হয়, মত বিনিময় হয়, বিতর্ক হয়, একটা গণতান্ত্রিক বাতাস টের পাওয়া যায়। প্রিয়ব্রত একটা কাজ

পেয়ে গেল। চিঠি লেখার জন্য নানারকম বই পড়া শুরু হল। কয়েকজন পত্রলেখকের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামল। কত বিষয়েই না সে চিঠি লিখেছে : ছিটমহলের জীবনযাপন, সীমান্তের মানুষ সীমান্ত মানে না, এমন কোনো অপরাধ নেই যা আমেরিকা করেনি, রূপ কানোয়ারদের পুড়ে মরতেই হয়, রাজনৈতিক চিত্রনাট্যে সেক্স অ্যান্ড ভায়োলেন্স, থিয়েটারের রাজনীতি ইত্যাদি, এমনকী সাপ ব্যাঙ হাতি ঘোড়া গাছগাছড়ার মতো বিষয়েও। চিঠিতে পেয়ে বসেছিল তাকে। একরকম জন পরিচিতিও পেয়েছিল। খবরের কাগজে নাম ছাপা হলে জন পরিচিতি ঠেকায় কে?

কেন সে চিঠি লেখা থেকে সরে এল? কতক চিঠি ছাপা হয়নি বলে? তা আগেও তো হয়নি। ছাপার মতো না হলে ছাপবে কেন। বক্তব্যে নতুনত্ব না থাকলে ছাপা হবে কেন। নাকি তার কথাগুলো বেশিমাত্রায় আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছিল বলে ছাপা যায়নি? নাকি কোনো শিবিরচিহ্ন থাকছিল না বলে ছাপা যায়নি? সে আগের মতো নিজেকে কোনো পক্ষের অন্তর্ভুক্ত করতে পারছিল না, চিঠিতে তার ছাপ ছিল। ব্যক্তিগত জীবনেও। এই অবস্থান সবদিক থেকে একজনকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এটাও ভালো ওটাও ভালো বলার মতো আদর্শহীনতা নয়, এটাও খারাপ ওটাও খারাপ বলতে পারার আদর্শনিষ্ঠা সহ্য করার মানুষ সব সময় সব সমাজেই কম থাকে। তাই একা হয়ে যেতে হয়। একা মানুষকে নিয়ে দলবদ্ধ মানুষ বিদ্রূপ করে। চায়ের দোকান থেকে আওয়াজ আসে, গুণীবাবু, বড় বড় কথা লিখে তো নাম ফাটান, কাজে কিছু করে দেখান! অফিসে আওয়াজ খেতে হয়, প্রিয়বাবু সিক্কিৎ আছে। সব কিছু উল্টা বোঝে! প্রিয়ব্রতকে একা হয়ে যেতে হয়।

আলব্যাট্রস পাখিটা উড়ছে। তার ডানার জোর মেপেছে কি কেউ? অন্তত আলব্যাট্রস জানে না। সমুদ্র তাকে ভয় দেখায়। বলে, বেশি দূর গিয়ে কাজ কি বাপু? আমি নিজেরই বিস্তার ভেবে হাঁপিয়ে যাই। নিজেরই গভীরতা জেনে ভয় পাই। তার চেয়ে তীরের কাছাকাছি ওড়াউড়ি করো। দ্বীপ বা পাহাড়-টাহারের খবর-টবর মানে আশ্রয়ের ঠিকানা রেখে চলাচল করো। খামোকা বিপদ টেনে আনা কেন? তবু আলব্যাট্রস দূর সমুদ্রের জলে নিজের ছায়া দেখতে ভালোবাসে। সে প্রশ্ন তোলে, যার নামের আগে সমাজসেবী লিখে দেওয়াল ভরিয়ে দেওয়া হল, সে যে সমাজবিরোধী সে কথা কেন চেপে দেওয়া? সমাজবিরোধী লোকটাকে সবাই চেনে, সবাইকে ভয় দেখাতেই কি 'সমাজসেবী' শব্দ বসানো? যাকে বেশির ভাগ মানুষ ঘৃণা করে এবং সংগত কারণেই করে, তাকে কেন ভালোবাসা? মানুষের বিপক্ষতা কেন? অতীতে যারা সমাজবিরোধীদের ওপর ভর দিয়ে চলেছে, এখনও যারা চলে, কোন নৈতিকতায় তাদের মন্দ বলা যাবে? আলব্যাট্রস ডানা স্থির রেখে উড়তে থাকে। সকালে সে দেখেছে রক্তাক্ত তরুণীর দেহ পড়ে আছে পথে। বিস্ফোরণ তাকে শেষ করেছে। হয়ত স্কুলে যাচ্ছিল কিংবা কলেজে, কাঁধের ব্যাগে বইখাতা

আছে, হাতে ঘড়ি, সুতোর কাজ করা কামিজে রক্তপ্লাবন, আহা এই তরুণীর স্বপ্ন ছিল, সাধ ছিল. দুর্বৃত্তের হাত তাকে বাঁচতে দিল না, ওরা দেয় না। তবে কেন এই দুর্বৃত্তদের দেশপ্রেমিক বলা হবে? তাদের দৌরাত্ম্যকে বলা হবে মুক্তিযুদ্ধ? এইসব খুনিদের কেন প্রশ্রয় দেবে কোনো রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠান? আলব্যাট্রস ধীরে ধীরে নেমে দেখে নিহত কাশ্মীরি তরুণীর মুখ তার সন্তানের মতো। যে সমাজবিরোধীর তাণ্ডবে পিতৃহারা হয়েছে দুই শিশু তাদের চেয়ে থাকা অবিকল তার সন্তানের মতো। আলব্যাট্রস আরও সমুদ্রের দিকে ওড়ে! টাওয়াব ভেঙে হাজার হাজার মানুষ মারে যারা, যারা এভাবেই দেশে দেশে মৃত্যুর উৎসবে মেতে ওঠে, কোন যুক্তিতে তাদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বলা? কেন আজিজুল-আবদুর-আনিসুররা উল্লাস করবে মুসলমানরাই টাওয়ার ভাঙার মুরোদ দেখাতে পেরেছে বলে? এটা কি মৌলবাদ নয়? মৌলবাদ সাম্রাজ্যবাদের চেয়ে ভালো? মৌলবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক কি এভাবে অস্বীকার করা যাবে? মৌলবাদের জন্ম ক্ষমতালোলুপতার গর্ভে, ক্ষমতালোলুপতারই চরম রূপ সাম্রাজ্যবাদ। যা কিছু মানবিক দুই বাদই তা ধ্বংস করে। এই সত্য কেন গোপন করা হবে? উচ্চশিক্ষিত উচ্চমানসম্পন্ন মৌলবাদীদের কি ঘৃণা করা যাবে না? আলব্যাট্রস আকাশে ইডিপাস ও জোকাস্টার কথোপকথন শুনতে পায়। ইডিপাস বলছে, আই ক্যান নট লিভ দা ট্রুথ আননোন। জোকাস্টার জবাব, ডুমড্ ম্যান! ও নেভার লিভ টু লার্ন দা ট্রুথ! সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করতে গিয়ে কেন একজন স্বৈরাচারীর পক্ষ নেওয়া হবে, যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে বিষ গ্যাস দিয়ে হত্যা করেছে? সাম্রাজ্যবাদের একদা বন্ধু সেই স্বৈরাচারীকে কেন হঠাৎ ঈশ্বর করে তোলার চেষ্টা হবে? তাতে কি মানুষের ভূমিকা নস্যাৎ করা হয় না? মানুষ স্বৈরাচার ও সাম্রাজ্যবাদ দুটোরই হাত থেকে মুক্তি চায়, এ কথা কেন এড়িয়ে যাব? জোকাস্টা বলে, ও লস্ট অ্যান্ড ড্যামড্! দিস ইজ মাই লাস্ট অ্যান্ড ওনলি ওয়র্ড টু ইউ ফর এভার! সত্য গোপন সব ধরনের অপরাধীদের অভিন্ন কৌশল। আলব্যাট্রস আরও দূরে যেতে চায়। যারা বিষাক্ত পানীয় বেচে, তারা ঘৃণ্য। যারা বিষাক্ত পানীয়র প্রচারক, তারা আদরণীয়? কোনো পেশা কি মনুষ্যত্বের ঊর্ধ্বে? কেন সেই প্রচারক মানুষের শত্রু নয়? আলব্যাট্রসকে লক্ষ্য করে পৃথিবীর সব রণতরী থেকে মিসাইল ছোঁড়া হতে থাকে। পাখিটা নাকি অশুভ আত্মা! অশুভ আত্মার মৃত্যুদৃশ্য দেখার জন্য টি ভি-তে ২৪ ঘণ্টার চুরি-চামারি খুন-খারাবি অপহরণ-ধর্ষণ নাশকতা-অরাজকতা নিন্দা-কেচ্ছা যাবতীয় বিনোদন বন্ধ রাখা হয়। আলব্যাট্রস ওড়ে, ক্ষেপণাস্ত্র ছুটে যায়।

এই লেখার, আসলে চিঠির শিরোনাম দেয় প্রিয়ব্রত : 'যে দেশে রাজার সেপাই'। যে দেশে কবির ঠোঁটে ছুঁচ দ্যায় রাজার সেপাই/ সে মাটিতে মেঘবৃষ্টি প্রকৃতির ষড়ঋতু নাই। তারপর সে সমুদ্রে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

লেখাটা শেষ হতে কত রাত হয়েছিল জানে না প্রিয়ব্রত, ঘড়ি তার কাছে ক্রমেই অদরকারি হয়ে পড়ছে, সময়ের সঠিক ব্যবহার কেন যে সে ঠিকঠাক শিখল না কোনোদিন।

লেখার, আসলে চিঠির, শিরোনাম খুঁজতে আরও রাত হয়ে যায়। যেন শিরোনাম খুব দরকার। শ্যাওলার মতো আদিম রাত্রির শরীরে স্তব্ধতা খস্‌খস্‌ করে। সে শুয়ে পড়ে, আর পারছিল না। পাটুলির প্রাচীন কম্বলের ওপারে বিনিবিনি ভরসার মতো অস্পষ্ট আলোয় সে যখন পেয়ে গেল 'যে দেশে কবির ঠোঁটে ছুঁচ দেয় রাজার সেপাই/সে মাটিতে মেঘবৃষ্টি প্রকৃতির ষড়ঋতু নাই', প্রিয়ব্রত সমুদ্রে ঘুমিয়ে পড়ল।

তাহাদের মন নাই

যেন বৃষ্টিতে এল অতীশ, জামাটা সেভাবেই ভিজেছিল ঘামে। ওফ্ কী কষ্ট! মরেই যেতাম।

বারান্দায় তক্তপোশে ধপাস করে বসে পাঁচটি শব্দ হাঁপাতে হাঁপাতে উচ্চারণ করে দু-হাতের ভরে মাথা পেছনে হেলিয়ে অনেকক্ষণ চুপ থাকল। কথা বলতে পারছিল না। দম নিচ্ছিল, রোমকূপ ছায়া ও বাতাস নিচ্ছিল।

দাদার কষ্ট অনুমান করতে পারে অনীশ। ডেইলি প্যাসেঞ্জারির অভ্যেস নেই, কষ্ট সওয়ার শরীর নেই, সুখে সুখে কমজোরি হয়ে গেছে। পৃথিবীর তাপমাত্রা যেভাবে বাড়ছে, তাতে এই সুখীরাই সবচেয়ে আগে পটকাবে, খসবে। চামড়া ঝলসে যাওয়া বা চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসা বা কোনো প্রত্যঙ্গ ভত্‌ভতে হয়ে ফুলে ওঠার আগামী পর্যন্ত দাদার থাকার কথা নয়, অনীশেরও নয়, যদি না পরমাণুবিলাসের ধুম আরও লাগে। মাত্র দু-বছরের ছোট সে, সময়ের হিসেবে এই অনুজত্ব কেউই গণ্য করে না, নেহাত সহোদর বলে, তাও তো মা বিস্তর বকা-ঝকা করে 'দাদা' বলা শিখিয়েছে, বলতে বাধ্য করেছে। 'হোক না দু বছরের বড়, দাদা বলবি না কেন, কী অসভ্য বেয়াদ ছেলে, আর কখনও যদি নাম ধরে ডাকতে শুনি, তোর একদিন কী আমার একদিন।' দাদাকে দেখে মায়া হয় অনীশের। চার-পাঁচ বছরে অনেক মুটিয়েছে, থপ্‌থপে হয়েছে, বিপদসীমা ছুঁয়ে ওজন বেড়েছে। অনীশ বলে, ভেতরে গিয়ে ফ্যানের নীচে বসো। জামাটা খুলে ফ্যালো আরাম পাবে।

অতীশ উত্তর দেয় না। দিতে পারে না।

অনীশ বলে, যা গরম পড়েছে এবার। চুয়াল্লিশ ডিগ্রি, ভাবা যায়! দুদিন ঝড়বৃষ্টি হল তাই বাঁচোয়া।

অতীশ বলে, সঙ্ঘমিত্রা একা এবার ছাড়তে চাইছিল না। বারবার বলল, চলো কাল একসঙ্গে যাই। কিন্তু কাল আমাদের কোম্পানির বোর্ড মিটিং, থাকতেই হবে। আর আজ সঙ্ঘমিত্রার স্কুলের প্রোগ্রাম। এদিকে তুই একা কী করবি না করবি ভরসা পাচ্ছি না। চলে আসতে হল। থেমে থেমে, ফাঁকে ফাঁকে দম নিয়ে বলে অতীশ।

ভরসা না পাওয়ার মন্তব্যে অনীশের প্রসন্ন হওয়ার কথা নয়। সে জবাব দিতেই পারে, আসলে তুই ভাবছিস, প্রশংসা আমি একা কুড়োব। তাই গলদঘর্ম হয়ে ছুটে এসেছিস। অনীশ বলে না। সে ভেতরে ভেতরে চটেছে সঙ্ঘমিত্রা প্রসঙ্গে। দাদা খোঁচা দিতেই ও কথা

বলেছে। সঙ্ঘমিত্রা অতীশকে কত ভালোবাসে সেটা বোঝানো যেন এতকাল পরেও জরুরি। অনীশ বলতেই পারে, তোমার শরীরের যা অবস্থা, একা ছাড়তে কে-ই বা ভরসা পাবে। অঘটনের সম্ভাবনা তো নিজে বয়ে বেড়াচ্ছ। বলে না। কী হবে বলে?

অতীশ জুতোর ফিতে খুলতে ঝুঁকে একটা শব্দ করে। পেটে চাপ লাগার দরুন শব্দটা হয়ত অজান্তেই বেরিয়ে আসে। যা চর্বি জমিয়েছে, ঝুঁকলে তো কষ্ট হবেই। অনীশ দেখল, সেঁটে যাওয়া জামার নীচে দাদার পিঠে থাক থাক চর্বি। দু-বারের চেষ্টায় ফিতে খুলল, যেন কেউ খুলে দিলে ভালো হত। দাদা এখন এতটাই পরনির্ভর হয়ে পড়েছে। অনীশের মনে হল, সঙ্ঘমিত্রার কথাটা দাদা যে বলল, খোঁচা মারার জন্য না-ও হতে পারে। আঠেরো বছর পেরিয়ে গেছে, এখন আর খোঁচাখুঁচির কী মানে! তিনজনই তো পুরাতন হতে চলেছে। সমুখে শান্তির পারাবারের কথা ভাবার বয়স আর দূরে নয়।

অতীশ জিজ্ঞেস করে, ঠান্ডা জল হবে? স্নান করলে আরাম হত।

অনীশ জানায়, কলের জল কিছুটা ঠান্ডা হবে। মিউনিসিপালিটি টিউবওয়েল নিষিদ্ধ করে দিল। ঠান্ডা জলে স্নানের সুখও গেল। রিজার্ভারের জল তো ফুটছে।

কলের জল কটা পর্যন্ত থাকে?

একটা।

আধঘণ্টা বাদে যাই। বারোটা বাজেনি এখনও।

সাপের খোলস ছাড়া কখনও দেখেনি অনীশ, মাংসের দোকানে পাঁঠা বা খাসির ছাল ছাড়ানো দেখেছে, তাতে ধারালো অস্ত্র লাগে, নিজের মাংসে বৈরী পাঁঠা বা খাসি ছিন্নমুণ্ড বলে কষ্ট পায় না, তবু স্নায়ু-শিরা কেঁপে কেঁপে ওঠে, দাদার গা থেকে গেঞ্জি ছাড়ানোর যন্ত্রণা দেখল অনীশ, বুক পর্যন্ত কোনোক্রমে তুলে একবার ডান হাত দিয়ে বাঁদিকটা আবার বাঁ হাত দিয়ে ডানদিকটা ধরে কাঁধের কাছাকাছি আনতে পিণ্ডাকৃতি শরীরটাকে মোড়াতে মোড়াতে অতীশ হাঁপায়, তারপর পিঠের দিকটা ধরে ছাড়ানোর চেষ্টা করে, বুকের দিক থেকে ছাড়িয়ে কাজটা সহজ করার চেষ্টা করে আটকে যায়, অবশেষে ডানহাতে বাঁদিক ও বাঁ হাতে ডানদিক বহু ক্লেশে শক্ত করে ধরে শরীর ঝুঁকিয়ে দুলিয়ে গেঞ্জিটা ছাড়ালো। গেঞ্জির বাঁধন থেকে ঝুলে পড়ল থোলো থোলো চর্বি। ফ্যানের নীচে এক মিনিট বুক ভরে শ্বাস নিয়ে বলল, ঘামে আটকে গিয়েছিল।

দাদার এখন প্রতি পদে সঙ্ঘমিত্রাকে দরকার, অনীশ বোঝে। ঠান্ডা খাবে?

কী আছে?

ঠান্ডা মতলব ধান্দাপানি নেই। ফ্রিজে জল আছে। নুন-চিনি গুলে দিতে পারি বা গ্লুকন-ডি।

বাদ দে। রোগী রোগী লাগে নিজেকে। ভালো লিকার হবে? চা পাতা দামি কি? না হলে দুধ চিনি দিতে হবে। পরিমাণে বেশি চাই। কিন্তু বানাবে কে? তোকেই তো যেতে হবে।

হেমা, লিকার চাই। তিন কাপ হবে। দাদার দু-কাপ, আমার এক।

অতীশের চোখের মাপ প্রায় ডবল হয়ে গেল। একবার বাড়ির ভেতরের দিকে, একবার অনীশের মুখের দিকে চলাচল করতে থাকল। হেমা? সে আবার এল কোত্থেকে?

অনীশ বলল, মুর্শিদাবাদের মেয়ে। গঙ্গা আর রাজনীতির পেটে গেছে ঘরবাড়ি। আমাদের স্টেশনের গায়ে রেলের জমিতে উঠেছে। এলাকার লোক জায়গাটাকে ঠাট্টা করে লালকুঠি বলে। ভোটের জন্য বামপন্থীরা ওদের পাহারা দেয়। আগে ছিল মুর্শিদাবাদের মেয়ে, এখন লালকুঠির মেয়ে। বিয়ের বাহানায় পাচারকারীরা ওকে টাটা পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল। স্বামীদেবতার মতিগতি বুঝতে পেরে পালিয়ে আসে। সদাশিবদা একদিন সঙ্গে করে নিয়ে এল। বলল, মেয়েটাকে রাখবে তোমার কাছে?

সদাশিব কে?

মাঝেরপাড়ার সদাশিব দাস। কলকাতার ফার্স্ট ডিভিসনে খেলত। চোট খেয়ে বসে যায়। আর মাঠে ফিরতে পারেনি। সেই থেকে জনসেবায় মন দিয়েছে।

ওর কথায় রেখে দিলি? যদি তোর ওপর কোনো ঝামেলা হয়? ওরা কিন্তু সুবিধের নয়। অনেক চক্কর আছে। ফাঁসিয়ে দেবে। নিজে মরবি, বাড়ির বদনাম হবে।

ভেবেছি ওসব। দেখাই যাক না, আগে থেকে ভয়ে না কুঁকড়ে চেষ্টা করতে দোষ কী?

কী চেষ্টা করবি? ও কি আর মেয়ে আছে! আদাড়বাদাড় দেখেছে। ঘাঁটাঘাঁটি হয়েছে। তুই এ বাড়ির সম্মানের কথা একবার ভাববি না? বাবার সম্মানের কথা ভাববি না?

আস্তে বলো। হেমা কষ্ট পাবে।

কথাটা শুনে অতীশের মটকা গরম হল, সে চিৎকার করে ফেটে পড়তে চাইল।

হেমা বড় ভালো মেয়ে। ও জানে ওর জন্য আমাকে জবাবদিহি করতে হয়। তাতে কষ্ট পায়।

নিজেকে সামলে অতীশ বলে, ভালোই ফেঁসেছিস তাহলে! কিছু মনে করিস না। ছোটবেলা থেকে তুই যে বিপ্লবীয়ানার ভান করিস, সেটা আসলে নষ্টামি।

এর জবাব ঠিক নয়, পাল্টা মার অনীশের আছে। মেপে দেখবে, কার বেশি, তোমার না আমার? অতীশ বলে না।

লাম্পট্যের জন্যই বিপাশা তোকে ছেড়ে চলে যায়।

যায়নি। এখনও ডিভোর্স দেয়নি।

ও! ডিভোর্স দেয়নি বলে রাগ! কেন দেবে?

সে কথা বলিনি।

জানি, তুই কী বলতে চাস। বিপাশা ভালো মেয়ে, তাই নিঃশব্দে সরে গেছে। কিন্তু বদনাম হয়েছে বাড়ির। আমি এখানে আসা কমিয়েছি কেন জানিস? তোর কীর্তিকলাপের জন্য। লোকে আড়ালে ছি ছি করে।

হেমার কথা শুনে এত চটে গেল কেন অতীশ? একটা পতিত মেয়েকে ঠাঁই দেওয়া হয়েছে বলে, নাকি অনীশ একটা মেয়েকে নিয়ে সুখে থাকতে পারে ভেবে? খোল ফাটাতে চায় অনীশ।

মেয়েটা কি রাতে এখানে থাকে?

থাকে।

মাই গড। ষোলো কলা পূর্ণ! বাড়িতে রেণ্ডির হাট বসিয়েছ! এর চেয়ে মাগিবাড়ি যাতায়াত করলে কি বেশি ফুর্তি হত না? পাল্টে পাল্টে ভোগ করতে পারতে। অনিমেষ মজুমদারের সুনাম কিছুটা অন্তত বাঁচত। খরচার ভয়ে বাড়িতে তুলে আনলে?

দাদার শরীর হয়ত ভালো নয়। প্রেসার বেড়েছে। হেমার মতো মেয়েকে বাড়িতে ঠাঁই দেওয়ায় হয়ত সত্যিই শক্ড। মেনে নিতে পারছে না। বাবার সুনামের ভাগ ওর খুবই দরকার। দাদাকে প্রথমেই হেমা সম্পর্কে এতটা না বললে ভালো হত, অনীশ ভাবে। সঙ্ঘমিত্রার নাম শুনে রাগের ঝাপটায় টলে গিয়ে সে যা করল, তা দাদার পক্ষে যথেষ্ট বেশি ডোজ্।

কিন্তু সঙ্ঘমিত্রার কথা শুনলে সে এখন কেন এত ক্ষিপ্ত হয়? কেন প্রতিপক্ষ হয়ে যায় সব? তাদের রক্তাক্ত করার ইচ্ছা কেন তার বোধকে হিংসাত্মক করে? তবে হেমা সম্পর্কে সে যা বলেছে তাতে এক বর্ণ মিথ্যে নেই, কোথাও বাড়িয়ে বলা হয়নি, লুকোনোও হয়নি। এই শিক্ষাপ্রাপ্ত আলোকপ্রাপ্ত, নীতিনিষ্ঠ ঐতিহ্যনিষ্ঠ, মানবিকতা, সহমর্মিতালালিত সমাজে একটি মেয়ে যেভাবে পতিত হয় এবং তার উদ্ধারহীন পতনের পথ ক্রমেই রচিত হয়, সেটাই বলা হয়েছে। হ্যাঁ, এই বলার পেছনে একটা অভিপ্রায় ছিল, সেটা অতীশকে আঘাত করা নয়, সঙ্ঘমিত্রার জন্য কাঁটা বিছিয়ে দেওয়া। অতীশের কাছে হেমার খবর পাবে সঙ্ঘমিত্রা, মানে অতীশ রং চড়িয়ে বলবে, এসব ঘটনা নিবিড় মুহূর্তে বলার সময় কে না রং চড়ায় এবং জানাবে যে, অনীশ মেয়েটাকে নিয়ে বেশ আছে এবং এই জানা সঙ্ঘমিত্রাকে জ্বালাবে পোড়াবে। অনীশ অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে সুখে আছে, এটা সহ্য করতে পারবে না ও। বিপাশা চলে যাওয়ার বড় কারণ সঙ্ঘমিত্রা। শেষে কিনা একটা নষ্ট মেয়েমানুষ? সঙ্ঘমিত্রার আহত রুষ্ট মূর্তিটা দেখতে পায় অনীশ। ভাবনার সরলতা ভেঙে অনীশ আবার নিজেকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। সঙ্ঘমিত্রা কি এখনও আহত হয়? আর কি সে বয়স আছে? ক্ষয়ে ক্ষয়ে শান্তির পারাবারের অদূরে দাঁড়ানো জীবন কি এইসব ঘটনাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে না? বয়স বড় ভারী, পাহাড়ের মতো, জলের অমেয় সঞ্চয়কে ছলোচ্ছল ঝরনা করে দেয়, জলোচ্ছ্বাস হতে দেয় না। অথচ অনীশ কিনা ভাবছে, সঙ্ঘমিত্রা আগের মতোই আছে। আর, বিশ্বায়ন তো ভাবাবেগের শেষ গৃহকোণটুকু কেড়ে নিয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের তলানির দেশে বিশ্বায়ন বলতে যা বোঝায়, অধোগতির নিলাম, অধোগতির পণ্যতা, মেয়েদের বুকভাসা পোশাক আর ছেলেদের পেশিভাসা, নগ্ন যুগ আসছে, ফটাফট শোয়াশুয়ি ওঠাউঠি পাল্টাপাল্টি, নো প্রবলেম ইয়ার, অতীত নেই, ইতিহাস নেই, বাষ্পযানের ধোঁয়ার

চেয়েও যা অসার অর্থহীন, সেই কালে ও প্রেক্ষিতে কুড়ি বাইশ বছর আগেকার বেকার ও ভাবালু জীবনের ভালোবাসাবাসির মূল্য থাকা কি সম্ভব? যত্তোসব ফালতু ব্যাপার, ভেবে হেসে ফেলে অনীশ।

মেজাজ হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে অতীশ মাথা গুঁজে চুপ করে ছিল। সে কিছুতেই মানতে পারে না যে তার ভাই রাস্তার একটা মেয়েকে, যে কি না যেভাবেই হোক বাজে চক্রে জড়িয়ে পড়েছে, তাকে তুলে এনে বাড়িতে রাখছে। এটা অন্যায়, অনাচার। সে জানে, বিপাশা চলে যাওয়ার পর অনীশ বড় একা। খা খা বাড়িতে একটা সমর্থ লোক কতদিন বসবাস করতে পারে। এ কথা সঙ্ঘমিত্রা বলেছে। যে ছেলেটা কথায় গল্পে তর্কে কৌতুকে গানে ক্লান্তিহীন, সে কেন মেনে নেবে নিঃসাড় জীবন! সঙঘমিত্রা অনীশের যন্ত্রণা বোঝে। কিন্তু তাই বলে একটা রাস্তার মেয়েকে ....! অসম্ভব! এটা হতে পারে না। যদি হওয়াতে হয়, অনীশ অন্য কোথাও চলে যাক, এ বাড়িতে নয়। তেমন হলে বাড়ি ফাঁকা পড়ে থাকবে, যত কষ্টই হোক মাসে একবার দেখে যাবে অতীশ। পরে অন্যভাবে বাড়িটা রক্ষার কথা ভাববে। অনীশ চাইলে ওর ভাগ টাকায় মিটিয়ে দেবে অতীশ। এই বিচ্ছেদ সন্দেহ নেই অত্যন্ত বেদনার। দুঃখ পাবে সঙঘমিত্রাও। তবু যাক অনীশ, চলে যাক, সুখে থাক।

ভাইয়ের দিকে তাকাল, অতীশ দেখল, অনীশ হাসছে। তার মুখে গালাগাল শুনে হাসছে? দাদার রাগ কমাতে হাসছে? নাকি হিম্মত দেখাতে পেরে হাসছে? অতীশ বলল, বাবার জন্মদিনের অনুষ্ঠান হবে না। স্কুলে গিয়ে আমি এখনই হেডমাস্টারকে জানিয়ে আসব প্রোগ্রাম ক্যান্সেলড্। নতুন বিল্ডিংয়ের জন্য বাবার উইলের টাকা অনুষ্ঠান ছাড়াই পরে দিয়ে দেওয়া হবে। সঙ্ঘমিত্রাকে ফোন করে দিচ্ছি, ওর আসার দরকার নেই। এ বাড়ি নরক হয়ে গেছে।

ঠিক সেই সময় ভেসে উঠল একটি মেয়ে, যার দু-হাতে ধরা ট্রে, ট্রের ওপর জলের গ্লাস চায়ের কাপ, যার পরনে পাকা গম রঙের শাড়ি, শাড়িতে মেধাবী আঁকিবুকি, যে কৃষ্ণাঙ্গী, যার মাথায় মেঘযমুনা, যার গ্রীবা দেবদারুর মতো, যার চোখ ভীরু কামনা, যার গড়ন কোনো প্রাচীন ভাস্করের আঙুল আগুনে ও রক্তে বারবার শুদ্ধ করে, যে হাঁটলে দু-পায়ের ভঙ্গিতে এগিয়ে আসে অলৌকিক তোরণ, যার নাম হেমা, অনীশ হাত থেকে ট্রে নামিয়ে নিলে সে অতীশকে প্রণাম করে।

এই মেয়েই তো লুঠ হবে, লুঠ হওয়ার স্বাধিকার আছে। অতীশ শুধু বলল, ভালো থেকো।

এ শরীরের দিকে বেশিক্ষণ তাকালে অযৌন থাকা সম্ভব নয়। স্বল্প তাকালেও সম্ভব কি? এক দর্শনেই হাহাকার জাগিয়ে দেয় যে মেয়ে, তার দিকে অতীশের মতো অনুশাসিত মানুষ কতক্ষণ তাকাতে পারে? অনুশাসন ভাঙার আনন্দ সে কোনোদিন পায়নি, অনুশাসন রক্ষার যন্ত্রণা আরও একবার, সম্ভবত তীব্রতম ভাবে পেতে থাকল। সে যথাসম্ভব পবিত্রতার

সঙ্গে মেয়েটির মুখপানে চায়। দেখে, কপালে মেঘছায়া, গালে শিশিরের জল, চোখে শ্বেতকাঞ্চনের বুকে ভ্রমরের মুগ্ধতা, ঠোঁটে নিঃশব্দ ঝড়ে অস্থির পদাবলির পাণ্ডুলিপি। চোখ নামাতে গিয়ে সে সূর্যাস্তের মালভূমিতে তিলেক দাঁড়াল। দ্রুত নেমে এল মাটিতে। অদূরেই সেই অলৌকিক তোরণ। এ কী অস্বস্তি! এ কী শান্তি!

টেবিল থেকে জলের গ্লাস তুলে অতীশের দিকে এগিয়ে দেয় অনীশ। হেমা দাঁড়িয়ে থাকে। অতীশ সচল হতে চায়। জল খায়। শব্দ করে তৃপ্তি জানায়। একটা বিস্কুট তুলে দাঁতে কুট করে ভাঙে। মেয়েটা নিশ্চয় সব শুনেছে। রান্নাঘর থেকে এ ঘরের কথা স্পষ্ট শোনা যায়। আর অতীশ তো রাগের চোটে হাউহাউ করে যা ইচ্ছে তাই বলেছে। সঙ্ঘমিত্রা থাকলে ভালো হত। ব্যাপারটা ও-ই ট্যাকল্ করত, অতীশকে কথা বলতে দিত না। আরও একটা কারণে সঙ্ঘমিত্রার কথা মনে হওয়ায় স্বস্তি পেল। অতীশের নিজস্ব অবস্থান আছে। সে অনীশ নয়, সামাজিক মান-সম্মান তার অনেক বেশি। তার হাহাকার থাকলে চলে না। হাহাকার কীসের? সে ঢের ঢের উপার্জন করেছে। সত্যি বলতে কী যোগ্যতার ঢের বেশি। হাহাকার কীসের? সঙ্ঘমিত্রা তাকে সব দিয়েছে। এখনও দেয়। দিতে চায়। হাহাকার কীসের? সে নিজেই বরং উত্তেজক ছবি দেখেও ততটা শরীর জাগাতে পারে না যা সঙ্ঘমিত্রা চায়। নিজের বউ কম যায় কীসে যে অতীশকে বাইরের ভরসায় থাকতে হবে! অতীশ নিজেকে সম্পূর্ণ মানুষ করতে পেরেছে, এটা অনীশের বোঝার কথা নয়, বুঝলেও মানবে না।

অতীশের বিবশতা লক্ষ করে মনে মনে হাসলেও অনীশ আবহাওয়া স্বাভাবিক করতে চায়। হেমাকে দেখে অনেকেরই এরকম হয়, অতীশেরও হয়েছে। কুৎসিত নিন্দেমন্দ থেকে হঠাৎই স্তম্ভিত মুগ্ধতায় গেলে ঘোর কাটতে একটু সময় লাগে, অতীশেরও লাগছে। রংটা পাতলা করতে অল্প অল্প জল মেশায় অনীশ।

চা খেয়ে নাও। ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

হ্যাঁ।

হেমাকে তোমার স্নানের জল ধরে রাখতে বলব?

কী দরকার। ও দাঁড়িয়ে আছে কেন? বসতে বলো।

তোমার জন্য ভাপা ইলিশ রেঁধেছে হেমা।

তুই বলেছিস বোধ হয়।

ওর রান্নার হাত বেশ ভালো।

টেস্ট না করা পর্যন্ত কোনো সুপারিশে আস্থা নেই আমার। কথাটা বলে মেয়েটির মুখের দিকে চোখ ওঠাল অতীশ। এবং আবার সেই এলোমেলো হয়ে যাওয়া। সামাল দিতে সে পটাপট প্রশ্ন করে যায়, তুমি বসছ না কেন? রান্নার তাড়া নেই। আমি আছি। তোমার পুরো নাম কী? বাবা কী করেন? ক ভাই-বোন? প্রশ্নগুলির উত্তর হয়ত হেমা দেয়, কিন্তু সে সব অবান্তর, অতীশ হেমাকে সপাটে দেখার জন্য মর্যাদার একটা উচ্চতা চায়।

সে চায় হেমা বসুক, কথা বলার ছলে মেয়েটিকে আরও দেখা যাবে। আবার সে চায় না হেমা বসুক, বসলেই অলৌকিক তোরণ ভেঙে যাবে আলোছায়ার প্রস্ফুটন মিলিয়ে যাবে এবং মেয়েটি সম্পর্কে তার আগ্রহের কোনো ইঙ্গিত অনীশের হাতে দিতে সে চায় না।

অনীশ বলে, ব্যাঙ্কে গিয়েছিলাম। টাকাটা সুদে আসলে কুড়ি লাখের কিছু বেশি হবে। স্কুল ম্যানেজমেন্ট ইউনানিমাস ডিসিশন নিয়েছে, ফাঁকা জমিতে নতুন বাড়ি হবে। বাড়িটা বাবার নামাঙ্কিত হবে। এডুকেশন মিনিস্টারকে আনার চেষ্টা করছেন ওঁরা। না পেলে জেলার এক মন্ত্রী। দুই এম এল এ থাকবেন। এম পি আসবেন।

অতীশ বলে, বাঃ। মনে মনে বলে, অনীশকে এতটা গাল না দিলেই হত।

জেলার সব শিক্ষাবিদকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। স্কুলের ছেলেরা নাটক করবে। প্রাথমিকে ইংরেজি নিয়ে ডিবেট হবে। দুই স্টলওয়ার্ট দু-দিকে — ড. সান্যাল এবং ড. সরকার।

সত্যি! হেমাকে দেখে নিল অতীশ। তুই তো বেশ কাজের হয়েছিস!

আমি কে? স্কুল ম্যানেজমেন্টই ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এই ইস্যুতে সবাই এক। পার্টি আইডেন্টিটি সরিয়ে রেখেছে। এবার একটা জিনিস বুঝলাম, তোর নামডাক আছে। তুই যে একটার পর একটা কোম্পানি ছেড়ে আজ বড় জায়গায় পৌঁছেছিস, সেটা অনেকেই জানে। গল্প করে।

বাদ দে। রান্না কদ্দূর।

হেমা অতীশের দিকে তাকিয়ে হাসল।

হাসলেই হবে? কী কী রাঁধছ?

হেমা আবার হাসে। চোখে মুখে সারা শরীরে। এ হাসির বিকিরণ আছে, যা অতীশের স্নায়ুতে স্নায়ুতে ফিসফিসিয়ে কিছু একটা করার কথা বলে।

অতীশ খুব সতর্কতার সঙ্গে কৌতুক করতে চায়। পদ্মার ইলিশ এখন বেঁটে গোবেচারা ছাপোষা হয়ে গেছে। আগের সেই ঝলকানি নেই, ঝাঁঝ নেই। নামেই পদ্মার। পদ্মার জলে ঢুকতেই পারে না তো স্বাস্থ্য হবে কোত্থেকে? আসলে মায়ানমারের। ফৌজি জুন্টার শাসনে সব নির্জীব নিস্তেজ।

হেমা কী বুঝল কে জানে। অতীশ ওর চোখে চোখ রেখে অনুমান করতে পারে না।

সুধীর চাটুজ্যে তো তোমার সাকসেসের হ্যান্ডআউট। কোন সালে কোন কোম্পানিতে জয়েন করেছ, কোন কোম্পানি ছেড়েছ, তুমি ছাড়ার পর কোন কোন কোম্পানি ডুবেছে, সরকার অধিগৃহীত সংস্থা লাটে তুলে দিতে তোমার কী ভূমিকা ছিল, তোমার বিরুদ্ধে করাপশন চার্জ কেন প্রমাণ করা যায়নি....

ও রকম ফালতু কথা অনেক শুনেছি। কেউ আমার কিস্‌সু করতে পারেনি। ওই সুধীর চাটুজ্যে বহুবার আমার বাড়িতে বডি ফেলেছে। জিজ্ঞেস করিস। সামনে পোষা কুকুরের মতো লেজ নাড়ে আর পেছনে রাস্তার কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করে। শুধু সুধীর কেন,

অধীর বধির পদির সব এক। পাইয়ে দিলেই ভালো। ব্যর্থ মানুষদের একটাই কাজ, সফলদের ফুটো খুঁজে বেড়ানো। সফল হতে পারা কম কথা নয়, তার চেয়েও বড়, সাফল্য ধরে রাখা। আমি মাঝে মাঝে বাসে, শেয়ার ট্যাক্সিতে উঠি। যেমন আজ লোকাল ট্রেনে চেপে এলাম। কেন জানিস? ব্যর্থ লোকগুলোর ভাঁড়ামি দেখে আমোদ পাই। হিংসায় বিদ্বেষে ভেতরটা কালো, ওপরে ঝকঝকে বাতেলা। আজ হাওড়া স্টেশনে দেখি, থিকথিক করছে ভিড়, ট্রেন নেই, অ্যানাউন্সমেন্টও নেই, দুটো মেয়েমানুষ ফষ্টিনষ্টি করছিল নিজেদের মধ্যে, একদল লোক তাতেই মজে, কিছু লোক একটা মওগাকে নিয়ে পড়েছে, কেউ কেউ শিব-সাজা ভিখিরিকে নিয়ে, অনেকেই দূর থেকে একপাল কুকুরের যৌন হাঙ্গামা দেখছে আর দেশটা বসবাসের অযোগ্য হয়ে গেছে বলে বুড়বুড়ি কাটছে। আসলে তোর কোনো স্বপ্ন নেই, অন্যরকম বাঁচার কথা ভাবতেই পারিস না।

সঙঘমিত্রা পৌঁছেই এ-ঘর সে-ঘর এ-কোণ সে-কোণ আনাচ-কানাচ অগ্র-পশ্চাৎ ভিতর-বাহির তল্লাশি চালাল। সি বি আই যেভাবে রেইড করে বলে শোনা যায়। কোথায় লুকিয়ে রেখেছ মেয়েটাকে?

কোন মেয়ে?

আর ন্যাকামি কোরো না। কোথায় আছে সে?

কে?

কে আবার? সুন্দরী!

কোন সুন্দরী?

চোখে তির ছোঁড়ে, হাসিতে বিদ্যুৎ।

ধুস্, কী যে বলো।

মাথায় মেঘ, ঘাড়ে উপত্যকা।

কী আবোলতাবোল বকছো।

মালভূমি থেকে সোনার আগুনের চাপা স্রোত।

কে বলল এসব?

কী ভীষণ সরু কোমর বিঁধে ফেলতে পারে।

কে দেখেছে?

তোমার দাদা।

কী জানি।

তার মানে?

বানিয়ে বলেছে।

অতীশ বানাতে জানে না।

জানে। তুমি জানো না।

অসম্ভব। আমার চেয়ে অতীশকে কেউ ভালো চেনে না।

এতটা জোর দিয়ে বলা ঠিক কি? বিকেলের বারান্দায় বৃষ্টির সম্ভাবনার মধ্যে বসে অনীশ বলল। মেঘ ঘনিয়েছে আকাশ জুড়ে। দূরের বাতাস আসছে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। ধুলোর একটা ছোট্ট ঘূর্ণি বাসকের নীচ থেকে নেচে নেচে কুন্দের ঝোপে মিলিয়ে গেল।

বারান্দার ঘেরায় পা ঝুলিয়ে বসল সঙ্ঘমিত্রা। অতীশ অ্যাকাউন্টস ঘুলিয়ে দিতে জানে। জাল রিপোর্ট বানাতে জানে। সে রিপোর্ট মনিটরিং বা এক্সপার্ট কমিটিকে দিয়ে অ্যাপ্রুভ করাতে জানে। কাট মানি খাওয়ার যত ফিকির আছে সব অতীশের জানা। ম্যানেজমেন্টের যত অলিগলি আছে সব অতীশের জানা। কিন্তু অতীশ কখনোই কোনো মেয়েকে না দেখে বলতে পারে না যে, 'সে এক অসম্ভব গতি, টান থাকতে গেলে ভেতরে ভেতরে হাড় গুঁড়ো করে দেয়।' সঙ্ঘমিত্রা শেষ বাক্যটা বলার সময় গলা নামিয়ে টেনে টেনে বেশ নাটকীয় করে তোলে।

হেসে ফেলে অনীশ। সঙ্ঘমিত্রার চোখে চোখ রেখে হাসি ভেঙে ভেঙে উচ্চারণ করে, অতীশ এসব বলল? কী চমৎকার বানিয়েছে। এরপরও তুমি বলবে, অতীশ বানাতে জানে না?

অতীশের স্বপ্ন নেই। যেটা আছে স্বপ্ন নয়, পরিকল্পনা। পরিকল্পনাকেই ও স্বপ্ন ভাবে।

ঝোড়ো হাওয়ায় গাছে গাছে হাততালি বেজে ওঠে। ধুলো ওড়ে।

অনীশ জবাব দিতেই পারে। তুমিই তো একদিন স্বপ্নকে মতিভ্রম বলে চলে গিয়েছিলে, পরিকল্পনায় খুঁজে পেয়েছিলে জীবনের স্বপ্ন। বলেছিলে, স্বপ্নের একটা জীবন লাগে। বাঁচার মতো না বাঁচলে স্বপ্ন রাখবে কোথায়? অনীশ এসব আর মনে করিয়ে দিতে চায় না। কী লাভ? ভুল স্বীকার তো একাধিকবার করেছে সঙ্ঘমিত্রা। তা আন্তরিক হলেও বা কী!

অতীশের কোনো স্বপ্ন নেই। সঙ্ঘমিত্রা বলল বিবৃতির চেয়েও কাষ্ঠগলায়।

অনীশ বলল, আজ বৃষ্টি হবে,

সঙ্ঘমিত্রা পা দোলাল তরুণীর মতো কোন্ খুশিতে

অনীশ বলল, এত গরমে কিচ্ছু ভালো লাগে না।

খুব কালো হয়েছে আকাশ। বৃষ্টি নামো নামো। বাতাসে জলের হাত। বারান্দায় অন্ধকার জমেছে।

সঙ্ঘমিত্রা বলল, অতীশ কোনো মেয়ের বর্ণনা দিতে পারে না। দ্যাখেই না ভালো করে। ওর পরিকল্পনায় নারী নেই। নারী ছাড়া স্বপ্ন হয় না।

বেশি দূরে নয় উত্তর-পশ্চিমে তীব্র নীল আলোর ঝলকানি। গুমগুম আওয়াজ গড়াল এ-আকাশ ও-আকাশ।

অনীশ বলল, মনে হচ্ছে আজ ভাসাবে।

সঙ্ঘমিত্রা বলল, হতে পারে। পাহাড় নিয়ে হতে পারে। মরুভূমি নিয়েও স্বপ্ন হতে পারে। এই যে বাসক, কাঞ্চন, কুন্দ, টগর, জবা—এসব নিয়ে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতি

থাকতে হবে। নারী। যে নারীই দেখল না প্রাণ খুলে চেয়ে, সে স্বপ্ন দেখবে কী? আমাকেই কি দেখেছে সেভাবে?

অনীশ বলে, তোমার বরের মতো তুমিও বেশ মুটিয়েছ।

ঘুমোবার আগে পর্যন্ত অফিসের ফাইলে যার চোখ, বিছানায় সে কী দেখবে? অঙ্কের মতো কিছু মামুলি চিহ্ন, ব্যস! তারপর ঘুম।

এবার সঙ্ঘমিত্রাকে থামানো দরকার। অনীশ ভাবে। নাহলে অতীশ যে একটা গড়পড়তা মানুষ, প্রচুর উপার্জন সত্ত্বেও জীবনের স্বাদ পায়নি, সম্পত্তি করেছে বিস্তর কিন্তু নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারেনি, যার বাইরেটা পূর্ণ কিন্তু ভেতরটা শূন্য, যার চেনাজানা প্রচুর কিন্তু বন্ধু নেই, যে বন্ধুর অভাব বোঝে না, মাঝে মাঝে অতীশকে গড়পড়তা মানুষেরও বেঁটে মনে হয়, মনে হয় লোকটা হৃদয়হীন, ভালোবাসা গ্রহণ করতে যে জানে না তাকে কি মানুষ বলা যায় — এইসব ছত্রাক-লাগা ধানাই-পানাই করে নিজেকে অতৃপ্ত তৃষ্ণার্ত উপবাসী হিসেবে তুলে ধরতে চাইবে এবং স্বীকার করবে যে অনীশকে ছেড়ে অতীশকে বিয়ে করে অসংশোধনীয় ভুল করেছে। প্রথম প্রথম এইসব জলকচুরি অনীশও খুব খেত। তখন ওরা এ বাড়িতেই থাকে। নিজের প্রেমিকাকে অতীশের কণ্ঠলগ্ন দেখে তার খুশি হওয়ার কথা নয়। হয়ওনি। সেই স্কুলবেলা থেকে যার সঙ্গে হাঁটাহাঁটি ছুটোছুটি, কলেজেও যারা সহপাঠী, কোনো দিন কোনো কারণে একা হলে পাঁচটা স্টেশন দূরে কলেজের পথ যাদের পরবাস পরবাস লাগত, যারা হেঁটেছে ভোরের সূর্যে, যারা দেখেছে আলোর রাশি রাশি চোখ ছড়িয়ে আছে শিশিরের ঘাসে ঘাসে, যারা স্কুলের টিফিনে বিনিময় করেছে জাম ও জামরুল বা কয়েতবেল ও করমচা কিংবা কাঠবাদাম ও কঙ্কে ফুল, যারা জলস্রোত ভেঙেছে সশরীরে, কলেজ থেকে ফেরার পথে ইচ্ছে করে নেমেছে ভুল স্টেশনে একটু নির্জনতা চেয়ে, দুজনে পড়েছে শারদীয় প্রেম বা মলাট ছেঁড়া চটি বইয়ে অশিক্ষিত অশ্লীলতা, ভাদ্রের বিকেলে সোনা আলোয় যারা দেখেছে দুজনের করুণ মুখ, কাল দাঁড়াবে তো আমার জন্য, বলো! চলে যাবে না—সেই জোড় ভেঙে গেল মুহূর্তে অতীশের বিবাহ প্রস্তাবে! অনিমেষ মজুমদারের জ্যেষ্ঠপুত্র অতীশকুমার চাকুরি পাইবা মাত্র গ্রামের সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে সঙ্ঘমিত্রাকে বিবাহ করিতে মনস্থ করিল। প্রথামত সে মাতার নিকট ঈষৎ রাখিয়া-ঢাকিয়া আপন ইচ্ছা ব্যক্ত করিল। এই সেকেলে ফর্মুলায় আজও বিষয়টি নিয়ে নবীন বাংলা উপন্যাস লেখা যেতে পারে। শুভ পরিণয়ের রাতে পুকুরঘাটে ঝরা বকুলের সিঁড়িতে বসে অনীশের কান্না একটি হৃদয়স্পর্শী অধ্যায় হতে পারে। নাম দেওয়া যেতে পারে 'চোখের জলে ভাসিয়ে দিলেম'। আজ অনীশের সেইসব হাস্যকর লাগে। সয়ে সয়ে হাস্যকর হয়ে গেছে। হয়েছে কি? তবে কেন সে আজও রাগ করে? কষ্ট পায় বলেই নয় কি? অনীশ তখন কোথাও চলে যাবে ভেবেছিল। কিন্তু কোথায় যাবে? কী খাবে? এভাবে সে হেরে যেতেও চায়নি। চোখের সামনে দেখেছে সে সঙ্ঘমিত্রার পরিবর্তিত প্রেম। তবু সে বিশ্বাস করেছে যে সঙ্ঘমিত্রা তাকেই ভালোবাসে। এবং সে বিয়ে করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল

এতটাই ভাবপ্রবণ ছিল অনীশ। দেবদাস কেসের এক্সটেনশন হতে পারত অনীশের জীবন। এই ভাবাবেগের মাটিতে সে যে কেন যুক্তির ওপর দাঁড়াতে গেল কঠিন হয়ে?

অনীশ বলল, স্কুলের প্রোগ্রাম কেমন হল?

সঙ্ঘমিত্রা বুঝল, অনীশ এড়াতে চাইছে। বারান্দার ঘেরা থেকে নেমে থামে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। যেমন সে দাঁড়াত পনেরো-ষোলো বছর কিংবা তারও আগে।

অনীশ বলল, তুমি স্কুলে এখনও চাকরি করো কেন? এত টাকা তোমাদের। কী দরকার? বলতে পারো, নিজের কিছু একটা করা দরকার। ভেবে দেখো, তোমার চাকরিটা অন্য কারও উপকারে লাগতে পারে। এটা নতুন কথা না হলেও ভাবা উচিত নয় কি?

সঙ্ঘমিত্রা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, আজ বৃষ্টিতে ভিজব। কতদিন ভিজিনি। কুড়ি-বাইশ বছর কিংবা তারও আগে যেভাবে বলত, সেভাবেই বলতে চাইল।

অনীশ মনে করিয়ে দিল, ছ-টা পঁয়ত্রিশের ট্রেন না ধরলে বাড়ি পৌঁছতে অনেক দেরি হবে।

হোক।

অতীশ ভাববে।

বয়ে গেছে। তেরো-চোদ্দ বছর আগে এক দুপুরে অনীশের ঘরে ঘনিষ্ঠ হয়ে যেভাবে সে অতীশকে অস্বীকার করেছিল, সেভাবেই আজও বলতে চাইল।

অনীশ বলল, তোমাকে ছাড়া ও অচল। দেখলাম তো। মাছের কাঁটা বেছে দিতেও সঙ্ঘমিত্রাকে খুঁজছে।

আজ ফিরব না। এভাবে সঙঘমিত্রা কোনোদিন বলেনি। আজ বলল।

অনীশ অনুমান করে, সঙঘমিত্রার খেলা আজ অন্যরকম। এক-আধ ঘণ্টার প্রণয়ে শরীর সেঁকে নেওয়ার চেয়ে অন্যরকম। অনীশকে ধান-দূর্বায় তুষ্ট করে অতীশের জন্য নিজেকে ক্ষেতপ্রান্তর করে তোলার চেয়ে অন্যরকম। অনীশও জেনেশুনে সে খেলায় সামিল হয়েছে কতদিন। কখনও ভেবেছে সঙঘমিত্রা আসলে তারই। কখনও ভেবেছে আসল নকল বিচারে কী প্রয়োজন? 'মনে পড়ে সরস্বতী পুজোর রাতে আমাকে শাকালু দেখিয়ে তুমি পালানোর ভান করেছিলে?' 'মনে আছে স্কুলের ছাদে সেই প্রথম আমিই তোমাকে লণ্ডভণ্ড করতে চেয়েছি।' 'তোমার দাদা তো ভাইয়ের বউয়ের সঙ্গে পরকীয়া করে।' 'এসো তবে আমিও দাদার বউয়ের সঙ্গে পরকীয়া করি।' কিন্তু সে খেলা থেকে বহুকাল সরে এসেছে অনীশ। বিপাশার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার ঢের আগে। লাভ যা হয় সেটা তো সঙ্ঘমিত্রারই। অনীশ আর ঠকতে চায় না, হারতে চায় না। বিপাশা চলে যাওয়ার পর সে বুঝেছে, সঙ্ঘমিত্রা ভয়ংকর নিষ্ঠুর। অনীশকে সে রিক্ত শূন্য করেছে কেবলই।

উদ্দাম বৃষ্টি নামল। চারদিক কালো করে ভাঙছে মেঘ। জল ঝাপটাচ্ছে বারান্দায়। ভিজছে অনীশ। সঙ্ঘমিত্রা বৃষ্টিতে নামল। অনীশ দেখুক তার মোহর এখনও ভিজতে পারে। অনীশ দেখুক তার মোহর নিজেকে ধুয়ে নিতে পারে। অনীশ দেখুক তার মোহ ফুরিয়ে যায়নি।

অনীশ বলল, এ-বয়সে চট্ করে ঠান্ডা লেগে যায়।

সঙ্ঘমিত্রা বলল, তুমি তো আছো।

অনীশ বলল, আমি নেই। ঝড়ের শব্দে অনীশের কথা যেন চাপা পড়ল।

সঙ্ঘমিত্রা বলল, এসো ভিজি।

চারদিক আরও অন্ধকার। যেন অন্ধকার ঝরছে মুষলধারায়। উঠোনে সঙ্ঘমিত্রা আবছা হয়ে গেছে। বৃষ্টি আর বৃষ্টিতে ভেজা-টেজা আর টুকরো-টাকরা ইঙ্গিতে খেলা বেশ জমেছে দেখে অনীশ চিৎকার করে ডাকে, সঙ্ঘমিত্রা! বাতাসের টানে ডাক দূরে দূরে যায়।

সঙ্ঘমিত্রা গলা খুলে জবাব দেয়, ও নামে ডাকবে না।

সঙ্ঘমিত্রা!

মরে গেছে।

সঙ্ঘমিত্রা!

জবাব নেই। জলধারায় ছায়া ছায়া।

হেমাকে খুঁজবে না?

আসছি।

হেমা অপেক্ষা করছে তুমি খুঁজে বের করবে বলে।

আগে ডাকো, মোহর!

অনীশ ডাকল না।

সঙ্ঘমিত্রা ডাকল, বিহান! আমার বিহান! ডাকো, তোমার মোহরকে ডাকো।

অনীশ ডাকল, মোহর! চেষ্টা করেও আগের মতো ডাকতে পারেনি। তবু খেলায় কিছুটা সহযোগিতা হল।

আলো জ্বালবে না। তোমার মোহর তোমার হেমাকে খুঁজে বের করবে।

ঘরের ভেতর ভেজা কাপড়ে জল ভাঙার শব্দ হয়। জলস্রোতের শব্দ হয়। কিছুই দেখা যায় না অন্ধকারে জলের শব্দ চলচ্চিত্র ফুটিয়ে তোলে।

দেখি আমার বিহানের হেমা এইখানে আছে কি না। এইখানে, এইখানে, এইখানে, বিহান!

মোহর! অনেক সময় আছে, খোঁজো, খুঁজে দেখো।

এ খেলা দ্রুত ফুরোবে জেনেই অনীশ সময় সাধ্যমতো ব্যবহার করে। খেলায় ক্লান্ত হয়েও সঙ্ঘমিত্রা বিশ্বাস করতে পারে না যে হেমা নেই।

সুরোমাসির মুখ

সব বদলে গেছে। অনি বলল। দোতলার বারান্দায় পা রেখে।

তরু বলল, অনেক বদলে গেছে। সিঁড়ির শেষ ধাপে পা রেখে। বারান্দায় উঠে গা ঢেকে আঁচলের একটা প্রান্ত ডান হাতে তর্জনীতে জড়াল।

এই বাড়ি একদিন শুনশান হয়ে যাবে কেউ ভেবেছিল?

বাড়িটা আছে।

এই বারান্দায় আমাদের ছোটাছুটি মনে পড়ে? মনে পড়ে মেঝের এইসব চৌখুপি গুনে গুনে আমাদের সু-তিতি খেলার ঘর কেটেছি?

তুমি নস্টালজিক হয়ে পড়ছ।

হব না!

একটু থেমে তরু বলল, মা-কাকিমাদের মতো আমরা কখনোই দক্ষিণের বারান্দায় গোলকধাম খেলতে বসব না। সুরোমাসির মতো কলের গান শুনে কাটানোর সময় নেই আমাদের।

সব বদলে গেছে। অনি বলল।

তরু বলল, অনেক বদলে গেছে।

তুমি এখন ইচ্ছে করলেও এ বাড়ির উঠোনে নৌকাবিলাস বা রামায়ণী পালা শুনতে পারো না।

আমার ইচ্ছে করে না।

এরপরও তুমি বলবে সব বদলায়নি?

অনেক বদলেছে।

তুমি এখনও আগের মতোই জেদি। অনি বলল।

তরু হাসল। তাহলে?

টানা বারান্দার প্রথম থাম ওরা পেরল। ওরা দক্ষিণ থেকে উত্তরমুখী হাঁটছে। ডানদিকে পরপর ঘর, হল ঘর, বৈঠকখানা। বাঁ দিকে পরপর থাম, টানা কাঠের রেলিং। বাঁদিকেই বিশাল উঠোন পেরিয়ে ঠাকুরদালান।

একবার পুজোয় 'শাজাহান' হল মনে আছে? কয়েকজন মুসলিম প্রজা বড়কর্তার কাছে আবদার করেছিলেন। তখন আমি কলেজে। হস্টেল থেকে বাড়ি এলাম। মনে আছে?

মনে পড়ছে না। হয়ত সেবার পুজোয় এখানে আসিনি।

আলবত এসেছিলে। সিংহীবাড়ির মেজগিন্নির জুঁই ফুলের মতো মুখ সরস্বতীতে ভেসে গেল। রমাপ্রসাদ সিংহকে ধরে নিয়ে গেল পুলিস। তোমার বাবা বড়কর্তাকে জানাল যে মেজগিন্নি খুন হয়েছে বলে পুলিস সন্দেহ করছে। সেবার পুজোর আনন্দ বিসর্জনের আগেই শেষ হয়ে গেল।

এত কিছু তুমি মনে রাখো কী করে?

অনি বলল, থেকে যায়। এইসব টুকিটাকি নিয়েই তো আমার জীবন। মহর্ষি বা মহামানব নই, বুদ্ধিজীবী বা সমাজসেবীও নই।

তরু থামিয়ে দেয়, আবার সেই ব্যর্থতা বিফলতার কাঁদুনি শুরু করলে?

না। সে কথা নয়। তোমারও মনে আছে। কিছু একটা ভেবে নাড়াচাড়া করতে চাও না। আমি নিজেকে পাই বলে পুরোনো দিনে ডুবে যাই। খুব ছোটখাট ঘটনাও যে আমার বাঁচার সঙ্গে জুড়ে আছে।

আমি কি কোনোভাবে তোমাকে আহত করেছি, অনি? আসলে আমি এরকমই। পুরোনো দিনের কথা আমি বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারি না। এতটাই অর্থহীন মনে হয় যে রাগ ধরে যায়।

চতুর্থ থাম আর বড়কর্তার ঘরের প্রথম দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পাঞ্জাবির দু-পকেটে হাত ঢুকিয়ে সিগারেট লাইটার খোঁজে অনি। সিগারেট বের করে। তরু কয়েক পা এগিয়ে গেছে। এইখানে এই থামের নীচে পড়ে ছিল বড়কর্তা, ইন্দুভূষণ মিত্র। কখন পড়েছে, কীভাবে পড়েছে, কেউ জানে না। জানার কথা নয়। কেউ ছিল না। ঝড়জলে ওভারহেড তার ছিঁড়ে ট্রেন বন্ধ হওয়ায় বেগমপুর থেকে ফিরতে পারেনি জলধরদা। পরদিন যখন ফিরল বড়কর্তার শরীর শক্ত হয়ে গেছে। হাত-পা গুটিয়ে কুঁকড়ে পড়ে ছিল শরীরটা। ভয় পেয়েছিল কি? শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় খাটে চেপেচুপেও বড়কর্তার শরীর পুরোপুরি সোজা করা যায়নি।

তরু বলল, কী হল?

অনি সিগারেট দেখিয়ে বলে, ধরালাম।

তরুর শরীরে বয়সের ভার নেই কোথাও। তেমনই ছিপছিপে। গাড়িতে বসার সময়ই লক্ষ করেছে অনি। সেসময় কোমরের নিম্নভাগ মূল গঠনের কাছাকাছি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। বড়কর্তার কথা ভাবতে ভাবতে সিগারেট ধরাতে ধরাতে আবার সে দেখে ফেলল সরু কোমর থেকে ভরাট সুডৌল নিম্নাঙ্গ।

বাদল যে কোথায় গেল! ওকে খবর দেওয়া হয়েছে আমি আসব। দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা যেন থাকে। পুজোর ব্যাপারে কী কী করতে হবে সেটা ও বুঝে নেবে। এই কথাগুলোই অনি একটু আগে বলেছে। আবার বলতে হল অস্বস্তি কাটাতে। বাদলের উপস্থিতি যেন জরুরি। তৃতীয়জন থাকলে হয়ত স্বাভাবিক হওয়া যায়।

৩৯. সুরোমাসির মুখ

তরু অনুমান করে অনি কেন আবার বাদলের কথা বলল। তৃতীয় একজন যে আছে, সে হাজির না থাকলেও আছে, সেটা বোঝাতেই বারবার বাদলের কথা বলা।

তরু বলে, কোথাও গেছে। বাজারে যেতে পারে। জানে যখন, তাড়াতাড়িই ফিরবে।

জলধরদা কিন্তু কখনোই এরকম করত না। যতবার এসেছি, দেখেছি ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে কিংবা সেরেস্তার দাওয়ায় বসে আছে। দেখতে পেলেই ছুটে আসত। পথে কষ্ট হয়নি তো, কোথাও কোনো ব্যাঘাত হয়নি তো, শরীর-স্বাস্থ্য ভালো তো, বাড়ির সকলের খবর কী — জিজ্ঞেস করত কতকালের আপনজনের মতো। আমি কী খেতে ভালোবাসি, জলধরদা জানে। তরুকে এসব বলার দরকারই ছিল না, সম্পর্কসূত্রে সে এ বাড়িরই মেয়ে, ছেলেবেলা কেটেছে এখানেই, পরে নানা উপলক্ষে থেকেছে এখানে, এ বাড়ির তেমন কোনো খবর নেই যা তরু জানে না। বাহুল্য জেনেও অনি বলল, বলতে হল। তরুকে একা ফাঁকা বাড়িতে নিয়ে আসার ঘটনায় আজ যে সে ন্যায়-অন্যায় বোধে বিচলিত হয়, সেটা প্রাণপণে চাপা দিতে চায়।

তরুও বোঝে। বলে, অনেক বদলে গেছে।

অনি হাসে। স্বস্তি পায়। বাদলের উপস্থিতি কতটা জরুরি তা হয়ত বোঝানো গেছে। ফাঁকা বাড়ি অনিও চায় না বুঝেই তরু সহমর্মিতায় কথাটা বলল। অন্য প্রসঙ্গে না গিয়ে আপাতত বাদলেই থাকতে চায় অনি। পুরোনো কথা তুলে তরুর কাছে সাড়া মেলেনি। বরং তরু স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে দিয়েছে, ওসব অর্থহীন, বিরক্তিকর। পুরোনো দিনের পথ ধরে আজ সে তরুর কাছে পৌঁছতে চেয়েছিল। যদিও প্রৌঢ়তা এখন দুজনেরই, তাতে কী, এখনই সুমুহূর্ত। ভেবেছিল তরুও তাকে ছুঁতে এগিয়ে আসবে। কিন্তু সেই যে দোতলায় উঠেই শরীরের ঢাকাঢুকি এঁটেসেঁটে প্রত্যক্ষত রক্ষণাত্মক করে নিল, কথাবার্তা তীক্ষ্ণ করে তুলল, বোধহয় তরু পছন্দ করছে না।

তরু ভাবে, অনির সঙ্গে সে এল কেন? আসতে রাজি হল কেন? অনির প্রস্তাব ফেরানো যায়নি বলে? অনিকে আঘাত দিতে চায়নি বলে? নাকি নিজেরও ইচ্ছে ছিল, সে আসতেই চেয়েছে? সেই চাওয়াটা কি এখন স্থির থাকতে পারছে না, শক্ত জায়গার ওপর দাঁড়াতে পারছে না?

মাসখানেক আগে, বর্ষার সন্ধ্যায় জল ভেঙে তরুবালা গুহর বাড়িতে হাজির হয় অনিরুদ্ধ চৌধুরি। তরু অবাক। সেই কবে, বছর দশেকেরও বেশি হবে, তরুরা যখন নতুন কেনা ফ্ল্যাটে এল, হঠাৎই এসেছিল অনি, বউকে নিয়ে। তরুর বরের এক বন্ধু তখন অনির সহকর্মী। তার কাছেই ঠিকানা পেয়েছে। সেদিনও তরু অবাক হয়েছিল। অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা মেরে দুটিতে চলে গেল। অনি যে খুব একটা বদলায়নি, বুঝতে অসুবিধে হয়নি তরুর। সে নিজেও কি বদলেছে? অনির ওপর জমে থাকা অভিমান সেদিন কি লুকোতে পেরেছিল দুই কন্যার জননী ও পরিবার-প্রিয় সুজনের জায়া? অনিও কি দৃষ্টিকটুভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেনি? দুই কিশোর-কিশোরীর নিবিড় মুহূর্তগুলোর কথা বলতে বলতে সে নিজে কি বেসামাল হয়নি? বেসামাল করতে চায়নি তরুকে? বলার মধ্যে যতই নিষ্পাপ

নিরপেক্ষ ভঙ্গি আনার চেষ্টা করুক, সেই মুহূর্তগুলিকে উজ্জ্বল হাসি দিয়ে যতই পবিত্র করার চেষ্টা করুক, অনি কি সম্পর্কের গোপন চিহ্নগুলো স্পষ্ট করে তোলেনি? সায় দেয়নি কি তরু? সে খুব ভালো জানে অনিকে কীভাবে থামাতে হয়। থামায়নি। শুনতে চেয়েছে, পুরোনো দিনগুলো পেতে চেয়েছে, সেই পাওয়ার মধ্য দিয়ে অনিকে ছুঁতে চেয়েছে, দেখতে চেয়েছে তার শরীরে প্রথম পুরুষের স্পর্শ, যাকে সবাই বলবে অবৈধতা, নির্লজ্জ হয়েছিল তরু সেই সন্ধ্যায়। অনি বলেছিল, সিংহীবাড়ি থেকে কাঠচাঁপা এনে দিতে পারিনি বলে তিনদিন কথা বলোনি তুমি। তরু বলেছিল, সিংহীবাড়ির সুদাম অনেক অনেক কাঠচাঁপা এনে দিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলতে বারণ করেছিল। অনি বলল, সুরোমাসির সাজা পান খেয়ে দুজনে কোথায় লুকিয়েছিলাম মনে আছে? তরু বলতে দ্বিধা করেনি, ওই বাড়িতে যে ওরকম একটা ঘর আছে জানতামই না। তুমি টেনে নিলে তা-ই জানা গেল। অন্ধকারে দম বন্ধ হয়ে আসছিল। অনি বলল, আমার স্কুলের জামার বোতাম ছিঁড়ে রাখত কে? তরু বলেছিল, আমি, আমি।

অথচ এরকম, অকপট বা নির্লজ্জ যা-ই হোক, হওয়ার কথা ছিল না তরুর। ছেলেবেলার সেসব কথা কে আর মনে রাখে, কী আর গুরুত্ব আছে সেসবের বড়বেলার জীবনে, জীবন যত বাড়ে অকিঞ্চিৎকর করে দেয় সরলতার আবেগের উচ্ছ্বাসের ছেলেবেলা। তরু জানে। জীবন কাকে মূল্য দেয়, জীবন কীভাবে মূল্যবান করে তুলতে হয়, জীবনের ও মূল্যের সারবান সূত্রগুলো সে জেনেছে। তার পক্ষে অনির প্ররোচনায় পা দেওয়া সম্ভব নয়। তবু সে কীভাবে যেন পা বাড়িয়ে দিয়েছে। এবং সে খুশিই হয়েছে। অনির ছেলেবেলার কথা বলাকে সে প্ররোচনা ভাবছে কেন? কীসের প্ররোচনা? কী প্রয়োজন? অনি তাকে সেভাবে কোনোদিন চায়নি। তরু ভেবেছিল, অনি চাইবে। চাইল না বলেই তো তরুকে চলে যেতে হল। তাতে অভিমান ছিল তরুর, আদিখ্যেতা নয়। সুজনের সঙ্গে যখন ভবিষ্যৎ বাঁধা স্থির হয়ে গেল, তখন তো অনিকে মনে রাখার কথা নয়, রাখেওনি। দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে, কখনও ভারী হয়নি বাতাস, জলকণা জমেনি কোথাও। অনি হয়ত গল্পচ্ছলে ছেলেবেলার কথা তুলেছে, তরু থামাতে জানে। দুটো ধারা যখন পৃথক ও দূরবর্তী, এড়াতে হয়। তবে কেন আজ জড়িয়ে গেল? জীবন বলতে তরু যা বুঝেছে তা যোগফলের মতো সরল ও অভ্রান্ত নয়?

অনি আর অনির বউকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে সুজন বলেছিল, তোমাদের আরও গল্প আছে নিশ্চয়। সারাদিন শোনার ইচ্ছে রইল। এবং সে রাতে তরুকে রোজ যেমন আদর করে ঘুমোয়, তেমনি ঘুমোল সুজন। কোনো নাটক হয়নি।

এরপরও অনির সঙ্গে তরুর কথা হয়েছে ফোনে, দেখা হয়েছে শিরীষডাঙার এই বাড়িতে পুজোয় ও দোলে। নানা কথায় ফোনের এপারে ওপারে হাসিতে বেজেছে তারা। ঠাকুরদালানে রাত জেগেছে, গান গেয়েছে। উঠোনে রঙিন জলে ভিজেছে। কিন্তু কখনোই আর ছেলেবেলা আসেনি। আনেনি অনি। বলেনি তরু।

কিন্তু মাসখানেক আগে বর্ষার সন্ধ্যায় তরুর বাড়িতে হঠাৎ হাজির হয়ে অনি জানাল, শিরীষডাঙার বাড়িতে এবার পুজোর ভার পড়েছে আমার ওপর। বড়মামার ছেলেরা বলেছে,

ওদের ব্যবসার অবস্থা খারাপ। এ বছর পুজোর তিনভাগ খরচ ওদেরই দেওয়ার কথা। পারবে না। যদি আমি শেয়ার করি এবং দেখাশোনার দায়িত্ব নিই সুবিধে হয়। রাজি হয়ে গেলাম। যদিও আমি কোনোভাবেই ও বাড়ির শরিক নই, তবু রাজি হলাম। ভাবলাম, ভাগ না থাকলেও সত্যি কি আমি ও বাড়ির শরিক নই? নিজেকে খোঁজা আমার যে ওই বাড়ি থেকেই শুরু করতে হয়। আমার অনেকটা জুড়ে ওই বাড়ি। ভাবছি, সামনের মাসে একবার যাব। জলধরদা না থাকায় এক বছরে বাড়িটার হাল কী হয়েছে জানি না। কয়েকটা ঘর অন্তত বাসযোগ্য করে রাখতে হবে। ঠাকুরদালান কলি করা দরকার হতে পারে। আমি চাই প্রতিমা এবার বাড়িতেই তৈরি হোক। আমাদের ছেলেবেলায় যেমন হত। তাতে পুজোর আমেজ আগে আসে। দরকার হলে আমার অফিসে ছুটি নিয়ে ওখানে কদিন থাকতে হবে। এই পুজো ঘিরেই আমরা কয়েকটা দিন একসঙ্গে থাকি। কয়েক বছর ধরে ব্যাপারটা নিয়মরক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেখা যাক পুরোনো দিনের মেজাজ ফেরানো যায় কিনা। এবং এরপরই অনি প্রস্তাব দেয়, চলো না একদিন ঘুরে আসি। তুমি গেলে ভালো লাগবে। যাবে? জবাব দিতে ভাবার সময় নেয়নি তরু সেদিন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়েছে। কেন?

অনি ভাবে, তরু রাজি হবে না ধরে নিয়েই প্রস্তাব রেখেছিল সন্তর্পণে। কেন রাজি হবে? কে কী বলল তাতে তরু গুরুত্ব না-ও দিতে পারে, নিজের ভাবনাকে, জীবনযাপনকে গুরুত্ব দেবে না কেন? অনি ডাকলেই আসতে হবে কেন? অনি কে?

তরুও ভাবে, কেন সে রাজি হল? কেন এল? নিজেরই ভেতর আসার ইচ্ছেটা কি প্রবল হয়ে ওঠেনি? অনির সঙ্গে আসার, অনির সঙ্গে একা থাকার, অনিকে কিছুক্ষণ পাওয়ার? সে নিজেই কি লোভী হয়ে ওঠেনি? তবে এখন আড়ষ্ট হচ্ছে কেন, অস্বস্তি বোধ করছে কেন? শুচিতা, পবিত্রতা? শৃঙ্খলাহীন না হলেও তেমন সংস্কার তরুর নেই। চুরি করে অনিকে পাওয়ায় আপত্তি? আর কোনোভাবে উপায় তো নেই, দুজনেরই। অনিকে পায়নি বলে প্রত্যাখ্যান? তা অনেক আগেই হয়েছে। তবে? তরু ভেবে পায় না। এই বাড়িতে এত বছর পর, বলতে গেলে জীবন বলতে যে স্বপ্ন আবেগ সাহস সংঘাত বোঝায় সেসব শুকিয়ে যাওয়ার পর অনির সঙ্গ তাকে পরিমাপহীন কষ্ট দিতে পারে, সেই কষ্ট সে পেতে চায় না, তারই ভয়ে তরু গুটিয়ে যাচ্ছে, যা তরু আগে বুঝতে পারেনি, ভাবতে পারেনি, অনুমান করতে পারেনি।

রেলিংয়ে ভর দিয়ে ঝুঁকে ঠাকুরদালানের দিকে জরুরি সংকেতপূর্ণ ডাক ছুঁয়ে দেয় অনি, বা-দ-ল। ঠাকুরদালানের পাশে কুয়োতলার পথে বাদলের ঘর। জলধরদা বছরখানেক হল এ বাড়িতে থাকে না। খুবই অসুস্থ বলে দেশের বাড়িতে নিয়ে গেছে বউ। জলধরদার সিঁড়ি ভাঙাভাঙি নিষিদ্ধ করেছে ডাক্তার। ওর ছেলে বাদল এখানে থাকে। মানে, থাকার কথা। বাদলই বাড়ির দেখভাল করে। মানে করার কথা। বাড়িতে পৌঁছে বাদলকে পায়নি অনি। ফটকে গাড়ি দাঁড় করিয়ে হর্ন দিয়েছে বেশ কয়েকবার। কোথায় বাদল! শূন্য বাড়ি থেকে রিক্ত হাতে ফিরেছে আওয়াজ। ফটকে তালা। ছোট দরজাটা খোলা ছিল। না হলে ভেতরে ঢোকাই হত না অনিদের। বারান্দা ধরে এগোতে এগোতে বাদলকে ডেকেছে অনি।

সাড়া পায়নি। সামনে গিয়ে দেখেছে বাদলের ঘরের দরজা বন্ধ। বাদল যে এখানে থাকে তার চিহ্নও নেই আশেপাশে। অনি দেখেছে, কুয়োতলার পথে পরমানন্দে ঘনিয়েছে ঝোপঝাড়। তবে কি বাদল এখানে থাকে না? কিন্তু কাকে জিজ্ঞেস করবে অনি? একটা কারণে বাদলের অনুপস্থিতি সমর্থন করে অনি : তার সঙ্গে ফাঁকা বাড়িতে অন্যের বউকে দেখলে বাদলের চোখ কৌতূহলী হতে পারে। কিন্তু আরেকটা কারণে অনুপস্থিতি মেনে নিতে পারে না : তরু ভাববে যে অনি বাড়ি ফাঁকা করে রেখে এখন অভিনয় করছে। তরুকে শুনিয়ে অনি বলেছে, কোথায় গেল! ঘরের দরজায় তালা। বাড়ি ছেড়ে কোথায় যায়! ফটকের ছোট দরজাটা খোলা। যে কেউ ঢুকে পড়তে পারে। যার হাতে বাড়ির ভার দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত, সে কিনা বাড়ি ফেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে! আসুক, স্পষ্ট বলে দেব, এভাবে চলতে পারে না।

আবার ডাকল অনি, বা-দ-ল।

আওয়াজটা ঘুরে ঘুরে, ঠাকুরদালান উত্তরের বারান্দা দক্ষিণের বারান্দা কড়িবরগা সার সার থাম লক্ষ্ণৌর রাজমিস্ত্রির হাতে কুসুমপল্লবিত দেয়াল আকন্দের ঝোপ কাঞ্চন করবী ঘাস ভাদ্রের মেঘ রোদ্দুর ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফিরে এল। কুয়োতলা থেকে পাখিদের ডাকাডাকি ভেসে এল।

অনি বলল, কোথায় গেল বলো তো! জল পাওয়া যাবে না, চা পাওয়া যাবে না! ওকে বলে দেওয়া হল, আমি আসব, তুমি থাকবে...

তরু বলে, চলে আসবে। কোনো কাজে আটকে গেছে হয়ত। ও জানে যে আমরা আসব, দুপুরে খাব।

ইচ্ছে করেই তরু 'আমরা' বলল। অনি লক্ষ করল।

অনি দূরে কিছু একটা শোনার ভঙ্গিতে বলে, ফটকের ছোট দরজা বন্ধ করার শব্দ হল যেন! খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে ডাকে, বাদল এলে?

শূন্যতা।

তরু বলে, ব্যস্ত হচ্ছো কেন? গাড়িতে জল আছে। নিয়ে আসি।

অনি বলে, তা নয়। তুমি একা যাবে কেন ? দুজনে যেতে পারি। আমরা...। থেমে যায়। কী যেন বলতে যাচ্ছিল। 'আমরা' শব্দটা জোর করে লাগানো হল কিনা বুঝতে গিয়ে কথাটা হারিয়ে গেল।

তরু হাসল।

অনি বলল, তোমার হাসি আগের মতোই আছে।

প্রশংসা শুনতে মন্দ লাগে না। অনেকেই তরুর হাসির প্রশংসা করেছে। সুজন কতবার বলেছে, তোমার হাসির সামনে আমি কোনোদিন বুড়ো হতে পারব না। তোমার হাসি কোনোদিন আমায় বুড়ো হতে দেবে না। অনি শুনে খুশি হবে ভেবে তরু বলল, তুমি এখনও সিংহীবাড়ির ঠাকুর কতটা হল দেখে আসি বলে অন্ধকার আর কুয়াশা ভেঙে ছুটে যেতে পারো।

অনি খুশি হয়। তরুর দিকে চোখ মেলে। বলে তুমি আগের মতোই আছো।

তরু বলে, তুমি এখনও রথের সড়ক থেকে মুকুট পড়ে রাজা সেজে ফিরতে পারো।

অনেক কিছুই তাহলে মনে আছে! অর্থহীন বিরক্তিকর হলেও ভোলেনি তরু। তার ছেলেবেলা যেখানে গল্প হয়ে আছে, সেই মুখ আবার দেখে অনি। বলে, তুমি বৃষ্টিতে ভিজলে মেঘ সরিয়ে এখনও আকাশ উঁকি দেয়।

তরু বলে, তোমার ছেঁড়া পকেট থেকে এখনও মেঝেয় পড়তে পারে গোলকধামের হারানো কড়ি ।

অনি বলে, আর তোমার বইয়ের তাকে মিলতে পারে আমার হারানো রাবার।

তরু বলে, তোমার পড়ার বইয়ে এখনও লেগে আছে লেবুপাতার গন্ধ।

এভাবে দুজনে উত্তরের বারান্দায় সুরোমাসির ঘরের সামনে দাঁড়াল।

তরু বলল, এখানে বসবে?

মেঝেয়?

ধুলো জমে আছে।

বসো।

দুজনে বসে পাশাপাশি।

ভাদ্রের দুপুরের আকাশে সাদা মেঘ কালো মেঘ খেলা করে। রোদ হয়, ছায়া হয়, জল হবে হবে হয়।

তরুকে বুঝতে পারছে না অনি। আঁচলচাপা সতর্কতা বা দূরবর্তিতা সরিয়ে দিয়েছে। ছেলেবেলার যে পথ ধরে তরুর কাছে পৌঁছতে চায় অনি, তরুও সেই পথ ধরে অনির কাছে আসতে চায়? দূরে সরে যেতে যেতে সহসা কেন মুখ ঘোরালো তরু?

তরু ভাবে, সেই যে রথের সড়কে বাঁক নিয়ে শিরীষডাঙার পথ ধরার পরই 'অনি সব বদলে গেছে' 'সব বদলে গেছে' বলে হাহাকার শুরু করেছিল, এখন আর বলছে না। এটা ঘটনা, রথের সড়কের বাঁকে মাঠ আর আকাশের জোড় আজ আর নেই। পথের দু-ধারে দিঘি আর পুকুরের জলে ভেজা গাছেদের সবুজ সবুজ হাত আর নেই। মাটির পথের সুগভীর যাত্রা নেই। নেই আমবাগান, বাঁশবন, ছোট ছোট চালাঘর, দাওয়ায় গাঁয়ের বধূরা, ছোট ছোট টিলার ওপর বালক-বালিকারা। এখন পথ ছেয়েছে দোকানপাটে, হাট বসেছে বিজ্ঞাপনের, ধুম লেগেছে পাকা বাড়ির। ঘুন্ডির খালের মাঠ থেকে সব পাখি উচ্ছিন্ন। কোনো বাড়ির বাঁশের বেড়ায় জড়িয়ে নেই তেলাকুচ। কোনো ডোবায় ছড়িয়ে নেই কলমি বা ঘোধকুমারী। কোনো পাঁচিল ডিঙিয়ে উঁচিয়ে নেই শ্বেতজবা বা বাসক ফুল। এটা ঘটনা, চারপাশের সবটাই দোকানদার আর খরিদ্দার হয়ে গেছে। এসব তো আর একদিনে হয়নি। শিরীষডাঙার বাড়ি যেতে যেতে অনি, তরু এবং অন্যরাও এই বদলে-যাওয়া দেখেছে বছরে বছরে। তবে আজ কেন এত হাহাকারে ভরে গেল অনি? হাহাকার তরুর জন্য, তরুকে শুনিয়ে? তরু ভয় পেয়েছিল, কোনো ভুল স্বীকারের নাটক করে বসবে না তো অনি!

অনি বলল, সুরোমাসির কথা মনে পড়ে?

পড়ে। দূরে বসলে কেন?

অনি ততটাই কাছে আসতে চায়, তিরিশ বছর আগেকার কাছে। বলে, সত্যি?

তরু বলে, সত্যি।

তোমার হাতে হাত রাখি?

হাত বাড়িয়ে তরু বলে, সুরোমাসিকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল?

অনি গেয়ে ওঠে, হৃদয়বাসনা পূর্ণ হল আজি মম পূর্ণ হল, শুন সবে জগৎজনে।

আমার বিয়ের বাসরে গেয়েছিল সুরোমাসি।

সেই কোন ছেলেবেলায় আমাকে শিখিয়েছিল।

তরু গায়, কী হেরিনু শোভা নিখিলভুবননাথ/ চিত্ত মাঝে বসি স্থির আসনে।

মুগ্ধ অনি বলে, তুমি আগের মতোই গাও।

সুরোমাসির কী হয়েছিল?

জানি না।

মা বলেছে, বড়কর্তার জন্যই নাকি সুরোমাসির ওই অবস্থা হয়।

ঠিকই। আর কিছু বলেনি?

মামাতো ভাইকে নাকি ভালোবাসত সুরোমাসি।

কেউ স্বীকার করেনি সেই প্রেম। স্বীকার করে না।

তুমিও করোনি।

কী বললে?

সুরোমাসি পাগল হয়ে যায়। কী ছিল বলো তার! শুধু গান।

ছিল। অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিল। অনেক বয়সে।

কী বলছ?

সত্যি। তারপরই নিখোঁজ হয়ে যায়। কিংবা নিখোঁজ করে দেওয়া হয়।

তরু অনিকে জড়িয়ে ধরে। বলে, তুমি ভুল বলছ, অনি।

শান্তাপ্রসাদের হাতে বাঁয়ার আওয়াজের মতো গুমগুম করে ওঠে কোথাও।

ভুল নয়, তরু। তুমি ভুল নও। তরুকে বহুকাল আগেকার মতো জড়ায় অনি।

তরু অনির ঘাড়ে মাথা রেখে সায় দেয়। শরীর অনেক ঝিমিয়ে গিয়েছে, তবু।

তরু বলে, সুরোমাসি আমাদের কে ছিল?

অনি বলে, জানি না। সত্যি বলছি জানতে পারিনি।

আলিঙ্গনের অতি পুরাতন তাপের মধ্যে চোখ মেলতেই তরু দেখে, সুরোমাসির ঘরের জানালা খোলা। জানালার ওপারে সুরোমাসির মুখ। চিৎকার করে ওঠে, জানালায় কে?

মুহূর্তে ঘাড় ঘুরিয়ে অনি দেখে, জানালা খোলা, যা কবেই চিরতরে বন্ধ করা হয়েছে।

বাইশে শ্রাবণ

কাল বিকেলে বর্ষাভিসারের আলোড়িত পদাবলির মতো যে বৃষ্টি ও হাওয়া হল, দুঃসহ তপ্ত মাটির হাঁড়ির মতো দ্বারিকজঙ্গলের পৃথিবী ডুবে গেল ওলাবিবি পুকুরের বর্ষীয়সী পাকের যে শীতলতায়, আজ সকাল ৮.৪৫ নাগাদ তার সুখরেণু উড়ছে বাতাসে রোদ্দুরে। মহীতোষ বারান্দায় দাঁড়িয়ে পেয়ারা গাছের শাখাপ্রশাখা পাতা ফুল কুঁড়ির গায়ে, আলগা হয়ে যাওয়া শুকনো বাকলের খাঁজে লেগে থাকা সকাল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। এ রকম সকাল সে কখনও কখনও পায় যা শৈশবের বর্ণপরিচয়ের ছবির ভেতর লুকিয়ে থাকা নানারকম গল্পের মতো অজানা সুন্দর। ঘুম থেকে উঠে সে বলতে গেলে রোজই এই বারান্দায় দাঁড়ায়। সকল সবুজ হননের যুগে ঘরের আঙিনায় পারিবারিক কাজললতার মতো এটুকু সবুজ চোখে মেখে নেওয়া তার গত কয়েক বছরের আরাম। এইরকম কিছু আরাম,. বিলাসও বলা যায়, মহীতোষ খুঁজে নিয়েছে। জমিদাবির লাঠালাঠি নেই, দখলদারির রক্তপাত নেই, ক্ষমতার নিশান নেই, এই কুরু-পাণ্ডববর্জিত মামুলি ভূখণ্ডে নিজের মতো করে বাঁচে মহীতোষ সর্বনাম। যেমন, জ্যোৎস্নার জানালায় পেঁচার প্রতীক্ষা, শেষ বিকেলে কাঁঠাল ঝোপের তামসে সবুজে মুনিয়ার প্রেম, ঘাসের বর্ণালী, গঙ্গার ভাঙনে উদ্বাস্তু মানুষের মেঘে মেঘে জড়ানো হাঁক 'ছাতা সারাই', লুপ্ত বৃক্ষছায়ায় নিহত ঘুঘু ডাকের জীবাশ্ম, পাকা সুপুরির মতো শীত বিকেলের রোদে প্রাচীন অশ্বারোহীর মহিমা — এ সবেই বেঁচে থাকে।

আজ বারান্দায় বসার সাধ হল তার। আলসেয় পা ঝুলিয়ে বসে সকালের পাণ্ডুলিপি খুঁজে দেখবে কোথাও নতুন বর্ণচিহ্ন মেলে কিনা। অবশ্য কাজের সকাল হয়ে গেছে ঢের ঢের আগে। খবরের কাগজ, শাকসব্জির গাড়ি, মাছের ফেরি, স্ন্যাক্সের ছেলেরা, কসমেটিক্সের মেয়েরা এতক্ষণে ঘুরে গেছে এ তল্লাট। খোলা বাজার, অনন্ত বেকারি, সম্ভাব্য খদ্দেরের কাছে প্রত্যেক বিক্রেতাকেই পড়ি-মরি করে আগে পৌঁছতে হবে; আজ পেছনের জন সামনের জনকে লেঙ্গি মেরে ফেলে দিচ্ছে, কাল ছুরি মেরে ফেলে দেবে, পরশু গুলি করে; পুঁজিবাদ সমাজকে এগিয়ে দেয়, প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই সুন্দর সমাজ গড়ে ওঠে; সমাজতান্ত্রিকরা পরাভূত, ইস্তেহারে ইস্তেহারে যাদের কবর খোঁড়ার সুসমাচার বারবার শোনানো হয়েছে আজ তাদেরই কাছে পুঁজি মেগে নিজেদের কবর আড়াল করতে হয়রান সমাজতন্ত্রীরা। কাজের সকাল ঢের আগে হয়ে গেছে, স্যালারি ফর সেভিংস, ওটি ফর রোটির ছন্দোময় শ্রমিক

আন্দোলনের কিছু মুজরো বেলফুল আতরের গন্ধ আর হাহাকার আর ঠান্ডা চিমনি ছড়িয়ে আছে ভোরের আকাশে। মহীতোষের খেয়াল হয়, সে আবার রাজনীতিতে ঢুকে পড়েছে, পাটোয়ারি বুদ্ধিহীন রাজনীতি, নিজেকে সর্বস্বান্ত করার রাজনীতি, অলীক প্রেমের রাজনীতি। না, আজ সকালটা, আজ সারাদিন সে শান্তিতে কাটাতে চায়। তা রবীন্দ্রনাথ যতই বলুন, কেউ কেউ বলে যে এমন দিন কখনও আসবে না যখন সমস্ত মানুষ খেতে পরতে পাবে, সুখস্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে — এটা যদি সত্য হয় তো তারা বড় কঠিন কথা বলে, এই যদি না হয় তাহলে বিধাতা বড় নিষ্ঠুর আর মানুষ বড় হতভাগ্য, মহীতোষ আজ দিনভর রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনবে। মিলিদি বিয়ের পরই গান ছেড়ে দিয়েছিল। কেন গাও না? ভালো লাগে না। কেন? ভালো লাগে না। কেন? জানি না। সত্যিই জানি না। তবে কেন গেয়েছিলে 'কেন রে এতই যাবার ত্বরা কেন'? জানি না। কেন বুক মুচড়ে শুনিয়েছিলে 'এখনি মাধবী ফুরালো কি সবই / বনছায়া গায় শেষ ভৈরবী'? আহ্ জ্বালাস নে, মহী! কেন সব শূন্য করে দাও তুমি গান গেয়ে? মহী আমায় ক্ষমা কর। তানপুরা থামিয়ে কেন চোখ মুছলে আঁচলে? কেন জ্বালাস আমায়, কোন অধিকারে? তোমার কান্না-ভেজা আঁচল হাতে নিয়ে বসেছিলাম। সরিয়ে নাওনি। আবার গাইলে। আমি পালালাম। না, আজ মিলিদিকে এড়াবে মহী। আজ গান শুনবে।

চোখমুখ ধুয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে মুছতে মুছতে মহীতোষের মনে হল তোয়ালেটা বিচ্ছিরি রকম খর্খরে হয়ে গেছে। কণা বলেছিল, গরম জলে গুঁড়ো সাবান গুলে ভিজিয়ে রাখবেন। এক রাত ভিজলে ময়লাটা ভালো ছাড়বে। যেন মহীতোষ এটা জানে না। এরকম ওরা কত কী যে বলে যায়। চায়ের কাপ সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে ফেললে তলার দিকে ছোপ ধরে না। খাবারের থালা জলে ডুবিয়ে রাখলে অনেক ভালো পরিষ্কার করা যায়। মহীতোষ এসব কণাদের চেয়ে ঢের বেশি জানে। বরং কণারা জানে না মহীতোষ কী জানে। ওরা জানে না মহীতোষকে ঘর পরিষ্কার রাখতে রোজ কতটা খাটতে হয়। কণা যে কাজ করে যায় তাতে ঘর এমন পরিচ্ছন্ন থাকা সম্ভব নয়। অবশ্য এজন্য ওকে খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না। হাজার চারেকের মতো বই জমিয়ে নিজস্ব লাইব্রেরি করেছে মহীতোষ। সেটা ঝেড়ে-ঝুড়ে পরিষ্কার রাখার দায় নিশ্চয় কণার নয়। ক্যাসেট - সিডি সাফসুতরো রাখার দায় নিশ্চয় কণার নয়। দুটো টেরাকোটা আছে, কয়েকটা ড্রয়িং আছে বাঁধানো — এসবে হাত দেওয়ারই কথা নয় কণার। আলমারির কাঁচ কেন মুছবে কণা? কেন ঝুল ঝাড়বে? ঘর মোছা ও বাসন ধোয়ার বাইরে কোনো কাজ করবে না সে। কে ঠিক করল? এরকমই ঠিক হয়ে আছে। বাড়তি কাজ করলে বাড়তি পয়সা দিতে হয়। কাজের লোক মোটে মেলে না, তার ওপর তোমার হাবিজাবি কাজ চাপালে লাফিয়ে পালাবে। কে যেন বলেছিল, তবু তো তুমি এখানে চার-পাঁচশো টাকায় লোক পাচ্ছো। বিদেশে ঘরের সব কাজ নিজেদের হাতে করতে হয়। গরিব দেশ বলে তোমার আমার মতো মধ্যবিত্তরা সুবিধা ভোগ করতে পারি। কোন বিদেশের কথা বলছে এ? তেমন বিদেশ কটা আছে? এ হেন আধা-মাথা আর কতকাল থাকবে এরা? পরের মুখের লালা নিজের মুখে জড়াবে? আর কতদিন বানাবে নৈষ্কর্মের যুক্তি? একদিন এরাই বলত, কারখানায় পুরো সময়

কাজ করা মানে মালিকের হাত শক্ত করা, পুঁজির সেবা করা। উদ্বৃত্ত শ্রমটাকে আগেই সরিয়ে নিতে হবে। এখন বলে কী? অথচ এরাই বাড়িতে কাজের লোককে খাটিয়ে মারে, মে ডে-র আগেকার নৃশংসতায়।

না, মহীতোষ উত্তেজনাবশত বারবার অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। খামোকা উত্তেজনা। অহেতুক বিড়ম্বনা। তোয়ালেটা রেলিংয়ে রেখে মহীতোষ বাড়ির দক্ষিণ কোণে বাসক গাছের দিকে তাকাল। লম্বা লম্বা পাতায় ঝমঝমিয়ে বেড়েছে গাছটা। বাড়ির বেশিরভাগ গাছই চেষ্টাকৃত, শুধু বাসক স্বতঃপ্রণোদিত এবং স্বপ্রতিষ্ঠিত। বাসকের নীচে কলহে মেতেছে একদল চড়ুই। ওরা প্রায়ই এ সময় হাঁপিয়ে-ঝাঁপিয়ে ঝগড়া করে, তারপর যে যার মতো উড়ুৎ-ফুরুৎ কেটে পড়ে। বোধহয় খেলা, নিজেদের চাঙ্গা রাখার কারুকলা। কাঞ্চন গাছে উড়ছে ভ্রমর। মহীতোষ দেখল ধবধবে সাদা পাঁচ পাপড়ির ভেতর চিকণ কালো ভ্রমর বসে গেলে তার ঘাড়ে লেগে থাকে বৃষ্টি-ভাঙা রোদের হলুদ। করবী গাছে সবুজতর কিছু দুলে উঠতেই মহীতোষের নজর সরে যায়। সে দেখে দুটো টিয়া। সেই দুটোই কি। টিয়া পাখি কত দিন বাঁচে? সে জানে না। বছর কুড়ি আগে দ্বারিকজঙ্গলের পৃথিবীতে ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়া উড়ত। নারকেল গাছের গায়ে ছোট ছোট গর্তে তাদের স্পষ্টত ঘরবাড়ি ছিল। মহীতোষ দেখেছে। ভোরের দিকে তারা উড়ে যেত রথের সড়কের দিকে। সেখানে ঢের ঢের বাগান ছিল। ঘুঙির খালের মাঠে অজয় হোম আসতেন পাখিদের চেহারা-চরিত্র জানতে। বাংলার বহু বিচিত্র পাখির খোঁজ তিনি এইখানে পেয়েছেন বলে জানা যায়। এখন সব ফ্ল্যাট হয়ে গেছে। আগে পাখি বেশি ছিল, মানুষ কম। এখন মানুষ নিদারুণ বেশি। কুড়ি বছরে পুড়িয়ে খাক্ করে দেওয়া সবুজের দুটো টুকরো কীভাবে যেন গত বছর মহীতোষদের বাড়িতে পেয়ারা খেতে এসেছিল। শেষ বর্ষার পাতায় পাতায় মেঘ-ছেঁড়া ভোরের আলোয় দুটো টিয়াপাখি দেখে মহীতোষ অবাক। কোত্থেকে এল? থাকে কোথায়? সেরকমই সবুজ, ঠোঁট লাল, চোখের দু-পাশে লাল। বিতাড়িত আত্মীয়র মতো ভয়ে ভয়ে এসেছে, ভয়ে ভয়ে খাচ্ছে। এখনও যে দোয়েল, বুলবুলি, পানকৌড়ি, কাঠঠোকরা মহীতোষদের বাড়িতে আসে হয়ত তাদের কাছেই খবর পেয়েছে। উন্নয়নের হাত এখনও সব কিছু ছবি ও সমাধিলিপি করে দিতে পারেনি জেনে মহীতোষ স্বস্তি পেয়েছিল। আজ টিয়া দুটো কেন এল? এখন বৈশাখ, পেয়ারার কুঁড়ি ধরেছে সবে, করবী গাছে তেলাকুচও শুকিয়ে গেছে, কোনো খাদ্য নেই। খাবারের খোঁজে এলে আজ এদের খালি পেটে ফিরে যেতে হবে। মহীতোষ অসহায় বোধ করে। কিন্তু সে লক্ষ করে, ওদের কোনো ব্যস্ততা নেই, খাবারের খোঁজে ডালে ডালে উঁকি-ঝুঁকি নেই। দুজনে পাশাপাশি চুপচাপ বসে আছে। একটি পুরুষ, কণ্ঠীগলা, মহীতোষ চেনে। ওদের বসে থাকা দেখে মহীতোষের মনে হয়, ওরা প্রেম করতে এসেছে। এক আশ্চর্য বর্ণালী খেলে যায় মহীতোষের চোখের সামনে। তৃষিত আত্মার মতো সে প্রণয়দৃশ্যের মুখোমুখি দাঁড়ায়। হালকা হাওয়ায় পাতা নড়ে, পুকুরের জল কাঁপে, সকালবেলার আলো কাঁপে। প্রণয়ীযুগল স্থির। স্থির মহীতোষ। প্রণয়ীরা ঘাড় ঘুরিয়ে ঠোঁটের দূরত্ব ছোট করে। এতক্ষণ ওদের পেছনে ছিল মহীতোষ। এবার ওদের একটি করে চোখ

মহীতোষের দিকে। কিন্তু ওরা যেন মহীতোষকে দেখছে না। পুরুষ এগিয়ে যায় নারীর দিকে। নারী স্থির, ব্যাকুলতা নেই বাহির-শরীরে, কিন্তু প্রস্তুত, সদিচ্ছায় স্থির নারী। পুরুষের ডানা নড়ে, ঘাড় নড়ে, ঠোঁটের কুশলতা কাঁপে। নারীর গ্রীবা সম্মতিতে স্থির। এরকম মগ্নতার ওপর হঠাৎ বাজ পড়ল। রাস্তা থেকে বিকট গলার চিৎকার খান খান করে দিল। ম-ই-তু-স! দুটো সবুজ ডানা ঝটপটিয়ে পালাল। রুক্ষ হয়ে গেল চারপাশ। বীরেশ্বর আবার চেঁচাল, মইতুস! খাড়াও। তোমার লগে কথা আছে। জরুরি কথা। আইতাছি। বীরেশ্বর চেঁচিয়ে বলল।

এতটা না চেঁচালেও চলত। বীরেশ্বর যে পথ ধরে আসছে তার গায়েই মহীতোষদের বাড়ি। খুব বেশি হলে পঞ্চাশ গজ দূরে বীরেশ্বর। কোনো হট্টগোল নেই। স্বাভাবিক গলায় কথা বলতে বলতে গেলেই দু-পাশের বাড়ির জানালায় দরজায় পৌঁছে যায়। পথের যে সাধারণ প্রস্থ থাকা উচিত এখানে তা নেই। সঠিক অর্থে গলি। এখনকার অ্যাম্বুলেন্স এবং পুলিশের গাড়ি ঢোকার মতো জায়গা ছেড়ে, 'দাও ফিরে সে অরণ্য'-র পেল্লায় বোর্ডিংয়ে প্রতীকী গাছ পাখি মেঘ সূর্য বৃষ্টি নদী টিলার অণুচিত্র এঁকে আমবাগান লিচুবাগান পেয়ারাবাগান বাঁশবাগান প্লট করে বিক্রি হয়, বাড়ি তৈরি হয়। পরে পথ বানিয়ে দেয় পুরসভা। 'সরণি' শব্দটা খুব চালু হয়েছে। স্থানীয় এক প্রভাবশালী নেতার প্রয়াত পিতৃদেবের নামাঙ্কিত এই সরণি। লোকজন অবশ্য বাঁশবাগান ও আমবাগান বলতেই অভ্যস্ত। যেমন, বেলতলা, বকুলতলা, মানিকতলা। বীরেশ্বর দলবল নিয়ে আসছে। বোধহয় মিটিং গোছের কিছু ছিল। মহীতোষ অনুমান করে, অনুমান কেননা, এদের অনেককেই সে চেনে না, চিনলেও মনে রাখতে পারে না, বীরেশ্বরের সঙ্গীদের মধ্যে কয়েকজন এল সি এম আছে। কথা বলছিল বীরেশ্বর, বাকিরা শুনছিল। মহীতোষ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল, মানুষের কাছে যেতে হবে, মানুষকে গোটা বিষয়টা জানাতে হবে, বুঝিয়ে বলতে হবে। আমরা কোনো মতামত ওপর থেকে চাপিয়ে দিতে পারি না। জনমতই শেষ কথা। তার জন্য ঘরে ঘরে গিয়ে কথা বলতে হবে। মহীতোষ সহসা দ্বিধাগ্রস্ত হয় : কথাগুলো কি সে এখন শুনছে, নাকি বহুযুগ বহুবার শোনা কথাগুলি তার ভাবনায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। হয়ত এরা অন্য কথা বলছে, মহীতোষ ঘোরের মধ্যে পুরনো সংলাপ শুনছে। কিন্তু, বীরেশ্বরের বাঙাল টানে তার প্রত্যয় হয় যে, কথাগুলো বীরেশ্বরই বলছে। এই প্রত্যয় অবশ্য কংক্রিটের ল্যাকপেকে কলামের বেশি কিছু নয়। কারণ, বীরেশ্বর মানেই বাঙাল টান এ সূত্র সর্বত্র খাটেনা। টান ঝোঁকহীন মার্জিত নাগর বাংলা বীরেশ্বর দিব্য বলতে পারে, মহীতোষ শুনেছে। পদ্মাপারের জলহাওয়ার অহংকার এবং দেশ ভাগের যন্ত্রণা যা তার বাচনভঙ্গি নিয়ন্ত্রণ করে বলে নিজেই জানিয়েছে, সেটা নিপুণ মাদারির মতো হাপিজ করে দিতে জানে বীরেশ্বর। চক্রান্ত কইর‍্যা অরা দ্যাশের মাটি কাইড়্যা নিছে। মুখের ভাষা কাড়তে পারে নাই। অগো হিম্মতে কুলায় নাই। অহন কুনো কুনো পুঙ্গির পুত্ ঠ্যাস মাইর‍্যা কয়, বীরু, তুমি বাঙাল ভাষায় কথা বলো ক্যানো? ইচ্ছা হয় পোঙ্গায় অ্যাকখান লাথি মাইর‍্যা উপ্‌তা কইর‍্যা ফেলি। একজন ব্রিটিশ কি চীনে গিয়া চীনা ভাষায় কথা কইবো? একজন জার্মান কি আরবে গিয়া আরবিতে কথা কইবো? না কি একজন ফরাসি হায়দরাবাদে আইস্যা তেলুগুতে কথা কইবো? আবাইল্যাগো কথা শুইন্যা হাসিও পায়, গা-ও জ্বলে। দ্যাশ ভাগের

কষ্ট তো অরা পায় নাই, পাইলে বুঝতো ভাষাটারে ক্যান অ্যাতো মায়া করি। বীরেশ্বরের এই যুক্তি আরও অনেকের মতো মহীতোষও বহুবার শুনেছে। একবার সে প্রশ্ন করেছিল 'অরা' মানে কারা? বীরেশ্বর জবাব দেয়নি। বলেছিল, বুইঝ্যা নাও। মহীতোষ পরে বুঝেছে, 'অরা' 'অগো' ভাঙলে বীরেশ্বরের পার্টির প্রপিতামহসুদ্ধ বহু মান্যজন জড়িয়ে পড়বে। বীরেশ্বরের বাঙাল ভাষা বলার মূলে আছে আত্মপরিচয়ের সংকট ও প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা, মনে হয়েছে মহীতোষের। সে ভাষা তার স্বভাবের উগ্রতা বোঝাতেই ব্যবহার করে। যেখানে উগ্রতা চাপা দেওয়া দরকার, ভাষা পাল্টে নেয়। সে ভাষা পার্টি কর্মীর অঙ্গীকারে দৃঢ় : সমাজকে দুর্নীতি মুক্ত করতে মৃত্যুবরণেও প্রস্তুত, সেই মৃত্যু শত শত চেতনাকে প্রবুদ্ধ করবে;সে ভাষা শ্রদ্ধাশীল : আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা নীতির প্রতি অনুরাগের প্রমাণ, নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যের প্রমাণ, আমি সেই আনুগত্যে অবিচল থাকতে চেয়েছি; সে ভাষা বন্ধুত্বপূর্ণ : বিরোধিতা তো থাকবেই, শত্রুতা নয়, হৃদয়ে হৃদয় মিশলে শত্রুতা দাঁড়ানোর জায়গা পায় না। সে ভাষায় ঝাঁঝের রূপটান নেই : আদর্শ মারাইয়া বিক্ষুব্ধ হইতে যাইও না চান্দু, পুট্‌কি জ্যাম কইর‍্যা দিব, হাগবার পারবা না, পেট ফুইল্যা পইচ্যা মরবা। বীরেশ্বরের সঙ্গে অনেকটা সময় রাজনীতিতে দলবদ্ধ থেকেছে মহীতোষ। নিকট থেকে চিনেছে বীরেশ্বরকে। পরে দূরত্ব হয়ে গেলেও নিকট বীরেশ্বর দূরের হয়ে যায়নি।

কিন্তু আজ সকালে বীরেশ্বরকে উপদ্রব মনে হয় তার। টিয়াপাখির সম্ভাব্য প্রণয়দৃশ্যে মগ্ন থকাটা ছিল অসতর্ক মুহূর্ত। সেই মুহূর্তে বীরেশ্বর তাকে টার্গেট করেছে। রাস্তা থেকে বারান্দায় দাঁড়ানো মহীতোষকে দেখে ফেলেছে সে। 'মা নিষাদ' বলার কেউ তো আর নেই। মহীতোষের সঙ্গে বীরেশ্বরের জরুরি কথা থাকতে পারে না। কারোরই নেই। জরুরি কথা বলতে যা বোঝায়, মহীতোষ কবেই সেসবের বাইরে চলে গেছে। জরুরি কথায় প্রসঙ্গের গুরুত্ব থাকে, যার সঙ্গে কথা হবে তার গুরুত্ব থাকে, সে যা বলবে তার গুরুত্ব থাকে — কোনোটাই নেই। বীরেশ্বর জরুরিমনে করছে এমন কিছু থাকতে পারে? একসময়ে ছিল, তখন মহীতোষ নানা বিষয়ে প্রশ্ন তুলত, আপত্তি জানাত, সমালোচনা করত অর্থাৎ তার একটা সক্রিয়তা ছিল। সেসব প্রশ্ন আপত্তি সমালোচনা যে মহীতোষের ক্ষতি করছে, বিপদ ডেকে আনছে তা বোঝাতে ও সতর্ক করতে ও নীরব থাকার পরামর্শ দিতে বন্ধুভাবে কাছে ডেকে নিত বীরেশ্বর। সেগুলি ছিল জরুরি কথা। মহীতোষকে চাকরি না ছাড়ার সামাজিক ও পারিবারিক জ্ঞান দেওয়াও ছিল জরুরি কথা কিন্তু সেসব কবেই চুকে-বুকে গেছে। সুতরাং মহীতোষ মনে করে, তার সঙ্গে বীরেশ্বরের জরুরি কথা থাকতে পারে না, এটা ওর ঢপ্।

দলবলসহ বীরেশ্বর মহীতোষের বাড়ির দরজায় থেমেছে। কাউকে দাঁড় করিয়ে রাখা ওর কায়দা, টেকনিক, এভাবেই সে একজনকে গুরুত্বহীন করে দিতে এবং নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে চায়। বীরেশ্বরও মহীতোষকে নিকট থেকে চেনে। সে জানে, মহীতোষ দাঁড়িয়ে থাকার পাত্র নয় এবং একবার চলে গেলে ব্যস্ত থাকার অছিলায় দরজা থেকে ফিরিয়েও দিতে পারে। তবু কেন এই আচরণ, এই দাঁড় করিয়ে রাখা? বুঝতে মহীতোষ বীরেশ্বরের দিকে

মনোযোগী হয়। কথা বলছিল বীরেশ্বর, অন্যরা শ্রোতা। মহীতোষ শুনল, অরে বুদ্ধিজীবী বানাইছে কে? বুকে হাত রাইখ্যা কও। আমরাই বানাইছি। ক্যান? আমাগো বুদ্ধিজীবী কম পড়ছিল? আমাগো বুদ্ধিজীবিগো বিশ্বাসযোগ্যতা কম ছিল? গ্রহণযোগ্যতা কম ছিল? মাইনষে আমাগো বুদ্ধিজীবীগো গোনায় ধরে না? ক্যান ধরে না? সেইটা ভাবো। আমাগো খামতিগুলা বাইর করো। সরকারের কাজে অনেক ভুলভ্রান্তি আছে, দুর্নীতি-জোচ্চুরি আছে, অপদার্থতা আছে, সব সরকারেরই থাকে, এমন একটি দেশ কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সব পার্টিরই একশো রকমের অপকর্ম থাকে, সরকারে থাকলে তো কথা নাই, তা তুমি দুই-চাইরটা হাল্‌কা অন্যায় অপকর্মের বিরুদ্ধে নিজেগো বুদ্ধিজীবী দিয়া বলাও, বিবৃতি দিতে বাইধ্য করো। দেখ্‌বা, প্যাপারগুলা লাফাইয়া পড়ব, হাতে ভুট্টা লইয়া চ্যানেলওলারা ছুটাছুটি করব, ক্যামেরা আমাগো বুদ্ধিজীবীগো মুখ দেখাইব অন্য ভুমিকায়। এ কী শুনি আজ মন্থরার মুখে? ট্রেনে বাসে বাজারে অফিসে দেখবা কী প্যাঁচাল পাড়ব লোকে, এতদিনে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর পাওয়া গেছে ভাইব্যা দুই কাপ চা বেশি খাইবো, দুই পেগ মাল বেশি টানবো। খাওয়াইতে জানতে হয়। আমাগো বুদ্ধি জীবীরা বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরা পাইবো, সাধারণ মাইনষে তারে তাগো লোক ভাববো। তা না কইর্‌যা তুমি অন্য শিবিরের বুদ্ধিজীবী আন্‌লা। তার উপর তোমার কন্ট্রোল কাজ করতে পারে না। তার হিসাব অন্য। তোমার হিসাবের লগে মেলে না। সে সময় বুইঝ্যা তোমারে লেঙি দিবো। বৃহত্তর লাভের জন্য তোমারে পথে বসাইবো। তাই হইল। মাঝখান থেইক্যা সে বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরা পাইল। মানুষের কণ্ঠস্বর হইয়া গেল। তুমি প্যাকে-কাদায় ভূত।

বীরেশ্বরের কথা সবসময়ই উপভোগ্য লাগে মহীতোষের। তা আংশিক সত্য হোকবা ডাহা মিথ্যা। পূর্ণ সত্য বীরেশ্বররা বলতে পারে না, বলার অধিকার নেই, তেমন চাপে পড়লে বিরোধী পক্ষের ত্রুটি বা দুষ্কর্ম আক্রমণাত্মক ভাবে তুলে ধরে সত্য ফাঁসের বিপন্ন পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়। আরও বেশি বেকায়দায় পড়লে 'নো কমেন্টস্', পরিস্থিতি আশঙ্কজনক হলে 'ক্লোজ চ্যাপটার', যতক্ষণ পর্যন্ত নীরবতা চাপিয়ে দেওয়া না হচ্ছে, বীরেশ্বর উপভোগ্য। পদ্মাপারের কথ্যভাষার কমিক রিলিফের সঙ্গে সর্ষে বাটার ঝাঁঝ জলের উজ্জ্বল শস্যের মতো একটা সম্মোহন ছড়িয়ে দিতে পারে। বাঙাল টানহীনেও সে উপভোগ্য, চালু পোলেটিকাল লব্‌জে দাঁড়িয়েই সে অ্যাপোলিটিকাল বাগ্‌বিধি বা উদ্ধৃতি জুড়ে দিতে জানে, যেমন আমাদের সমালোচকরা চক্ষুষ্মান হবেন এটাই কাম্য। পুত্রদের একে একে মৃত্যুসংবাদে বিলাপকাতর ধৃতরাষ্ট্রকে আমরা দেখতে চাই না। এইসব যদি গুণ হয়, প্রভূত পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও বীরেশ্বর কেন অঞ্চল পেরিয়ে উচ্চতর পদাধিকারে যেতে পারল না, এ প্রশ্ন মহীতোষের থেকেই গেছে। হয়ত গুণের ভাগ বেশি, যা মিডিওকাররা পছন্দ করে না। মাফিয়ায়ানার এই যুগে বীরেশ্বর হয়াত বেমানান ও বিপজ্জনক। কিংবা আরও কিছু গুণ থাবা দরকার ছিল, বীরেশ্বর যেখানে নামতে পারেনি।

কিছু ঘটনায় বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকায় শহর ইদানীং কিঞ্চিৎ আলোড়িত। কাগজে বিবেচনাপূর্ণ সুলিখিত চিঠিপত্র প্রকাশিত হচ্ছে, অন্যরকম জ্বালা-জোয়ারিও বেরচ্ছে, যা ছাপা না হলেই ভালো হত। বীরেশ্বরও এ মুহূর্তে সে-প্রসঙ্গেই মুখরিত। একটা কথা তোমারে মানতেই হইবো,

তোমার ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট ফেল করছে। কারে দিয়া তুমি পক্ষে বলাইবা, কারে দিয়া বিপক্ষে, কারে বোবা কইরা রাখবা, সেইটা বুঝতে পারে নাই তোমার ম্যানেজমেন্ট, বরং কর্তালি করতে গিয়া ঘাইট্যা দিছে, ঘাইট্যা দিয়া নিজের পুটকি নিজেই মার্‌লা, স্যরি, রাগের মাথায় ফস্‌কাইয়া গেছে, যারা চুপ মাইর্‌্যা ছিল, হাওয়া বুইঝ্যা তারাও চোপা খুলল। ঠিক আছে, ভুল যখন হইয়্যা গেছে, চুপ যাও, ইস্যুটা মরতে দাও। তা না কইর্‌্যা তুমি আবলতাবল বকতে শুরু করলা, আন্দাগোন্দা মারতে লাগলা। ওই যে কয় না — পোলাপানের হাতে লোহা/শয়তানে মারে গোয়া। স্যরি। অ তুমি কইলা, ওই বুদ্ধিজীবীর গলায় বকলসের দাগ আছে। যদিও এইসব মান্ধাতার বাপের যুগের কায়দার কথা লোকে এখন আর খায় না, তবু কিছু কইতেই যখন হইবো একবার ভাবো। মগজ কি বি আই এফআর -এ গেছে? লোকে প্রশ্ন তুলবো, বকলসের দাগ তো আগেও ছিল, তখন চোখে পড়ে নাই? চোখে কি ন্যাবা হইছে? আরো কতজনের গলায় বকলসের দাগ আছে, তাগো দাগ দ্যাখো না ক্যান? তোমার বিরুদ্ধে কইছে বইল্যা অরে নিয়া পড়লা? ওই বুদ্ধিজীবী যদি কয় — মহাশয়রা আমার গলায় বকলসের দাগ আছে, আর আপনাদের হাতে চেনের দাগ। আমি অসহায়, আমাকে বকলস পড়ে বাঁচতে হয়। আর আপনারা হাতে চেন নিয়ে বাঁচেন। আমি ভৃত্য, আপনারা প্রভু। দোহাই ভৃত্যকে আর ভয় দেখাবেন না। প্রভুগণ! — আমাদের মুখ কি শ্যামলসুন্দর হইবো? এতদিন যে বুদ্ধিজীবীরা সুখে দুঃখে আমাগো লগে ছিল, তাগো ক্যান মায়ের ভোগে কইর্‌্যা দিলাম? মানি, তাগো খামতি আছে। কিন্তু আর কতকাল ভাড়ার পুতুল দিয়া নিজের ঝুলন সাজাইবা?

বীরেশ্বরের ক্লাস হয়ত আরও চলত, হয়ত শ্রোতাদের থেকে প্রশ্নও করা হত, হঠাৎ মোবাইল বেজে ওঠে। এক 'নাইকবয়' গেঞ্জি 'বাংলার মাটি বাংলার জল' লিখিত ও চিত্রিত পাঞ্জাবির লোকটার দিকে তাকিয়ে কিছু বলে এবং সবাই প্রায় ছুটে মোড়ের মাথায়, কয়েকটা বাইক স্টার্টের শব্দ এবং সেই ডিগ্‌ডিগ্‌ ধ্বনিসমূহ দুরন্ত গতিতে মিলিয়ে যায়। মোড়ের দিকে ছোটার আগে বীরেশ্বর চেঁচিয়ে বলে, মইতুস, আইতাছি।

জোড়া টিয়া উড়ে যাওয়া আর বীরেশ্বরদের ছুটে যাওয়ার মধ্যবর্তী সময়টা নিয়ে মহীতোষ বারান্দায় খানিক দাঁড়িয়ে থাকল।

টিয়াপাখিদের, দোয়েল ময়না বুলবুলি ফিঙেদের, বক সারস ডাহুকদের পালাতেই হবে। সন্ত্রাস তাদের গাঁ-ছাড়া দেশ-ছাড়া করেছে। কেউ যদি না মানে তো বুঝতে হবে পোলিটিকাল মতলব আছে। আদেখলাপনার খাঁচা বাদে পাখিদের কোনো জায়গা নেই। জোড়া টিয়ার পালানোর ছবিটা মহীতোষের চোখে লেগে আছে। যেন সব সবুজ সব সৌন্দর্য সব শান্তি সমাসন্ন সর্বনাশের হাত এড়াতে পাখায় তীব্র পলাতক গতি এনে বাতাস ফুঁড়ে অতিদূর কোথাও চলে গেল। অতিদূর তেমন কোথাও আছে কি যেখানে সর্বনাশের হাত পৌঁছয় না?

বীরেশ্বরদের যাওয়াটা পাখিদের উল্টো রকমের। ভয় দেখাতে যাওয়া। সে যাওয়া সাহস তেজ বীরত্ব পৌরুষ হেক্কর মস্তানি, দরকার হলে মালপত্তর ও ফাইন টাচের কাঁপন ধরানো, বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা। ওরা কোথায় যেতে পারে, তা অনুসরণ করবে সংবাদপত্র, জানবে

পুলিশ, জানবে বাংহি সিরিয়াল, ভাববে উত্তর-সম্পাদকীয়। মহীতোষ ঘরে ঢুকে দেবব্রত বিশ্বাসের ক্যাসেটটা খোঁজে, যা সে বিপ্লবী রাজনীতির মানুষ ও কম্পারেটিভ ফিললজির গবেষক মৃণালদার কাছ থেকে উপহার হিসেবে পেয়েছে, যেখানে দেবব্রত বিশ্বাস বলছেন, 'আপনেরা হইলেন সেন্টিমেন্টাল অ্যাডাল্টস্, কতটা সাবালক হইছেন বোঝনের উপায় নাই, তবে এই যে আমার গান রেকর্ড করছেন, তার উদ্দেশ্যটা বুঝি, অন্যদের বলবেন যে জর্জদার গান আমার সংগ্রহে আছে', সেই ক্যাসেটের খোঁজে পূর্ণ মনোযোগী হওয়ার আগে স্বস্তি কামনায় মহীতোষের মাথায় একটা ভাবনা কিছুক্ষণ কাজ করে : বীরেশ্বর সম্ভবত অ্যাকশনে গেছে, যদিও তাদের এখন কোনো প্রতিপক্ষ নেই, স্বপক্ষেই বিপক্ষতা নানা রূপে ছড়িয়ে আছে, তাই অ্যাকশনে যেতে হয় এবং অ্যাকশনে গেলে বীরেশ্বর আজ নিশ্চয় আর আসছে না।

মহীতোষ ক্যাসেট খুঁজতে থাকে। বিষয় ধরে, শিল্পী ধরে মোটামুটি একটা শৃঙ্খলা আনা গেলেও কখন যে নিজেই এলোমেলো করে দেয়, রাজেশ্বরী দত্ত চলে যায় ফৈয়াজ খাঁর পাশে, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের পাশে রবিশঙ্কর, বা বিসমিল্লা খানের পাশে রাজা অয়দিপাউস, নিজেই ভুল করে, সংশোধন করে, আবার ভুল করে। অন্য কাউকে দোষ দেওয়া যাবে না, কারণ বাড়িতে যারা আছে তারা কেউই এসবে হাত দেয় না, দিলে ভালো হত, অন্তত দোষ চাপানোর ঘাড় পাওয়া যেত, তবে নিজের ভুল করার মজা থেকে বঞ্চিত থাকতে হত। মহীতোষের শেষ অফিসের এম ডি ভুবন রায় এ মজা পাননি। নিজেরই ভুলের দায় চাপানোর ঘাড় খুঁজতেন বলে। তিনি খুব ভালো জানতেন যে অন্য কারও ভুল করার সুযোগই নেই, কারণ সেই স্বাধীনতাটুকুও কাউকে দেওয়া হয় না। ভুবন রায় নিজের ব্যর্থতার অপদার্থতার দায় অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বোঝাতে চাইতেন যে তিনি নির্ভুল এবং দু-একটা ফোনে ব্যস্ত হয়ে প্রতিপত্তি দেখাতেন। ভুবন রায় নিজের সীমাবদ্ধতা হয়ত জানতেন, তাই তাঁর কাজের পদ্ধতি ছিল ডিক্‌টেটেরিয়াল, তাঁকে ছাপিয়ে যেতে পারে এমন কাউকে তিনি কাছাকাছি ঘেঁষতে দিতেন না, তাঁর নিকটবর্তীরা ছিল বেসিকালি অশিক্ষিত ও অসৎ এবং চাপরাশি;কিন্তু পঙ্গুরও তো গিরিলঙ্ঘনের সাধ হয়, চাপরাশিরা বার খাওয়ায়, তাঁর ঔদ্ধত্য সীমা ছাড়ায়, প্রতিষ্ঠানে লোকসান পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার জমায় এবং নিজের অপদার্থতা চাপা দিতে ভুবন রায় আজ একে কাল তাকে ডেকে খাস্তা করেন। ভুবন রায় যদি জানতেন তিনি অপদার্থ এবং সেটা উপভোগ করতে পারতেন, তাহলে অন্যরকম আনন্দে ডুবতেন তিনি। ডিক্‌টেটররা কেন যে এই পথ খোলা রাখে না? মহীতোষ হ্যারি বেলা ফন্টের ক্যাসেটের পাশে দেবব্রত বিশ্বাসের বর্ষার গান পেল। এদের পাশাপাশি থাকার কথা নয়, কিন্তু আছে, মহীতোষই রেখেছে, কীভাবে রাখল, ভুলে, বেখেয়ালে, কিংবা হয়ত ইচ্ছে করেই, তার প্রিয় দুই শিল্পীকে পাশাপাশি রাখার সাধ হয়েছিল। যদিও এই রাখাটা তার মনে নেই, বর্ষার গানের ক্যাসেট খুঁজতে সে দেবব্রত বিশ্বাসের থাকই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখত, 'ওয়েস্ট উইন্ড' ঘাঁটত না। তবে আজ কেন যে ঘাঁটল? এটা কি ভুল খোঁজা নয়? সাধারণ অর্থে তা-ই। অন্য কোনো অর্থ আছে, যেখানে

খোঁজার ভুলে খোঁজ মেলে। জীবনভর তো ঢের ঠিকঠাক খোঁজাখুঁজি হল, কটা ঠিক হয়েছে? তার চেয়ে বেঠিক খোঁজা যদি দু-একটা মিলে যায়, তার আনন্দ অপার। মহীতোষ সেই ভুলের আনন্দে আপাতত দেবব্রত বিশ্বাসের বর্ষার গানের ক্যাসেটের গা থেকে ধুলো মোছে। ভুবন রায় এই ভুলের আনন্দ অনেক বড় করে পেতে পারতেন, কেননা তাঁর কাজের এলাকা বড়, সরকারকে টুপিটাপা পরিয়ে, বহু ব্যক্তিকে ও বহু সংগঠনকে টুপিটাপা পরিয়ে তিনি ব্যবসা করেছেন। দুর্নীতি দমন বিভাগের কেতাবি ভাষায় যাকে বলা হয় 'হিসাব বহির্ভূত সম্পত্তি' তা ভুবন রায় করেছেন। ব্যবসা রুগ্ন বলে ছক্কা-পাঞ্জা করে হিতাকাঙ্ক্ষী ধনীদের প্রচুর মালকড়ি মেরেছেন। এই সাফল্য নিশ্চয় তাঁকে প্রভূত আনন্দ দেয়। যথেষ্ট প্রাইভেট রিসোর্স ও স্টেট স্পনসরশিপ পেয়েও তিনি ব্যবসাকে লাভজনক করতে পারেননি। এই ব্যর্থতা যদি তিনি মানতেন, তাঁর বাণিজ্যিক নির্বুদ্ধিতা যদি তিনি মানতেন, আরো ঢের বেশি আনন্দ পেতেন বলে মহীতোষের মনে হয়। ব্যবসার সব সিদ্ধান্ত তিনি নিজেই নিয়েছেন, সব কর্মসূচি, সব রূপায়ণ তাঁরই তত্ত্বাবধানে, বাইরের কারও কোনো ভূমিকা নেই তবু যে সাফল্য অনায়ত্ত থেকে গেল, সব সাহায্য ব্যর্থ করে দেওয়া গলে, কর্মীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে দেওয়া গেল, সব স্বপ্ন খসিয়ে দেওয়া গেল, তার আনন্দ কী কম? সেই আনন্দ উপভোগ না করে কেন দূরবর্তী কর্মীদের হেঁকে-ডেকে বকে-ঝকে ব্যর্থতার দায় চাপানো? নাকি এটাও আরেক ধরনের আনন্দ দেয়? নিরীহ অধীনস্থদের বকতে পারা, বেবাক মানুষকে বোকা ভাবতে পারা এক ধরনের তৃপ্তি তো দেয়ই। যা হওয়ার ছিল তা হতে পারা গেল না বলে মেনে নেওয়া কি কোনোভাবেই আনন্দদায়ক নয়? ঘন পাতার আড়াল গলে খুচরো পয়সার মতো কয়েকটা রোদ্দুর মহীতোষের মাথায় গড়ালে তার মনে হয়, সে বিষয়টা জটিল করে ভাবছে। ভুবন রায় সফল ব্যবসায়ী হতে চাননি। চেয়েছেন চিররুগ্ন সন্তানের পিতা হয়ে সফল সমৃদ্ধ জীবনের রসে ডুবে থাকতে। তাঁর সফলতা যেন কখনও সন্তানকে ছুঁতে না পারে। সন্তান তাঁর চিরনির্ভর থাকবে, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে পিতার কর্তৃত্ব নিয়ে, সীমাবদ্ধতা নিয়ে কোনোদিন প্রশ্ন তুলতে পারবে না। তিনি সন্তানকেও বিশ্বাস করেন না। তাঁর অবর্তমানে সন্তানের বেঁচে থাকা তিনি চান না। এরকম নিষ্ঠুর নৃশংস নির্বিবেক মানুষ কি ভুল করতে পারে? অসম্ভব। ভুবন রায় কালীঘাটের ফুটপাথ বা শিয়ালদা স্টেশন বা লোকাল ট্রেনের ভিখারি নন, তিনি পাকা খেলোয়াড়, তিনি জানেন কীভাবে প্রতিষ্ঠানকে রুগ্ন রাখতে হয়, তিনি জানেন প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্যোদ্ধারের অছিলায় কীভাবে কোটি কোটি টাকা বের করে ঝেড়ে দিতে হয়। সরকার বা কোনো ব্যক্তি কেন টাকা দেবে? এই প্রশ্নে থমকে গেলেও মহীতোষ জবাব পেয়েছে, সেই দেওয়া বা আদায় করার পেছনে অনেক অকথিত কাহিনি আছে, যা জানা যাবে পরে, ঢের পরে। ইতিহাসে এরকম অকথিত কাহিনী শুঁয়োপোকা থেকে প্রজাপতি হয়েছে প্রচুর। ভুবন রায়ের জীবনে ভুলের জায়গা নেই। তবে কেন অধস্তনদের কাউকে কাউকে ডেকে হেনস্তা করেন? ওটা প্রশ্ন গুঁড়িয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া। তিনি তাদেরই হেনস্তা করেন, যারা ওঁর কাজ নিয়ে প্রশ্ন তোলে। এত সোজা ব্যাপার মহীতোষ কেন জটিল করে দেয় : প্রতিষ্ঠানের ভালো

চাইলে প্রথমেই আমচা-চামচাদের সরাতে হয়, ল্যাংড়া-খোঁড়া যতই সহানুভূতির পাত্র হোক তাদের নিয়ে যুদ্ধ জেতা যায় না। ভুবন রায়রা যে যুদ্ধে আছেন সেখানে পঙ্গুরাই সবচেয়ে ভালো সার্ভিস দেয়। সুস্থ সৎদের বকা-ঝকা পঙ্গুদেরই পৃষ্ঠপোষকতা।

বঁধু দয়া করো/ বঁধু দয়া করো/ আলোখানি ধরো হৃদয়ে/ বঁধু দয়া করো। ক্যাসেট চলছে, দেবব্রত বিশ্বাস গাইছেন। আলফাল ভাবনা থেকে বেরিয়ে মহীতোষ গলা মেলাল : আলোখানি ধরো হৃদয়ে/ বঁধু দয়া করো। লক্ষ লক্ষ মুহূর্ত আলোড়িত হয়েছে সে বঁধুর দয়া চেয়ে। লেডি ব্রাবোর্ন কলেজের পেছনে মুগ্ধ অন্ধ ঘাসপৃথিবী থেকে একা একা নিয়মমাফিক ট্রামলাইন স্থবির পুরু আলো চাপা আগুনের শরীর শিককাবাবের ক্ষত্রিয় গন্ধ সিনেমার লাইনে হাভাতের দল দাঁড়াও পথিকবর ঠুলি-আঁটা গোঙা মস্তান ঝরুক মহুয়া ফুল দেরাদুন রাইস কাগজ ঠাসা কচি কচি ব্রা সার সার ভিখারির থালা ও মোমবাতি ভুটিয়া মাতাল চাঁদসি চিকিৎসা ট্রাম গুমটির নোনা অন্ধকার জোহান কথিত সুসমাচার ও কাচা কমলালেবুর স্মৃতি পেরতে পেরতে চাঁদের পাল্কির মুখাপেক্ষী হয়ে সে আপন মনে গেয়েছে : আধো-জাগরিত তন্দ্রার ঘোরে/ আঁখি জলে যায় যে ভরে। বাড়ির দরজা তখনও অনেক দূর। মধ্যরতে সরকার গঠনের বিরুদ্ধে তুলকালাম হচ্ছে ইস্ট ইন্ডিয়া রেস্টুরেন্ট। সে ঘুরে গেল রামচরিতমানস পাঠের শ্রদ্ধালু বাতাসের, কৃষ্ণচূড়া কাঠচাপা কদম গাছের, চোলাই বেচা কুপির আলো আর বেঁটে বেঁটে কাচের গ্লাস আর ছায়া ছায়া লোকজনের ফিসফাসের পথ ধরে। কিছুই তাকে ছুঁতে পারে না। আরেকবার সে আলোর হৃদয় দেখতে চায়। রাই তার বালিশে মাথা রেখে চোখের অত কাছে চোখ নিয়ে এল কেন? অমন তো কখনও হাসেনি আগে? চুলে আঙুল চালিয়ে বলল কেন 'পাজি'? যাওয়ার সময় জানালায় কেন শোনাল 'মন যে কেমন করে হল দিশেহারা'? লক্ষ লক্ষ মুহূর্ত সে উত্তর খুঁজেছে। সে গান জানে না, হারমোনিয়াম জানে না। বাঁশি জানে না। রাই বলে, শিখিস না কেন? কী হবে বল খেলে? মারপিট গুণ্ডামি। নলিনদার কাছে শিখবি? দেখিস, তোর গান হবে। যেন কে দিয়েছে ডেকে/ রজনীতে সে কে। আমরা এক সঙ্গে শিখব। রাইয়ের বাবা বারণ করল। তোমরা দুজনে বড় হচ্ছো। দুজনের দল আলাদা হচ্ছে। তোমার এখন ঘরে বসে মেয়েদের সঙ্গে গান গাওয়া মানায় না। বরং 'আত্মশক্তি ক্লাবে' ভর্তি হও। বুকডন দাও, মুগুর ভাজো। তবু রাই তাকে গান শিখিয়েছে। গোপনে গোপনে এলি কেয়া। সহসা বালিশে নেমে এসে রাই চোখে রাশি রাশি কথা নিয়ে নিশ্চুপে তাকাল। ফিসফিসিয়ে বলল 'পাজি' ! হয়ত বর্ষা ছিল। আজ আর মনে নেই। বণিক বাড়ির তিনতলার ছাদে ওঠার লোহার সিঁড়িতে হয়ত দাঁড়িয়েছিল মেঘ। আজ আর মনে নেই। মহীতোষ দেবব্রত বিশ্বাসের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গায় : স্বপনের তলে ছায়াখানি দেখে মনে মনে ভাবি এসেছিল সে কে— । হঠাৎ মনে হয় এভাবে চিৎকার করে গেয়ে ওঠার দিন তার শেষ হয়ে গেছে। কোনোকালেই সে গাইতে পারে না। রাই অবশ্য অন্য কথা বলত। এত ভয় পাস কেন? গলা ছাড়। ধর। পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে/ পাগল আমার মন জেগে ওঠে। গলা ছাড়, মহী। যে গলায় চেঁচিয়ে ডাকিস বন্ধুদের। যে গলায় খেলা নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে তর্ক করিস। যেভাবে

পুকুরের মাঝখান থেকে উড়িয়ে দিস কথা। চেনা শোনার কোন বাইরে/ যেখানে পথ নাই নাইরে। গলা কে চেপে ধরে? তোর এত ভয় কেন রে মহী? কেন গলা ছাড়তে পারে না মহীতোষ? বৃষ্টিভেজা কোন সন্ধ্যাবেলা। সে যে রাইয়ের মতো সেই সন্ধ্যায় মেতে উঠতে চায়। পারে না। ফুসফুস থেকে কে যেন টেনে রাখে তার গলা। রাই বলে ভয় কী আমি তো আছি। তার গলা সুরে খেলে না মহীতোষ সেটা পরে জেনেছে। তবু তো সে আপন মনে গাইত। নিজেকে শোনাত। মরণ বলে আমি তোমার জীবনতরী বাই। একা ঘরের শূন্যতো ভরিয়ে গেয়েছে সে কতদিন। গানটা যেভাবে সে জানে, সেভাবে গাইতে পারে না। তাতে কী হল? নিজের ভালোলাগা প্রকাশ করবে না কেন? তখন কিছুটা হলেও সাহস ছিল। আজ পাশের বাড়ির লোকের কানকে, চোখকে সে ভয় পায়। ওদের মজার খোরাক হয়ে ওঠার সম্ভাবনাকে ভয় পায়। নীচে সুচরিতা আছে। কানে গেলে নির্ঘাত নাক-মুখ কোঁচকাবে, যেন মহীতোষ অশ্রাব্য কিছু উচ্চারণ করছে, যেন লজ্জাজনক আচরণ করছে, যেন বিরক্তিকর আপত্তিকর কাজ করছে। পাশের বাড়ির মহিলা হয়ত এতক্ষণে জানালা দিয়ে প্রকৃত গোয়েন্দার মতো দেখে নিয়েছে মহীতোষের জানালা, সুচরিতার জানালা এবং আরও যেটুকু দেখা যায়, ভেবে নেওয়া যায়। হয়ত স্বসমাজে আজ কিংবা কাল দুপুরে কী প্রমত্ত হওয়ার রাতে তার পাশের বাড়ির পুরুষটির ব্যথা বা ব্যভিচারের কথা ফেটিয়ে বলবে। তার হায়ার সেকেন্ডারি দেওয়া মেয়ে, কাছের দূরের যুবকদের টানে যে বড় বড় হয়ে উঠেছে, সে-ও স্বসমাজে হয়ত পাশের বাড়ির লোকটির পাগলামি বা পেজোমির কথা বলবে। তবু মহীতোষ গায়, আধো-জাগরিত তন্দ্রার ঘোরে/ আঁখি জলে যায় যে ভরে। নিজেরই কানে বেসুরো লাগে। এত খারাপ আগে কখনও তো লাগেনি। সে কি এতই নষ্ট হয়ে গেছে' 'আধো-জাগরিত তন্দ্রা'ও নিষ্প্রাণ বিবৃতির পেরেক ঠোকার আওয়াজ যেন। তবু মহীতোষ গায়, বঁধু দয়া করো। দেবব্রত বিশ্বাস থেমে গেছেন। মহীতোষ একা একা গায়, বঁধু দয়া করো, আলোখানি ধরো হৃদয়ে। সে কাঁদতে চায়। আলোর জন্য চোখের জলে ভাসতে চায়। কথার পথে সে অনেক না-বলা কথার পথে হাঁটে। রিমিকি ঝিমিকি ঝরে ভাদরের ধারা। বাইরে বৈশাখ জ্বলে ওঠে। রুদ্র হতে থাকে। মহীতোষ গায়, আরো আরো প্রভু আরো আরো/ এমনি করে আমায় মারো। ..../ হাটে ঘাটে বাটে করি মেলা/ কেবল হেসে খেলে গেছে বেলা —/ দেখি কেমনে কাঁদাতে পারো।

স্তব্ধতার ভেতর বেড়াল ডাকল।

জানালার পর্দা টেনে ঘর প্রায় অন্ধকার করে বসেছিল মহীতোষ। বাইরে গরম বাতাস ছুটছে। ঘরের ভেতর অশ্রুকণা কবেকার আজিকার কথাহীন আখ্যানচূর্ণে মিশে স্নিগ্ধ মেঘ হয়ে আছে।

ডাকল, মঁও।

আজ সকালে ওকে আদর করা হয়নি, মনে পড়ল মহীতোষের। মনে পড়ল, সকালে চা খাওয়া হয়নি। অমন যে প্রিয় পানীয়, যা না পেলে মেজাজ খিঁচড়ে যায়, মাথা ধরে, সব কিছু

অসার মনে হয়, যা সে অপরিমেয় অতুলনীয় মূল্যবান মনে করে, যে পানীয় তার অনেক না পাওয়াকে শান্তি ও সান্ত্বনার রসে সিঞ্চিত করে, যা তাকে কত লক্ষ বার অনাহার ও অপমানের জ্বালা থেকে মুক্ত করেছে, আজ তাকে ভুলে থাকল মহীতোষ! চা তার সেই কিংবদন্তির ধাত্রী যে তাকে ঘাতকের চোখ থেকে দূরে দূরে রেখেছে নিঃস্বার্থ নিষ্ঠায়। সেই ধাত্রী অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেল! কী এমন হল আজ?

বেড়ালটা এগিয়ে এসে চেয়ারের পায়ায় গা ঘষতে লাগল। এরপর আদর না করলে লাফ দিয়ে কোলে উঠবে ।

মহীতোষ আদরের হাত বাড়িয়ে বলল, কী খবর গোপীমোহনবাবু! আজ ব্রেকফাস্টে কী ছিল, ছানা না দুধ? এতক্ষণ কি ফ্যান চালিয়ে ঘুমোনো হচ্ছিল? কণাদেবী নিশ্চয় ফ্যান বন্ধ করে দিয়েছেন। তাই উঠে এলেন। যান, এবার ওই কোণে শুয়ে পড়ুন। মাছ কাটা হলে আপনার ডাক পড়বে। ততক্ষণ ঘুমিয়ে নিন।

বেড়াল বলল, মঁও।

এত নরম করে ডাকে বেড়ালটা যে সাড়া না দিয়ে পারে না মহীতোষ। এখন তো সবাই কড়া গলায় কথা বলে, মহীতোষের সেইরকমই অভিজ্ঞতা। সেদিন পোস্টম্যান বলল, আপনি দোতলায় চড়ে থাকবেন, আর আমি নীচে ওয়েট করব, কেন, আপনি কে? এরপর পোস্টাফিসে গিয়ে নিয়ে আসতে হবে বলে দিলাম। এটা ঘটনা, মহীতোষের নামতে দু-মিনিট দেরি হয়েছিল। নিজেরই প্রয়োজনে ফোনটা কেটে দেওয়া যাচ্ছিল না। দু-মিনিট দাঁড়াতে হল বলে এভাবে বলল! তার রেজিস্ট্রি চিঠি আসে কদাচিত। বছরে দুটো, বড় জোর তিনটে। এর আগে কোনোদিন দু-মিনিট অপেক্ষা করতে হয়নি। মাথাটা গরম হয়ে উঠেছিল মহীতোষের। সামলে নেয়। কী লাভ? রাগী প্রজন্ম। ওরা এভাবেই কথা বলে। অবশ্য প্রভাবশালীর সামনে, বা যেখানে বিলা বা ভোগে করে দেওয়ার ভয় আছে, সেখানে কুঁই কুঁই। কী আর করা যাবে, এটাই সামাজিক প্রবাহ। একদিন পোস্টম্যান সম্পর্কে কী উড়ু উড়ু সুখই না ছিল ডাকঘর থেকে হেমন্তের অরণ্যে ছড়ানো। এক রিক্‌শচালককে মহীতোষ খান দুই জামা দিয়েছিল। তখন তার রিক্‌শয় যাতায়াত করত সে। কিছুদিন আগে সন্ধ্যার মুখে সেই রিক্‌শচালকের সঙ্গে দেখা অনেকদিন পর। বলল, আপনি বেঁচে আছেন? মহীতোষ রাগ করেনি, মজা পেয়েছিল, ঠিক প্রশ্ন। শুধু জামা পাওয়া নয়, মহীতোষের বেঁচে থাকার কোনো সংকেত পায় না রিক্‌শচালক। উপযোগিতা ফুরোলে সংকেত থাকে কি? মহীতোষকে মাঝে মাঝে ডাক্তারের কাছে যেতে হয়, ডাক্তারবাবুরা অনেক বেশি কড়া গলায় বলেন। পি এফ অফিসের খেটে খাওয়া ও প্রগতিশীল বিশ্বভাবনাসমৃদ্ধ কর্মচারীদেরও গলা যেন ঝামা। ইলেকট্রিক অফিসের অমন যে সাদামাটা লাইনম্যান, তারও কী মেজাজ। কেন, ব্যাঙ্কের কর্মীরা? একটু নরম করে বললে কী ক্ষতি হয়? সেভাবে বলা যায় না তা তো নয়। লিস্টি বিরাট হয়ে যাবে। মহীতোষেরই অফিসের কজন যে থাকবেন সেই লিস্টিতে। অথচ এক সময় ভুবন রায়ের কাছের লোক হতে পারে ভেবে সবাই তার সঙ্গে

নরম গলায় কথা বলত। যতদিন চাকরিতে ছিল, বাইরে নরম গলা শুনেছে। চাকরি ছাড়ার পর সব কড়া হয়ে গেল। এটাই সামাজিক প্রবাহ। মহীতোষ এসব জেনেছে ঢের ঢের আগে, অল্প অল্প করে। যেভাবে ভাঙনের নদী তলায় তলায় মাটি খেয়ে ফেলে, প্রথমে বোঝা যায় না, তারপর বোঝা গেলেও বিশ্বাস ধরে রাখতে হয় যে পুরোটা ধসবে না, তারপর কিছু প্রতিরোধের ব্যবস্থা থাকলেও করা যায় না, তারপর নিমেষে কয়েকটা জনপদ নিশ্চিহ্ন, যেন নিয়তি-নির্ধারিত। মানুষের প্রতি মহীতোষের বিশ্বাসের ক্ষয় কিংবা অবিশ্বাসের জাগরণ ঠিক কবে থেকে সেটা নির্ভুল বলা কঠিন হলেও সে একরকম অনুমান করতে পারে যে, টেক্সট্ বুক প্রকাশনা সংস্থায় কাজ করার সময়েই ক্ষয় তাকে ধরেছে, যখন তার সামনে আলো আমার আলো ওগো আলোয় ভুবন ভরা, যখন তার সামনে আনন্দ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে/ আনন্দেন জাতানি জীবাঃ, যখন তার সামনে দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি, যখন তার সামনে ব্যর্থ নয় গো ব্যর্থ নয় গো স্বপ্নের দিন গোনা, অর্থাৎ যখন সুন্দর পৃথিবীর জন্য নিজেকে নির্মাণের সময়। এক মাস্টারমশাই বলেছিলেন, পার্ বই কত ছাড়বেন বলুন। পাঁচটা বই হয়ে যাবে ধরে নিন। সিক্স-সেভেন-এইটে স্টুডেন্ট অলমোস্ট ওয়ান থাউজেন্ড। নাইন-টেনে কিছু কম। তাও ধরুন থ্রি হানড্রেড। বুঝতেই পারছেন বিগ মার্কেট। আপনাদের বই তেমন সুবিধের নয়। অথর ফালতু। গতবার ওরিয়েন্টালের বইগুলো দারুণ ছিল। কিন্তু ওরা কথার খেলাপ করল, মালকড়ি দিল না। সংগঠন ভাবল, আমি পুরোটাই মেরে দিয়েছি। কী বেজ্জুতি বলুন তো! ওদের ৯ টা বই পাঠ্য করেছিলাম। কম করে ৯ হাজার কপি সেল। গড়ে ৩০ টাকা করে বইয়ের দাম ধরলে ৯ হাজার ইন্টু ৩০ মানে ২ লাখ ৭০ হাজার টাকার ব্যবসা। প্রথম বছর ২৫ হাজার দেবে বলেছিল ওরিয়েন্টালের লোকটা। ২০ দিয়ে হাওয়া! দেব এবার সব উড়িয়ে। বলুন কত ছাড়বে আপনার কোম্পানি। আমাদের সংগঠনগত বন্ধু আছে। ওকে বলে আরও তিনটে স্কুল করে দেব। দেখুন মশায়, এখানে কৃপা-করুণার জায়গা নেই। আপনাকে কেন কৃপা করব? আপনিই বা নেবেন কেন? এখানে সম্পর্ক খুব স্পষ্ট, থাকলে আছে না থাকলে নেই। মোস্ট প্রফেশনাল, ধান্দাপানি। আপনার কোম্পানি কামাবে, কয়েক পার্সেন্ট ছাড়বে। সোজা ব্যাপার। সিলেকসন্ কমিটিতে রামজীবনবাবু আছেন। আইডিয়ালিস্ট। উনি আমাদের বই বাঁ হাতে সরিয়ে দেবেন। সন্দীপনবাবু আছেন। উনি বুকলিস্টে আপনাদের বইয়ের নাম ছাপা অক্ষরে দেখাবেন, বিক্রি হবে না। হেডমাস্টারের ভাইপোর বইয়ের দোকান আছে, ওখানে সুবিধে করতে পারবেন না। নৃপেনবাবুর আর দু-বছর বাদেই রিটায়ারমেন্ট। উনি আমাদের চটাবেন না। সুধীরদা আপনাকে পাঠিয়েছেন বলেই এতসব বলছি। না হলে দরজা থেকে বিদেয় করে দিতাম। সুধীরদার কাছেই আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, ওনার ঋণ জীবনে শোধ করা যাবে না। আপনি ইয়ংম্যান, আমার চেয়ে বেশ ছোটই হবেন। লম্বা পথ পড়ে আছে সামনে। খানা-খন্দ দেখে চলবেন। এই যে আমেরিকা ভিয়েতনামে ন্যাপাম বোমা ফেলেছে, এটাকে কী বলব? বর্বরতা, পাশবিকতা? কোনো শব্দই যথেষ্ট নয় এই নরঘাতকদের নিন্দার জন্য। হাজার হাজার বিষাক্ত গ্যাসে মরে যাচ্ছে, মায়ের কোলে শিশু লুটিয়ে পড়ছে, যুবকরা

পঙ্গু হচ্ছে, শস্যক্ষেত্র পুড়ে খাক হচ্ছে। কবি বলেছেন, 'যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো'। আসুন, আসুন। ভালো? হ্যাঁ, আসছে। ৪টের মধ্যেই মিটিং শুরু করে দেব। ওই ঘরে বসুন, শতরঞ্চি পাতা আছে, আমি এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা সেরে এখখুনি যাচ্ছি।

মনে আছে মহীতোষের, বহরমপুর থেকে জিয়াগঞ্জের দিকে যেতে যেতে দরজার বাতাসে দাঁড়িয়ে সে ভেবেছিল, এ রকম শিক্ষক নিশ্চয় বেশি নয়, ভালো লোক অনেক আছে।

গোপীমোহন ডাকল, মঁও।

মুখ তুলে তাকিয়ে আছে মহীতোষের দিকে। বলছে, দাও। ও জেগে থাকলেই কিছু না কিছু চাইবে। এখন খাবার চায় না, জানে যে এ ঘরে ওর পছন্দের খাদ্য নেই। কোলে উঠে আদর খেতে চাইছে। খানিকক্ষণ আদর নিয়ে ফ্যানের নীচে টানটান শুয়ে ঘুমোবে।

বলল, দাও।

এই গলায়ই ভুবনের রায় কাছে ডাবল ইনক্রিমেন্ট, প্রমোশন, ট্যুর অ্যাসাইনমেন্ট চায় তাঁর নিকটবর্তীরা। আরও দাও, আদর দাও, সুখ দাও। সেই নিকটবর্তীদের কাছে তাদের নিকটবর্তীরা বলে, দাও। চাইতে জানতে হয়। সম্রাটের কাছে, রাজাধিরাজের কাছে, সভাধিপতির কাছে, যুদ্ধাধিপতির কাছে, ধর্মগুরুর কাছে, মহাজনের কাছে, কোটালের কাছে, বস্-এর কাছে, ক্ষমতার কাছে যুগে যুগে কাকুতি-মিনতির সহজ-দ্রবণীয় সহজ-শয়নীয় স্বরে দাঁড়ায়েছে অমৃতের পুত্ররা। তাদের অনেকেই পরে ক্ষমতার পুত্র হতে পেরেছে। এবং সেইসব ক্ষমতার পুত্রদের কাছে সেভাবেই দাঁড়ায়েছে অমৃতের পুত্ররা। এভাবেই ......

গোপীমোহন বলল, দাও।

মহীতোষ বেড়ালের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলে, আমিও তো জানতাম, ক্ষমতার কাছাকাছি থাকতে হয়। তাহলে মান-সম্মান সুখ-সমৃদ্ধিতে বাঁচা যায়। আমি কেন পারিনি? সেভাবে বাঁচা আমি কি অস্বীকার করেছিলাম? আমি তো জানতাম, যারা ক্ষমতার বিরুদ্ধে বলে তারাও ক্ষমতালোভী কিংবা ক্ষমতাপ্রিয়। আমি তো সেরকম বুরবক নই যে বার খেয়ে শহিদ হয়ে যাব এবং মৃত্যুর আগ্-মুহূর্তে ভাবব যে শহিদ মিনারে আমিও আছি। তবে কেন সেই জ্ঞান ইমপ্লিমেন্ট করা গেল না?

গোপীনাথ কোলে উঠে পড়ল। তাকেই মহীতোষ প্রশ্ন করল, তোমার মতো যদি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যেত, কী ক্ষতি হত ? না কাটিয়েই বা কী লাভ হল?

বেড়াল বলল, মওঁ।

এইসব কথাবার্তা হয়ত ওর আদর বিঘ্নিত করছে। জীবন নিয়ে এত ভাবলে আদর না করা যায়, না পাওয়া যায়। মহীতোষ বুঝতে পারে, সে একটা কমলাকান্তীয় ব্যাপারের দিকে চলেছে। বেড়ালের স্বভাবের ছায়াতলে সমাজতন্ত্রী চিন্তাভাবনার উল্লাসে তপ্ত হয়েছিল সে যুবাবয়সে। একজনের উদ্বৃত্ত, অন্যের বঞ্চনা — এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে বলেছেন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সে কী আনন্দ! বাংলা থিয়েটারের হতজীর্ণ প্রেক্ষাপটে সম্পন্ন বাংলার নিসর্গের

ছেঁড়া-ফাটা ছবির মতো মলিন হয়ে গেছে সে বয়স, সে আনন্দ। তবু তার ইচ্ছা করে বেড়ালের সঙ্গে কথোপকথনে। কিছুক্ষণের জন্য ভুবন রায় হওয়ার আমোদে আপত্তি কী? গোপীমোহন, তুমি আজকাল আমাকে সঠিক খবর দিতেছ না। শুনিতে পাই কোম্পানির দুরবস্থায় কোনো কোনো কর্মচারী ভাবিত। যদিও সংখ্যায় তাহারা দুই-চারিজনের বেশি নয়। কিন্তু তাহারা ভাবিবে কেন? আমি তো তাহাদের ভাবিতে বলি নাই। আমি না বলিলে ভাবিবে কেন? বেতন ঠিকঠাক সময়ে পাইতেছে, ফ্যান ঘুরিতেছে, আলো জ্বলিতেছে! এসব সুখের পরেও ভাবনার অসুখ কেন? তাহাদের চিকিৎসা দরকার। সম্ভবত তুমি এই ভাবুকদের খবর পাও নাই। পাইলে নিশ্চয় জানাইতে। কিন্তু ইহা যে তোমার ব্যর্থতা মানিবে কি? চুক্‌লি ছাড়া তোমাকে তো আর কোনো কাজ দিই নাই যে তুমি ব্যস্ত থাকিবে?

গোপীনাথ বলল. মঁও। আপনি যথার্থ বলিয়াছেন।

চরবৃত্তিকে আমি ঘৃণা করি, তোমরা জানো। ইহা আমি লিখিতভাবেও বলিয়াছি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, পৃথিবী যতদিন থাকিবে, চরবৃত্তি থাকিবে। চরবৃত্তির উপযোগিতা কেহই অস্বীকার করে না। তবে আমি ইহা লিখিব না। শতং বদ মা লিখ।

মঁও। আপনি নির্ভুল।

আমি তোমার পিছনেও চর লাগাইয়াছি।

জানি।

মন দিয়া কর্ম করো। কর্মেই উন্নতি। কর্মেব বিকল্প নাই। যাহারা বলিবে, কোম্পানিকে লাভজনক করা হইতেছে না কেন, তাহাদের জানাইয়া দিবে, কোম্পানিব লাভের চেয়ে আপন আপন লাভ নিশ্চয় অনেক বড়।

সুদেব বলিল, ঠিক আছে।

আমি যখন বলিব, কোম্পানির অবস্থা ভালো নহে, তখন সকলে উদ্বিগ্ন মুখ লইয়া নির্ধারিত জায়গায় দাঁড়াইবে।

ঠিক আছে।

কোম্পানির লাভ হইল কি না, ইহা তো বুর্জোয়া ভাবনা। শ্রমজীবী মানুষ কেন ইহা ভাবিবে?

সুখেন বলল, ঠিকই তো।

শ্রমজীবী মানুষের ভাবনা হইল নিজের শ্রমের উপযুক্ত মূল্য সে পাইতেছে কিনা। পূজার সময়ে নূতন বস্ত্রাদি কিনিবাব বাড়তি টাকা হাতে আসিতেছে কিনা। সি এল, ই এল, এম এল ঠিকমতো পাওয়া যাইতেছে কিনা। ক্যান্টিনে সস্তায় ভরপেট খাবার মিলিতেছে কিনা। ক্লাবে তাস ক্যারম খেলা, টি ভি দেখা, বাংলা উপন্যাস পড়া, ইন্টারনেটে শরীর সেঁকা ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে কিনা। মনে হয়, কোম্পানির স্বাস্থ্য লইয়া অযথা তাহারা চিন্তিত হয়। এই চিন্তার অধিকার ও যোগ্যতা কোনোটাই তাহাদের নাই।

সুদেব বলল, আপনি অনুমতি দিলে আমার বিশ্লেষণ পেশ করি।

অনুমতি দিলাম।

আপনার ঘনিষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছে এমন দুই-চারিজন কোম্পানি সম্পর্কে গুজব রটাইয়া আপনার বিরুদ্ধাচরণ করে।

উহারা যা বলে তা গুজব বলিয়া তুমি মনে করো?

নিশ্চয়। আপনার কোম্পানির মতো সুখসাগর কয়টি আছে?

তুমি একটি মহামূর্খ কিংবা নির্লজ্জ মিথ্যাবাদী। তোমার পত্নী পরপুরুষের ভোগ্যা হইবে।

এ কী বলেন, এ কী বলেন! আমি কত খরচাপাতি করে অন্যের বউ ফুঁসলে থাকি। আর আমার বউকে অন্য লোক ঝাড়ি করবে, আপনি বললেন! প্রভু, এই অভিশাপ ফিরিয়ে নিন। এই একটি মাত্র মূল্যবোধ আমি প্রাণপণে রক্ষার চেষ্টা করেছি। যোগ্য স্বামী হতে চুরি-ছ্যাঁচড়ামি থেকে বহু দুষ্কর্ম করেছি। এখন সেই ভদ্রমহিলা অন্য পুরুষের কোলে বসবে এটা ভাবলেই আমি মরে যাব, প্রভু!

মহীতোষ হাসল।

বেড়াল ডাকল, মঁও।

শোন গোপীমোহন, তুমি নির্বোধ, অলস ও আয়েসি। তোমাকে আজ তাড়াইয়া দিলে কালই তুমি বুঝিতে পারিবে যে বাঁচিয়া থাকিবার ন্যূনতম যোগ্যতা তোমার নাই। আমি রাখিয়াছি, তাই আছো। তোমাকে যখন চরগিরির কাজ দেওয়া হয়, তখন তুমি ছিপছিপে ছিলে, পোশাকে অভাবের ছাপ ছিল, চুল অগোছালো ছিল, হাসিতে সরলতা ছিল, পলকা হইলেও প্রতিষ্ঠান-বিরোধী চালু কথাবার্তার ছায়া ছিল। সহকর্মীরা তোমাকে নিজেদের লোক মনে করিত। নিজেদের মনের কথা বলিত। ভাবিয়া দেখ, তোমার কথার ভিত্তিতে কত জনকে অনুগ্রহ দিয়াছি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাহা ফলপ্রসূ হইয়াছে। দুই-চারিটা বিশ্বাসঘাতক বেইমান অবশ্য আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। গোপী, তোমার গালে গলায় কপালে পেটে পোঁদে এখন চর্বির ঘনঘটা। জামাকাপড়ে ফুটানির ব্র্যান্ড। চলাফেরা হইয়াছে পুরসভার ইঞ্জেকশন খাওয়া ষণ্ডেশ্বরের ন্যায়। তো তোমাকে চুতিয়া ছাড়া আর কী বলিয়া সম্বোধন করিব। মন খারাপ করিও না। আঁখিজল মোছো, গোপী! মন দিয়া শোনো, কাজের ধারা বদলাইতে হইবে।

সুদেব বলল, মন খারাপ করব কেন, এই ভর্ৎসনা আমাদের প্রাপ্য।

সুখেন বলল, আপনার কাজ ঠিকমতো করতে না পারলে চোখে জল এসে যায়।

ঢ্যামনামি ছাড়ো তো বাপের নাতিরা। মন দিয়া শোনো। কোম্পানির স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। সেটা আর অস্বীকার করা উচিত নয়। প্রতিযোগিতায় আমাদের কোম্পানি অনেক পিছাইয়া পড়িয়াছে। বলিতে পারো, আমরা তো প্রতিযোগিতায় ছিলাম না। এখন হইতে প্রতিযোগিতার কথা বলিতে হইবে। ধরো, একটি রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধান বলিলেন, আমরা খুব সুখে আছি। কোথাও কোথাও দুর্ভিক্ষ হইতেছে, তবু তিনি বলিলেন, দেশে খাদ্যাভাব

নাই। বেকারি বাড়িতেছে, তবু তিনি বলিলেন, বেকার সমস্যা নাই। নাগরিকদের কথা বলার স্বাধীনতা নাই, তবু তিনি বলিলেন, গণতন্ত্র সুরক্ষিত। তিনি পুলিশ মিলিটারি আর পরমাণু অস্ত্রে দেশটাকে মুড়িয়া ফেলিলেন। ইহাকে সুখের দেশ বলিতে কোনো অন্তঃকরণ সায় দিবে না। যত অসত্য প্রচার করা হোক না কেন প্রকৃত একদিন দেশটাকে ভাঙিয়া ফেলিবে।

গোপীমোহন ফট্ করে বলল, আপনি কোন দেশের কথা বললেন বুঝেছি।

মালটার বুদ্ধি আছে দেখিতেছি। শোনো, এমতাবস্থায় ব্যাপক আশঙ্কা ছড়ানো স্থিতাবস্থা রক্ষার একমাত্র বিকল্প। বলিতে হইবে, এখন তবু দু-বেলা খেতে পড়তে পাচ্ছি, ছেলেমেয়েরা স্কুলে-কলেজে যাচ্ছে, বছরে দু-একবার বেড়াতে যাওয়া হচ্ছে, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের অনুষ্ঠানে সসম্মানে যাওয়া হচ্ছে। পরিবর্তন হলে যে কী হবে বলা কঠিন। তার চেয়ে এই ভালো। পরিবর্তনের কথা যাহারা বলে তাহাদের যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নাই তাহা বারবার বলিতে হইবে। কীসের পরিবর্তন, কীভাবে? বলিয়া বলিয়া অনিশ্চয়তা গাঢ় করিয়া তুলিতে হইবে। পরিবর্তন শব্দটি যেন লোকের মধ্যে বিপন্নতা তৈরি করে। বাছিয়া বাছিয়া সেইসব নজির তুলিয়া ধরিতে হইবে, যেখানে পরিবর্তন চাহিয়া সর্বনাশ ডাকিয়া আনা হইয়াছে।

যেমন, মহিমপুবের টায়ার কারখানা।

তোমরাও পরিবর্তনের কথা বলিবে। বলিবে যে, কোম্পানির অবস্থা আশাপ্রদ নহে। কিন্তু পরিবর্তন সম্ভব কীভাবে? এই জায়গাটা ঘুলাইয়া দিবে। দেখিবে, তাহাতে স্থিতাবস্থার পক্ষেই জনে জনে সাড়া দিবে। অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হইলে নতুন উদ্যমে কাজ করিতে হইবে, প্রশ্ন তুলিয়া কাজের মানসিকতাকে খণ্ডিত করিলে চলিবে না, হ্যাঁ আমরা বিপদে পড়িয়াছি, সেই বিপদ অতিক্রম করিতে হইবে, লড়াই চাই, লড়াই হইবে ভুবন রায়ের নেতৃত্বে, তাঁর বিকল্প নাই। তোমাদের অনেক দিয়াছি, চুরি-চামারির সুযোগও দিয়াছি। এবার এই কাজটা মন দিয়া করো। অনুগৃহীতের সংখ্যা আমি বাড়াইতে চাহি না। মনে রাখিও, অনুগৃহীতদের আমি শুধুই ঘৃণা করি।

বেড়াল কোল থেকে নেমে ধীরে ধীরে হেঁটে আলমারির পাশে গিয়ে বসল। যেন সে ঘৃণা শব্দটির মানে জানে। যেন মহীতোষের কথায় সে আহত হয়েছে। হোক পরান্নপ্রতিপালিত, তারও কিছু আত্মসম্মান আছে। যেন সে পাল্টা ঘৃণায় মহীতোষের কোল থেকে নেমে গেল। এভাবেই হয়ত মহীতোষ অফিসে এক কোণে বসে থাকত, স্বাভিমানে স্বাধীনতায় স্বাতন্ত্র্যে।

বীরেশ্বরের বিশ্লেষণই যথার্থ মনে হয় মহীতোষের। মহীতোষ চাকরি ছেড়ে দেবে শুনে ছুটে এসেছিল বীরেশ্বর। বলেছিল, তোমার মাথায় ক্যারা ঢুকছে? পাগলা ডাক্তাররে মাথাটা দেখাও; দুই-এক হপ্তা ঠাইস্যা বিবশ থাকনের ওষুধ খাইবা, পইড়্যা পইড়্যা ঘুমাইবা, ক্যারা নাইম্যা যাইব। শোনো, ওই যে আত্মসম্মান আত্মমর্যাদা আরও কী সব পাহাড়ের মতো মহান মহান লাগে শব্দ আছে না, আসলে ওই সব লোম, বাড়া ভাতে লোমের মতন। ধরো, তুমি বিরিয়ানির মধ্যে লোম পাইলা, গা-টা গুলাইয়া উঠব কিনা কও? সে বিশ্বসুন্দরী ব্রহ্মাণ্ডসুন্দরী গো লোম হইলেও গলা দা বিরিয়ানি নামবো না। আত্মসম্মানের লোম ফালাইয়া দাও মইতুস,

না খাইয়া মরবা। দিনকাল খু-উ-ব খারাপ। যতটা জানো তার চেয়ে ঢের বেশি খারাপ। তুমি ভাববাদী মানুষ, ভাতেরে কও অন্ন, শকুনরে কও শকুন্তলে। অগুরুর ধুঁয়ার মধ্যে, ঘোরের মধ্যে থাকো। চাকরিটা আছে তাই বুঝতে পারো না, বাস্তব কী গুরুতর কুৎসিত কদর্য। রাস্তা-ঘাটে লাথি-ঝাঁটা খাইবা। পিছা চেনো, ঘরের লোকে তোমার কপালে পিছা মারবো!

আপন মনে হাসে মহীতোষ। সামান্য শব্দ হয়। শব্দের প্রয়োজন ছিল না। শোনবার কেউ নেই। থাকলে প্রয়োজন হয়। একার শব্দটাই নিঃশব্দ, বিনিময়হীন। তবে কেন শব্দ হল? আরও কোনো একা তারই ভেতরে বসে শুনতে চায়? কোনো আরেক একা ওরে খোঁজে, সেই তো এরই দরদ বোঝে। একাকিত্ব, নৈঃশব্দ্য ভেঙে একারাই নিজেদের এভাবে শব্দ করে জানায়।

বেড়াল শুয়ে পড়েছে। এতক্ষণে সম্ভবত ঘুমের দেশে পৌঁছে গেছে। সুচরিতার ভাষায়, স্বপ্ন দেখা শুরু হয়ে গেছে বাবুর। মাথার ভেতর জলসাঘরের ছবি উড়ছে। উনিশ শতকের বাবুদের ভোগ বিলাস আরাম নিদ্রার উত্তরাধিকারী তো! কাঠ সাপ্লাইয়ের বরাত পেয়েছে কোম্পানিতে, সাহেবের দয়ায় দুটো কুঠিবাড়ির পত্তনি মিলেছে, লেঠেল লাগিয়ে খাজনা আদায় হচ্ছে ভালোই, বাবু আর কী করেন, ইয়ারদের নিয়ে ফূর্তিফার্তা, নদীবক্ষে ঠুংরি শ্রবণ, বহির্বাটিতে নিশিযাপন ....। সুচরিতার থিওরি, লাখ লাখ টাকা খরচ করে বেড়ালের বিয়ে দেওয়া কোনো বাবু এ জন্মে গোপীমোহন হয়ে এসেছে। সুচরিতা অষ্টোত্তর শত না হলেও বিস্তর নামে ডাকে বেড়ালটাকে : গোপীনাথ, রতিকান্ত, নিশিকান্ত, রমণীকান্ত, সুধাকান্ত, সুখবিলাস, শয্যাবিলাস, ভোগেশ্বর, আরও কত।

সুচরিতার সঙ্গে মহীতোষের শেষ কথা হয়েছিল এই বেড়ালকে নিয়েই। একতলার বারান্দায় ওকে হেঁটে যেতে দেখে মহীতোষ বলেছিল, দেখো, যেন সাহিত্যসভায় চলেছেন। কাঁধে একটা 'কলা কুঞ্জ'-এর ব্যাগ ঝুলিয়ে দাও।

কথাটা বলেই ভয় পেয়েছিল মহীতোষ। সুচরিতা কীভাবে রিঅ্যাক্ট করে কে জানে। বলতে পারে, তোমার কোনো কাজ নেই, ওকে নিয়ে আদিখ্যেতা করো। মুখের কাছে তৈরি খাবার পেলে আমিও রসের কথা বলতে পারতাম। বলতে পারে, আমার কি ওসব দেখার সময় আছে, তোমার গেলার ব্যবস্থা করতে হবে না! বলতে পারে, কপালের জোরে যা-ও একটা চাকরি জুটেছিল সেটাও রাখতে পারলে না। এখন বেড়াল দেখে সময় কাটাও। বলতে পারে, তুমি এতটা অপদার্থ, বুঝতে পারিনি। বলতে পারে, যাও নকুড়বাবুর জলভরা নিয়ে এসো, ওর দৌলতে আমার ভাগ্যে এক-আধ টুকরো জুটতে পারে। কিন্তু বিস্ময়কর, কই দেখি, বলে সুচরিতা ছুটে এল। সত্যি, এত সুন্দর ধুতি পরতে আমি কাউকে দেখিনি। বাবু সংস্কৃতির অবশেষ। এই যে ধুতিবাবু, কোথায় চললেন?

বেড়াল ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। পিছু-ডাকে যেন ঈষৎ বিরক্ত।

সুচরিতা বলল, আয়।

বেড়াল দাঁড়িয়ে থাকে।

সুচরিতা ডাকে, আয়।

বেড়াল আসে। ওর চলায় ভারী সুন্দর দোলা আছে। কখনোই জোবে হাঁটে না, ছোটে কদাচিৎ। সম্ভ্রান্ত চাল, যে চালের সামনে অন্যরা প্রজা প্রজা হয়ে যায়।

বেড়াল দরজার চৌকাঠের ওপারে দাঁড়াল।

সুচরিতা ডাকল, আয়রে আমার রতিকান্ত গোপীকান্ত শশীকান্ত।

বেড়াল দাঁড়িয়ে থাকে।

ওর চলাফেরা, দাঁড়ানো, তাকানোর সঙ্গে অধ্যাপক সংগ্রাম রায়চৌধুরীর অদ্ভুত মিল পায় মহীতোষ। গোপীমোহনের ধুতি সহজাত, পেছনের পায়ে লোমের ছাঁদই ওরকম। আর সব বেড়াল থেকে ওইখানেই একদম অন্যরকম হয়ে যায়। অধ্যাপক সংগ্রাম রায়চৌধুরীর ধুতির পারিপাট্য সব্বাইকে দাঁড় করিয়ে বলে, দ্যাখ কেমন লাগে। গোপীমোহন হাঁটলে পার্শ্ববর্তীদের দেখতেই হবে। অধ্যাপক সংগ্রাম রায়চৌধুরী জানে যে পার্শ্ববর্তীরা তার হাঁটা দেখে। গোপীমোহন ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালে যে ওকে বাঘের ক্ষুদ্র সংস্করণ লাগে তা জানে না ও। অধ্যাপক সংগ্রাম রায়চৌধুরী জানাতে চায় যে, সে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালে তাকে দৃষ্টিপাত বলে।

সুচরিতা বেড়ালকে কোলে তুলে আদর শুরু করেছে। এটা আমাদের মিষ্টিকান্ত নষ্টিকান্ত ফষ্টিকান্ত। দুধ-মাছ খেতে ভালোবাসে, ভীম নাগ - নকুড় রক্ষিতের সন্দেশ ভালোবাসে, পায়েস - রাবড়ি খুব ভালো খায়, ঘুমোতে খুব ভালোবাসে, ফ্যান চালিয়ে ঘুমোয়, গরম লাগে তো, ও কখনও ইঁদুর মারে না, শিকার করে না, অন্য বেড়ালের সঙ্গে ঝগড়া করে না, ও পুরুষমানুষ, তোমরা কেউ ওকে পরগাছা বলো না।

অধ্যাপক সংগ্রাম রায়চৌধুরীর ছাত্রজীবনে নাম ছিল শীতল মিস্ত্রি। মিস্ত্রির পক্ষে অধ্যাপক হওয়া কতটা সম্ভব সে বিষয়ে সংশয়ী হয়ে সে এম এ পাসের আগেই এফিডেভিট বলে সংগ্রাম রায়চৌধুরী হয়। প্রথমাবধি সে ধুতিদুরস্ত। অধ্যাপক যে হবে তা যেন জানাই ছিল। ছাত্রকালে কিঞ্চিৎ ক্যাংঠা হলেও একটা ভঙ্গি-ভিন্নতা সে আয়ত্ত করে। কোনো বহুজ্ঞাত বা অজ্ঞাত ছকে কলেজে চাকরি ম্যানেজ করার পরই তার স্বাস্থ্য লাবণ্যময় হতে থাকে। পরে কলেজে ব্যাপক বেতন বৃদ্ধি এবং অহোরাত্র টুইশনির সুবাদে অধ্যাপক সংগ্রাম রায়চৌধুরী সম্ভ্রান্ত হয়ে ওঠে। ক্রমে ক্ষমতাশীল প্রগতিশীল বহু সংগঠনে জড়িত হয়ে বাড়তি আকর্ষণীয়তা পায়। অধ্যাপক সংগ্রাম রায়চৌধুরী এখন কচিৎ হাঁটে, তাকে মাঝে মধ্যে 'শ্রীকৃষ্ণ গাড়ি ভাণ্ডার' ও 'মা তারা ফার্মেসি'তে হেঁটে যেতে দেখে মহীতোষ।

সুচরিতার আদর চলেছে। তোমরা ওকে টাটকা মাছ এনে দিতে পারো। পার্সে, বাটা, সরপুটি,পদ্মার ইলিশ। সাহেব সাহেব নামের মাছ বাবুর পছন্দ নয়। বাবু স্নান করেন না, তবে ওডিকোলন আনতে পারো, জিভ দিয়ে গা চেটে মেখে নেবেন। তোমরা ওর জন্য জাজিম এনো, মখমলের তাকিয়া এনো। একটা ব্রুহ্যামও এনো, সাহেবের খানসামার সঙ্গে দেখা করতে গেলে লাগে।

অধ্যাপক সংগ্রাম রায়চৌধুরী সম্প্রতি সামান্য বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছে। সে যে পেল্লায় বাড়ি করেছে, তার মধ্যে তপোবন স্টাইলের হলঘর আছে। সেখানেই ওর শিক্ষাশ্রম। হলঘরের এক প্রান্তে ভিতর-বাড়ির দরজার পাশে একটি খাট আছে। ছাত্র-ছাত্রীদের টেস্ট নেওয়ার ফিকিরে ক্লান্ত সংগ্রাম সেই খাটে জিরিয়ে নেয়। কিছুদিন আগেকার ঘটনা, খাটের প্রায় পায়া পর্যন্ত নেমে আসা হ্যান্ডলুমের চাদরে সাঁটা কাগজে নাকি লেখা ছিল, 'বিছানা ছোঁবে না'। লেখাটা এক ছাত্রের নজরে পড়ে। তার মর্যাদায় লাগে। এমনিতে স্যার মাটিতে বসিয়ে পড়ান। সতরঞ্চির ব্যবস্থা নেই। বলেন, মোজাইকের মেঝেয় সতরঞ্চির কথা বলে কোন নির্বোধ? ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই লেখাটা দেখে। অপমানিত হলেও 'ঠিক আছে' বলে অনেকেই মেনে নেয়। কেরিয়ার গড়তে হলে ইনফ্লুয়েনশিয়াল টিচার চাই। স্যার চটলে মুশকিল। তবু কিছু ঠ্যাটা থাকে, যারা প্রতিবাদযোগ্য ঘটনার প্রতিবাদ করেই। সে রকম দু-চারজন অধ্যাপক সংগ্রাম রায়চৌধুরীর কাছে জানতে চায়, স্যার আমরা ধাঙড়? চাদর ছুঁলে অশুদ্ধ হবে ? স্যার আপনি আমাদের মুখে বলতে পারতেন। স্যার আমরা খাটের ধারে কাছে যাই না। অধ্যাপক সংগ্রাম রায়চৌধুরী নাকি জবাব দেয়, আমার পক্ষে জনে জনে বলা সম্ভব নয়। মুখে বললে তোদের মধ্যে কেউ কেউ আছে যারা পরে বলা হয়েছে বলে মানতে চাইবে না। আমার পক্ষে রোজ রোজ বলা সম্ভব নয়। দশ-বারোটা ব্যাচ। রোজ ঘণ্টায় ঘণ্টায় আমি এক কথা বলব? কেন স্যার, রোজ তো একই জিনিস পড়ান! কে রে? ওর কথা বাদ দিন, স্যার! আমরা কেন আপনার বিছানায় হাত দেব? আপনি এটা কেন ভাবলেন? অধ্যাপক বলে, আছে, কারণ আছে। ছাত্র-ছাত্রীরা জানতে চায়, কারণটা বলুন। অধ্যাপক বলে, আমি তোদের অপমান করিনি। যাদের জন্য লিখেছি তারা ঠিক বুঝে নেবে। এক ছাত্র বলে, স্যার, আপনাদের কত কেলো আমরা চুপচাপ শুনে যাই। স্যার, কটা ক্লাস নেন কলেজে? অত টাকা মাইনে নিতে লজ্জা করে না? কিছু মনে করবেন না স্যার, আপনারা সুবিধাভোগী সম্প্রদায়। অধ্যাপক সংগ্রাম রায়চৌধুরী চিৎকার করে ওঠে, শাট্ আপ্। তুমি অনির্বাণ, তোমার ব্যবস্থা হবে। শোনো, আমি শুধু লিখেছি, বিছানা ছোঁবে না। লেখা উচিত ছিল, বিছানায় শোবে না। আমি ঘরে না থাকলে তোমরা যে জোড়ায় জোড়ায় শোও তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। ছাত্র-ছাত্রীরা হঠাৎই যেন কথা হারিয়ে ফেলে। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কথা ফিরে পেতে হয় তাদের। জোর দিয়ে বলে তারা, আপনি মিথ্যে কথা বলছেন। অধ্যাপক সংগ্রাম রায়চৌধুরী সবাইকে ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে বলে, আমি মিথ্যেবাদী? ইউ, ইউ অল আর লায়ার। সত্যি বলার সাহস নেই। বলো, কে কে বিছানায় শুয়েছে। নাম বলো। বুঝব, তোমাদের সাহস আছে। বলো, চুপ কেন? ইউ আর আইদার ক্রিমিনাল অর কাওয়ার্ড। বেরিয়ে যাও, আমি তোমাদের সহ্য করতে পারছি না। ছাত্র-ছাত্রীরা বাইরে এসে একটা বিক্ষোভ ধূমায়িত করে। স্যারের নির্দেশে ওরা কলেজ থেকে কী কী গেঁড়িয়েছে, স্যারের নির্দেশে কোন কোন স্যারকে হ্যাঁটা করেছে, স্যারকে খুশি করতে কতরকম ফাই-ফরমাস খেটেছে, কম পয়সার গরিব ছাত্রদের কেন স্যার নোটের জেরক্স কপি দিয়েই ফুটিয়ে দেয় ইত্যাদি অধ্যাপক সংগ্রাম

রায়চৌধুরীর বাড়ির গেটের বাইরে জমা হতে থাকে। গন্ধে গন্ধে রাজনীতির জড়ো হয়, সক্রিয় হয়। দু-রকম ঝান্ডা ওড়ে। দু-রকম কর্মসূচি হয়। এতক্ষণে বেশির ভাগ ছাত্রী কেটে পড়েছে। শোয়া নিয়ে বেশি চেঁচামেচি হলে বিলা হবে। এটা তো ঘটনা, অল্প হলেও অনেকেই শুয়েছে। ঘাঁটাঘাঁটি হলে এরপর পাড়ার যে কোনো ছেলে রাস্তায় ধরে বলবে, শোবে নাকি ? সেদিকেই ঘটনা টার্ন করাতে চাইছে এক ঝান্ডার লোকজন। অন্য ঝান্ডার লোকরা প্রথমে অধ্যাপকদের কলেজে ফাঁকি ও প্রাইভেট টিউশনির বিরুদ্ধে বলে হাওয়া গরম করতে ব্যর্থ হয়ে সংগ্রাম রায়চৌধুরীর চরিত্রের দিকে বল গড়িয়ে দেয়। কেচ্ছা জমে পিক্‌লস হওয়ার আগ-মুহূর্তে বড় নেতা আমলা পুলিশ মিলে সামাল দেয়। এরপর অধ্যাপক সংগ্রাম রায়চৌধুরীর হাঁটা চলা, তাকানো, ঘাড় ঘোরানো অবিকল গোপীমোহনের মতো লাগে মহীতোষের।

কিন্তু সে-কথা সুচরিতাকে বলা যাবে না। নিজেরই বিপদ ডেকে আনা হবে। বলতে পারে, তুমি ভীষণ পরশ্রীকাতর। নিজে যেখানে চাকরি করতে তার কথা কাউকে বলা যেত না। শুনলেই চুক্‌চুক্ করে লোকে বলত, ওই কোম্পানির অবস্থা ভালো নয়। জলে পড়ার আগে মহীতোষকে কিছু করতে বলো। তোমার সঙ্গে কোথাও যেতে আমার লজ্জা করত। বাপের বাড়ি যেতে পারতাম না। মা-র মুখে দুশ্চিন্তা, দাদা-বৌদির ঠোঁটে বাঁকা হাসি। একটা মেয়েকে যদি সমাজে জবাবদিহির ভয়ে ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকতে হয়, সে মানুষ থাকে কী করে বলো ? যার জন্য তাকে লুকিয়ে থাকতে হয়, তাকে সে কী করে ভালোবাসে ? নিজের অপদার্থতা ঢাকতে তুমি সংগ্রামবাবুকে একটা বেড়ালের সঙ্গে তুলনা করছ।

সুচরিতা বেড়ালকে জানালায় বসিয়ে ছড়া কাটছে, গন্ধবেনে গোপীমোহন/ সন্ধে হলেই মন উচাটন/ অন্ধকারে দু চোখ জ্বলে/ বন্ধ করে রাখে নয়ন।

বেড়ালের সঙ্গে অধ্যাপক সংগ্রাম রায়চৌধুরীর তুলনা কুরুচিপূর্ণ। মহীতোষ মানে। সেই বোধটা কাজ করেছিল বলেই মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে যায়নি।

সুচরিতা রান্নাঘরে চলে গেল। বেড়াল জানালায়। মহীতোষ কী করবে কী করবে ভাবতে ভাবতে দু-চারবার গোপীমোহন গোপীমোহন ডেকে দরজার দিকে হাঁটছে, প্লেটে কয়েকটা মাছের ডিমের বড়া নিয়ে হাজির হল সুচরিতা। বলল, ধরো, চা খাবে, বোসো। মহীতোষ বসল চেয়ারে। অনেক দিন সে এ-ঘরে বসেনি। রান্নাঘর থেকে সুচরিতা বলল, তুমিও একসময় সাহিত্যসভায় যেতে, মনে পড়ে ? বিয়ের পরও দেখেছি। রোববার দুপুরে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে বেরোতে। তুমি অবশ্য কোনোদিনই ধুতি পরোনি। পায়জামা-পাঞ্জাবি। ফিরে গল্প করতে সাহিত্যসভার। তোমার কাছে অনেক আশা ছিল। ভেবেছিলাম, দাদা-বৌদিকে দেখিয়ে দেব, তোমাকে বিয়ে করে আমি ভুল করিনি।

সুচরিতা, তুমি কি কখনও বলেছিলে, আমাদের বিয়ের ঘটকালি করেছেন রবীন্দ্রনাথ ? তোমাকে ভালো লাগার কারণ খুঁজে হয়রান আমি মুহূর্তে আলোকোল্লাসের সামনে দাঁড়িয়ে তোমাকে কি জড়িয়ে ধরেছিলাম ? গেয়ে উঠেছিলাম, তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে/

টুকরো করে কাছি/ আমি ডুবতে রাজি আছি? সুরের ভুল শুধরে দিয়ে বলেছিলে, হল না, টুকরো করে কাছি/ আমি ডুবতে রাজি আছি? বাকিটা তুমি একাই গাইলে, দাও ছেড়ে দাও ওগো আমি তুফান পেলে বাঁচি? তোমার করতলে প্রবাহিত রক্তের তুফানে আমি কি আত্মসমর্পণ করেছিলাম? আকাশে শ্রাবণ ছিল, এই বাড়িতেই। দিনের আলোর কণায় কণায় জমেছিল মেঘ? তুমি বলেছিলে, ঘটকালির গানটা ছিল অন্য। তুমি গাইলে, আকাশ কাঁদে হতাশসম/ নাই যে ঘুম নয়নে মম/ সুদূর কোন নদীর পারে/ গহন কোন বনের ধারে/ গভীর কোন অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে আমার গলা চোখের জলে ভেঙেছিলে। তুমি মাথা টেনে নিয়েছিলে কোলে। মনে পড়ে? মনে পড়ে এইসব সুচরিতা? তোমাকেই পরাণসখা চেয়েছিল এই অপদার্থ। কেন যে অন্যরকম হয়ে গেল সব, কেন যে সব গান ব্যর্থ হল, কেন যে সন্দেহভাজন নিন্দনীয় ঘটকের মতো হয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথ, কেন যে চতুর ঘটকালির মতো প্রতারণাময় হয়ে থাকল কিছু গান। আমিও ভেবেছি, সুচরিতা!

এসব বলা যেতেই পারত। বলেনি মহীতোষ। কী হবে আরও একটা কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে। নিজেরই মৃত্যুর ধারাবিবরণী শুনে কী লাভ! যখন জীবনের সমুজ্জ্বল সংবাদ চারিপাশে! সর্বত্রই নিজেকে এক অনুপ্রবেশকারী মনে হয় মহীতোষের, যে জীবনধারণের গূঢ় ও অমোঘ প্রক্রিয়াগুলো বরাবর জেনেও পূর্বার্জিত ধারণাবশত তা মেনে নিতে পারেনি। ছকে মিলে থাকতে হয়, মিশে থাকতে হয়, অন্যরকম থাকা যায় না।

বীরেশ্বর বলত, মনটারে পরমহংস করো, মানে ফার্স্ট ক্লাস ফিল্টার। পুষ্টি খাইবা, অপুষ্টি ফালাইবা। বুঝতাছো চুকলি করলে প্রমোশন হয়, চাইরটা ইনক্রিমেন্ট হয়, তো চুকলি খাও। চুকলি খাওয়া উচিত না এই ভাবনাটাই ফালাইয়া দাও। দেখো, একবার বড়ো হইয়া গেলে ছোট কথা আর তোমারে ছুঁইতে পারব না। তুমি কোন্ সায়েবের পুট্‌কি মাইরা নিজের সম্পত্তি ফুলাইছো, লাইঠ্যাল দিয়া কোন চাষিরে পিটাইছো, কোন সায়েবরে পটাইয়া-পুটাইয়া পুরস্কার বাগাইছো, কোন ব্যবসায়ীর টাকায় বিদেশ গেছো, দুই-চাইরটা মাইয়ামানুষের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করছো — এইসব লোমছোম লইয়া পাঁচ-সাতটা লোক ঘাঁটাঘাঁটি করবো। বাকি সব কোটি কোটি — ও আমার দেশের মাটি তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা। জীবনটারে ব্রোঞ্জের মূর্তির মতন ভাবো, যা দিয়া জীবনটা তৈরি হয়, সেইটাই ফালতু হইয়া যায়। চাইরদিকে ফুটা-ফাটা, ভিতরটা ফোঁপরা। তবু তুমি ব্রোঞ্জের মূর্তি।

বীরেশ্বরের ইঙ্গিত বুঝতে অসুবিধে হয়নি মহীতোষের। তাকে বলা যেত, এখন তো সেই ভদ্রলোককেই আমরা সবচেয়ে বেশি ছোট করি। প্রাথমিকে ইংরেজি গ্রহণ-বর্জন থেকে শুরু করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পর্যন্ত বহুবিধ সমস্যা সংকটে তাঁর বাণী সমাধান হিসেবে উদ্ধৃত হয়। অথচ একদিন তাঁকে হিন্দু মহাসভা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সমভাবাপন্ন বলেছি। বলেছি, তিনি গান্ধীর চেয়েও প্রতিক্রিয়াশীল, সাভারকরের দীক্ষাগুরু। বলেছি, গরিব কৃষককে কুলাকের ভয় দেখিয়ে তিনি জমিদারি প্রথা সমর্থন করেছেন। এমনও তো আমরা স্পষ্টাস্পষ্টি

বলেছি,সমগ্র জীবন ধরে রবীন্দ্রনাথ যা সৃষ্টি করে গেছেন, শ্রেণী সংগ্রামের ক্ষেত্রে তা প্রতিক্রিয়াশীল শিবিরের শক্তি, প্রগতি শিবিরকে এগোতে হবে রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করেই, তাঁর শেষ জীবনের নজিরটা শুধু তুলে ধরে রবীন্দ্রনাথকে সমগ্রভাবে এবং মূলত প্রগতিশীল বলে ঘোষণা করলে সেটা হবে নিছক সুবিধাবাদ। বলিনি কি? বীরেশ্বরকে এসব বলেনি মহীতোষ। সব শুনে বীরেশ্বর হয়ত এটাও ঠিক ওটাও ঠিক বলে আদর্শহীনতার এক উদার আদর্শ তুলে ধরত।

সুচরিতাকে আলগোছে একটি কথা, প্রশ্ন নয়, বলেছিল মহীতোষ, একদিন আমরা দুজনে গেয়েছি 'ঝড়কে আমি করব মিতে, ডরব না তার ভ্রূকুটিতে'। কতকাল হয়ে গেল তুমিও গানটা আর গাও না।

বাথরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে সুচরিতা জবাব দিয়েছিল, ওসব অল্প বয়সের ব্যাপার। প্রথম প্রথম ওরকম হয়। জীবন তো আর ঝড়ের মিতে-ফিতে দিয়ে চলে না। অনেক কিছু লাগে। বাথরুমের দরজা বেশ শব্দ করে বন্ধ হয়।

অতিঅনুজ এক বন্ধু সম্প্রতি ইফ্‌ফত আরার সি ডি মহীতোষকে দিয়েছে। উঠে সি ডি-টা বের করে সিস্টেমে লাগিয়ে সে রিমোটে ৫ নম্বর টিপলে 'তোমার খোলা হাওয়া' বেজে ওঠে। শুনতে শুনতে সেই দিনগুলো খোঁজে। নিচু গলায় নিজেও গায়। গানের কথা ভোলেনি। 'রেখো না আর, বেঁধো না আর কূলের কাছাকাছি'। কিন্তু সুর লাগে না। বিবৃতির মতো ভঙ্গুর কথাগুলো খসে খসে যায়। সে সাধ্যমতো চেষ্টা করে প্রাণের স্পর্শ পেতে। অর্থ না থাকলে প্রাণ পাবে কোথায়? সে অর্থই পায় না। সুচরিতা গাইলে কি এখনো অর্থের ভগ্নাবশেষ পাওয়া যেতে পারে? তার ভীষণ ইচ্ছে করে সুচরিতার গলায় শুনতে। স্মৃতিও একরকম জীবিতের কথা বলে। ইচ্ছেই সার। অতদূর যাওয়া আর হয় না, হবেও না।

বেড়ালটা ঘুমোচ্ছে। সি ডি-তে পরের গান বাজে।

নীচের জানালা থেকে সুচরিতার গলা শোনা গেল, চ্যাটার্জিদা এসেছেন। তোমাকে ডাকছেন। সুচরিতার এই একটা অসামান্য গুণ, প্রসন্ন ও সুরেলা উচ্চারণ শুনে মনে হবে তারা স্বাভাবিকের চেয়েও ঘনিষ্ঠতায় আছে। গলায় এতটুকু বিরক্তি নেই। বাইরের লোক বুঝতেই পারবে না যে তারা মেরুদূরে সরে গেছে। এই অসাধারণ সৌজন্যের জন্য ওকে ধন্যবাদ জানাতেই হয়।

বিছানা এখনও তোলা হয়নি, খেয়াল হল মহীতোষের। ১২ টার ঘরে দুটো কাঁটার একাত্ম হতে আর মাত্র ১০ মিনিট দেরি। জানালার পর্দা সরাতেই গুণ্ডাবাহিনী বা পুলিসবাহিনীর মতো রোদ ঢোকে। এই দুপুরে চ্যাটার্জিদা এল! তেমন জরুরি কী থাকতে পারে? তার কাছে কারও জরুরি কিছুই থাকার কথা নয়। অল্প হলেও কোনোকালে ছিল। দু-দশজন ফোনে খেজুরি করত, কোম্পানি সম্পর্কে তাদের গঠনমূলক ভাবনা-চিন্তার কথা জানাত, কোম্পানি তথা ভুবন রায়ের সুনাম যে বহুদূর প্রসারিত সেসব বানিয়ে গুছিয়ে বলত, ভুবন রায়ের অনুগত নয় এমন কর্মীদের সম্পর্কে ঝাল মাখিয়ে বলত, নিজেরা যে ব্যক্তিগত কাজে কোম্পানির গাড়ি

ব্যবহার মানে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করে মানে বউয়েরও অফিস যাওয়া আর গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে আসা আর বাজার-টাজার করা আর মাঝে মধ্যে দক্ষিণেশ্বর ও দক্ষিণাপন যাওয়া আর সপ্তাহে একদিন মেয়েকে নাচের শিক্ষয়িত্রীর কাছে, মানে সবাই ওখানে গাড়ি নিয়ে যায় তো, আর দুর্গাপুজোর সময় একটা রাত ঠাকুর দেখা আর জামাইষষ্ঠীর দিন শ্বশুরবাড়ি যাওয়া আর মাঝে মাঝে তেমন পার্টি থাকলে আর টুকটাক কাজে গাড়ি ব্যবহারের স্বীকারোক্তি দিত। মহীতোষ তখন ভুবন রায়ের ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। কোনো অজ্ঞাত কারণে মহীতোষকে একটা সুযোগ দিয়েছিল ভুবন রায়। ভুবন রায়রা বোধহয় এভাবেই বাজিয়ে নেয়। মহীতোষ নিশ্চয় বেসুরো বেজেছিল। নাহলে কেন প্রথম সুযোগেই সরকারের বরাত্তের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল না হয়ে বাজারে দাঁড়ানোর কথা বলবে, প্রতিযোগিতায় যাওয়ার কথা বলবে! স্বভাবতই মহীতোষ কাছের লোক হওয়া থেকে দূরে ছিটকে যায় এবং এ রকম লোককে ততদিন খেজুরি-করা লোকজন এবার পেড়ে ফেলে। তারপর তার কাছে আর কারও জরুরি কেন, কোনোরকম প্রয়োজন নেই। চ্যাটার্জিদা বীরেশ্বর নয় যে জরুরি অছিলা খাড়া করবে।

মহীতোষ চ্যাটার্জিদাকে ওপরে নিয়ে এসে বাইরের ঘরে বসাল। একটু বোসো। আমি এখ্‌খুনি আসছি। বলে সে চটপট বালিশ-কোলবালিশ ডিভানের ডালা তুলে ভেতরে ঢোকায়। চাদরটা নামমাত্র ঝেড়ে টানটান করার চেষ্টা করে। এদিক টানলে ওদিক কোঁচকানোর খেলা থেকে অব্যাহতি নিয়ে বাইরের ঘরে যায়। জিজ্ঞেস করে, এই দুপুরে এলে যে?

ঘনপক্ষ্মের ছায়াময় টানটান চোখ তুলে হাসে চ্যাটার্জিদা। সবে ১২টা বাজে। এখনই দুপুর হয়ে গেল?

না, মানে প্রচণ্ড রোদ বাইরে।

বুড়ো হয়ে গেছ, মহী! বৈশাখে রোদ তো হবেই। নতুন কী। তবু কাল যথেষ্ট ঝড়বৃষ্টি পেয়েছ।

সকালটা বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা ছিল।

পঁচিশে বৈশাখে রোদে পুড়ে গান শোনা, সারা দুপুর টইটই, গঙ্গায় স্নান সেরে ঘাটেই পুরি-তরকারি, বা ময়দানের কোনো টেন্টে টোস্ট-চা খেয়ে আবার সন্ধ্যায় গান শোনা, নাটক দেখা এবং দারুণ একটা দিন কাটানোর খুশি নিয়ে বাড়ি ফেরা — ভোলোনি নিশ্চয়।

তুমি কি সেইসব ঘটনা থেকে আজ কোনো সুখ পাও?

জানি না। তবে একটা স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম, যার রেশ আজও কোনো-না-কোনো ভাবে আমার মধ্যে থেকে গেছে, এই দিনটিতে সেসব যেন আমার বেঁচে থাকার সপক্ষে দাঁড়ায়।

এটা সত্য কি, চ্যাটার্জিদা? তোমার মনগড়া ব্যাখ্যা নয় তো? নিজেকে খুশি রাখার ছল নয় তো? তুমি যাকে স্বপ্ন বলো, আমি যদি বলি উন্মাদনা, ভুল বলা হবে কি?

চ্যাটার্জিদা নরম হেসে, না না, স্বপ্ন। ব্যর্থ হয়েছে বলে স্বপ্নকে স্বীকার করবে না।

বীরেশ্বর বা আর কেউ হলে মহীতোষ থেমে যেত। চ্যাটার্জিদার সঙ্গে কথা বলা যায়, যেন নিজেরই সঙ্গে কথা বলা।

চ্যাটার্জিদা, রবীন্দ্রনাথ বলতে আমরা বুঝি কিছু গলা, গায়কী, বাগ্মিতা, বিশ্লেষণ, বই, পাঠ্য, নোট, সমারোহ, মোচ্ছব, মূর্তি আর শহরতলি ও জেলা সদরে রবীন্দ্র নামাঙ্কিত ভবন। ব্যাস্! তিনি আর কোথায়? পোলিটিশিয়ান, আমলা, মন্ত্রী, তাদের আমচা-চামচা লেঙ্গট-গামছার কথা বাদ দিলাম, তাদের কোনো নীতি বা আদর্শে বাঁধা পড়লে চলে না, বাকি সব, জনগণ বলি যাদের — স্কুল-কলেজের শিক্ষক-অশিক্ষক, সরকারি-বেসরকারি কর্মী-শ্রমিক, ছাত্র-যুব— সেখানে রবীন্দ্রনাথ কোথায়? ধান্দা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ নেই। মানুষের ভেতর থেকে জাগরণ চেয়েছিলেন যিনি, তাঁকেই মানুষ বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে, ধান্দার মোড়েমোড়ে গেঁথে বসিয়েছে। ছাড়ো তো হাবিজাবি কথা। তোমার দোকান কেমন চলছে? জন্মোৎসবে রবীন্দ্রনাথের বই দু-চার পিস বিক্রি হল?

তেমন নয়। সস্তার চোখের বালি, নৌকাডুবি কয়েকটা গেল। কপিরাইট উঠে যাওয়ার পর কম দামে রবীন্দ্র রচনা কেনার একটা হিড়িক পড়েছিল। তা কেটে গেছে। বাঙালি কোনো কালেই ভালো পড়ুয়া ছিল না। যেটুকু ছিল তাও চটকে দিয়েছে রাজনীতি আর বিনোদন। আমি বলছি কী, যাকে উন্মাদনা বলছ, হয়ত রাগ করেই বলছ, আমার কাছে সেটা স্বপ্ন। যা আমাকে একটা সুন্দর পৃথিবীর জন্য তৈরি হতে বলেছিল। তোমাকেও বলেছিল। উন্মাদনায় আমাদের ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। যারা পুরোপুরি ভেসে যেতে পারেনি, স্বপ্ন এখনও তাদের কাছে আসে। স্মরণ করলে বেঁচে থাকার ইচ্ছেটা শক্তি পায়।

তাই জোড়াসাঁকো আর রবীন্দ্রসদন চত্বরের মতো এখানে তর্পণ করতে এলে ঝাঁ ঝাঁ রোদ মাথায় নিয়ে?

স্বপ্নের তর্পণ। নিছক আচার নয়, নিজের কাছে কিছু অঙ্গীকার।

এরপর তোমাকে চা খাওয়াতেই হয়। হেসে মহীতোষ ওঠে। বোসো।

চ্যাটার্জিদা বলে, এখন চা না হলেও চলবে। অনেক বেলা হয়েছে।

বোসো, বোসো, কত সব ভারী ভারী কথা বললে! 'অঙ্গীকার'- এর মতো একটা বেবুশ্যে করে দেওয়া শব্দকে কী বিশ্বাসজনকভাবে লাগালে! এরপর তোমাকে চা না খাওয়ালে নিজেরই খারাপ লাগবে।

নিজেরই চা দরকার মহীতোষের। এতক্ষণ যে কী করে কাটাল, কোন নেশায়? একটা হাহাকার তার কণ্ঠনালী থেকে মিহি ধোঁয়া হয়ে শ্রুতি ঘ্রাণ শুষে নিতে থাকে। সে দ্রুত পায়ে নীচে আসে। সুচরিতার ঘরের দিকে তাকায়। জানালা দিয়ে সুচরিতার পা দেখা যাচ্ছে। ঘর থেকে টি ভি-র আওয়াজ আসে। খাটে উপুড় শুয়ে সুচরিতা চ্যানেলের প্রোগ্রাম দেখছে। এ সময় চা বসাতে বললে আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও কেস হয়ে যাবে। খুব স্বাভাবিক। আমার

জীবনে কি একটু বিশ্রাম থাকতে নেই? একটু আনন্দ থাকতে নেই? সব সুখ তো খাক্ করে দিলে! সব আশা তো চিতেয় চড়ালে! পোড়া কাঠের মতো ঘরের কোণে অন্ধকারে মুখ বুঁজে পড়ে থাকি। সেটাও সহ্য হয় না? আর কী চাই তোমার? ঝি-চাকরদেরও সময় বাঁধা। ওদেরও শখ-আহ্লাদ আছে। আমার কিছুই থাকবে না? দাদা বারবার বলেছিল, মহীর সঙ্গে তুই থাকতে পারবি না। বউদি বারবার বলেছিল, ওর নিজেরই কিছু নেই, ও তোমাকে কী দেবে? কেন যাবে ওর কাছে? বা, এইসব যদি না-ও বলে, কোনো সিরিয়ালের অতি গুরুত্বপূর্ণ সিকোয়েন্স যদি সে সুযোগ না দেয়, এরকম ঝাঁঝিয়ে উঠতে পারে, এই অবেলায় কোনো ভদ্রলোক কারও বাড়ি আসে? তাদের কি ঘরবাড়ি নেই? রাস্তায় মাথা ঘুরিয়ে পড়ে মরে না কেন? কত ভালো লোককে ভগবান তুলে নেয়। এইভাবে ব্যথা তার উর্ধ্বপানে জ্বলে ওঠার আগে মহীতোষ নিঃশব্দে রান্নাঘরে ঢোকে। কিন্তু চামচ খুঁজতে গিয়ে থালা পড়ে যাওয়ার শব্দে টের পেয়ে যায় সুচরিতা। প্রায় ধেয়ে এসে বলে, থাক থাক অনেক হয়েছে। একটা সিলিন্ডারে মাস চালাতে হয় আমাকে।

চায়ে চাঙ্গা হয় পঁচিশে বৈশাখের আড্ডা।

চ্যাটার্জি বলে, ভেবেছিলাম এবার ভোরে জোড়াসাঁকোয় যাব। এখন কেমন লাগে দেখব। হল না। ইচ্ছেটা মিইয়ে গেল।

মহীতোষ বলে, কী দরকার? টি ভি-তে লাইভ টেলিকাস্ট দেখায়।

তা নয়।

জানি। কল্পনা করো, মহর্ষি ভবনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছো।

মোহনকে বলেছিলাম, আজ সকালের কাগজ বেঁটে দিতে। মোহন রাজি ছিল। বলল, যাও ঘুরে এসো। রোজই তো এক কাজ করো। তোমার নাচ-গানের শখ আছে, মিটিয়ে এসো। চ্যাটার্জি হাসে।

মোহন চ্যাটার্জিদার বাবার আমলের কর্মী। দ্বারিকজঙ্গলের নিউজপেপার এজেন্ট সদানন্দ চ্যাটার্জি যখন তেমাথায় দোকানঘর খুলে বসেন, সেই থেকে মোহন আছে। সব বিষয়ে হাঁদা-গঙ্গা হলে কী হবে খবরটা যেন ও কী করে চমৎকার বোঝে। কোন কোন খবরে কাগজ বেশি কাটে, লুজ মাল বেশি আনতে হয়, কোন খবর কোন কাগজ ফাটাবে, কোন খবরে কোন কাগজের বেশি টান হবে—মোহন ঝরঝরিয়ে বলে দেবে। চ্যাটার্জিদা একবার ঠিক করেছিল, এজেন্সি ছেড়ে দেবে। মোহন বাধা দেয়। খাবে কী? বইয়ের দোকান থেকে চা-খরচা উঠবে না। চ্যাটার্জিদা বলেছে, খবরের কাগজ বেচতে খুব খারাপ লাগে। মনে হয়, রোজ ভোর রাত থেকে পাপকর্ম শুরু করছি। পরে ভেবে দেখলাম, দোকান চালাতে যে সব বই বেচতে হত, তার চেয়ে খবরের কাগজ ভালো। চ্যাটার্জিদার কাছেই মহীতোষ জেনেছে, জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে বিশেষ সংখ্যা খুব বিক্রি হয়। জীবনানন্দের বই বিক্রি হয় না। কমলকুমার মজুমদার সংখ্যা খায় পাঠক, তাঁর বই কেনে না। বাঙালি পাঠক বিচিত্র জিনিস। মিডিয়া হাইপে ইংরেজি

বই কিনতে ঝট্ করে সাতশো-আটশো টাকা বের করে। অথচ অবনীন্দ্রনাথের বই বা সতীনাথ ভাদুড়ি বা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ একশো-দেড়শো টাকায় কিনতে সাতবার ভেবে বলে, পরে নেব। মায়া হয় লোকগুলোকে দেখে। প্রতারকের পাল্লায় পড়েছে! কে বোঝাবে? বোঝাতে গেলেই শুনতে হবে 'আউটডেটেড' 'ওল্ড হ্যাগার্ড'।

চ্যাটার্জি সিগারেট বের করে। মহীতোষের দিকে এগিয়ে দেয়। খাবে না জানিয়ে মহীতোষ বলে, ধন্যবাদ।

ছেড়ে দিয়েছ?

অনেকদিন।

খেয়াল করিনি।

খেয়াল করার মতো ব্যাপার নয়।

আমি সাতবার ছেড়েছি।

এখনও সময় আছে স্কোর বাড়িয়ে নেওয়ার।

চ্যাটার্জি হাসে। তোমার ধক্ আমার নেই।

ধক্ আবার কী! পয়সা নেই, তাই ছেড়ে দিয়েছি। মৃত্যু পর্যন্ত খোরাকির ব্যবস্থা রাখতে হবে তো। যে হারে সুদ কমছে, জানি না আমার বেঁচে থাকার ইচ্ছে কতকাল অটুট রাখতে পারব। অনেক কিছুই ছাড়তে হচ্ছে, হবে। বিদ্যুতের দাম ভয়াবহ. গান প্রায় শোনাই হয় না, পড়া যা কিছু দিনে, রাতে একটা হালকা আলো জ্বেলে বারান্দায় বসে থাকি, ফ্যানের খরচও বাঁচে,টেলিফোনটা এবার জমা দিয়ে দেব, মাসখানেক আগেও আশা ছিল কেউ ফোন করতে পারে, আমারও আর কাউকে করার নেই।

এভাবে কি বাঁচা যায়, মহীতোষ?

গোটা দেশ বাঁচছে এভাবে।

ভুল। দেশ এভাবে বাঁচে না। যারা দেশকে রিপ্রেজেন্ট করে তারা এভাবে বাঁচে না।

জানি। দেশ এভাবে মরে। মড়ার ওপর কয়েকটা লোক দাঁড়িয়ে বলে তারাই দেশ। কী আর করা যাবে, সেই লোকগুলোর দলে ভেড়া গেল না, তাই প্রকৃত দেশেই মরতে হচ্ছে। বাদ দাও আমার কথা, নতুন কোনো খবর পেলে? কোথাও কি কোনো ভালো কাজ হচ্ছে? কোথাও কি কোনো যুবকেব দল অন্যভাবে ভাবছে? ক্ষুদ্র হলেও কোনো বিপ্লবপ্রয়াস গঠিত হচ্ছে?

থেমে গেল, আরও বলত মহীতোষ। চ্যাটার্জিদা যথাসম্ভব অনুচ্চ কিন্তু দৃপ্ত উচ্চারণে কতদিন তাকে জানিয়েছে, বাঁকুড়া থেকে একদল ছেলে এসেছিল। ওরা গ্রাসরুটে কাজ করছে। নিজেদের শক্তি সম্পর্কে নিপীড়িতদের সচেতন করছে। মেদিনীপুর থেকে কয়েকটা ছেলে এসেছিল। ওরা ছোট ছোট বাহিনী তৈরি করেছে। নদিয়া-হুগলি-মুর্শিদাবাদ-বর্ধমান-বীরভূম-বাঁকুড়া-মেদিনীপুরে একটা গোপন করিডর তৈরি হয়েছে। প্রথম প্রথম চ্যাটার্জিদার মোহঘোর

ফাঁসিয়ে দিতে মহীতোষ বলত, রাষ্ট্রের ঝাড় জানো, সব দেওয়াল-চিত্র করে দেবে, তা গান্ধীবাদী-মার্কসবাদী বা লাল গেরুয়া যে রকমই রাষ্ট্র হোক। কথা না শুনলে বডি ফেলে দেবে, নয়ত জিভ কেটে নেবে। পরে আর বলত না মহীতোষ, তবু তো লোকটার একটা শূন্যোদ্যান আছে। আজ সে চ্যাটার্জিদার সংলাপ আওড়াল কেন? সে তো চ্যাটার্জিদাকে বিদ্রূপ করতে চায়নি। ওকে কোনোদিন সে বিদ্রূপ করেনি। চ্যাটার্জিদার বিশ্বাসের মূলে কোনো মতলব নেই, সুন্দর করে মিথ্যা বলার আধুনিকতা বা নাগরিকতা নেই, যে জীবন সে যাপন করতে চায়নি তার থেকে মুক্তির অন্তর্মুখী চাপ আছে। তবে কেন মহীতোষ হুবহু বলল, 'ক্ষুদ্র হলেও কোনো বিপ্লব প্রয়াস কি কোথাও গঠিত হচ্ছে?' কথাগুলো যেন উদ্ভিদের মতো বেরিয়ে এল। যেন আজ সে চ্যাটার্জিদার কাছে কথাগুলো শুনতে চাইছিল। বলছে না দেখে নিজেই বলে ফেলল।

অ্যাশট্রে না পেয়ে চায়ের কাপেই চ্যাটার্জিদাকে সিগারেটের ছাই ফেলার পরামর্শ ও অনুমতি দিল মহীতোষ।

চ্যাটার্জি বলে, সংগ্রাম রায়চৌধুরী ক্রমে একটা দেশ হয়ে উঠছে। তোমার বাড়ি আসার পথে দেখি, ঠ্যালা-বোঝাই কাগজের বান্ডিল। ওপরে ইউনিভার্সিটির লেবেল দেখে বুঝলাম পরীক্ষার উত্তরপত্র। হাজার হাজার ছেলেমেয়ের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা, তাদের অভিভাবকদের বিনিয়োগ ও উত্তেজনা ও উদ্বেগ, কয়েক শো শিক্ষকের ব্যবসাবুদ্ধি, লক্ষ লক্ষ মানুষের দেওয়া করের অ-সম্যক ব্যবহারের স্তূপ যেন ঠ্যালাগাড়ির পিঠে। দুজন লোক সেই স্তূপ নামিয়ে সংগ্রাম রায়চৌধুরীর বারান্দায় তুলছে। গোলায় ফসল তোলা দেখছে অধ্যাপক।

এ ফসল নিয়ে সংগ্রাম রায়চৌধুরী তত চিন্তিত নয়। পাস মার্ক দিয়ে সফল পরীক্ষার্থীর হার বাড়িয়ে ঠিক সময়ে খাতা পাঠালেই হল। খোসা খসে চাল উঠবে ঘরে। অধ্যাপকের চিন্তা, কবে পদ্ম আসবে ঘরে। বান্ডিলে থাকে না প্রভাবীদের সন্তানের গৃহনির্মিত উত্তরপত্র। অগাধ জলের তলা হতে অমলকুঁড়ি ওঠে ভেসে। তাতে রেকর্ড মার্কস বসাতে হয়। দেখরে চেয়ে আপন পানে, পদ্মটি নাই পদ্মটি নাই। শুনতে কি পাও সংগ্রাম রায়চৌধুরীর হাহাকার?

রাশি রাশি ভারা ভারা ধান কাটা হল সারা ..

ধান দিয়ে কী হবে? গোপন করিডর দিয়ে বিখ্যাত ব্যক্তির সন্তানের নির্জন উত্তরপত্র হাতে এলেই তবে অধ্যাপক জীবন সার্থক।

দ্বারিকজঙ্গলকে লোকে চিনবে অধ্যাপক সংগ্রাম রায়চৌধুরীর নামে। গত বছর বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে নতুন ভাষ্যে 'রক্তকরবী' করল অধ্যাপক। দেখনি? রাজা আই এম এফ, নন্দিনী মিস ইউনিভার্স, রঞ্জন বিশ্বায়নের বিরোধিতার লিফ্‌লেট। দারুণ জমেছিল ব্যাপারটা। যদিও শেষ পর্যন্ত গোঁজামিল দিয়ে মেলাতে হয়। সংগ্রাম রায়চৌধুরীর 'রক্তকরবী' দেখে বীরেশ্বর প্রস্তাব দিয়েছিল, নামাও একখানা। রাজা পুঁজি আনতে অধ্যাপককে বিদেশে পাঠাচ্ছে, অধ্যাপকের সঙ্গী হচ্ছে কুনকি হাতির মতো দু-চারটে শিল্পপতি। অধ্যাপক যখন খালি হাতে ফিরবে, নেপথ্যে বাজবে 'তোমার দেখা নাই রে তোমার দেখা নাই'। 'পরদেশি পরদেশি জানা নহি'-

ও লাগাতে পারো। নামাও তো দেখি। হইচই ফালাইয়া দিমু। মনে রাখবা, স্টেজ হইব বন্ধ কারখানার।

বীরেশ্বর আসে?

আজ যেতে যেতে একবার প্রায় এসে পড়েছিল।

বেশ লাগে ওকে।

কীভাবে যেন একটু অন্যরকম থেকে গেছে।

মনে আছে, পূর্ববঙ্গ ছেড়ে চলে আসার বেদনা বোঝাতে ও বলেছিল, খেলার সঙ্গিনী ওকে জিজ্ঞেস করেছিল, হ্যাঁরে বীরু, তোরা নাকি এ গাঁ ছেড়ে চলে যাবি? সত্যি? তুই যে বলিস নিশ্চিন্দিপুর বড় ভালো গাঁ, এমন নদী, এমন মাঠ কোথাও নেই—সে গাঁ ছেড়ে তুই যাবি কী করে? সেই সঙ্গিনীর নামও নাকি রানি। কবিতার মগ্নতায় স্মৃতি থেকে বীরেশ্বর আবৃত্তি করত, সে কী ভালোবাসে এই মাটির তাজা রোদে পোড়া ..ন্টা, এই ছায়া ভরা দূর্বা ঘাস, সূর্যের আলোমাখানো মাঠ,পথ গাছপালা, পাখি, বনঝোপ, ওই ঝোলানো ফুল-ফলের থোলো, আলকুশি, বনকলমি, নীল অপরাজিতা। ঘরে থাকিতে তাহার মোটেই ইচ্ছা হয় না, ভারী মজা হয় যদি বাবা তাহাকে বলে—খোকা তুমি শুধু বেড়িয়ে বেড়াও, তাহা হইলে এরকম বনফুল-ঝোলানো ছায়াচ্ছন্ন ঝোপের তলা দিয়া ঘুঘুডাকা দূর বনের দিকে চোখ রাখিয়া ....

চ্যাটার্জিদা উঠে পড়ে। ....এইরকম মাটির পথটি বাহিয়া শুধু হাঁটে ....

........শুধুই হাঁটে। সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছে চটিতে পা গলায় চ্যাটার্জিদা। মহীতোষ দরজা খোলে।

দরজার ওপারে তন্দুরির চুল্লির মতো গনগনে রোদ থেকে চোখ ফিরিয়ে চ্যাটার্জি মহীতোষকে বলে, বাংলা থাকবে তো?

উত্তর যেন মহীতোষের তৈরিই ছিল, বাঙালির যদি নিজের জায়গার দরকার থাকে, তাহলেই বাংলা থাকবে। না থাকলে নেই।

চ্যাটার্জি পথে নামল। আজ সে কোনো যুবকের দলের নিঃশব্দ গভীর কার্যকলাপের কথা, বিপ্লবপ্রয়াস গঠিত হওয়ার কথা বলেনি। মহীতোষ তাকে মোড়ের বাঁ দিকে মিলিয়ে যেতে দেখে।

দরজা বন্ধ করে সিঁড়ির দিকে যেতেই সুচরিতার গলা ভেসে আসে। স্নান করবে তো?

মহীতোষ বলে, হ্যাঁ। বেলা অনেক হয়ে গেল।

দু-বালতি জল ধরে রেখেছি। রিজার্ভারের জল ফুটছে।

কী হল আজ সুচরিতার। মহীতোষ স্তম্ভিত। কী যেন বলে, সূর্য কোনদিকে উঠেছে? কী ভেবে সুচরিতা দু-বালতি জল ভরে রাখল মহীতোষের জন্য? কোনো কারণ নেই। কোনো কারণ খুঁজে পায় না মহীতোষ। নিশ্চয় কোনো কারণ আছে, মহীতোষ খুঁজে পাচ্ছে না,

মহীতোষের সেই বুদ্ধি সেই বোধ নেই। সে হিসেব জানে বোঝে, হিসেবের ভেতর বেড়ে উঠেছে, অনেক হিসেব সে অস্বীকার করেছে, হয়ত তারও একটা হিসেব ছিল। হিসেবের বাইরে বিপুল চলাচল সে জানে না।

গামছা দিয়ে জল ঢাকা আছে। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নাও।

এখখুনি করছি। ওপরে দাড়িটা কামিয়ে আসছি।

দেরি কোরো না। গরম হলে স্নান করে শান্তিতে পাবে না।

দাড়ি কামাতে কামাতে মহীতোষ সুচরিতাকে খুঁজল। পেল না। আয়নায় নিজের মুখটা কী ভীষণ খারাপ দেখল। চোখের কোলে গর্ত, চোয়াল উঁচু, গালে কালচে খয়েরি ছোপ, হাসলে ফাঁক ফাঁক হওয়া দাঁত লোভের চেহারায় ভেসে ওঠে। কী কুৎসিত সে!

নিজেকে আয়নায় মহীতোষ বহু কাল মন দিয়ে দেখে না। কোনোদিনই সেভাবে দেখেনি রূপহীনতার দিকগুলি আরো বিশদে আরও বিচারে ধরা পড়ার ভয়ে। তার চেয়ে ভেবে নেওয়ার স্বাধীনতা রাখা ঢের ভালো, রূপহীনতাকে সে আড়াল করছে যেন মনের সৌন্দর্যে। তবু মাঝে-সাঝে দেখত, নতুন শার্ট গুঁজে পরে আয়নার সামনে দাঁড়াত, চুল পরিপাটি আঁচড়ে টাকের প্রসার মেপে নিত, নতুন প্যান্টের সামনে বা পেছনে কোথাও অশ্লীলভাবে কুঁচকে যাচ্ছে কিনা দেখে নিত। এখন আয়নার সামনে দাঁড়ানোর কোনো মানে নেই দরকার নেই। দাড়ি কামানোর সময় অভ্যাসবশত শুধু দাড়ি গোঁফ ঝুলপি দেখে নেওয়া।

আজ দেখল, সে উল্লেখযোগ্য রকমের কুৎসিত হয়ে গেছে।

সুচরিতার গলা শোনা গেল, স্নান করে নাও। জল আর ঠান্ডা নেই।

মহীতোষ জবাব দেয়, যাচ্ছি। সুচরিতার অভিপ্রায় অনুমান করার প্রবল একটা ইচ্ছে সস্তার গন্ধ সাবানে চাপা দিয়ে রূপে তোমায় ভোলাব না গুনগুনিয়ে সিঁড়িতে ভেসে যেতে গেল। বালতিতে হাত ডুবিয়ে জল ততটা ঠান্ডা না লাগলেও সে বলল, আজ স্নান করে আরাম পাওয়া যাবে। রিজার্ভারের জলে তো হাত দেওয়া যায় না।

সুচরিতা বলল, যদি বলো কাল থেকে দু-বালতি ধরে রাখব। পাম্প চালানোর সময় কমিয়ে দেব। ইলেকট্রিক বিল কম হবে।

সুচরিতার জন্য কষ্ট হল মহীতোষের।

মাথায় জল ঢেলে যতটা সে আরাম পেল, তার চেয়ে কয়েক গুণ আরামজ্ঞাপক শব্দ করে খুশি করতে চাইল সুচরিতাকে।

কিন্তু সেই চেষ্টায় অভাবনীয় সুখ পেল শরীর। যেন বৃষ্টি ঝরতে থাকল। কোনো পুরনো পলাতক প্রেমিক মেঘের জল যেন। আলিপুরদুয়ারে মেহগনির নীচে যেভাবে সে ভিজেছিল এক বিকেলে। মেঘ আসার কোনো কথাই নয় এমনই সাফসুতরো ছিল আকাশ। সে হাঁটছিল শেষ রোদে মুখোমুখি মেহগনিদের কথোপকথনের মাঝখান দিয়ে। মাটির নীচে তাহাদের প্রেম গাঢ় হওয়ার আগে তাহারা পাতায় পাতায় কথা কয়, কথার ইঙ্গিত হয়, ইঙ্গিতে

শিরা-উপশিরা নদী হয়, নদী ভাঙন ভালোবাসে, ভাঙনের টানে সংঘর্ষপ্রমত্ততা বাতাস কাঁপায়, রাত্রি নামে পাতাল অবধি, তাহাদের চাওয়া-পাওয়ার ক্লান্তিহীন তৃপ্তিহীন অরুণিমা জ্বলে, আহা, কে পুরুষ কে নারী সেইসব অকার্যকর বিচার ভেঙেচুরে যেতে নক্ষত্রভরা রাতে মেহগনি বীথি দেখে এরকম ভেবে ফেলেছিল মহীতোষ। কাঠের বাড়ির অগাধ বৃত্তান্ত তাকে ঘুমোতে দেয়নি কিংবা কেয়ার চলে যাওয়া কিংবা গুন্ডাদের হাতে বিপ্লববিশ্বাসী ভূদেবের মৃত্যু। অথবা কিছু কিছু রাত ঘুমহীন হয়ে যায় জেগে থেকে লাভ আছে বলে। সেই রাতে মেহগনি তাকে আচ্ছন্ন করেছিল। কাঠের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে কবে কোন বাঙালি-মাতা ও শ্বেতাঙ্গ-পিতার মেয়ে নীলা গেয়েছিল, এ পরবাসে রবে কে, হায় রে এ প্রান্তরে তেমন আপন কাউকে না পাওয়ার বেদনা লেগে আছে কাঠের দেওয়ালে, মহীতোষ শুনেছিল। বিপ্লবীর মৃত্যু পাহাড়ের চেয়ে ভারী ঘোষণা করে বিপ্লবপ্রবক্তাদের চড়ুইয়ের পালকের চেয়ে লঘু আচরণে সে দুঃখ পেয়েছিল। ভূদেবের মৃত্যু তার বন্ধুদের কোনো শক্তি দেয়নি, শুধু শোক দিয়েছিল। আর কেয়া, খোয়াইয়ের রক্তাভ দৃশ্য পেরিয়ে, আমার সোনাঝুরি মাথা নুইয়ে কোপাই যেখানে গভীর সেইখানে নদীজলে হাত রাখার মতো তোমার কোমর ছুঁয়ে ভাঙনের সংবাদ জানতে চেয়েছি অথবা জানাতে, ঝামা পাহাড়ের মতো রুক্ষ তোমার কাম, নদী নদী জল শুষে নাও, আমি হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে নিজের শরীরের অনিচ্ছা অক্ষমতা ফাটিয়ে ফাটিয়ে প্রবাহিত করি আরও ভাগীরথী, বিদ্যুতে ফালা ফালা হই, আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, তুমি কিনা আমার পথের থেকে তোমার পথ বেঁকে গেছে বলে অকস্মাৎ দূরে চলে গেলে। পরদিন বিকেলে সেইসব কথাকাহিনি মুছে দিতে যেন প্রপিতামহের সঞ্চয়ের মেঘ শেষবেলার আলোয় গরিমাপূর্ণ আকাশ নিঃশব্দ দাপটে দখল করে নিল। তারপর নেমে এল মেহগনিদের মাথায়। হাওয়া উঠল ঝড়ের মতো। তুমুল বৃষ্টি নামল। জলের শব্দে অন্ধকার ঘন হল। মেহগনির নীচে দাঁড়িয়েছিল মহীতোষ। বৃষ্টি তাকে ভেজালো। সে ভিজতে চাইছিল। বৃষ্টি ঝরল তার হাড়ের ভেতর। ঝরতে থাকল।

মাথা মুছতে মুছতে মহীতোষ ডাকল, সুচরিতা!

আবার ডাকল। পায়জামা ধুয়ে তারে মেলে দিয়ে আবার ডাকল। দেখল, জানালা বন্ধ। দরজা বন্ধ। রান্নাঘরের দরজায় ছিটকিনি তোলা। সুচরিতা হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে।

তারও ঘুম পায়। মাথার ভেতর ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে ঘুম। ঘুম তাকে পায়। নিয়ে যায় ঘুমের স্বদেশ ভিতর।

হঠাৎই সে ধড়মড়িয়ে ওঠে নিজের শব লুঠ হয়ে যাওয়ার দুঃস্বপ্নে।

শব শোয়ানো ছিল তক্তপোশে। শিয়রের ডানে ও বামে গুচ্ছ চন্দনকাঠি পুড়ছিল। দু-জোড়া রমণীর হাত শবের গায়ে গন্ধ তেল মেখে দিচ্ছিল। তারা কাঁদছিল। অদের হাতে ভালোবাসা ছিল। বাইরে থেকে কারা যেন চিৎকার করে বলে, নকড়াবাজি শেষ হল? বডি পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলে আগুন জ্বলবে। কোনো দরজা ভেঙে বহু নবযুবক ঢুকে পড়ল ঘরে। রমণীরা আতঙ্কিত হল, জোড়াসাঁকোর বাটিতে অন্তঃপুরস্থ নারীরা সেদিন যেমন

ভয়ে লজ্জায় বেদনায় সাদা হয়ে গিয়েছিলেন। কে যেন বলল, বডি ছাড়বি না। কে যেন জিজ্ঞেস করল, মালটা দামি, গুরু ? বলেই ধারালো কিছু দিয়ে শবের ডান পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ উপড়ে নিল। কে যেন বলল, চুলে-দাড়িতে কেউ হাত দেবে না। চিকারিদা বলেছে, যে কটা আছে, ব্ল্যাকে ঝেড়ে পরে ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউট হবে। বডি নিয়ে দৌড়তে শুরু করল একদল লোক। তারা বলছে, অমর রহে। শববাহকরা বহুদিন পর চ্যালেঞ্জিং আমোদ পেয়ে তুমুল কেরামতি দেখাচ্ছে। গান স্যালুট দেবে বলে পুলিশ নাকি মোড়ে মোড়ে ভ্যান ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যারা মজা হাতছাড়া করতে চায় না, তারাও পেছন পেছন ছুটছে। তাদের সংখ্যা কম নয়। কেউ এক খাবলায় শবের দাড়ি, কেউ পোশাক ছিঁড়ে নিতেই ঝাড়পিট লেগে গেল। শব আছড়ে পড়ল মাটিতে। মহীতোষ ঘেমে নেয়ে জেগে উঠল। আঃ বেঁচে আছে মহীতোষ।

অলীকসন্ধ্যা

আজ, এই সন্ধ্যায় মা-র হাতে লাগানো গাছে গন্ধরাজ আর টগর ও আকাশে নক্ষত্র বিস্তর ফুটেছে। বারান্দায় চেয়ার এনে দূরসুদূরের হাওয়ায় হাওয়ায় বসল পরমার্থ সঙঘকার। একটু আগে, বিদ্যুৎ ঘাটতি কিংবা বিভ্রাটে মনোনীত আলোর কোল থেকে পড়ে এই ভূখণ্ড রাত্রির উৎসারিত আলোয় ভেসেছে এবং সেই আলোয় আশপাশের দালানবাড়ি পাহাড় পাহাড় হয়েছে। এবং চোখের কাছের ডোবা যেন বুরুডির লেক—হাজার বছরের পুরাতন মেঘ বৃষ্টি জন্ম মৃত্যু সূর্য শান্তি জমে আছে, পাঁচ পাহাড় এই জল পাহারা দেয়, আগামী হাজার বছরের তৃষ্ণার্তের জন্য। সে একবার বুরুডির জলে রাত্রি নামতে দেখেছিল, যেন জল টেনে নিচ্ছে রাত্রিকে অবিসংবাদী আকর্ষণে, অপরিমেয় রাত্রির শরীর জলের ভেতর প্রবিষ্ট হতে থাকে, জল রাত্রি একাকার হয়ে যায়, জল সংজ্ঞা হারায় কিছুক্ষণ, তারপর জলই জেগে ওঠে, বাকিটা রাত্রিকে ভাসিয়ে খেলা করবে সূর্যের কড়া নাড়া অবধি। সেবার শবরী সঙ্গে ছিল। এইসব কথাবার্তা ওর ন্যাকাবোকা মনে হতে পারে, কিংবা পুরুষতান্ত্রিক। পরমার্থ শবরীর দিকে তাকায়নি। একটা কুকুর তখনও তেলেভাজার প্রত্নচিহ্ন বা বেসনের ডেলার খোঁজে নিভে যাওয়া উনুনগুলো ঘিরে ঘিরে ঘুরছে। শবরী বলল, এই জলে মরে যেতে ইচ্ছে করে। কোনোদিন কেউ খুঁজে পাবে না আমাকে। পরমার্থ বলে উঠতে চেয়েছিল, বানানো, বানানো। বলতে পারেনি। ভয়ও পেয়েছিল এই ভেবে যে, স্তব্ধতায় যদি মনের কথা শোনা যায়। সুধাকান্ত গাড়ির আলো জ্বালিয়ে রেখেছিল জলের উল্টোদিকে। পরমার্থ সুধাকান্তকে বলল, চলো, এরপর ফিরতে অসুবিধে হবে। শবরী হয়ত ভেবেছিল, ওর কথার জন্যই পরমার্থ ফিরতে ব্যস্ত হল, মরে যাওয়ার কথায় ভয় পেয়েছে, শবরীকে নিয়ে মৃত্যুর অনুভব থেকে পালাতে চায়।

আলো জ্বলতেই ডোবার জল ডোবা হয়ে গেল। কিন্তু পরমার্থ ওঠে না, বারান্দায় বসে থাকতে তার ভালো লাগে। হাওয়া আসে, গাছের মাথায় মাথায় পাতায় পাতায় শেকড় বাকড়ে দুলে দুলে হাওয়া আসে। কত দূর থেকে আসছে কে জানে, কত কিছু ছোঁয়াছুনি ঘাঁটাঘাটি করছে এই হাওয়া। ভান্‌সি মজা করে বলত, চিনদিদিমার পুজোপাটের কাপড় ছুঁয়ে দিল ধাঙড়পট্টির বাতাস। দেখো, পাকুড়গাছ নড়ছে, বাতাস ঠিক ওইখান দিয়ে ঢুকছে। জানালা বন্ধ করো। নাড়ুগোপাল কি নমোশূদ্দুর বাতাস খাবে? বারান্দার ওই কোণে চিনদিদিমা

অস্থিচর্মসার হাতে সলতে পাকাতে পাকাতে হয়ত রেগে গিয়ে বলতেন, তোর মুখে রক্তপুঁজ হবে, পোকাবমি হবে। ঠাকুরদেবতা নিয়ে মস্করার পাপ তোকে পচিয়ে মারবে। হয়ত কোনোদিন মেজাজ ফুল্লকুসুম, চিনদিদিমা বললেন, বাতাস কখনও অশুচি হয় না রে, মূর্খ, বাতাস গঙ্গাজল। ভান্‌সি রে, তোর মতো আকাটও যে বাতাস পায়, ঠাকুরের এত কৃপা। শুদ্ধতা শুচিতার বিশ্বাস নিয়ে চিনদিদিমা গভীর শ্বাসকষ্টে সাতদিন সাত রাত ধরে খুদকুড়োর মতো ধূসর বিবর্ণ হতে হতে অনন্তে বিলীন হয়েছে। ভান্‌সি গায়ে আগুন দিয়ে মরেছে, এমনটা বলা হয় যে তার সমর্থ শরীর সামাজিক সন্ত্রাস ডেকে এনেছিল, পরমার্থর মনে হয় যে গরিবের ঘরে হাসিখুশি মেয়ে মানায় না বলেই তাকে পুড়ে মরতে হয়েছে। আজ এই হাওয়ায় হাওয়ায় ভান্‌সির কথা মনে পড়ায় পরমার্থ একটু অন্যরকম ভাবল, মেয়েটা পুড়ছিল, ওর হাসি ছিল আগুনের শোভা, তাই শেষ পর্যন্ত এতটুকু চিৎকার করেনি। তবে কি ভান্‌সির সব সুখ শেষ হয়ে গিয়েছিল? তাহলে মরার আগে সুখবিলাসকে বিয়ে করল কেন? দুঃখকে আরও বেশি উপভোগ করতে? পরমার্থ থই পায় না, পেলেও পায়ের নীচে মাটি তৎক্ষণাৎ গলে যায়। বারান্দার কোণে বসে সলতে পাকাতে পাকাতে চিনদিদিমা মুচকি হাসেন মনে হয়। ভাবখানা এই যেন, এত সোজা! হাওয়া আসে।

মশার উপদ্রব অসহ্য হয়ে উঠেছে। সন্ধে না হতেই বাড়ির আনাচ-কানাচ দখল করে ফেলছে। কাঁহাতক কয়েল বা ম্যাট জ্বালিয়ে বিষাক্ত বাতাসে থাকা যায়! দুপুরেও রেহাই নেই। ভাত খাওয়ার পর আধশোয়া হয়ে পরমার্থ সঙ্ঘকার প্রেমচন্দের গল্পসংগ্রহ পড়ছিল। 'নিমকের দারোগা'। শীতের রাতে যমুনা নদীর ওপর নৌকা দিয়ে বানানো সাঁকোয় ঘোড়ায় টানা মালবাহী সার সার গাড়ি। সেখানে লড়াই হচ্ছে ধর্মের ও অর্থের। ধর্মের প্রতিনিধি দারোগা বংশীধর। অর্থের মুখপাত্র কালোবাজারি ও বিপুল প্রভাবশালী পণ্ডিত অলোপীদীন। অলোপীদীন চরিত্রটা অসাধারণ। কালে কালে দেশে দেশে খারাপ লোকজন যত ভালো ভালো কথা বলে সে সবই অলোপীদীনের সংলাপ। অলোপীদীনের যুক্তির বিন্যাস পড়তে পড়তে ও পরিবেশনের নম্রতা অনুভব করতে সেইসব মুখ ভেসে উঠতে থাকে যারা ইতিহাসে কালো পাতায় ঠাঁই পেয়েছেন এবং যারা নানাবিধ আলোর মধ্য দিয়ে সগর্ব হাঁটতে হাঁটতে কালো পাতার দিকে চলেছেন। 'ধর্মের নির্বোধ দৃঢ়তা এবং দেবদুর্লভ ত্যাগ দেখে অর্থ খুবই ক্ষুব্ধ হয়। তারপর উভয় শক্তির মধ্যে সংগ্রাম শুরু হয়। অর্থ লাফিয়ে লাফিয়ে আক্রমণ করতে শুরু করে।' পরমার্থ মশার আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়। পায়ের পাতায়, হাঁটুর নীচে বিচ্ছিরি রকমের জ্বলুনি হচ্ছে। কপালেও বোধ হয় কামড়েছে। কানের সন্নিকটে পঁ পঁ করে উড়ছে। পরমার্থ বইটা বন্ধ করে খাড়া বসতেই দেখে, তাকে ঘিরেছে অনেক অনেক মশা। বছর দশেক আগেও ভরদুপুরে এভাবে মশার খপ্পরে পড়তে হত না। তখন সন্ধে পর্যন্ত নির্বিবাদে থাকা যেত। গরম পড়ার মুখে মশার প্রকোপ বাড়ত। অন্য সময় রাতে মশারি টাঙানো ছাড়া বাড়তি কোনো ব্যবস্থার দরকার হত না। এখন রাজনৈতিক কথাবার্তা যত বাড়ছে, তত্ত্ব বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতা যত বাড়ছে, সপ্রতিভতা যত বাড়ছে,

বিনোদন যত বাড়ছে, রূপের বাজার ও বিজ্ঞাপন যত কামমূলক হচ্ছে, ইস্যুভিত্তিক জোট ও জোটের মধ্যে ঘোঁট ও ঘোঁটের মধ্যে জোট যত রংদার হচ্ছে, মশা বাড়ছে ততই। পুরপ্রতিনিধিদের ভাষণ, বিতর্ক, গোপন সঙ্গম কি মশার জন্ম দেয়? অলোপীদীনরা হয়ত বলবেন, মশা তাড়ানোর নানারকম প্রোডাক্ট বাজারে আসছে, প্রতিযোগিতা বাড়ছে, বাজার বড় হচ্ছে, বিনিয়োগ হচ্ছে, কর্মসংস্থান হচ্ছে। এটাকে কি বিকাশ বলা হবে না?

এই উড়ালি-বিরালি হাওয়া আর গন্ধরাজ টগর আর নক্ষত্রের সন্ধ্যা আর পরমার্থর শান্তি আক্রমণ করে করে ঝাঁকে ঝাঁকে মশা ওড়ে। হঠাৎই ইরাকে মার্কিন হামলার উপমা মনে আসে পরমার্থর। ইদানীং ট্রেনে বাসে অফিসে বাজারে বিষয়টি খুব চর্চিত হচ্ছে। টিভি-র ছবিতে কার্পেট বম্বিং, ট্যাঙ্ক মিসাইল আগুন ধোঁয়া মৃত্যু রিরংসা উপগ্রহের ছবি সুদর্শন কমান্ডার মরুবালি মরুনারী দেখে দেখে মানুষ বেশ যুদ্ধে মজেছে। যুদ্ধ এখন সবচেয়ে তাজা বিনোদন। পলাশ সেদিন বরুণকে বলল, তুই তো খচে টোমাহক। বরুণের জবাব, তোর মতো কেমিক্যাল আলি নই। পলাশ বলল, প্রমাণ করতে পারবি না। সেদিনই, অফিস থেকে বেরোতে দেরি হল বছর শেষের কাজ তুলতে, সাতটা বেজে গেছে, দুজন সিকিউরিটি পুরনো পিসবোর্ড পোড়াচ্ছিল মশা তাড়াতে, বলল, তেলের কুয়ো জ্বালিয়ে দিলাম, যাবে না, কিছুক্ষণ দূরে দূরে থাকবে। এক সিকিউরিটি জিগ্যেস করল, মরুঝড়ের খবর কিছু আছে? গতকাল বাজারে পরমার্থ শুনেছে, ব্যস্ত বিক্রেতাকে ক্রেতা বলছিল তুমি তো বুশকেও হার মানালে। কারও কথা কানে তুলছ না! সবচেয়ে ভালো বলেছে লিয়াকত, গঙ্গার পেটে মুর্শিদাবাদের ভিটে খোয়ানো চাষি অধুনা ফেরিওলা, ঝুড়ি থেকে চকচকে টিনের মগ বের করে বলেছে, সাদ্দামের রাজপ্রাসাদের জিনিস, বিলাতে নিলাম থেকে কেনা! বারান্দায় মশার বীভৎস ওড়াউড়ি দেখে পরমার্থর মনে হল বাগদাদের আকাশের মতো বিপজ্জনক। এবং ম্যালেরিয়ার আতঙ্কে ভরে গেল চারপাশ। সে উঠে কয়েল নিয়ে এল। জ্বালিয়ে খুব কাছাকাছি মাটিতে রাখল। ধোঁয়ার বলয় তাকে একরকম নিরাপত্তা দেয়, যদিও সে জানে যে এই নিরাপত্তা গভীরতর অসুখের উৎস, কিন্তু উপায় নেই। সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে বড় মানুষদের রাসায়নিক যুদ্ধে ধীরে ধীরে আত্মঘাতী হতে হচ্ছে সাধারণকে। এসব কথা ভাবতে নেই, বলতে নেই, শুনতে নেই, তার চেয়ে ক্রিকেটের কথা বলো, স্পনসরড জাতীয়তার কথা বলো, সেল-সুন্দরীদের শরীরের কথা ভাবো, কোটিপতিদের কথা ভাবো, কাকে ধরলে চারটে পয়সা দুটো মেয়েমানুষ হয় চিন্তা করো, চিন্তা করো মাটির শরীর মাটি হয়ে যাওয়ার আগে কতটা সোনা রেখে যেতে পারে, বলে এক করো অন্য, লোকে বলে ধন্য ধন্য, অন্তত অলোপীদীনের মতো বলো, হাসপাতাল একটা শিল্প, রোগী যত বাড়বে বাজার তত ছড়াবে, সমৃদ্ধি কে ঠেকায়।

ভান্‌সি গন্ধরাজের নীচে দাঁড়িয়ে হাসছে। যেন খুব মজা পেয়েছে। না পেলেও হাসে। অকারণে হাসে। পাগল। দিলদরিয়ায় ডুব দিয়া দেখ, পাগল বিনে ভালো কেডা ? ভান্‌সি

লম্বা হাত বাড়িয়ে গাছের মাথা থেকে পূর্ণপ্রস্ফুটিত হৃদিনন্দিত দুটি গন্ধরাজ খোঁপায় গুঁজে পুলকিতযামিনী হয়ে দাঁড়াল। জিগ্যেস করল না, কেমন লাগছে? টিলার ওপর সেই শবরী বালির মতো কি? দু-চোখ হাসতে থাকল আরও দুটি গন্ধরাজ হয়ে। কয়েক পা এগিয়ে সেবার দরদী আঙুলে টগর তুলে আঁচলে ভরতে লাগল। যেন তাকে নাচে পেয়েছে। প্রতিটি ফুল তোলার আনন্দে তার শরীর দুলে দুলে উঠল। যেন যমুনায় ভেসে যাওয়া গাগরি যা ঢেউয়ে ঢেউয়ে ও অখিল কুঞ্জমিলনের স্বপ্নে দোল খায়। এখন ভান্‌সি ফুল তুলে কী করবে? চিনদিদিমার ঠাকুরঘর তো কবেই লোপাট। পেতলের প্রতিমা টু পিলসুজ টু পূজাবস্ত্র টু প্রণামী ঝেড়ে ফাঁক করে দিয়েছে কোনো হরণজীবী। গরাদ-কাটা জানালা দিয়ে শূন্যপ্রায় ঠাকুরঘর দেখে পাড়ার লোকজন গলার স্বরে উদ্বেগের মেরুনিমা মিশিয়ে বলেছিল, হবে না, জুটমিল এক মাস বন্ধ। কবে খুলবে ঠিক নেই। চুরিচামারি আরও বাড়বে। সিদ্ধান্ত এরকম যেন, শ্রমিকরা চোর হয়েছে। অথচ এঁরাই ঠিকঠাক জায়গায় শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম-মুখীতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তার কীর্তন করেন। ইদানীং এঁদের কেউ কেউ পুরোপুরি শ্রমিকদের পক্ষে বলার আগেকার ধরন থেকে সরে এসে মালিকদেরও গুণগান করছেন। মালিকদের আর শোষক বলা হচ্ছে না। ইতিহাস বোধ হয় আর শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস নেই। মালিকের হাত সম্ভবত আর কালো নেই। বিনিয়োগ বড় দরকারি। পরদেশি বা পরগাছা যা-ই হোক। ভান্‌সি উঠোনে বসে কোঁচড়ে জড়ো করা ফুল তুলে তুলে মালা গাঁথতে থাকে। ওর ডান হাতের আঙুল ফুলের গূঢ় রন্ধ্র দিয়ে শূন্যে উঠে যায়। বাঁ হাত ফুলটিকে বিন্যস্ত করে আরেকটি ফুল তুলে আনে। ওর বাঁ হাতের আঙুল ফুলের গূঢ় রন্ধ্র দিয়ে শূন্যে উঠে যায়। ডান হাত ফুলটিকে বিন্যস্ত করে আরেকটি ফুল তুলে আনে। এভাবেই দুটো হাত ফুলের নির্মাণ হয়ে ওঠে। ওর গলা, বুক, কটিদেশ ফুলে ফুলে গাঁথা হতে থাকে। ভান্‌সি যেন কুসুমবালা, শুধু ওর কপাল নাক ঠোঁট চিবুক পুরনো ভান্‌সির। ও জানতে চায় না, কেমন লাগছে ওকে, পৃথিবীতে ওকে মানায় কিনা। ভান্‌সি নাচে। কোথাও বাদ্যযন্ত্র নেই, খোল বা খঞ্জনি নেই, মৃদঙ্গ বা মন্দিরা নেই, বেহালা বা সারেঙ্গি নেই, কাহারবা বা দাদরা নেই, পূরবী বা ভৈরবী নেই, চারদিকে দরদালান, রিয়েল এস্টেটের রবরবা, রাষ্ট্র ও বিপ্লব নেই, যেথায় তোমার লুট হতেছে ভুবনে, বাঁশি ও বৃন্দগান নেই, শূন্যখা শূন্যখা, কুসুমবালা নেচে যায়, আসরবাসর নেই, মন্ত্রীপরিষদ নেই, কলা সমালোচক নেই, নিতি নৃত্যে সে যে নাচে, নূপুর নেই, নৈবেদ্য নেই, পুর উন্নয়ন নেই, পুলিশ কল্যাণ নেই, উড়ালি-বিরালি হাওয়া আসে, উমরাওজান নেই, দিল কি ধড়কন নেই, মাটিতে পদপাতে বাতাসে বাহুমূলে বন্দনায় আঁখিপাতে কুসুমবালা পদাবলি গান হতে থাকে যেন: কাননে কুসুম তোড়সি কাহে গোরি/কুসুমহি নিরমিত সব তনু তোরি।/সব তনু ফুটল চম্পক গোর/পাণিক তল থল কমল উজোর। কুসুমবালা ধীরে ধীরে চঞ্চল হয়, যেভাবে বানের গন্ধে নদী কেঁপে কেঁপে ওঠে, শরীর বেঁকে বেঁকে যায়, পর্নো ফিল্মের দেখানোপনায় নয়, আধা-পর্নো ছবির বিড়ম্বনায়

নয়, বেহুলা সুন্দরীর দেবতোষণায় নয়, কুসুমবালা অভ্যন্তরীণ প্রেরণায় ঘুর্ণির মত মাটি থেকে আকাশমুখী হতে থাকে, কাউকে দেবে বলে হয়ত নক্ষত্রের স্তূপে হাত বাড়ায় ভান্‌সি। নক্ষত্র কি বিলাসদ্রব্য মনে হল তার? নাকি অস্পৃশ্য কিছু? ওকে ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ছি। ময়লা ছুঁইলে শাস্তি পাইতে হইবে : ষাট দশকের এ-শহরে করোগেটেড টিনের ড্রামে কালো কালিতে লেখা পুরসভার বাণী। নাকি আকাশে কেউ ভান্‌সিকে বলল, ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বধূ, ওইখানে থাকো।/মুকুর লইয়া চাঁদমুখখানি দেখ। উঠোনে নেমে আসে ভান্‌সি, সব ফুল খুলে ফেলতে থাকে, প্রতিটি ফুল তার হাসি বা আগুনের টুকরো হয়ে ছড়ায়।

পরমার্থ দেখছিল। সে ভান্‌সিকে বারণ করতে চাইছিল। কী বলে বারণ করবে? কেন? কোন অধিকারে? সে আবার সেই অসহায়তা টের পেল। সে ভান্‌সিকে পোড়া গাছের মতো দেখল, বইমেলার মাঠে পুড়ে যাওয়া অবিকল সেই শিরীষ গাছ যেন।

পরমদা বাড়ি আছো? ডাক শুনতে পেল পরমার্থ। বুঝল নির্মাল্য দলুই এসেছে।

কতক্ষণ ডাকছে কে জানে? এসব ঘটনা যখন ঘটছিল, তখন কি ডেকেছে? হতে পারে, সে সময় শোনা সম্ভব ছিল না। ডেকে ডেকে হয়ত ফিরে গেছে, আবার এসেছে। বাইরের দরজাটা আগে এরকম ছিল যে যে-কেউ ইচ্ছে করলেই খুলে উঠোনে চলে আসতে পারত। পাঁচিলটা আগে এত নিচু ছিল যে রাস্তা থেকেই উঠোনে বারান্দায় শুকোতে দেওয়া আমলকি আমসিও দেখা যেত। সে-সব পরমার্থর পিতৃদেব সদানন্দ সঙঘকারের বিশ্বাসের যুগের কথা। তিনি যখন অবিশ্বাসী হলেন, যখন বুঝতে পারলেন তাঁদের বিশ্বাস হেরে গেছে, তার কিছুদিনের মধ্যেই দরজা ও পাঁচিল সংস্কার করেন। অবাধ গতিবিধি বা হাটখোলা থাকা তখন আদিবাসী নির্বুদ্ধিতা বলে বিবেচিত হচ্ছে।

পরমার্থর জবাব দিতে ইচ্ছে করল না। নির্মাল্য এলে ভান্‌সি চলে যাবে। এখনই তো ভান্‌সির কাছে থাকার সময়, এখনই তো ভান্‌সিকে আরও ভালো করে দেখার সময়। পোড়া গাছের মতো মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে। উঠোন জুড়ে ছড়ানো টগর ফুলের মাঝখানে দগ্ধ গলিত কুঞ্চি ত ভান্‌সি। পরমার্থ সে-দৃশ্যে চোখ রাখতে পারে না, ফেরাতেও পারে না। দৃশ্যটা দুঃসহ সন্দেহ নেই, কিন্তু তার চেয়ে বড় প্রশ্ন, পরমার্থর তাকিয়ে থাকাকে ভান্‌সি সহানুভূতি ভাবছে কিনা। সে সহানুভূতি দেখাতে চায় না, ভান্‌সিও নিশ্চ য় আলগা সহানুভূতি পছন্দ করে না। কোন অধিকারে সে ভান্‌সিকে সহানুভূতি জানাবে, ভান্‌সিই বা কোন উদারতায় তা মেনে নেবে? কিন্তু যে-মেয়েকে দেখে পরমার্থ বহুদিন শান্তি পেয়েছে, অশান্তিও পেয়েছে, যে-মেয়ের কথা ভেবে সাহসী হয়েছে, সংযমীও হয়েছে, যে-মেয়েকে পরমার্থ চায় কিনা নিজেই বুঝতে পারেনি, যে-মেয়ে পরমার্থকে চাওয়ার ইঙ্গিতও দিতে পারেনি, সেই অস্পষ্ট মেয়েকে ফুলের শরীরে আবার দেখতে চায় সে, এবং আবার যদি শুরু করা যায় ....

পরমদা! চিৎকারটা যেন জেদের জোরে ফুলে উঠছে। পার্লামেন্ট-অ্যাসেমব্লিতে এ ধরনের চিৎকার প্রায়ই শোনা যায়। কেউ বলতে চাইছে, তার বলার চেষ্টা অনেকে মিলে ডুবিয়ে দিতে চাইছে, তবু বলার চেষ্টা প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে তুলে ধরতে চায়। এখানে নির্মাল্যর কণ্ঠস্বর ডুবিয়ে দেওয়ার একজনও নেই, কিন্তু সাড়া পাচ্ছে না বলে জেদি হয়ে উঠেছে। পরমার্থ যে ইচ্ছে করে সাড়া দিচ্ছে না, তেমন হয়তো ভাবছে না, নির্মাল্য ভাবতে পারে, বাথরুমে ঢুকেছে বা টিভি দেখছে বা শরীর খারাপ বলে ঘুমিয়ে পড়েছে। দু-তিনবার ডেকে নির্মাল্য চলে যেতেই পারত। যায়নি। গেলেও ফিরে এসেছে। পরমার্থর সঙ্গে তার এমন কোনো দরকার থাকতে পারে না যে সাড়া পেতেই হবে। তবু সে ডাকছে। আশপাশের বাড়ির লোকজন এই চিৎকারে অজ্ঞাত কোনো ঘটনা সম্পর্কে আগ্রহী হতে পারে, জানালায় দরজায় বারান্দায় উৎসুক মুখ দাঁড়াতে পারে। সেটা পরমার্থর পক্ষে অস্বস্তিকর হবে বুঝেই হয়তো নির্মাল্য ডেকে চলেছে। পরমার্থর জীবনযাপন আর পাঁচজনের মতো স্বাভাবিক হতে পারেনি বলে একটা চাপা কথাবার্তা এলাকায় এমনিতেই আছে। মানুষ এসব আরবের খেজুরের মতো গরম দুধে ফেলে রসিয়ে রসিয়ে খায় কিংবা গ্রীষ্মের দুপুরে লেবুর আচারের মতো।

পরমদা! এবারের চিৎকার হুমকির মতো। যেন নির্মাল্য বুঝেছে, পরমার্থ ইচ্ছে করে সাড়া দিচ্ছে না। এই সাড়া না দেওয়া এক ধরনের অপমান। উপেক্ষা, অবজ্ঞা। অপমান কত প্রকারের তা পরমার্থ অনেকের চেয়ে বেশি জানে। এ-বিষয়ে সে একটি খাতা প্রস্তুত করেছিল, অপমানকে কর্তৃ কর্ম করণ অপাদান সম্প্রদান ও অধিকরণে ভাগ করেছিল, বিস্তর উদাহরণ সংগ্রহ করে প্রাথমিক শ্রেণীবদ্ধ রূপ দিয়েছিল। ক্রমে কাজটা জটিল হয়ে পড়ে। যেমন দেখা গেল, একই অপমান কর্তৃ হয়, আবার সম্প্রদানও হয়। যেমন অফিসের ট্যুর অ্যাসাইনমেন্ট। এটা সাধারণত ভদ্রলোকদের দেওয়া হয় না। কখনও কোনো ভদ্রলোক পেয়ে গেলে সেটা কোন শ্রেণীর অপমান হবে? যেমন, বাড়ির কাজের লোককে দিয়ে ফোন ধরানো ও নাম জানতে চাওয়া। যেমন, অনুপস্থিতিতে আসা ফোনের উত্তর দেওয়ার সৌজন্য বোধ না করা। যেমন, কারও নাম বিকৃত করে ডাকা। যেমন, কারও লেখাপড়াকে 'সিক্ষিৎ মারাচ্ছে' বলে পরিহাস করা। যেমন, কোনও ধর্ষিতার চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা। এরকম অনেক অনেক। জীবন যত ছড়াবে তত অপমান। ওই ছয় ভাগে ধরে না। পরমার্থ ছত্রিশ ভাগ পর্যন্ত গিয়েছিল। তারপর আর সাহসে কুলোয়নি। বেঁচে থাকার সব সৌধ অপমানের ভিতে দাঁড়িয়ে, একথা স্পষ্ট হয়ে গেলে পরমার্থ বাঁচবে কেন? অপমানকে উপেক্ষা করে বাঁচার একটা পথের কথা বলা হয় বটে, কিন্তু সেটা তো অকূল সাধুর কানাগলি, যে-গলি কোথাও যায় না, যে-গলিতে কুকুরপালকরা শুধু কুকুর হাগাতে আসে। আসলে সেই ক্রিয়াটা উপেক্ষা নয়, আপস করা। আপস করলে সিংহাসন, না করলে নির্বাসন। অপমান থেকে পরমার্থ দূরে থাকতে চেয়েছিল এবং বিষয়মূর্খতার নমুনা রেখে ক্লাবে ও অফিসে পার্টিতে হায়ারার্কির সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করেছিল, সাধারণের সঙ্গে সাধারণ

হয়ে থাকার চেষ্টা করেছিল পরমার্থ সঙঘকার। কিন্তু তাতে দেখেছে, অপমানের মাত্রা কয়েক গুণ বেশি হয়েছে। অমুকবাবুর কাছের লোক নয় বলে তলার লোকজন অহরহ বুঝিয়ে দেয় যে, পরমার্থ ফালতু, গাণ্ডু। অমুকবাবুর কাছে 'শুয়োরের বাচ্চা' বা 'রেণ্ডি কা আউলাদ' বা তজ্জাতীয় সম্বোধন শুনেও কাছের লোক বলে তলার লোকজনের কাছে পারমাণবিক বর্জ্যের মতো সমীহা সম্ভ্রম পেয়ে আতঙ্ক ত্রাস হয়ে বাঁচতে পারত।

প র মা র্থ দা! এবার আর্তনাদের মতো শোনালো নির্মাল্যর স্বর। এরপর সাড়া না দিলে পাড়ার পরিদৃশ্য থিয়েটারের স্ক্রিন থেকে লাফিয়ে জেগে উঠবে। ঘরে ঘরে বারান্দায় সিঁড়িতে আলো জ্বলে উঠছে। এপাড়ার বাড়িঘরে সাধারণত আলো জ্বলে কম। ধারদেনা করে বাড়ি তৈরির ঠেলা সামলাতে হয়ত বিদ্যুৎ খরচ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, হয়ত এক ঘরে আলো জ্বালিয়ে ফ্যান চালিয়ে গোটা পরিবার মাথা গুঁজে পরের দিনের পাতে মাছের টুকরোর স্বপ্ন গাঢ় করছে, হয়ত অন্ধ্রের মাছের নির্বিকল্প সমাধি সম্পর্কে ভক্তিমান হয়ে ফ্রিজ বন্ধ রাখা হয়েছে। এখানে কোনো বাড়ির সব ঘরে আলো জ্বললে ভয় হয় : হয়ত চুরি হয়েছে, সেটাকে ডাকাতি বলেও চালানো হয়; হয়ত বাড়ির কেউ মারা গেছে, স্বাভাবিক মৃত্যু হলে; হয়ত কারো সেরিব্রাল বা হার্ট অ্যাটাক হয়েছে; হয়ত কোনো মৃত্যুসংবাদ এসেছে কিংবা পরিবারের টাকার জোগানদার লোকটি সময় পেরিয়ে যাওয়ার দীর্ঘক্ষণ পরও বাড়ি ফেরেনি। আলোর চেয়ে অন্ধকার ঢের ভালো, এই জন্যে যে, কাল যেমন ছিল, আজও তেমনই আছে, নতুন করে খারাপ কিছু হয়নি।

পরমার্থ বলে, আসছি নির্মাল্য।

নির্মাল্য বলে, কী হলো তোমার?

কী আর হবে! পরমার্থ নিজেই কি বুঝতে পারে? কেন সে নির্মাল্যকে দাঁড় করিয়ে রাখল? নির্মাল্যকে অপছন্দ করে এমন নয়। নির্মাল্যর সঙ্গে কথা বলা যায় না এমন নয়। বরং কথা বলতে ভালোই লাগে। নির্মাল্য কম করে বছর পনেরো ছোট। আদর্শবাদের হ্যাংওভার নেই, অলীক স্বপ্নাতুরতা নেই, বাস্তবিক, বুদ্ধিমান, তির্যকভাবে দেখার চোখ আছে বলে মজা করে কথা বলতে পারে, ভান-ভনিতা নেই। 'দলুই' পদবি বর্জন করা ও আবার ফিরিয়ে নেওয়ার গল্প সে নিজেই করেছে পরমার্থর কাছে : হাইস্কুলে ভর্তি হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই বুঝতে পারি, আমার পদবি কয়েকজন সহপাঠী মজার খোরাক করছে। অবশ্য বটব্যাল বা মাইতির মতো কুৎসিতভাবে বিকৃত করতে পারেনি। ওরা ড্রিমিকে বলত কৃমি, কল্যাণকে কেলানে, অতনুকে অতনুনু, চেতনাকে চোদনা. পিয়ালকে শিয়াল, এরকম আরো কত। ক্লাস পেরোতে পেরোতে সংস্কৃতির এই লীলাভূমি দেখেছি বড় হয়েছে। নাম আর পদবি নিয়ে ছড়া বানানোর কদর্যতাও দেখেছি। এ ব্যাপারে সবার ওপরে ছিল অভিজিৎ বসু। এখন নামী সাংবাদিক হয়েছে। ল্যাংগুয়েজ টুইস্টের পুরনো অভ্যাস পোলিটিকাল কলামে লাগায়। তা, আমিও দলুইকে বাঁচাতে পাল্টা ছড়া বানিয়েছি।

তার মধ্যে দু-চারটে অশ্লীলতার গুণে হিট করেছিল। ইউনির্ভাসিটিতে গিয়ে বুঝলাম, দলুই অচল। ছেলেরা তাচ্ছিল্য করে, মেয়েরাও প্রেম করে না। শহরের বাঙালি শিক্ষিত উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্তের কাছে পদবি একটা ব্যাপার। আবিষ্কার করি, গ্রামেও আমরা পদবি ধরে বিশেষ সম্মান দিয়েছি। জাতপাত রক্তে মিশে আছে। ফিউডাল কাঠামোয় তবু দলুই সাবুই ঘোড়ুইরা নিজস্বতা নিয়ে বাঁচতে পারত। কিন্তু ভাঙা ফিউডালে ঘোষ-বোস-গুহ-মিত্র-রায় আর গোটা আ ষ্টেক বামনা আর দু-তিনটে বদ্যি পদবি ছাড়া সব বাতিল হয়ে গেল। সভ্যতা এগোচ্ছে। নির্মাল্য দলুই নামে কোনোদিন বড় কিছু হওয়া সম্ভব নয় বুঝে রায় হয়ে গেলাম। আমার তো রবি ঠাকুরের ওয়ান পার্সেন্ট প্রতিভা নেই। মিডিওকারদের অনেক হিসেব করে চলতে হয়। ব্রান্ডেড পোশাক পরতে হয়, পার্লারে যেতে হয়, ফেসিয়াল করাতে হয়। অবশ্য ফিগার হতে গেলে ফিগারের চর্চা করতেই হবে। প্রফুল্লচন্দ্র রায় আর কজন? বছর পনেরো রায়ে ছিলাম। কিছু হল না। জবাবদিহিই সার হল। কোথাকার রায়, বাবার নাম কী, ঠাকুরদার নাম কী? রায় নাকি আসলে পদবিই নয়, উপাধি। আমি তো পদবির ইতিহাস জানি না। বিতর্ক এড়াতে বাপ-ঠাকুর্দার পদবিও পাল্টে দিলাম। তাতেও কিছু হল না। চারদিকের হালচাল দেখে বুঝলাম, শেকড়ে ফেরা দরকার। এরকম একটা হাওয়া জোর হয়েছে। অকুলীন পদবিগুলোতে মাটির গন্ধ আছে বলে পৃথকভাবে জায়গা দেওয়া হচ্ছে। তবে সিনেমা বা সাহিত্যে না থাক, বাংলার পেইন্টিং-স্কাল্পচারে মেঠো পদবি অনেকদিন ধরেই আছে। পাইন, হালুই, কর্মকার, মণ্ডল, আশ, পাল, শাউ। বেইজ পদবির কোনো লেখককে বাঙালি পাঠক-পাঠিকা ছুঁয়ে দেখবে কিনা সন্দেহ আছে! আমি এখন নির্মাল্য দলুই। আমার শেকড় আছে। শেকড়ে গাঁ-গঞ্জের মাটি আছে। আমার ঠাকুরদা মাঠের কাজ করতেন। ঠাকুমার কথকতা এলাকায় সুপ্রসিদ্ধ ছিল। দ্বারিকলালের গঞ্জে বাবা দোকান করেছিলেন।

দরজা খুলে দেয় পরমার্থ।

নির্মাল্য ঢোকে। বলে, তুমি তো সন্ধেবেলা ঘুমোনোর পার্টি নও দাদা। আমাকে ফোটাতে চাইছিলে?

না না, তা কেন! প্রেমচন্দের একটা গল্প নিয়ে ভাবছিলাম।

কোন গল্প?

নুনের দারোগা।

পড়েছি। কী যেন নাম সেই পণ্ডিত চোরাকারবারির?

অলোপীদীন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। গল্পটা নিয়ে তুমি বহুকাল আগে আমার সঙ্গে আলোচনা করেছিলে।

মনে আছে তোর?

নিশ্চয়।

আজ আবার আলোচনা হতে পারে।

কিন্তু তার আগে বলো, তুমি আমাকে ফোটাতে চাইছিলে কেন?

বিশ্বাস কর।

করছি না। করতে পারছি না।

অসহায় বোধ করে পরমার্থ। ধরা পড়ে গেছে। তবু বলতেই হয়, বিশ্বাস কর।

আমি জানি, তুমি আমাকে অপছন্দ করো না। পছন্দও করো না। আমিও করি না। তবু তো আমার সঙ্গে কথা চলে। কিন্তু আজ কেন ডাক শুনেও দরজা বন্ধ রাখলে। সেটাই আমি জানতে চাইছি। কোনো গোপন ব্যাপার, ওই ব্যক্তিগত-ট্যক্তিগত আর কী?

নির্মাল্য কী অনুমান করছে? পরমার্থর কোনো ব্যক্তিগত ব্যাপার নেই। হঠাৎ করে তেমন কিছু ঘটার সম্ভাবনাও নেই। সেটা নির্মাল্য ভালোই জানে। শবরী চলে যাওয়ার পর একাই আছে পরমার্থ। একা থাকার যন্ত্রণা কাটাতে দোকা হওয়ার চেষ্টা তার নেই। কারণ সে জানে, পরিবার পরিজন হলেও তাকে একাই থাকতে হবে, তার স্বভাবেই আছে একাকিত্ব। নির্মাল্য কি ভাবছে পরমার্থদা শারীরসুখের সস্তা কোনো বন্দোবস্তে মেতেছিল? তা হয়ত নয়, তাহলে এত জোর দিয়ে জানতে চাইত না। অন্যভাবে পরমার্থকে আক্রমণ করত, সে সুযোগ নির্মাল্যর হাতে আছে। পরমার্থর সময়ের আগুনখোর কয়েকজনের ছোঁকছোঁকানির কাহিনি শুনিয়ে দিত। বলত, ধ্যাঁ সব জিনিস, বেণী ভেজাব না, ভাবমূর্তি খসাব না। নির্মাল্য কী ভাবতে পারে তার আন্দাজ পায় না পরমার্থ। নির্মাল্য এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে তাকে সাড়া দেওয়া হয়নি। কেন এই উপেক্ষা, এই অপমান সেটা জানতে চায় নির্মাল্য। সে অনেক কিছুই ভাবতে পারে, কিন্তু এমন কিছু নিশ্চয় ভাববে না যার সঙ্গে পরমার্থর সঙ্গতি নেই। পরমার্থ সত্য বলতে চায়। কিন্তু কোন সত্য বলবে সে? ভান্‌সি এসেছিল বলে নির্মাল্যকে সাড়া দেয়নি? সে চেয়েছিল নির্মাল্য চলে যাক। এ-সত্য নির্মাল্য বিশ্বাস করবে কেন? কবেই মরে-যাওয়া ভান্‌সিকে নিয়ে পরমার্থর সুখবিলাস বা দুঃখবিলাসের সত্যতা নির্মাল্যর কাছে নেই। পরমার্থর ভালো লাগছিল ভান্‌সির কুসুমবালা হওয়া দেখে। কিন্তু সেই হওয়ার সঙ্গে, দেখার সঙ্গে নির্মাল্যদের পৃথিবীর কোনো সম্পর্ক নেই। পরমার্থর কাছে ভান্‌সির আসা নির্মাল্যদের জগতে অলীক।

তাহলে নির্মাল্যই খুঁজে নিক পরমার্থর সাড়া না দেওয়ার কারণ। এ কথা ভেবে পরমার্থ স্বস্তি পায়।

দরজা বন্ধ করে বারান্দার দিকে হাঁটতে হাঁটতে নির্মাল্য প্রশ্ন করল, চারদিকে এত ফুল ছড়ানো কেন? ফুল নিয়ে খেলছিলে নাকি?

পরমার্থ অবাক চোখে দেখে, উঠোন জুড়ে ফুল ছড়িয়ে আছে, বারান্দার সিঁড়িতেও, চিনদিদিমা যেখানে বসে সলতে পাকাতেন সেখানেও! তবে কি ভান্‌সির আসা নির্মাল্যর কাছেও সত্যি!

কত খেলা যে খেললে গুরু! নির্মাল্য বলে। সবই পালানোর খেলা।

নির্মাল্যর চোখে চোখ রাখে পরমার্থ সঙঘকার। বোঝার চেষ্টা করে কী বলতে চায়। কয়েক মুহূর্তেই চোখ নামিয়ে নেয়। কী দরকার সব বোঝার? সত্য যে পাওয়া গেছে, কী দরকার তাকে হারানোর?

শচীন চাটুজ্জের স্মরণসভা ছিল। টাউনহলে। তুমি খবর পেয়েছিলে? নির্মাল্য প্রশ্ন করে।

কেউ আমাকে বলেনি।

বলার কেউ নেই। তবে তোমার জানা উচিত ছিল।

কেন?

শচীন চাটুজ্জে সম্পর্কে তোমার কাছেই প্রথম শুনি। তুমি বেশ প্রশংসা করেছিলে মানুষটির। তিনি মর্যাদা পাননি বলে তুমি দুঃখ করেছিলে।

কেমন হল স্মরণসভা?

কেমন হওয়া উচিত?

শচীনবাবু খুব ভালো লোক ছিলেন।

তাতে কী হল? কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শোকমিছিলে ছিলেন মাত্র পঞ্চাশ-ষাট জন। গণেশ ঘোষের স্মরণসভায় লোক হয়নি বলে এক বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী বেজায় চটেছিলেন। কোনো ভালো কাজে আজকাল লোক মেলে কি? একুশে ফেব্রুয়ারি বলো, আর পুলিশি নিগ্রহ বিরোধী মিছিল বলো, বা পরিবেশ সচেতনতা আন্দোলন বা রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন নিয়ে সভা —ঘুরেফিরে সেই কয়েকটা মুখ হেঁটে যায়, বলে যায়।

শেষ বাক্যটি পরমার্থর। কোনোদিন বলেছিল নির্মাল্যকে। মনে রেখেছে! আজ পরমার্থকে শুনিয়ে দিল। পরমার্থ হাসল। বলল, তার মানে লোক হয়নি।

নির্মাল্য ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। বলল, ভাবতে পারবে না এত ভিড়। হলের বাইরেও লোক। শুনতে পাচ্ছে না বলে বাইরে স্পিকার বক্স লাগাতে হল। টিভি-তে ক্রিকেট ছেড়ে লোকজন সভায় এল। ভাবতে পারবে না!

নির্মাল্যকে ভালো করে দেখে পরমার্থ। নিশ্চয় মজা করছে। বেদনা নিয়ে মজা, যা বেদনাকে গাঢ় করে। মস্করা নয়, তামাশা নয়, কেন লোক হয় না বলে চটাচটি নয়, খুব লোক হচ্ছে বলে মিথ্যাভাষণও নয়, শচীন চাটুজ্জেকে অবহেলার বেদনা যে কত গভীর, সেই অবহেলা যে কী মারাত্মক চেহারা নিয়েছে সেটা বোঝাতেই নির্মাল্য অন্তর্গত রক্তক্ষরণের সঙ্গে গল্প ফাঁদছে।

স্মরণ সমিতির ক-বছর হল?

পাঁচ-ছ বছর হবে। দীনেশ রায় আর মণি বর্মন করেছিলেন।

ওঁদের হয়ত আশা ছিল, একদিন ওঁদের নামেও স্মরণ সমিতি হবে।

পরমার্থ নিঃশব্দে হাসল। বলল, মণিদা সম্ভবত তেমন নন। নানারকম সরকারি প্রস্তাব উনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। রাজি হয়ে গেলে জীবদ্দশায়ই নাম করতে পারতেন।

প্রাইমারি স্কুলের চাতালে স্মরণসমিতির সভা হত। কারণ, দীনেশবাবু প্রাইমারি স্কুলের সেক্রেটারি। আর, শচীন চাটুজ্জে স্কুলের ফান্ডে টাকা দিয়েছিলেন।

সেসব জানি । আজ কী হল বল।

গত বছর পর্যন্ত সভায় লোক হয়েছে বড় জোর দশ-পনেরো জন। সংসারে যারা বাতিল হয়ে গেছে, দিন যাদের ফুরিয়ে এসেছে, যাদের স্বপ্ন প্রেতাত্মা হয়ে তাদেরই ক্ষতবিক্ষত করে, স্মৃতিই যাদের একমাত্র সুখ, সেইসব বৃদ্ধরা শচীন চাটুজ্জের নামে দু-চারটে ফুল ছিটিয়ে আগেকার সব কিছু ভালো আর এখনকার সবই খারাপ বলে রেগেমেগে গলা ফাটিয়ে ঠকঠকিয়ে কেঁপে লম্বা লম্বা ভাষণ দিত। কেউ কেউ অজানা কোনো খার মেটাতে এখনকার রাজনীতিবিদদের গালমন্দ করত। এই তো ছিল স্মরণসভার ছিরি। আজ কী হল জানো, বিশ্বাস করবে না, একজনও শচীন চাটুজ্জের আমলের লোক নেই মধ্যে , সব তরুণ। তুমি যাদের এড়িয়ে চলো, যাদের পছন্দ করো না। কারণ ওরা পণ্য সংস্কৃতির সন্তান, যৌনসংস্কৃতির সন্তান, ওরা মূল্যবোধহীন, স্বার্থপর, কেরিয়ারিস্ট, জীবনে ভোগ ছাড়া সুখের অন্য ভাষা জানে না।

নির্মাল্য , তোমাকেও যে বক্তৃতায় পেল!

পরমদা, আমি চার্জড্ হয়ে আছি। কে না কে শচীন চাটুজ্জে, এরকম গাদা গাদা শচীন চাটুজ্জে একসময় পাড়ায় পাড়ায় ছিল। নীরবে মরে শেষ হয়ে গেছে। তাদের নিয়ে স্মরণসভা করার কোনো মানে নেই। হ্যাঁ, থাকতে পারে, যদি ভালো ভালো কথা বলে নিজের কুকর্ম চাপা দেওয়ার মতলব থাকে, যদি কোনো অপরাধীকে গাল পেড়ে নিজের অপরাধ চাপা দেওয়ার মতলব থাকে, যদি অন্যায়ভাবে আক্রমণকারী কোনো দেশের বিরুদ্ধে তর্জন-গর্জন করে নিজের অন্যায় চাপা দেওয়ার ধান্দা থাকে, যদি ভিনদেশের আক্রান্তদের জন্য কেঁদে স্বদেশের আক্রান্তদের আর্তনাদ ঝাপসা করে দেওয়ার কৌশল হয়।

নির্মাল্য সত্যিই আজ চার্জড্ হয়ে আছে। অন্যদিন ও এত বেশি কথা বলে না। ও যা বলছে তা নতুন নয়। এরকমই হয়। একটি দেশের মুক্তি যুদ্ধে সেনা পাঠিয়ে নিজের দেশে গণতন্ত্রের টুঁটি টিপে ধরা তো অনেক আগেই হয়েছে। এখনও হচ্ছে। রাষ্ট্রশক্তি সভ্যতার সব অবদান, সব মূল্যবোধ হাসি মুখেই খতম করে দেয়। এবং রাষ্ট্রশক্তি তাদের নিয়েই গঠিত হয়, যাদের হৃদয়ে প্রেম নেই, করুণা নেই, শুভ নেই, কাকের কপালের চেয়ে কালো যাদের মস্তিষ্ক। কিন্তু সেই রাষ্ট্রশক্তি তো শচীন চাটুজ্জের স্মরণসভা করেনি। কোনো-না-কোনো ভাবে রাষ্ট্রশক্তির সেবা করতে পারে না বা সেবায় লাগে না এমন কিছুকে রাষ্ট্রশক্তি কেন ছোঁবে? পরমার্থ বলে, তরুণরা কি শচীন চাটুজ্জেকে স্মরণ করল? তারা তো তাঁকে দেখেইনি, ওঁর সম্পর্কে কিছু জানে না।

জানে।

জানে?

এটা ঘটনা, ওরা জানে।

কীভাবে জানবে? কমপক্ষে কুড়ি বাইশ বছর হল শচীন চাটুজ্জে মারা গেছেন। পরমার্থর বয়স তখন তিরিশের নীচে, নির্মাল্য খুব বেশি হলে সিক্স-সেভেনের ছাত্র। আজকের তরুণরা তখন কোথায়? জীবনের শেষ কয়েক বছর শচীন চাটুজ্জে সব কিছু থেকে নিজেকে এতটাই সরিয়ে নিয়েছিলেন যে, মৃত্যুর পর বোঝা গেল তিনি বেঁচে ছিলেন। যখন সক্রিয়ভাবে বেঁচে, তখনই তিনি অনালোচিত। মৃত্যুর পর তাঁকে মনে রাখার দায় কার? পরমার্থর বাবার ছাপাখানায় আসতেন শচীন চাটুজ্জে, ভোটের সময় প্রচারপত্র পোস্টার ইত্যাদি ছাপার জন্য, অন্য সময়ও আসতেন, গাছপালার গল্প করতেন, শিশুদের মজার মজার খেলার গল্প করতেন, ছবির কথা বলতেন। কিন্তু সেসব তো আজকের তরুণদের জানার কথা নয়। তাঁর কথা বলবেন, এমন মানুষও নেই।

শচীন চাটুজ্জের স্মরণসভা কেন টাউনহলে হবে তা নিয়ে প্রথমেই এক দফা বিতর্ক হয়। দীনেশবাবু চেয়েছিলেন প্রাইমারি স্কুলের চাতালে আটকে রাখতে। ওঁদের যুক্তি, শচীনদার স্মরণসভায় লোক আসে না। বড় জায়গায় খাঁ খাঁ সভা করে মানুষটাকে কেন আরও অপমান করবে? যুক্তি উড়িয়ে দেওয়ার নয়। তবু কোথায় যেন একটা জেদ তৈরি হয়েছিল, টাউন হলেই সভা হবে। পরমদা, এখন সন্ধেয় টাউনহল ফাঁকা পাবে না। আজ ক্রেডিট সোসাইটির মিটিং তো কাল কো-অপারেটিভ, পরশু জয়মাতা ট্যুরিজম। হরেক চিট ফান্ড, হেলথ্ কেয়ার, গোল্ডেন কেরিয়ারের কর্মী-সভা, গাদা গাদা ধর্মসভা, ফ্যাশন শো, হাঙ্গামা সেল, বিয়ে, পৈতে, বুগি-উগি, অন্ত্যাক্ষরী লেগেই আছে। দুপুরেও ফাঁকা পাওয়া কঠিন। আজ টিভি-তে ওয়ান ডে ছিল তা-ই পাওয়া গেল। ওয়ান ডে মত্লব্— সুপার এনটারটেইনমেন্ট, দ্রৌপদীর কাপড় খোলা ইস্তক মজা। ভালোই হল, স্মরণসভায় তরুণরা এল হইহই করে, ওরাই জমিয়ে দিল।

ক্রিকেট ফেলে ?

হ্যাঁ। ভাবতে পারছ না তো! ওরা কেন ক্রিকেটে মেতে থাকে, কেন এ ধরনের স্মরণসভায় যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না, কেন ভালো কথার ধার ধারে না, কেন ওরা জ্ঞানমশায়দের এড়িয়ে চলে, লেখক-ফেখকদের কেন আওয়াজ দেয়, ধাষ্কাপ্রসাদদের পেছনে ঘুরঘুর কেন করে সেসবই বলল।

পরমার্থ এই সভার খবর বিস্তারিতভাবে জানতে চায়। ভালো ভালো কথার অর্থহীন সভায় ঢের গিয়েছে সে। পরিপাটি বিশ্লেষণের প্রলোভনময় শোকেস ঢের দেখেছে সে। বলল, অবিশ্বাস্য হলেও সেই সভায় কী কী হল তুমি বলো।

নির্মাল্য দলুই উঠে দাঁড়ায়। বলে, বারান্দার এদিকটা ধরো স্টেজ। যা হল তা জানাতে স্টেজটা ব্যবহার করতে হচ্ছে। তুমি যেখানে বসে আছ সেদিকটা অডিয়েন্স। অ্যাকটিংও করতে হতে পারে। স্বাভাবিকভাবে নেবে। সভা শুরু হল জন লেননের গান দিয়ে। ইয়েস্। বলো তো কোন গান? একসময় তোমরা বিট্‌লদের শ্রাদ্ধ করেছিলে বলেই হয়ত লেনন দিয়ে শুরু। দু-একজন হিন্দি হিট ফিল্মি গানের কথা বলছিল। কারণ হিন্দি গানের জলসা এখন তোমরা স্পনসর করো। তুমি কি ভাবছ 'ইমাজিন'-এর কথায়! নো বস, গানটা হল 'ক্রিপলড্ ইনসাইড'। ইউ ক্যান ওয়্যার ও মাস্ক/অ্যান্ড পেইন্ট ইয়োর ফেস/ ইউ ক্যান কল ইয়োরসেল্‌ফ দা হিউমান রেস/ ইউ ক্যান ওয়্যার ও কলার/ অ্যান্ড এ টাই/ ওয়ান থিং ইউ কান্ট হাইড/ ইজ হোয়েন ইউ আর ক্রিপলড্ ইনসাইড। কী মনে হচ্ছে?

কী মনে হতে পারে? নির্মাল্য যা বলছে তা কোনোভাবেই বিশ্বাস করা যায় না। পরমার্থর ভালো লাগলেও না। পরমার্থ খুশি হলেও না। বিশ্বাসযোগ্যতা কারও খুশি হওয়ার ওপর নির্ভর করে না। নির্মাল্য বানাচ্ছে। বুদ্ধিমান ছেলে, বলবে বলে আগেই বানিয়ে এসেছে। সত্যি কি তা-ই?

পরমদা, তোমার নিশ্চয় মনে আছে, শচীন চাটুজ্জে সাইকেল রিক্‌শয় বসে, মাঝে মাঝেই কাঁকিয়ে ওঠা। মাইক্রোফোন নিয়ে ঘুরে ঘুরে প্রচার করতেন?

সেছবি ভুলতে পারবে না পরমার্থ। কেননা, এখন আর ওভাবে কেউ প্রচার করে না। সত্তর দশকেও করত না। সকাল থেকে দুপুর, বিকেল থেকে রাত একা একা মানুষটি পথে পথে ঘুরছেন। সঙ্গী শুধু রিক্‌শচালক, তিরিশ টাকা ভাড়ায় দিনভর ঘোরাঘুরি। দুপুরে ঘণ্টা চারেক বিশ্রাম। কোথাও থেমে ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে গলা ভিজিয়ে নিতেন দু জনে। একটু চাঙ্গা হয়েই আবার সেই অদ্ভুত প্রচার: আমি যেখানে বাস করি, সেখানকার মাটি ও মানুষকে ভালোবাসি। ভালোবাসি এই জলা, এই পুকুর....

আমি ভালোবাসি এই বাঁশবন, আমার জীবনযাপনের বন্ধু সে। আমি ভালোবাসি এই খাল, আমার গঠনে তার ভূমিকা আছে। আমি খুঁজি সেই নদীকে, যার ভালোবাসা ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। আসুন খুঁজি সবাই মিলে। আমাদের ইতিহাস খুঁজি, বর্তমান খুঁজি। কোনো নির্দিষ্ট মতাদর্শে আমরা বাঁচতে পারি না, কোনো মতাদর্শই দীর্ঘকাল বাঁচে না। তাঁকে বাঁচিয়ে রাখা হয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। প্রতিষ্ঠান মানুষের শত্রু হয়, মানুষকে অশক্ত করে, অসহায় করে। আসুন আমরা নিজেদের শক্তি নিজেরা খুঁজি, যা হারিয়ে গেছে নদীটির মতো। আমাদের শক্তি খোঁজার দায়িত্ব অন্যকে দেবেন কেন? যিনি বা যাঁরা নির্দিষ্ট মতাদর্শে বিশ্বাস করেন, এই বাঁশবন এই পুষ্করিণী এই মাঠ তাঁর আত্মীয় হতে পারে না। — শচীন চাটুজ্জে যেভাবে টেনে টেনে, ছেড়ে ছেড়ে, অন্তর্গত বহমানতায় বলে যেতেন, ঠিক সেইভাবে এক তরুণ বলতে বলতে থেমে গেল। শ্রোতৃমণ্ডল সমস্বরে বলে উঠল, আমরা কেউ তাঁকে সমর্থন করিনি। আমরা তাকে পাগল বলেছি।

পরমার্থ অবিশ্বাস করে কীভাবে ? এসব কথাই শচীন চাটুজ্জে বলতেন। আর, সবাই তাঁকে পাগল ভাবত। কিন্তু এই সময়ের ছেলেরা তাঁর কথা পেল কীভাবে? তারা কি শুনেছে তাদের পরিবারের বয়স্কদের কাছে? সেই বয়স্করা কি ঢের দেরিতে বুঝেছিল যে শচীন চাটুজ্জের কথা ছিল অনেক সহজ সরল এবং সে-কারণেই ফালতু ভেবেছিল? নাকি বয়স্করা এক পাগলের গল্প করতে গিয়ে এসব কথা বলেছে?

এরপর আরেক তরুণ উঠল। সে বলল, শচীন চাটুজ্জে পার্টি সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করেছিলেন। তিনি বলতেন, সব পার্টিই বস্তুত এক। তারা নিজেরা মিলমিশ করে থাকে। আর, সমাজকে টুকরো করে। মানুষে মানুষে হানাহানি বাধিয়ে রাষ্ট্রশক্তির সেবা করে। সেই বৃদ্ধ বলেছিলেন, দক্ষিণ ও বাম তো দুটো দিকচিহ্ন মাত্র। দক্ষিণপন্থী মাত্রই খারাপ আর বামপন্থীরা সবাই ভালো, এত সরলীকরণ কি বিশ্বাস করা যায়, না বিশ্বাস করা উচিত? এই চিহ্নায়ন রাজনৈতিক। মানুষ কেন রাজনীতির দ্বারা চালিত হবে? মানুষ পূর্ণাঙ্গ মানুষ হতে চায়, রাজনীতি তাঁকে খণ্ডিত করে। মানুষের চাওয়া অনেক। রাজনীতি চায় ক্ষমতা, ক্ষমতা নিজের স্বার্থে মানুষকে ছাঁটে এবং ছাঁটতেই থাকে। আসুন আমরা পার্টিকে অস্বীকার করি। নিজেদের কথা নিজেরা বলি। হয়ত প্রথমে আমাদের স্বর ফুটবে না, জিভ জড়িয়ে যাবে, ভাষা খুঁজে পাব না, কথা পিছলে যাবে। ক্ষতি কি? আসুন নিজের ভাষায় কথা বলি। শেখানো বুলি আওড়ানো সোজা। কিন্তু তাতে নিজের কথা যে চাপা পড়ে যায়। যখন বুঝব শেখানো বুলিতে সত্যের খামতি ছিল, তখন জীবনটা জলে গেল বলে কষ্ট পাব না কি? তার চেয়ে নিজেদের মতো করে ভাবুন, একে অপরের সঙ্গে ভাবনা বিনিময় করুন, হোক তর্কবিতর্ক, তাতে মগজ শক্ত হয়, সম্পর্ক সুস্থ হয়, রেষারেষি থাকে না। পার্টি চায় রেষারেষি। পার্টি চায় আনুগত্য। মানুষ তার চিন্তাভাবনা বিসর্জন দিয়ে বাইরের কোনো শক্তির অনুগত হবে কেন?—দ্বিতীয় তরুণ বলে যায়, তার বলার ফাঁকে শ্রোতৃমণ্ডল সমস্বরে জানায়, আমরা শচীন চাটুজ্জেকে পাগল বলেছি।

'রাজা অয়েদিপাউস'-এর দৃশ্য মনে পড়ে পরমার্থর। অয়েদিপাউস এক এক করে তাঁর ভুল-ত্রুটিগুলো বলছেন, কীভাবে তিনি হত্যা করেছেন পিতাকে, কীভাবে মা-র শয্যাসঙ্গিনী হয়েছেন.... আর প্রজারা তাঁর কথার ফাঁকে ফাঁকে বিলাপধ্বনি করছে, হায় রাজা, হায় রাজা। পরমার্থ অভিভূত। তার সম্মুখে পরিপার্শ্বে সংলাপ আলোড়িত হতে থাকে: আসুন, আমরা প্রলোভন থেকে দূরে থাকি □ আপনি একটা পাগল □ আসুন, আমরা পাইয়ে দেওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করি □ পাগল কি গাছে ফলে □ ভেতরটা না জাগালে আমরা যে নিশি ডাকে ভেসে যাব □ পাগল ভালো করো মা □ আমরা কেন বারবার বাইরের হাতছানিতে উছলে উঠি □ দে পাগলের মাথা ভেঙে....

পরমার্থদা! নির্মাল্য ডাকল। শুনতে পাচ্ছো ? জমিদারবাড়ির ছেলেদের নিয়ে এককালে তোমরা বিস্তর আমড়াগাছি করেছ। ফিউডাল সিস্টেম খারাপ, অথচ জমিদার-পুত্ররা

আদর্শস্থানীয়! তাদের গায়ের রং, তাদের পোশাক, তাদের আচার আচরণে গদগদ তোমরা তাদের পুরোভাগে বসিয়ে সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়েছ। আর সেই জমিদার-পুত্র যদি মস্কো-টস্কো নিয়ে ভাবত, বামপন্থীদের মধ্যে তার সে কী হ্যালো, মনে পড়ে? পারিবারিক ঐতিহ্যের নামে তোমরা সেই ফিউডাল সিস্টেমকেই জিতিয়ে দিয়েছ। সামাজিক ঐতিহ্য খোঁজোনি। চাষাভুষোর বিচারবুদ্ধিতে আস্থা রাখোনি। চাষাভুষো নেতা শহিদ হলে বাঁকুড়ার পোড়ামাটি বা বীরভূমের যমপটের শহুরে খদ্দেরের মতো তোমরা সমঝদার সংগ্রাহক হয়েছ। শচীন চাটুজ্জে বলতেন, দু-দশটা পরিবারের ঐতিহ্য হল, আর বাকিরা পতিত থেকে গেল— এর মূলে যে বঞ্চনা আছে বৈষম্য আছে, তা ভাবব না আমরা? পারিবারিক ঐতিহ্য আসলে বঞ্চনারই আরেকটি ফাঁদ। আসুন, আমরা ফাঁদগুলো সরিয়ে দিই। আসুন, আমরা ফাঁকিগুলো মুছে ফেলি। না হলে আমরা অনেক অনেক ফাঁকির মধ্যে পড়ব।

পরমার্থ স্পষ্ট দেখতে পায়, ছাপাখানার ঘুপচি অফিস ঘরে বাবা আর শচীন চাটুজ্জে মুখোমুখি বসে আছেন। স্পষ্ট শুনতে পায়, এইসব কথাই বলছেন শচীন চাটুজ্জে। কিন্তু স্মরণসভার আজকের তরুণরা জানল কীভাবে? সত্য জানার আকাঙ্ক্ষা কি সব আচ্ছাদন নির্মম হাতে ছিঁড়ে ফেলে?

পরিপার্শ্বে ড্রাম আর ফ্লুটের ওয়েস্টার্ন টিউন। যেন প্যারিসের মঞ্চে ফ্যাশন প্যারেড তরুণ তরুণীদের। হাতে উল্কি, বুকে উল্কি। অস্থির স্তনবৃন্ত। পেছনে সমুদ্র, সামনে ল্যান্জারি। নাভির গভীর নীচে লাল চাকতিতে কালো হরফে লেখা 'কিলার'। ক্ষৌম কাঁচুলিতে নীল হরফে 'রাইট চয়েস'। মিউজিকের সমান্তরালে লিরিক শোনা যায় : দু-লাখ দেব, মাস্টারি দাও জুট মিলের জমির বখরা দাও ☐ কলা বেচতে কানাডা পাঠাও ☐ হাসানজলায় লেবার আমার ☐ তোমার জন্য পদ্য লিখেছি, পদ তো দাও ☐ গুরু, বুকনি ছাড়ো, ধান্দা বলো ☐ ধর্ষণ করেছি তাতে কী হল ☐ রাজনীতি আমরা ঘেন্না করি ☐ সুনীলবাবুর নয়া গাড়ি ....। পরমার্থর চোখের সামনে মেকিং অফ পিরেলি ক্যালেন্ডার স্তরে স্তরে ভেসে ওঠে। সভা জমে ক্ষীর। প্রবন্ধের মতো স্বপ্নের মধ্যে পরমার্থকে রেখে চলে যায় নির্মাল্য দলুই।

উড়ালি-বিরালি হাওয়া ঝড় ঝড় হচ্ছে, বুঝল পরমার্থ, ততক্ষণে ছড়ানো ফুলরাশি উঠোন থেকে বাগান থেকে সরে সরে কোণে কোণে অন্ধকারে জড়োসড়ো হয়েছে। সে চেয়ার ছেড়ে উঠে বারান্দা থেকে নেমে আকাশ খুঁজে দেখল, তেমনই নক্ষত্রখচিত, মেঘ নেই। সে পায়চারি করতে থাকল, যেন আরও কোনো ব্যক্তিগত ঘটনা থেকে পালাতে চায়। ঢের হয়েছে, ভান্সি যেন আর না আসে, নির্মাল্য যেন আর না আসে, তাদের চিন্তা মাথায় যেন জমাট না হয়ে যায়। মাথার ভেতর হাওয়া ঢুকুক, হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ুক কুসুমবালা, রোহিণী, স্মরণসভার টুকরো টুকরো ছবি, উড়ুক পাখির গান বা ম্যান্ডোলিনের সুর। সে দেখল, সামনে ডোবার ওপর রাত্রি, চুপচাপ দরদালানের ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে রাতের সংসার ঝিমোচ্ছে, পাঁচিলের গায়ে ল্যাম্পপোস্টের আলোয় আমগাছ গর্ভে ভারী হয়ে

আছে। পরমার্থ ভাবল, চানাচুর দিয়ে মুড়ি মেখে খাওয়া যেতে পারে। খাবে বলে গত রবিবার এনেছিল। খাওয়া হয়নি, কারণ মাখতে ইচ্ছে করেনি। পেঁয়াজ-লঙ্কা কুচিয়ে তরিবত করে খেতে যে খাটুনি লাগে, সেটা করতে আর ইচ্ছে হয়নি। প্লেটে বিস্কুট আর ডালমুট নিয়ে চা খেতে খেতে কমল দাশগুপ্তর গান শুনে চমৎকার কাটিয়েছিল সন্ধেটা। এখন মুরলীর দোকানে গেলে বেগুনি না হলেও আলুর চপ পাওয়া যাবে। থাক। মুড়ি আর চানাচুর মেখে নেওয়া যাক। সে বড় বাটিতে খানিকটা মুড়ি ঢালল, তারপর গোল করে ছড়াল সরষের তেল, মুড়ির কৌটোর ঢাকনা ও তেলের বোতলের মুখ বন্ধ করে চানাচুরের জার নামাল। মুড়ি মাখতে গিয়ে বুঝল তেল বেশি হয়ে গেছে। আরো খানিক মুড়ি ঢালতে হল বাটিতে। মেখে দু-মুঠো চানাচুর ছড়িয়ে দিল মুড়ির ওপর। জারের মুখ বন্ধ করে বাঁ হাতে বাটি ধরে ডান হাতে মাখতে মাখতে বারান্দায় এসে বসল।

তখনই দরজায় শোনা গেল, পরমার্থ!

বাটিটা আরেকটু হলেই ছিটকে পড়ত, এতটাই কেঁপে উঠেছে সে। শবরী এসেছে! কোনোক্রমে বাটি মাটিতে নামিয়ে রেখে লম্বা পায়ে উঠোনে নেমে পরমার্থ বলল, কে? সে জানে শবরী। তবু হঠাৎ মর্যাদায় লাগছিল একবারে চিনে ফেলতে। মনে হল হ্যাংলামি হয়ে যাবে। কে যেন বলল, তার লাফিয়ে ওঠা উচিত হয়নি। চেয়ারে বসেই জিগ্যেস করা উচিত ছিল? তা যখন হয়নি, গলা যথাসম্ভব নিরাসক্ত করে সে বলল, কে?

শবরী বলে, চিনতে চাইছো না?

পরমার্থ বুঝতে পারে, বোকামি হয়ে গেছে। যার সঙ্গে আট বছর ঘর করেছে, মনের বা চিন্তার কোথাও মিল না হলেও এক ঘরে থেকেছে, নিছক আইনি সম্পর্কের গিঁটে হলেও একই বিছানা একই বাথরুম একই বারান্দায় তারা লিপ্ত থেকেছে, তার গলার স্বর ও উচ্চারণ ভঙ্গি অচেনা হয়ে যাবে তেমন কোনো বিপর্যয় গত বারো বছরে হয়নি। আট বছরের স্মৃতি কিছু কম নয়, বেশির ভাগটাই যন্ত্রণার হলেও গত বারো বছরে তা কয়েক গুণ ভারী হয়েছে। সুখের স্মৃতি যেটুকু আছে, তা অম্লানকুসুম করে রেখেছে পরমার্থ। সুতরাং কে বলাটা ভুলই। আবার ভাবল, ভুল কেন? সে যে চিনতে চায় না, সেটা তো বুঝিয়ে দেওয়া গেল। একই সঙ্গে বারান্দা থেকে নেমে সে যে নিজেকে খেলো করে ফেলেছিল, কে বলে কিছুটা উদ্ধার করা গেল। শবরীর প্রশ্নে পরমার্থর মাথায় হঠাৎই একটা চালাকি খেলে যায়। চালাকি করাটা উচিত হবে কিনা ভাবতে ভাবতে সে বলেই ফেলে, তা নয়। পৃথা আসবে বলেছে। তাই ভাবলাম,—এসো।

ভাবলে পৃথা এসেছে?

তা-ই। পরমার্থ জোর দিয়ে বলে। এখানে আমতা আমতা করা ঠিক হবে না।

পৃথা আসবে?

চেনো ?

কোনো মেয়ে হবে। শবরীর স্বরে কৌতুক।

পরমার্থ বুঝতে পারছে না, আবার বোকামি করে ফেলল কি? শবরী হয়ত চালাকিটা, বলা ভালো মিথ্যেটা ধরে ফেলল। শবরী সম্পর্কে তার আধিক্যতা বেশ বিচ্ছিরিভাবেই ধরা পড়ে গেল। নিজেকে এভাবে হাস্যকর করে তোলা কেন? পরমার্থ এখনও কিছু কিছু ব্যাপারে আবেগের ঝটকায় হেলে যায়। শবরী তার একটি। শবরীকে সে অপছন্দ করে, তার হাত থেকে মুক্তি চেয়ে সে আদালতে গিয়েছিল, তবু তাকে চাওয়া আজও ফুরলো না। নাহলে সে শবরীর গলা শুনে লাফিয়ে উঠবে কেন।

পৃথা কি প্রায়ই আসে?

শবরী মজা করছে। এটা নিয়ে খেলবে খানিকক্ষণ। খোরাক পেয়েছে। পরমার্থকে মুরগি করা ওর পুরনো আনন্দ। কথা ঘোরাতে পরমার্থ জিগ্যেস করে, তুমি হঠাৎ কী মনে করে?

আসতে নেই বুঝি!

না, তেমন নয়।

পুরুষরা কত তাড়াতাড়ি বদলে যায়।

ফ্লার্ট করছে শবরী। পরমার্থ বলে, অনেক দূর থেকে আসে মেয়েটা। আমার সঙ্গে কথা বলতে নাকি ভালো লাগে। পরমার্থও খেলতে চায়। জানে, এর পরের উত্তরেই শবরী যৌন ইঙ্গিতের দিকে ঢলবে। ভান্‌সির সঙ্গে পরমার্থর সম্পর্ক নিয়ে এমন সব নোংরা মন্তব্য ও করেছে, যা উদ্ধততম পুরুষবাদকেও লজ্জা দেয়।

পৃথা নির্মাল্যর সঙ্গে গল্প করছে। দেখলাম শবরী বলে।

কোন পৃথা? প্রশ্নটা পরমার্থ প্রায় করে ফেলেছিল। পৃথাকে চেনো? নির্মাল্যকে চেনো?

আজই আলাপ হল স্মরণসভায়।

তুমি স্মরণসভায় গিয়েছিলে?

কেন? আমি যেতে পারি না!

তা নয় ....। স্মরণসভার সত্যতা নিয়ে পরমার্থর সংশয় রয়েই গেছে।

শুনলাম খুব ভালো সভা হয়েছে।

অ সা ধা র ণ। পৃথা আর নির্মাল্যই তো সব। ওরাই গবেষণা করেছে, টেক্সট্ তৈরি করেছে, মিউজিক লাইটও ওদের।

এ কোন বিপদে পড়া গেল। কোনটা খেলা আর কোনটা নয়, কিছুই বুঝতে পারছে না পরমার্থ। শবরীকে বারান্দায় বসিয়ে সে ঘরে গেল। পায়জামা পাঞ্জাবি বদলে নিল। নোংরা পোশাকে শবরীর সামনে বসতে লজ্জা করছিল। ইচ্ছে হল, শবরীকে ঘরে ডাকে। কোথায় যেন বাধল। সেটা অভদ্রতা হবে। ফাঁকা বাড়ির নির্জনে ঘরের ভেতর প্রাক্তন স্ত্রীকে ডেকে নেওয়া অসাধু মতলব বলে বিবেচিত হতে পারে। শবরীর নিশ্চয় ঘরে আসতে ইচ্ছে করে না। বারান্দায় বেরিয়ে দেখে, শবরী মুড়ির বাটি কোলে নিয়ে বসে আছে। দেখে মনে হল,

শবরী অনেক অনেক বদলে গেছে, হৃদয় ছুঁয়েছে এই নারীকে। তার সহৃদয়তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে খাটো করা নয়, অভিনন্দন জানাতে ইচ্ছে করে পরমার্থর। কিন্তু সে কী বলবে?

বলল শবরীই, বাঃ, বেশ লাগছে তোমাকে । পাঞ্জাবিটা দারুণ, হালকা নীল রঙে তোমাকে বরাবরই খুব ভালো লাগে।

পরমার্থ প্রশ্ন করতে চায় না। জানতে চায় না, আগে কোনোদিন একথা কেন বলেনি, যা ঘটছে, ঘটে যাক। আজ অঘটনের রাত। শুধু বলল, তা-ই! বলে লাজুক হাসল।

সেই যে একটা নীল শার্ট পরে তুমি বাসস্ট্যান্ডে কৃষ্ণচূড়ার নীচে দাঁড়িয়ে থাকতে, মনে আছে, কী নরম নীল ছিল। আমার বন্ধুরা তোমাকে বলত, নীলকণ্ঠ পাখি। তুমি তখন ছিপছিপে ছিলে। বন্ধুদের কথা শুনতে শুনতে আমি ভরাট হয়ে যেতাম। আমি তখন তোমাকে দূর থেকে দেখছি, তুমিও আমাকে। তখনই জানতাম, তোমাকে আমি পাবই।

পরমার্থ কিছুই ভাবতে চায় না। ভাবতে চায় না যে, এসব বানানো কথা, তার আট বছরের দাম্পত্যে সেই প্রেম পা রাখার জায়গা পায়নি। ভাবতে চায় না, নীল রং ভালো লাগার জন্য শবরী তাকে নাবালক এবং ক্রমে রুচিহীন বলে বিদ্রূপ করেছে।

শবরী বলল, মুড়িমাখা ভালো হয়নি। মনে হল, ভুষি খাচ্ছি। আগে আমতেল দিয়ে কী সুন্দর মাখতে। আমতেল নেই?

পরমার্থ ভাবতে চায় না, মুড়ি ভালো লাগার জন্য শবরী তাকে গেঁইয়া বলেছে।

শবরী বলল, অনেকদিন একা আছো। আর থেকো না। এমন কিছু বয়স হয়নি তোমার। স্বাস্থ্য এখনও মজবুত। বয়সের একটু ফারাক হলেও, সেটা কোনো ব্যাপার নয়, পৃথাকে বিয়ে করতে পারো।

পরমার্থ ভাবতে চায় না যে, বুড়োটে চেহারার জন্য শবরী তাকে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে অপদস্থ করেছে। সে কিছুই ভাবতে চায় না। শুধু একটা কথা না ভেবে পারে না, পৃথা এল কোত্থেকে? পৃথা নামের কাউকে পরমার্থ চেনে না। সে যে পৃথার কথা বলেছে, সেটা নিছক নাম। তার আসা বা যাওয়ার কোনো ব্যাপারই নেই। পৃথা না হয়ে মল্লিকা বা যূথিকা বা অপর্ণা, যা কিছু হতে পারত; পৃথা মনে এসে গেল, তাই বলে ফেলা।

শবরী বলল, আমি বুঝেছি, পৃথা তোমাকে ভালোবাসে। না হলে নির্মাল্যকে ওভাবে বলতে পারে না যে, আমরা ভাবতে শিখেছি পরমার্থর কাছে। পরমার্থকে বাদ দিয়ে কোনো প্রোগ্রাম ভাবা যায় না। আমি মেয়ে। মেয়েদের মন ছেলেদের চেয়ে একটু বেশি বুঝি। পৃথার কথায় নির্মাল্য আহত হবে। পৃথা নির্মাল্যকে আহত করতে চায়। মেয়েরা এরকমই হয়, যাকে ভালোবাসে, তাকে পেতে আর কাউকে নির্মমভাবে সরিয়ে দিতে পারে।

আজ হল কী! উল্টে পাল্টে সব কাণ্ড ঘটছে, উল্টে পাল্টে সব কথা হচ্ছে! বাইরে তেমনই হাওয়া ও নক্ষত্র। গাঢ় রাতে ল্যাম্পপোস্টের আলোয় ডোবার শরীর জুড়ে শিহরণ আর কচুবন ও বোধকুমারীর ঝোপে নিরীহ ঢেউগুলোর ব্যর্থ হয়ে যাওয়া।

শবরী বলল, পৃথা তোমাকে চায়।

ইয়ার্কি মারছে শবরী? পরমার্থকে খাস্তা করার আরেকটি প্রক্রিয়া? সে বোকামি করে, আত্মসম্মান বাঁচানোর বোকা-বোকা ভাবনা থেকে মহিলাবাচক একটি নাম বলে ফেলেছে। তার জন্য হেনস্থা? শবরী বরাবরই ভিন্ডিক্টিভ। কিন্তু সে-রূপ বিষখোবরা। এখন নম্র, স্মিত, শ্রীময়ী। এটাও কি কায়দা, যা বারো বছরে শবরী আয়ত্ত করেছে। খুন করার আগে ও পর মুহূর্তে, এমনকী খুন করার মুহূর্তেও খুনিকে খুনি বলে মনেই হবে না, এতটাই স্থিতধী, এতটাই নিপুণ। পরমার্থকে নিয়ে শবরী তামাশা করতে পারে। দূরত্ব ও দায়হীনতা সে-সুযোগ বাড়িয়ে দিয়েছে। আর পরমার্থ যে তামাশা করারই মাল, তা শবরীর চেয়ে ভালো আর কে জানে। তবু পরমার্থর মনে হয়, শবরী ইয়ার্কি মারছে না, তামাশা করছে না। ঘটনা বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার চেষ্টা ওর স্বরে বা ভঙ্গিতে নেই।

আমি লিখে দিতে পারি, পৃথা নিবেদিতা নয়। নিবেদিতার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক গড়ে উঠছে বলে খবর পেয়েছি। নিবেদিতা এ-বাড়িতে আসছে সেটাও শুনেছি। আমি জানতাম, ওটা কেটে যাবে। নিবেদিতা রোমে রোমে কেরিয়ারিস্ট। তোমাকে ওর বেশি দিন ভালো লাগার কথা নয়। অন্যভাবে নিও না, নিবেদিতা প্রসটিটিউদেরও লজ্জায় ফেলে দেবে। বাবুর ধামসানি ভরপেট খেয়ে দেশগাঁয়ের দিঘি, গোয়ালঘর আর স্বজনভরা জীবনের জন্য মায়া কাঁদে। না হলে বিলো-মিডিওকার মেয়ের এই সাকসেস্ হয়!

কী বলছে শবরী! নিবেদিতা ওর মডেল। জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছি পান/ তুমি জানো নাই। লাইফ ইজ ফুল অফ জুবিলেশন। নিবেদিতার মতো জীবন চেয়ে ও ঘর ছেড়েছে। টাকা চাই, জীবনে বড় হতে গেলে টাকা চাই, আরও টাকা....। শরীর ছাড়া এমন কিছু আমার নেই যার বিনিময়ে আমি অনেক টাকা পেতে পারি। যা আছে তা তোমরা পুরুষরা পাম্প করে দেখাও, দাম দিতে পারো না। তাতে আমার পোষাবে না। নিবেদিতাকে দেখো, নিজের হাতে নিজের মতো জীবন গড়ছে। বিয়ে হয়েছে বলে নিজের জীবন থাকবে না! সেই নিবেদিতাকে আজ খারিজ করতে চায় শবরী? হতে পারে, বারো বছর অনেকটা সময়। অনেক পরিবর্তন, অনেক পরিণতি হতে পারে। জীবনবোধ পাল্টে যেতে পারে। কিন্তু নিবেদিতার সঙ্গে পৃথার তুলনা কেন? পৃথা নামের অস্তিত্বহীন একটা মেয়েকে তোল্লাই দিয়ে, তারপর তাকে ফেকলু বানিয়ে পরমার্থকে অপমান করা? নিবেদিতার সঙ্গে পরমার্থর সম্পর্ক গড়ে উঠছে বলে শবরী কি অপমান করল না? নিবেদিতাকে পছন্দ করা মানে তো পরমার্থ যে-জীবনের কথা বলে তার বিরোধিতা। শবরী পরমার্থর দ্বিচারিতার কথাই বলল। এবার পরমার্থকে রূঢ় হতেই হচ্ছে। সয়ে গেলে পেয়ে বসবে।

শবরী বলে, পরমার্থ, পৃথা আসছে। নির্মাল্যও আসছে। পৃথা তোমাকে ভালোবাসে বলে নির্মাল্য তোমার ওপর বেশ চটেছে। এরকমই হয়। একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। লোভের মুখ অনেক দেখেছি আমি। এমনকী যারা লোভের বিরুদ্ধে বলার জন্য বিখ্যাত,

তাদের মুখেও। তোমার মুখের সঙ্গে পৃথার আশ্চর্য মিল। লোভের ছায়া নেই। এভাবেই শেষ পর্যন্ত মিলে যায়। একদিন এসে তোমাদের সঙ্গে অনেক গল্প করব। সেদিন আমতেল দিয়ে মুড়িমাখা খাবো। পৃথাকে বোলো, শবরী এসেছিল।

শবরী চলে গেলে পরমার্থ চেয়ারের পেছন দিকে মাথা হেলিয়ে বসে রইল। ভাবার চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুই ধরতে পারল না, উদ্ধার করতে পারল না, যেটুকু সে ছুঁতে পারল তা অবিশ্বাস, তবু তার ভালো লাগল এবং হাসল। তার মনে হল, দরজা বন্ধ করে আসা দরকার।

ফিরে দেখে, চিনদিদিমা একটা মাটির প্রদীপে সলতে বসাচ্ছে। এরপর শিশি থেকে তেল ঢালবে প্রদীপে। চারপাশে প্রদীপ জ্বেলে বসে বলবে, আলো নিভিয়ে দে। হয়ত ইঁদুরের বাঘ হয়ে বেঁচে থাকার কাহিনি বলবে। কোন বনে ইঁদুর সন্ত্রাস ছড়িয়ে বাঘের ভাবমূর্তি ধরে রেখেছিল। এরকম হয়। ভান্সি বিছানার চাদর পাল্টালে আকাশ জুড়ে মেঘ করে। বর্ষার রাতে জল থেকে উঠে এসে নদী কতদিন যে পরমার্থর সঙ্গে গল্প করেছে।

আজ পরমার্থর আর বারান্দায় বসতে ইচ্ছে করল না। ঘরে ঢুকে প্রেমচন্দের 'নুনের দারোগা' গল্পটা তুলে নিল। দারোগা বংশীধর সততা ও কর্তব্যনিষ্ঠার পুরস্কার পেয়েছে। বিচারকরা কালোবাজারি পণ্ডিত অলোপীদীনের পক্ষে রায় দিয়েছেন। চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়েছেন বংশীধর। ছেলের দুর্বুদ্ধির জন্য বংশীধরের বাবা কপাল চাপড়ালেন। মা ক্ষুণ্ণ হলেন। এমন সময় অলোপীদীন বংশীধরের বাড়িতে এলেন তাঁর সম্পত্তির স্থায়ী ম্যানেজারের পদ গ্রহণের প্রস্তাব নিয়ে। ছয় হাজার টাকা বার্ষিক বেতন ছাড়াও দৈনন্দিন খরচ আলাদা। চড়বার জন্য ঘোড়া, থাকবার জন্য বাংলো, চাকর-বাকর মুফতে। আলোপীদীন বললেন, এই পদটি আপনি গ্রহণ করুন, আর এতে আপনার স্বাক্ষর করে দিন। আমি ব্রাহ্মণ, যতক্ষণ না আপনার সম্মতি পাই, আমি দরজা ছেড়ে নড়ব না। না, বংশীধর সম্মতি দেননি। ম্যানেজারির কাগজ কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলছেন। চিৎকার করে অলোপীদীনকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলছেন। তাঁর সততাকে কেনার ষড়যন্ত্রের জন্য আলোপীদীনকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করছেন। অলীকসন্ধ্যায় প্রেমচন্দের টেক্সট্ বদলে যাচ্ছে।

যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মধ্যে

পতাকা এসেছে ঢের। উজ্জ্বল উদ্দীপক যত রং প্রথম চৈত্রের এতোল-বেতোল বাতাসে উড়ছে। কাল খুব বড় রকমের ঘূর্ণি ছুটে গেছে। শৈলশহরের মতো বরফে ছেয়েছিল কয়েকটি জেলা। আজও তার রেশ হাওয়ায়। আমের ঝরা মুকুলের গন্ধ মরা নদীর খাতে কান্নার মতো ভেসে গেছে। আজ সেই কান্নার দাগ সূর্য সম্পূর্ণ দিনের কোথায় যেন লেগে, তাই বাতাস ভেজা ভেজা 'নো এন্ট্রি' লেখা টিনের চাকতির পাশে দাঁড়ানো ভারী রকমের ট্রাফিক পুলিসের ইশারায় বাসটা ডানদিকে ঘুরতেই সত্যকিঙ্কর দরবারী নেমে পড়ে। তখনই সে দেখে উজ্জ্বল উদ্দীপক রঙের পতাকা উড়ছে ঢের।

এলাকাটা সত্যকিঙ্করের অচেনা নয়। ছেলেবেলা থেকেই চেনা, তবে অচেনা হয়ে গেছে, বা যে চেনার কোনো মানে হয় না। বাসটা যে পথ দিয়ে ঘুরে গেল, তার মোড়ে রাঙাদার বাড়ি। রাধাচূড়া গাছটা আজও আছে। উল্টো ফুটপাথে ভাঙা সরকারি ছাত্রাবাস, আরও ভেঙে ভেঙে অখণ্ড ভগ্ন হয়েছে এতদিনে। 'কুকুর হইতে সাবধান' লেখা দরজার ওপারে কাঁচা হলুদ বর্ণের রাঙাদা মালকোঁচা এঁটে মুগুর ভাঁজছেন বা লম্বা করিডর ধরে হাঁটতে হাঁটতে বিবেকানন্দর বাণী চেঁচিয়ে মুখস্থ করতেন। রাঙাদার বাবা পরমাদিত্য শেঠ সবুজ সুতোর কাজ করা অরণ্য-ঘন গাউন পরে দোতলায় দাঁড়ালে পৃথিবী প্রজা হয়ে যেত। সত্যকিঙ্করের এই একটা মস্ত অসুবিধে, অসুখই বোধহয়, যেখানে সে থেকেছে, যে স্কুলে পড়েছে, যে কলেজে পড়েছে, দাদু-দিদিমা যেখানে থাকতেন, দাদুর সঙ্গে যে বাজারে সে গিয়েছে, বা ছেলেবেলার থেকে গড়িয়া নাকতলা চুঁচুড়া দেউলটিতে পা রাখলেই পুরনো সময়—উদ্বাস্তু, বাঁশবন, দিঘি, কুপির আলো, কালীঠাকুরের ক্যালেন্ডার, কাঠ চেরার গন্ধ, সুড়ঙ্গের পাঁক, ভোরের ট্রামের সুর, সাইকেল ভ্যানে সার সার বাড়ি, সহৃদয়তা, ভালোবাসা আরও কত কী কালো জামের কষের মতো এই সময়ের কথা বলাকে অস্পষ্ট করে দেয়।

সে আর না-ভাবার চেষ্টা করে শতশত পতাকার দিকে হাঁটতে থাকে। অনেকদিন পর ভেতর থেকে তাড়া পেয়েছে মিছিলে হাঁটার। অনেক মিছিল তো হল গত দশ-বিশ বছরে। বেশ কিছু মিছিল জোরজবরদস্তির, নাচার মানুষ বেঁচে থাকতে হবে বলে কখনও এদিকে ঢলেছে কখনও ওদিকে। কিছু মিছিল হয়েছে খামোকা। কিছু মিছিল অবশ্যই অর্থপূর্ণ ছিল, সেখানে প্রকৃত হৃদয়ের লোকজন হেঁটেছিল। মাঝরাতে পুলিসের কড়া নাড়ার বিরুদ্ধে,

লকআপে মৃত্যুর প্রতিবাদে। এই অর্থপূর্ণতায় অংশ নেবে ভেবে সত্যকিঙ্কর মনে মনে তৈরিও হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আসা আর হয় না। এই নিষ্ক্রিয়তার জন্য সে অনুতপ্ত হয়েছে। ভেবেছে, প্রতিবাদ সম্পর্কে আস্থাহীনতাই কি তাকে দূরে সরিয়ে রাখছে, নাকি ভেতরে-বাইরে সে এতটাই বুড়িয়েছে যে নিজের প্রতিই তার আর আস্থা নেই? এভাবে কি নিজের বেঁচে থাকাকে অর্থহীন করে দিচ্ছে না? অরিজিৎ মিত্র বলত, নিজেকে বিচ্ছিন্ন, নিঃসম্পর্কীয় করে তুই কি বাঁচতে পারবি? আজ অরিজিৎ থাকলে দেখত, সত্যকিঙ্কর এসেছে। হয়ত একথা ভেবে খুশি হত, ব্যাটা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়নি।

তার মিছিলে আসাটা কি বেশিরকম গুরুত্বপূর্ণ করে দেখছে না সত্যকিঙ্কর? সে এমন কেউ নয় যার মিছিলে উপস্থিতি একটা ঘটনা হতে পারে। সংখ্যার বাইরে কোনো ওজন নেই তার। ভিড়ের বাইরে পৃথক কোনো জায়গা নেই তার। বহু প্রতিবাদীর একজন হিসেবেই সে গণ্য। সুতরাং এত ভাবাভাবির কী আছে? তবে কি সত্যকিঙ্কর বিশেষের মান্যতা চায়? ভিড়ে থেকেও ভিড়ের থেকে আলাদা কোনো ভাবমূর্তি? মিছিলে হাঁটছি বলে কোনো গোপন গর্ব যা পরে অহমিকা ও আত্মপ্রচারের দিকে ঠেলে দেয়? মিছিলে হেঁটে মিছিলকে ধন্য করার ফিউডাল উন্নাসিকতা? সত্যকিঙ্কর প্রশ্নগুলো উড়িয়ে দিতে পারে না। কোথাও যেন সত্যের অনস্বীকার্য স্তর রয়ে গেছে। সে-ও হয়ত বিশিষ্টতা চেয়েছে মনে মনে আমি যে এসেছি দেখো, সমাদর করো, অন্যদের জানিয়ে দাও আমার উপস্থিতি, আমাকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলো, আলোচ্য করে তোলো। কিন্তু এই বিশিষ্ট হয়ে ওঠা বা ভাবমূর্তি গড়ে তোলার জন্য যে বুদ্ধিমত্তা দরকার তা তো সত্যকিঙ্করের নেই। আসলে বিখ্যাত ব্যক্তিদের নামোল্লেখ দেখে, বিখ্যাত, ব্যক্তিদের শিরোনাম হতে দেখে নিজেকে আর ইত্যাদি প্রভৃতিতে রাখতে চায়নি সত্যকিঙ্কর। এরকম একটা ব্যাখ্যা সে খুঁজে পায়। বিখ্যাত ব্যক্তিদের কাজকর্ম সম্পর্ক প্রশ্ন সংশয় তাকে ইত্যাদি প্রভৃতি থেকে দূরে রেখে একরকমের আত্ম-উপভোগ্য নিজস্বতা দিয়েছে।

নিজেকে নিয়ে অযথা ভাবার বাতিক থেকে সত্যকিঙ্কর কিছুটা রেহাই পেল বেলতলা পার্কে পৌঁছে। লোহার সেকেলে গেট ছিল এইখানে। একসঙ্গে খুব বেশি হলে দুজন করে ঢোকা বা বেরনো যেত। অর্ধবৃত্তের মধ্যে একটি পাল্লা এদিক-ওদিক টেনে-ঠেলে। বিকেলে পার্কে ঢোকার এবং সন্ধের পর পার্ক থেকে বেরনোর ভিড় হলে মানুষজন সার দিয়ে দাঁড়াত। তেমন বেশি ভিড় কখনোই হতো না, হলেও তাড়াহুড়ো ছিল না, সবার হাতেই যেন ধীরে সুস্থে চলার সময় থাকত। যাদের তর সইত না, এমন লোকের সংখ্যা বেশি নয়, তারা কয়েক পা পশ্চিমে হেঁটে রাত ৮টা পর্যন্ত অবারিত দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেত। সত্যকিঙ্করদের অবশ্য যাওয়া-আসা ছিল তিন ফুট পাঁচিলের ওপর দু-আড়াই ফুটের কুসুমলতার লোহার ঢালাইয়ের জাল ডিঙিয়ে। বাহাদুরি দেখানোর সেই তো বয়স। অস্থিরতার সেই তো শুরু। নিয়ম ভাঙার সেই তো সময়। এইখানে ছিল বিশাল কৃষ্ণচূড়া। মাঠের বিস্তারে একাই ছায়া দেবে বলে রাশি রাশি উৎসাহে ডালপালা পাতা ও ফুল ঢের উঁচু

অবধি ছড়িয়েছিল। এইখানে ধুতি আর কেড্‌স সু পরা সুবোধদা বাঁশি হাতে দাঁড়িয়ে থাকতেন সত্যকিঙ্করদের জন্য। ছেলেরা এলেই বল নিয়ে মাঠে পড়তেন। প্রথমে প্র্যাকটিস, তারপর দল গড়ে খেলা। সুবোধদা চিরদিনের রেফারি। সবুজ ঘাসের দেশে গড়িয়ে যেত বল সূর্য কৃষ্ণচূড়া সুধামাধব নীহারবিন্দু কোটালপুত্র বানরকুমার। এখন এখানে কেউ বল খেলে না। খেলা দেখে ক্রিকেট। এখন মাঠের গা আর্সেনিকে খাওয়া হাতের চেটোর মতো কদর্য করুণ। গত তিরিশ বছরে প্রভূত উন্নতি হয়েছে বলে সরকার বিজ্ঞাপনে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করে। এ মাঠে এক গাছা ঘাসও গজাতে পারেনি। কারা যেন বলে দিয়েছে, এ মাটিতে আর কোনোদিন ঘাস হবে না। এখন রাতে মাঠের ধারে ধারে আলোর নীচে মেয়েরা দাঁড়ায়, যেন তারা গারো পাহাড়ের বেদিনী, যেন তাদের চুলের ভাঁজে গোখরো গুটিয়ে আছে।

সেই মাঠ বা মাঠের উচ্ছিষ্টে উজ্জ্বল উদ্দীপক পতাকাগুলিকে রেলকলোনির গুমটির দোকানে মাল্টিন্যাশানাল কোম্পানির ভোগ্যপণ্যের মোড়কের জেল্লার মতো হল, যেন এখনই পতাকার ফাঁকে উঁকি দেবে কোনো রাই বা রানীর কম গরম মুখ, যেন কোনো পতাকা চোলির মতো উড়ে গেলে কৃষ্ণাঙ্গ এই ভূখণ্ডে শ্বেতসঙ্গিনী পা মদনঅসির মতো চকিতে খেলে যাবে, যেন সব লাল জল নীল পানি পাঁচ পাঁচ পাঁচ হেঁকে হেঁকে অ্যাংলো-গ্রামীণ হিন্দিভাষী কপট গোয়ালিনির শরীর ভিজিয়ে কৃষ্ণকথার ভারতসংস্কৃতি মনে করিয়ে দেবে, যেন কোনো ষণ্ডা পানওয়ালা 'দুবারা মৎ পুছনা' বলে গর্জে উঠবে, যেন পতাকার ঘষায় ঘষায় ফিসফিসিয়ে বলা হবে 'ঠান্ডা মৎলব', যেন.........

সত্যকিঙ্কর দরবারী সিনিক হয়ে গেছে। পজিটিভ অ্যাটিটউড না থাকলে জীবনের সত্যটা হারিয়ে যায়, হাতের মুঠোয় আসা সোনার গুঁড়ো ধুলো মনে করে ছুঁড়ে ফেলে সিনিক, বেছে নিতে জানে না সে। অরিজিৎ মিত্র বলত, এসব পালানোর অছিলা, কিন্তু তুই পালাতে পারিস না, কোথায় পালাবি?

পতাকা এসেছে ঢের, লোক বড় কম। খাঁ খাঁ লাগে। পার্কের রেলিংয়ে, বাঁশঘেরার গায়ে গায়ে, ল্যাম্পপোস্টে, মঞ্চের মাথায় ডাইনে বাঁয়ে সামনে পতাকার ঐশ্বর্য। যদি এত লোক আসত, যদি এত লোক আসে! যদি এত পতাকা সেদিন থাকত, ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে কয়েকশো তরুণ হিঙ্গন জমাদার লেন, আসগর মিস্ত্রি লেন, ঘটকপাড়া, বামুনপাড়া, পটারি রোড, রেল কলোনি, ক্রিস্টোফার রোড, বিরসুলহাট, অলিগলি ঘুরে ঘুরে স্লোগানে স্লোগানে গর্জে উঠেছিল, সে তো শুধু শূন্যে নয়, হাজার হাজার মাইল দূরের ইয়াংকিদের শোনাতে নয়, স্বদেশে যত ইয়াংকিদের উপাসক আছে, দাসানুদাস আছে, যত লম্পট লুটেরা আছে, যারা শ্রমিক মারে কৃষক মারে, পুলিস দিয়ে মানুষ মারে, যাদের প্রতিশ্রুতি প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়, যাদের মিষ্টভাষা মিথ্যাচার ছাড়া কিছু নয়, তাদের বুকে কাঁপন ধরাতে, রাষ্ট্রক্ষমতার মানেটাই বদলে দিতে চেয়েছিল সেই তরুণরা তাদের পতাকা কত কম, কোথায় পাবে, দরকারই বা কী, তবু যদি থাকত, হোক না অনুজ্জ্বল, মিছিলের মাথায় আগুন হয়ে জ্বলত।

সত্যকিঙ্কর মঞ্চে র দিকে এগিয়ে যায়। ন্যাড়া মাঠ কোথাও কোথাও কালকের বৃষ্টিতে কাদা হয়ে আছে। কাদায় ও নরম মাটিতে নানা মাপের গাড়ির চাকার ছাপ। এ মাঠে কি এখন গাড়ি চলে! ড্রাইভিং শেখানোর জন্য ব্যবহৃত হয়? হতেই পারে। কতরকমের পরিবর্তনই তো হয়েছে। ভাবা হয়েছিল এরকম, হয়ে গেছে অন্যরকম। রাশিয়ার বিখ্যাত লেখকের নামাঙ্কিত সদনে একদা সমাজবিপ্লবের তাপ পাওয়া যেত বিশ্বজোড়া সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটা স্বপ্ন প্রশ্রয় পেত, এখন সেখানে ফ্যাশন শো হয়, আরো কত কী যে হয়, যা একদিন অবক্ষয়ী সংস্কৃতি বলা হয়েছিল তারই ঝমঝমা। মঞ্চে র কাছাকাছি হতেই সত্যকিঙ্করের চোখে পড়ল পার্কের পেছনে যে সরু পথ আছে, সেখানে সার দিয়ে নামী মডেলের গাড়ি দাঁড়িয়ে। মেরা গাড়ি মেরা সপ্না-র চেয়ে ঢের বেশি স্বপ্নার্পিত, টিভি-র বিজ্ঞাপনের রোদ্দুরে উইন্ডস্ক্রিনে গাছের ডালপাতার ছায়া নিয়ে ছুটে যাওয়া, দুপুরের মরুবালি উড়িয়ে কিংবা সমুদ্রের সূর্যাস্ত জড়িয়ে উঠে আসা, দুর্গম পাহাড়ি পথে মহার্ঘ কামিনীর প্রিয়পাত্র হওয়া যত গাড়ি আছে, সবই যেন এসেছে। সবই কি এই মিটিং মিছিলের জন্য! সত্যকিঙ্কর কাকে জিজ্ঞাসা করবে?

বিমলেন্দু চট্টোপাধ্যায় সেবার কর্পোরেশনে ভোটে দাঁড়ালেন, সাহুজির লঝ্ঝর জিপটা ভাড়া করেছিলেন। সাহুজি ওই জিপটা গ্যারেজের এক কোণে ভক্তিভরে রেখে দিয়েছিল, চালাত না, ঠাকুরমশাই রোজ জিপের বনেটে চন্দনের টিপ আর মালা পরিয়ে দিত। ব্যবসার শুরু তো ওই গাড়ি দিয়ে, সিদ্ধিদাতা। বিমলেন্দুবাবু সাহুজির কাছে একটা গাড়ি চাইলেন এক মাসের জন্য, ভাড়া যত কম হয়, গরিব মানুষের দু-চার আনা চাঁদায় পার্টি চলে, গাড়ি তো বিলাসিতা, তবু ভোটের কাজে লাগে, তাই। ওই লঝ্ঝর জিপটাই বিমলেন্দুবাবুকে দিল সাহুজি; কারণ, বিমলেন্দুবাবু বেশি ভাড়া দিতে পারবে না, ভালো গাড়ি কম ভাড়ায় দিলে জানাজানি হয়ে গেলে অপোনেন্ট ক্যান্ডিডেট দশ বছরের কাইন্সিলর হুড়কো করে দেবে, কর্পোরেশনের রাস্তায় গাড়ি রেখে মেরামতি করা পুরবিধি লঙ্ঘন, বিমলেন্দুবাবুকে গাড়ি দেওয়াই তা বিচারে অন্যায়, তবু যখন-তখন বিগড়ে যাওয়া গাড়ি দিলে কাউন্সিলরকে বুঝিয়ে ঠান্ডা করা যাবে, আর বিমলেন্দুবাবুকে কোনো গাড়ি না দেওয়া এবার ঠিক হবে না, পরিবর্তনের হাওয়ার গন্ধ পেয়েছিল সাহুজি। বলেছিল, নিয়ে যান আমার সিদ্ধিদাতাকে, আপনাদের তো ঠাকুর-দেবতায় বিশ্বস নেই, আমার আছে, দেখবেন, সিদ্ধিদাতা ঠিক জিতিয়ে দেবে। দশ বছরের কাউন্সিলার প্রচারে বিদ্রূপ করেছিল, ওদের সিম্বল সাইকেল, চড়ে জিপ। ওরা কালোবাজারিদের টাকা খায়, মুখে বলে গরিব। সেই সিদ্ধিদাতা, যা সত্যকিঙ্করকে বিস্তর ঝামেলায় ফেলেছে, যখন- তখন স্টার্ট বন্ধ হয়ে অনেকটা পথ ঠেলিয়ে ছেড়েছে, বিমলেন্দু চট্টোপাধ্যায়কে বিপুল ভোটে জিতিয়ে দেয়। অবশ্য বিজয় মিছিলে বিমলেন্দুবাবু উঠলেন নতুন হুড খোলা কমান্ডারে। সাহুজি দিয়েছিল বিনা ভাড়ায়, শুভেচ্ছা অভিনন্দনস্বরূপ, আরও কয়েকটা গাড়ি এসেছিল। তবে বিমলেন্দুবাবুর অপোনেন্টের বিজয়

মিছিলে শেভ্রলে, মরিস, অস্টিন ও আরও কত প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের ভিনটেজ কার র‍্যালি লেগে যেত, তার ধারে কাছে নয়। যেমন আজকের বিশ্বায়ন যুগের কার র‍্যালির ধারে কাছে নয় সেদিন। এত গাড়িতে কারা এল, ওই কটা লোক, নাকি শুধু পতাকা? সত্যকিঙ্করের মনে হল, পতাকা কি আজ মোড়কের কাজ করে? চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার জন্য, বাকহীন করে দেওয়ার জন্য, সম্মোহিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়? সে স্মৃতি থেকে ছবি তুলে আনতে থাকে। ভোটের জনসভা, ভোটের প্রচার, ভোটকালীন পথঘাট, ব্রিগেডে সভা, ময়দানে সভা, প্রতিবাদ মিছিল, বিজয় মিছিল। পতাকা দিয়ে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ছবি। সার্কাসের তাঁবু ঘিরে পতাকা। খেলার মাঠের গ্যালারিতে পতাকা। ধর্মীয় উৎসবে পতাকা। ধর্মীয় শোভাযাত্রায় পতাকা। পতাকা কি অন্তঃসারশূন্যতা ঢাকা দিতে? তাই এত বেশি লাগে? নাকি ক্ষত চাপা দিতে? যে ক্ষত গোটা শরীর ছড়িয়ে মৃত্যু ত্বরান্বিত করেছে। সে শরীরের অস্তিত্ব না থাকলেও তা জানা যাবে না। সভ্যকে লুকিয়ে রাখবে পতাকা। অনতিদূরে কোনো সুন্দর সকালে বা সন্ধ্যায় কোনো কিছুই না থাকলেও, স্বপ্ন সংকল্প প্রত্যয় নিষ্ঠা সততা সুস্থতা পতাকা বলবে, আমি তো আমি, আমি আছি, আমি থাকলে আর কিছু লাগে না। পতাকার মৃত্যু নেই। সত্যকিঙ্কর দরবারীর মনে পড়ে, পতাকাকে একদিন তারা নিশান বলত। আজ আর বলা যায় না। নিশানের অন্তর্দীপ্তি সরে গেছে পতাকা থেকে।

মাইকের ঘোষণা সত্যকিঙ্করকে আবোল-তাবোল ভাবনা থেকে মুক্তি দিল। ঘোষিত হল : বন্ধুগণ, আজ বিশ্বশান্তি আক্রান্ত। যুদ্ধবাজরা দাঁত নখ বের করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ক্ষমতার মদে মত্ত এইসব দুরাত্মা সভ্যতার শত্রু। এদের লোভ, লোভ, এদের দম্ভ, এদের হুংকার পৃথিবীকে বিপন্ন করেছে। এরা চায় বিশ্বের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হতে, এরা চায় বিশ্বের সব সম্পদ কুক্ষিগত করতে, এরা চায় অস্ত্রের সন্ত্রাস দিয়ে বিশ্বশাসন করতে, এরা চায় মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করতে.....

এ-মুখো ও-মুখো লাগানো বহুতর চোং মারফত কথাগুলো দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ে। সত্যকিঙ্কর দরবারী মঞ্চে কাউকে দেখতে পায় না। পতাকার আড়ালে থাকতে পারে ভেবে সে এদিক সেদিক সরে সরে শূন্য মঞ্চই দেখে। কাছাকাছিও কেউ নেই।

পৃথিবী আর যুদ্ধ চায় না। যুদ্ধ তার অনেক ক্ষতি করেছে। স্বামীহারা বধূ, সন্তানহারা মা, পিতৃহীন সন্তান, স্বজনহীন মানুষ........

সত্যকিঙ্কর দরবারী অনুমান করে, মঞ্চের পেছনে কেউ, হয়ত সাধারণ কর্মী বা আঞ্চলিক নেতা আজকের সমাবেশের ভূমিকা করছে। সে পেছনে পৌঁছে কাউকে পায় না। মঞ্চটাকে পাক খায়, না নেই।

তাই তো কবি বলেছেন, যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু ....

বিস্মিত হওয়ারই কথা সত্যকিঙ্কের দরবারীর। সে আরও বিস্মিত হয়, কিছুক্ষণ আগেও কাছে-দূরে কয়েকজনকে দেখা যাচ্ছিল, এখন তারাও নেই।

বন্ধুগণ, এই হামলাবাজির বিরুদ্ধে, চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধের বিরুদ্ধে, স্বাধীনতা হরণের চক্রান্তের বিরুদ্ধে ......

সত্যকিঙ্কর দরবারী বস্তুত একা। মাঠে শুধু পতাকা আর পতাকা, বসন্তের ভেজা ভেজা বাতাসে উড়ছে। সত্যকিঙ্করের মজা লাগে। সে দক্ষিণ দিকে যায়, দক্ষিণ থেকে পশ্চিম, পশ্চিম থেকে সরে উঁচু মঞ্চের নীচে শাল খুঁটি আর বাঁশের কাঠামো দেখে। কোথাও কেউ নেই। পার্ক ইউনিয়নের ক্লাবঘরের সামনে কিছুক্ষণ আগেও কয়েকজনকে দেখা গেছে। কাঠবাদামের নীচে চেয়ারে বসেছিল দু-চার জন। চেয়ারগুলো এখন খালি। বাঁশের গায়ে পোস্টার বাঁধছিল যারা, তারাও নেই। ভি আই পি-দের পথ নিরাপদ রাখতে যারা বসেছিল, তারাও নেই।

বন্ধুগণ, আজ এই যুদ্ধবিরোধী সভায় আমরা সমবেত কণ্ঠে ঘোষণা করব, তেলের জন্য....

সহসা চারদিক থেকে ছুটে আসা উত্তাল উল্লাসতরঙ্গে শূন্যমধ্যে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হল, তরঙ্গসমূহের সংঘর্ষে বিকট শব্দ বিস্ফোরিত হতে থাকল, মা-কাকের আর্তনাদ প্রাচীন বৃক্ষের আকাশে উড়তে থাকল অজস্র কাক, উল্লাসের ঘূর্ণিস্রোতে হারিয়ে গেল সব ভাষা, 'কাম অন ইন্ডিয়া, দুনিয়া কর লো মুঠ্‌ঠি মে'-র জান্তব হাত সব কণ্ঠ টিপে ধরল।

এরপর যা হল, সত্যকিঙ্কর দরবারী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে : পশ্চিম থেকে দল বেঁধে লোক আসছে, মাঠটা এদিকে বেশি বিস্তৃত বলে জনস্রোতের চেহারা নিয়েছে, উত্তরদিক হতে অনেক সরু ধারা রেলিং টপকে মাঠে প্রবাহ হয়ে যাচ্ছে, পুবদিকের বড় গেট দিয়ে পরপর কয়েকটা মিছিল এল, মাইকে গান মাঝপথে থেমে গেল, আমাদের সভা এখনই শুরু হচ্ছে, এখন থেকে আমরা মিছিল করে যাব তেমাথায়, মিছিলের পুরোভাগে হাঁটব, দক্ষিণের ফটকে অসম্ভব দ্রুততায় হাজির হতে লাগলেন বিশিষ্টরা, দ্রুত পায়ে তাঁরা মঞ্চের দিকে যেতে থাকলেন, ফাস্ট ফরোয়ার্ডের বোতাম কে যেন টিপে দিয়েছে, অনিবার্য কারণে আমাদের সভা আজ সংক্ষিপ্ত করতে হচ্ছে, হাজার হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতাকে যারা বোমা মেরে ধবংস করতে চায় তারা কখনোই সভ্য বলে গণ্য হতে পারে না, অন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব যারা স্বীকার করে না তারা সভ্যতার সন্তান নয়, হাজার হাজার নারী শিশুকে হত্যা করে যারা ন্যায়ের কথা বলে তারা শয়তান, নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ মেটাতে যারা শান্তিপ্রিয় মানুষের ঘাড়ে বারবার যুদ্ধ চাপিয়ে দেয় তাদের ক্ষমা করে না ইতিহাস, মিছিল শুরু হয়, বন্ধুগণকে অনুরোধ করা হচ্ছে স্বেচ্ছাসেবকদের নির্দেশ মেনে চলতে, দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিস অফিসারকে বলা হচ্ছে পথ পরিষ্কার রাখতে......

কথায় কথায় উদার অর্থনীতিকে গাল-পড়া এবং কাজে উদার অর্থনীতির উপদেষ্টাদের শরণ নেওয়া ভদ্রলোক পুরোভাগেই আছেন; আছেন পুলিস-মিলিটারি লাগিয়ে চা-বাগান উচ্ছেদ করে প্রমোটারদের হাতে জমি সম্পর্ককারী ভদ্রলোক; পাশেই আছেন একদা

স্বজনপোষণের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষণ দেওয়া অধুনা ডবল স্বজনপেষণকারী ভদ্রলোকগণ ধর্ষণের ঘটনায় যিনি ধর্ষিতার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি আছেন; একটি ধর্ষণের ঘটনায় প্রবল প্রতিবাদী হয়ে যিনি আরেকটি ধর্ষণের ঘটনায় উদাসীন হয়ে যান তিনিও হাঁটছেন; যাঁর নাম প্রায়শ দুষ্কৃতীদের আশ্রয়দাতা হিসেবে উঠে আসে তিনি কাপ্তানের ভঙ্গিতে হাঁটছেন; মানুষের জন্য কৃচ্ছ্রসাধনের ব্যবস্থা করে নিজেরা রসে-বশে থাকা লোকজন প্রচুর এসেছেন; বিপদে না পড়লে যাঁরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন না, তাঁদের হাতে বিপন্ন গণতন্ত্রের পোস্টার; দীর্ঘকাল বন্ধ ও চিরতরে বন্ধ হয়ে যাওয়া কল-কারখানার সফল শ্রমিক হাঁটছেন; আঞ্চলিক কমিটিগুলি পৃথক পৃথক শক্তি পরিচয়ে চলেছে; খড়গপুর, শিলিগুড়ি, ঘোকসাডাঙা, ধানতলা, হলদিবাড়ি, দমদম, বারাসত, বনগাঁ চলেছে; যুদ্ধের ধবংসের প্রতিরোধবাহিনীর সশস্ত্র মহিলাকর্মীর বিশাল ছবি নিয়ে, 'ওয়র ইজ টেররিজম' 'ওয়ার ইজ ক্রাইম' ইত্যাদি লেখা বিশাল ব্যানার নিয়ে গাড়ির কনভয় চলেছে....

সত্যকিঙ্কর দরবারী পিছিয়ে পড়ছিল। হয়তো ইচ্ছে করেই পিছিয়ে পড়ছিল, নিজের জায়গা পাচ্ছিল না বলে। সে তেমাথার কিছুটা আগে থেমে গেল। উল্টোদিকে হাঁটতে থাকল এই ভেবে যে, হয়ত এখন ওদিকে গাড়ি চলতে শুরু করেছে। তার অনুমান ভুল। গাড়ি তখনও ঘুরপথে চলেছে। ফলে তাকে অনেকটা পথ হাঁটতে হল। হাঁটতে হাঁটতে মোড়ে মোড়ে সে দেখল শনিপুজোর মতো ক্রিকেটপুজোর আয়োজন। ছবি, সিঁদুর, চন্দন, ধুপ, মালা, বালি, ঠাণ্ডা জলের বোতল, এবং যজ্ঞের অবশেষ— আত্মবিশ্বাসের ছাই, পোড়া গন্ধ।

সত্যকিঙ্কর হাঁটতে থাকল। হাঁটতে তার ভালো লাগল। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎই সে একটা যুদ্ধ বিরোধী সভা পেয়ে যায়। সভা বললে বাড়িয়ে বলা হবে। দুটো চোং নিয়ে দশ-বারো জন জড়ো হয়েছেন। দুটো চেয়ারে দুজন বসে। যিনি বলছেন, তিনি অপেক্ষাকৃত তরুণ। বাকিরা এদিক-ওদিক দাঁড়িয়ে। যাঁরা উদ্যোক্তা, মূলত তাঁরাই শ্রোতা। পথ চলতি মানুষের দু-একজন খানিকক্ষণের জন্য দাঁড়াচ্ছেন। অন্যরা হয়ত চলতে চলতে শুনছেন কিংবা শোনা অর্থহীন মনে করছেন। তরুণ বক্তা বলছেন যুদ্ধের সঙ্গে বিশ্বায়নের সম্পর্ক, অর্থনৈতিক ও সামরিক সাম্রাজ্যবাদের পরস্পর পরিপূরকতা, মৌলবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ, সন্ত্রাস ও সাম্রাজ্যবাদ, সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ, বিনোদনের বিশ্বায়ন, পণ্যসংস্কৃতি, ক্রিকেট, ঠান্ডা জল, গাড়ি, নারী, সুরা, নেশা, ধর্ম, পৃথিবীকে মধ্যযুগের রথে চড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে.....

সত্যকিঙ্কর দেখে সভার পাশে একটা ছোট ছেলে মাটিতে কাগজ রেখে কিছু আঁকছে। এখন বসে আঁকার ফলে গাছ পাহাড় নদী সূর্য বেশ আঁকে। চোখে টানা রং লাগায়। এই ছেলেটিও সেরকমই হবে। তবু সত্যকিঙ্কর আগ্রহী হয়, ছেলেটির পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। দেখে সে স্তম্ভিত। এই বয়সের ছেলেরা এখন হুমড়ি খেয়ে হ্যারি পটার পড়ে, পড়ার টেবিলে

ডাইনোসর সাজিয়ে রাখে, রিমোটে কমান্ডো চালায়, টয়-স্টেন নিয়ে মানুষ মারা খেলে, লাথি মেরে জানলার কাঁচ ভেঙে দেয়, খাটের ছত্রিতে দড়ি বেঁধে ঝুলে পড়তে গিয়ে মরে যায়, বাবার কেন গাড়ি নেই বলে বাড়িতে উৎপাত করে।

তুমি কার ছবি আঁকছো, জানো?

ছেলেটি জবাব দেয়, অর্নেস্টো চে গ্যেভারা।

কে তোমাকে আঁকতে বলেছে?

নিজে আঁকছি।

গ্যেভারার ছবি কোথায় দেখলে?

টিভিতে। একটা মিছিলে চে গ্যেভারার পোস্টার ছিল।

সেই ছবি মনে রেখেছ তুমি?

হ্যাঁ।

কেন?

মনে আছে।

সত্যকিঙ্কর দরবারী বিশ্বাস করতে পারে না এই ঘটনাকে, নিজের চোখকে। এ তো সেই সাবেক বামপন্থী গপ্পো! লাল সূর্য উঠিতেছে, হাজার হাজার মশাল জ্বলিতেছে। সত্যকিঙ্কর আপনমনে হাসে। নিজেকে ঠকানোর ব্যাপারটা আজও তার গেল না। এমন কী হতে পারে, চে গ্যেভারার ছবিও তো পণ্য হয়ে গেছে, জামা গেঞ্জিতে ছেপে বিক্রি হয়, ধান্দাবাজ লোকরাও আজকাল বিশেষ অকেশনে গ্যেভারার মুখ ছাপা গেঞ্জি পরে, হয়ত সেরকমই? সে ছেলেটিকে আর প্রশ্ন করতে চায় না। ভাবতে চায়, ছেলেটি সত্য বলছে। সে এই ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে চায় না। বিশ্বাস করতে চায়, এটাই ঘটছে।

বাসনার মতো ভালোবাসা

এসময় পথের কুকুরের কুকুরীর গায়ে খুব পোকা হয়। ওরা লাতিন অ্যামপারস্যান্ড চিহ্নের মতো দুমড়ে বসে বুক পেট গলা পিঠের লাগোয়া অঞ্চল পেছনের পায়ের নখ দিয়ে চুলকোয়, আঁচড়ায়, পোকা ঝাড়ে আর ঝাড়তে ঝাড়তে যন্ত্রণা ও আরামের মিশ্র মাদকতায় বেঁকে আধশোয়া হয়ে সেতারের দ্রুতলয় বাদনের ক্ষিপ্রতায় শরীরের দুরূহ প্রান্তগুলো ছুঁতে থাকে এবং যা ছুঁতে পারে না তার জন্য মাটির গায়ে গা ঘষে। আজ সদ্য ফাল্গুনের শীতমাখা বাতাসে সেভাবেই ওরা পোকা ঝাড়ছে, লোম ও পোকা বাতাসে উড়ে উড়ে ছড়াচ্ছে। চাঁদটাকেও মনে হয় একই কাজ করছে এবং তার গা পথের কুকুরের কুকুরীর মতোই রোয়াঁ-ওঠা। এ সময় আমের বোল হয়। এবার খুব হয়েছে। সাতাশতম বা তেত্রিশতম বা ছেচল্লিশতম গর্ভের সাময়িক দেমাকে ফুলে নষ্টগর্ভের সমাজে দাঁড়িয়ে আছে আম গাছটা। এ সময় গাছের নীচে দাঁড়ালে মধু ঝরে। এসময় সদ্যোজাত কুকুরশাবকরা কুঁই কুঁই শব্দে টলমল পায়ে ঘুরে বেড়ায় আর গাড়ির চাপায় চেপ্টে বা ঈশ্বরের করুণায় শুকিয়ে পটাপট মরে যায়। তাদের মায়েরা স্তনমালা ঝুলিয়ে নর্দমায় ডাস্টবিনে ছোটাছুটি ঝগড়াঝাটি করে। আর ঘুমের মধ্যে তাদের কৃষ্ণ স্তনবৃন্ত থেকে পৃথিবীর বুকে চুঁইয়ে পড়ে ভোরের মতো দু-চার ফোঁটা দুধ।

এসব বিহানের তিরিশ বছরেরও বেশি চেনা। দ্বিতীয় দফায় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে উদ্বাস্তু হওয়া তার বাবা মা পুব বাংলার জল ও গাছের মতো ঠান্ডা গন্ধ পেয়ে এইখানে আশ্রয় নিয়েছিল। ভেবেছিল, তৃতীয় দফায় উৎখাত হওয়ার আগে শরীরের চারপাশে দরমার ঘের ও মাথার উপর কয়েকটা টালি থাক। পালাতে পালাতে, পুড়তে পুড়তে বিহান দেশোদ্ধারের চক্কর থেকে ছিটকে ভাদ্রের বিকেলে ঠান্ডা গন্ধের এইখানে পৌঁছে গেল। তখন সে যুবক হয়েছে। তাদের অন্য কোথাও যেতে হয়নি, যাওয়া হয়নি আর। সেই ঠান্ডা গন্ধ এখন নেই। জলা বাগান নিকেশ করে উন্নয়ন মানে জমি-বাড়ির উদোম ধান্দা হচ্ছে। চারপাশ দৃশ্যত অনেকটাই পাল্টেছে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তিরিশ বছর কিংবা আরও আগেকার দিনগুলি যেন আছেই। নন্দীদের রাজবাড়ি এখন দু-ভাই ভাগ করে অনুষ্ঠানে খাটায়। বিয়ে হয়, শুটিং হয়, নাচগানও হয়। আজ ছোট ভাইয়ের ভাগের বাড়িতে বিয়ে ছিল। রঙিন আলোর প্রজাপতিটা এখনও নেভেনি। দোতলায় এরিকা পামের বাগানে ফ্যাসফেসে নীল আলোয় দুটো মাথা

ও ধোঁয়া দেখা গেল। গুরুভোজের গন্ধে ভারী বাতাসে কোনো মেয়ের কপট কাতরতা শোনা গেল। ফটকের বাইরে মামুলি মোটরগাড়ির ভেতর মশার ধূপ জ্বেলে ঘুমোচ্ছে ড্রাইভার। আরেকটা গাড়ি ফুলটুসি, জানালা-কপাট বন্ধ। নন্দীবাড়ির পাঁচিল ঘেঁষে পথটা, বেশি দিন আগে নয়, মাটির ছিল, চওড়া ছিল, একপাশে এলোমেলো গাছ ছিল। এখন পাষাণী হয়েছে, সবটাই। রোজ এক পথ ধরে বিহানকে বাড়ি ফিরতে হয়, তার ভীষণ খারাপ লাগে, প্রতিদিনই একটা প্রতিরোধ তৈরি হয় ভেতরে ভেতরে, অসহায়তা দিয়ে সেটা ভাঙতে ভাঙতে সে ফেরে, যেমন সে আজ ফিরছে, অন্য কোনো পথ নেই। রোজ তার বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করে না, কিন্তু কোথায় যাবে, জায়গা নেই, আছে কি, কোথাও কোথাও গিয়ে চেষ্টা করেছে কয়েকবার, তার চেয়ে বাড়ি ভালো, নিজের কাছে ফেরা যায়।

শেষ মোড়ে সে দেখল, পাঁচটি শাবক নিয়ে শুয়ে আছে এক কুকুরী প্রসন্নময়ী। পায়ের শব্দ শুনে পথচারীকে একবার মাথা তুলে দেখে নামিয়ে নিল। কিন্তু একটি শাবক, নেহাৎই দুধের শিশু, মাতৃস্তনের ঘ্রাণ থেকে মুখ ঘুরিয়ে তার খুদে শরীরের সাধ্যানুসারে চিৎকার শুরু করল। এই শাবকটি তুলনামূলকভাবে, তার ভাইবোনের চেয়ে স্বাস্থ্যবান। বিহান এরকম আগেও দেখেছে। এই স্বাস্থ্যবানরাই মস্তানি করে, অন্য ভাইবোনের ভাগ থেকে মায়ের দুধ কেড়ে শক্তিমান হয়, কারও দেওয়া খাবারে ভাইবোনের ভাগ কেড়ে নেয়, ঠেলে গুঁতিয়ে খাবারের মাঝখানে ঢুকে পড়ে, দাঁত খিঁচিয়ে ভাইবোনকে ভয় দেখায়, তেমন হলে কামড়ে দেয়। মানুষের ভাষা জানলে এই শক্তিমানরাই বড় হয়ে সভায়, লেখায় দীন-দুঃখী ভাইবোনদের সমস্যা ও উত্তরণের কথা গুছিয়ে জানাত। সেই শক্তিমানটি দু-চার পা এগিয়ে সাধ্যানুসারে এখনও চেঁচাচ্ছে। এসময় ওরা চেঁচায়। ভাবতে ভাবতে বিহান মনে মনে হাসতে হাসতে দেখে, বাড়ির দরজায় কবেকার সেই নারী।

দুই

'শ্যামলী, তোমার মুখ সেকালের শক্তির মতন' বা 'সবিতা, মানুষজন্ম আমরা পেয়েছি মনে হয় কোনো এক বসন্তের রাতে' বা 'সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ বিকেলের নক্ষত্রের কাছে' এইসব কাটা কবিতায় আলোড়িত বিহান তখন জলাজমি ছায়াজমি মায়াজমির ঠান্ডা গন্ধে নিজের সুবর্ণভূমি খুঁজে বেড়ায়, খণ্ডকেই ভেবে নেয় পূর্ণতা; মা বলেন, চাকরি-বাকরি খোঁজ, আর কদিন ঘরে বসে কাটাবি : বাবা মা-কে বলেন, ওটাকে এখনও টানতে হবে, কিছু একটা করতে বলো; মা বলেন, সবাই কিছু না কিছু করে নিচ্ছে, তোর কপালেই জোটে না; বাবা বলেন, আমি আর পারি না, বিছানা নিলে কে দেখবে; হ্যারিকেনের আলোয় গোলমরিচের গুঁড়ো ছড়ানো চালভাজা চিবোতে চিবোতে কান গরম হয়ে ওঠে। ছিটকে বাইরে চলে যায়, কোথায় যাবে, হাত-পা ভারী হয়ে আসে, হাঁটার শক্তিও হারিয়ে যেতে থাকে, সে এতটাই অকিঞ্চিৎকর যে তার কোথাও অনুরোধ আবেদন দাবি জানাবার জায়গা নেই, কারও কাছে তার কিছু চাওয়ার নেই, কারও কাছে কিছু পাওয়ার নেই, কাউকে কিছু দেওয়ার নেই,

নিজেকে সে এতটাই অপদার্থ করেছে যে তার বাঁচাটাই অর্থহীন হয়ে গেছে, তার যে কিছু যোগ্যতা আছে সেটা প্রমাণ করতে না পারাটা অপদার্থতা ছাড়া আর কী, সে ভালো নয় এবং সে খারাপও নয়, এরকম ছেলের আত্মমর্যাদা মানায় না, মেরুদণ্ড মানায় না, এরকম ছেলের না বাঁচা বাবা-মার পক্ষে স্বস্তিদায়ক; মাথার কাছে দাঁড়িয়ে মা ডাকেন, বিহু খেয়ে নে, অনেক রাত হল, আমাকে আবার ভোরে উঠতে হবে, বাবার ওপর রাগ করিস না, উনি সবসময় তোর কথা ভাবেন, তোর কিছু হচ্ছে না বলে কষ্ট পান; দেশোদ্ধারের দিনগুলির ব্যর্থতার ভেতর থেকে একটা কান্না তার বুকের ভেতর চাপা বেদনায় জমাট বাঁধে; ছাতিম শিরীষ পলাশ হরিতকির অন্ধকারে নক্ষত্র আরও উজ্জ্বল হলে, স্তব্ধতা আরও গূঢ় হলে বিহান বৃহত্তর অন্ধকারের তীরে দাঁড়ায়।

এ সময় এসেছিল রানি। রানি রায়চৌধুরি। বাঁশবাগান সাফ করে সলিসিটর বি.কে. রায়চৌধুরি যে জাহাজবাড়ি বানিয়েছে, সে বাড়ির মেয়ে। ইংরেজি নিয়ে পড়ে বোধহয়। বাস থেকে নেমে শেষ বিকেলের আলোয় পাখি-ডাকা বাতাসে ছায়ামাখা মাটিতে অহংকারী শরীর-রেখায় ওকে হাঁটতে দেখেছে বিহান, কখনও দেখেছে কোমর ছাড়িয়ে দুলছে লম্বা বেণী, কখনও বুক ছুঁয়ে 'এঁসেজ অন শেক্সপিয়র', তার ওপর দীর্ঘ গ্রীবা, তার ওপর পাখির নীড়ের মতো চোখ।

এক সকালে কী কারণে প্রকৃত অকারণে রানি এসে দাঁড়াল বিহানদের উঠোনে। বিহান তখন গুঁড়ো মাজন আঙুল দিয়ে ঘষতে ঘষতে ঠোঁট চিবুক মাখামাখি করে ফেলেছিল। খালি গা। এই সার্বভৌমত্বে এর আগে কেউ ঢুকে পড়লেও যা ক্ষুণ্ণ হয়নি, রানির আবির্ভাব তা নাড়িয়ে দিল। বিহান কলতলায় পালাল। ঘর থেকে সবেধন চেয়ারখানি উঠোনে রেখে মা বিহানকে জামা পৌঁছে দিলেন কিছু না বলতেই। মা কী ভালো বোঝেন। হঠাৎ ভীষণভাবে মনে হল পৃথিবীটা খালি গায়ে থাকার নয়। যাদের খালি গায়ে থাকতে হয়, তাদের মধ্যে বিহান পড়ে না। তার অবস্থানটা এমনই যে, এখানে পোশাকহীনতা নিজের এবং অন্যেরও অসম্মান। রানির গলা শোনা গেল, আবার কষ্ট করে চেয়ার টেনে আনলেন কেন? আমি ঘরেই বসতাম। মা-র জবাব শোনা গেল, ঘরের যা অবস্থা। বিছানা তোলা হয়নি। চারদিক থুবথুব হয়ে আছে। জানালাগুলোও খোলা হয়নি। অর্থাৎ মা-ও কুণ্ঠিত, রানিকে আগোছালো ঘরে বসানো যায় না। মা কি রানি সম্পর্কে জানে? না জানলেও, অত রূপবতীকে অনাদরে রাখা যায় না।

'এটা কি বিহান বসুর বাড়ি ' বলে রানি যখন দরজায় দাঁড়াল, টগর কাঞ্চন অস্ফুট গোলাপ উন্নত করবী ঝুলন্ত তেলাকুচ পুলকিত ঘৃতকুমারীও মনোযোগী হয়েছিল। বিহান কলঘরে পালাতেই মা জবাব নিয়ে এগিয়ে যান, হ্যাঁ। রানি বলেছিল, আমি রানি রায়চৌধুরি। এখানেই থাকি। বিহান কি আছেন? এরপরই চেয়ার বের করে দিলেন মা, বোসো। আমি বিহানের মা। বিহু সবে ঘুম থেকে উঠেছে। বোসো। গতকালের ইস্ত্রি-ভাঙা জামাটা এনে দিলেন মা। রানির সামনে তাহলে ভালো জামা পরতে হয়! তাঁর ছেলের কাছে সুন্দরী

তরুণী আসায় মা কি বিচলিত? মা কি গর্বিত? বিহুর শখ-বাসনা অনুমান করে তিনি কি আশ্বস্ত? ছেলে তাহলে এতটা হাঁদাহাবা জরদ্গবা নয়, সুখের সন্ধি জানে। মা কিন্তু আগ বাড়িয়ে কথা বলছেন না, আদিখ্যেতা নেই। রানি বলল, এত গাছ। আপনিই যত্ন করেন? মা বললেন, যত্ন করতে হয় না। নিজেদের খেয়ালেই থাকে। রানি বলল, মেসোমশাই বেরিয়ে গেছেন? মা বলল, বাজারে গেছেন। রানি বলল, ওই যে বেয়ে উঠেছে ওটা কি গাছ? মা বললেন, চালকুমড়ো। বিহানের আত্মমর্যাদার ব্যাধিটা কি মা-রই উত্তরাধিকার? কিন্তু পায়জামাটা যে নোংরা, তার ওপর একটু দামি ও চকচকে জামাটা কি বেমানান হবে না? কলতলার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে বিহান। ভেজা হাত মাথায় বুলিয়ে চুলগুলো ভদ্রস্থ করতে করতে, বুকের ঢিপ্‌ঢিপানি চাপা দিয়ে সে বলে, আপনি কিছু বলবেন? রানিকে একবার দেখে সে চোখ কোথায় রাখবে বুঝে উঠতে পারে না। রানি বলে, সুরঞ্জনা প্রায়ই আপনার কথা বলে। বিহান জিজ্ঞাসা করে, সুরঞ্জনা কে? রানি বলে, সুরঞ্জনাকে চিনতে পারছেন না? গোলপার্কে থাকে। ওর দাদা দীপাঞ্জন আপনার বন্ধু। বিহান আগেই চিনতে পেরেছিল, ফট্ করে চিনে ফেলাটা দুর্বলতার পরিচয় হবে কিনা বুঝতে না পেরে অচেনার ভান করেছিল, কিন্তু এরপর ভানটা রাখতে পারেনি।

গল্প জমে। আপনি এ পাড়ায় থাকেন তা সুরঞ্জনা না বললে জানতেই পারতাম না। এখানে এত পাড়াগাঁ, আমি কথা বলার লোকই পাই না। কাঁহাতক বই পড়া যায়, গান শোনা যায়। মাঝে মাঝে চলে আসব। আপনিও আসবেন আমাদের বাড়িতে। মাসিমা কত গাছ করেছেন। আপনার নানা বিষয়ে পড়াশোনা নিয়ে সুরঞ্জনা তো উচ্ছ্বসিত। আপনার ভাবশিষ্যা হয়ে গেছে। ডেসডিমোনা ওর প্রিয় চরিত্র। আমার একেবারে ভালো লাগে না। আমাদের তর্ক হয়। সুরঞ্জনা বলে, বিহানদা থাকলে ঠিক বুঝিয়ে দিত।

রানি অনেক বেশি সুন্দর, বাসস্ট্যান্ডে বা পথে পেছন থেকে খোলা বা মুখোমুখি আড়চোখে বিহান যা দেখেছে, তার চেয়ে ঢের বেশি। সে চোখ রাখার জায়গা পাচ্ছিল না, রাখলেও নিজেরই ধাক্কায় ছিটকে পড়ছিল। এ অবস্থা থেকে রেহাই পেতে সে যেন সুরঞ্জনায় নিবিষ্ট হল। 'সুরঞ্জনা, আজো তুমি আমাদের পৃথিবীতে আছ; পৃথিবীর বয়সিনী তুমি এক মেয়ের মতন; ...' এরকম দু-চারটি পংক্তি ঘুরে ঘুরে একদিন সে মনে মনে খেলেছে সুরঞ্জনার সঙ্গে। সে কথা বলা হয়নি, বলা যায় না।

মা বললেন, চা খাবে? রানি জবাব দিল, না মাসিমা। চা আমি খেতে পারি না। কষ্ট হয়। বিহান রানির চোখে চোখ রাখে। রানি বলে, সত্যি।

এই মেয়ে একদিন তাকে বলবে, আমরা যেখানে থাকতাম, সে বাড়িতে কোটি কোটি আরশোলা ছিল। আরশোলার কথা মনে পড়লে আমি খেতেই পারতাম না। কেন এত আরশোলা ও বাড়িতে বলো তো? ওখানেই নাকি সভ্যতার সূত্রপাত। নদীর কাছে মানুষ ঘর বেঁধেছে, শস্য ফলিয়েছে, স্নেহ প্রেম প্রীতি এইসব ঘরে তুলেছে। আরশোলা মানুষের সঙ্গ ভালোবাসে. উচ্ছিষ্ট ভালোবাসে। এই মেয়ে একদিন নদীর পাড়ে তাদের পুরনো বাড়ির

ছাদে মাস্তুলের ছায়া, মাটির নৌকায় কাঁখের দেশোয়ালি, দুপুরের চড়ুই, জলের ভেতর তরল বারুদের ভিড় দেখাবে।

বাবা ঢুকে রানিকে দেখে অবাক, ঘামে ভেজা পাঞ্জাবির নীচে তাঁর স্বাস্থ্য টানটান করে বললেন, তুমি তো সলিসিটর বাড়ির মেয়ে। কী নাম? এরপর বাবা কী কী বলবেন অনুমান করে বিহান রানিকে তাড়া দেয়, চলুন, আপনাকে এগিয়ে দিই। বিহান শুনল বাবা বলছেন, আমাকে ফেকলু বানালো, দেখলে! বিহান তখনও পড়েনি : 'একবার নক্ষত্রের পানে চেয়ে — একবার বেদনার পানে / অনেক কবিতা লিখে চ'লে গেল যুবকের দল;/ পৃথিবীর পথে পথে সুন্দরীরা মূর্খ সসম্মানে / শুনিল আধেক কথা; — এইসব বধির নিশ্চল/ সোনার পিত্তলমূর্তি; তবু আহা ইহাদেরি কানে / অনেক ঐশ্বর্য ঢেলে চলে গেল যুবকের দল।'

তিন

এখনও তার চোখে নক্ষত্রের বিভাচূর্ণ, আমের বোলের গন্ধের মতো পুনরুত্থিত শরীরে গ্রীষ্মের অরণ্যে বাতাসে ছেঁড়া ছেঁড়া জ্যোৎস্নার মতো আলো এখনও।

বিহান বলল, জানালা খুলে দিই?

রানি বলল, থাক।

বিহানের মনে হল ঘুরে ঘুরে বাড়ি ফেরা এতদিনে যেন সফল হয়েছে।

বিহান বলল, বারান্দায় দাঁড়াবে?

রানি বলল, আকাশ নেই। তার চেয়ে টি ভি খুলে দাও।

বিহান জিজ্ঞাসা করল, বর কোথায়?

রানি জবাব দিল, সমুদ্রে।

বিহান টি ভি অন করতেই আছড়ে পড়ল ঢেউ, ফেনা আর গর্জন আর যতদূর চোখ যায় নিরাময়ের মতো আকাশ, সাদা মেঘ, লম্বা ডানার পাখি।

রানি জিজ্ঞাসা করল, বউ কী করছে?

বিহান জানাল, ভালো আছে।

রানি বলল, চটি নীচে রেখে এসেছি।

বিহান বলল, থাক। কিছু হবে না।

রানি হাসল। বিহান হাসল। ঢেউয়ে ভিজে যারা অবয়ব হয়েছে, তারা হাসল।

রানি বলল, অনেক পাল্টে গিয়েছ।

বিহান বলল, অনেকটাই।

টি ভি-র ছবি হল বরফ-ঢাকা শহরের ঘরবাড়ি। গরম পোশাকে মোড়া দুই পুরুষ-নারী বাড়িতে পৌঁছল। তাদের জন্য জ্বলছে ফায়ার প্লেস। পুরুষটি কোনো কারণে উত্তেজিত। সে সেলার খুলে বোতল বের করল।

রানি জিজ্ঞাসা করল, বরফ ভালো লাগে তোমার?

বিহান বলল, কী আর করা যাবে।

রানি বলল, বরফ পড়ার গল্প ভালো লাগে! একবার বলে আমি ফার্স্ট হয়েছিলাম।

বিহান বলল, তুমি চিঠি লিখেছিলে।

রানি বলল, আমি জানতাম তুমি জবাব দেবে না।

বিহান বলল, চিঠির তারিখ ছিল দশ ফেব্রুয়ারি উনিশশো চুরাশি।

রানি বলল, আমরা বাঘ দেখতে গিয়েছিলাম। টুরিস্টদের হাত থেকে ডালমুট বিস্কুট শোনপাপড়ি খায় বাঘ। গাইডকে পয়সা দিলে বাঘিনীর সঙ্গে প্রেম করা দেখায়।

টি ভি-তে বাঘের ছবি এল। দূরে হরিণের পাল দেখে শরীর টান করছে। ঝোপঝাড় ফুঁড়ে পেশল আগুন ছুটে যাবে।

বিহান জানতে চাইল, কেমন হয়েছে বাড়িটা?

রানি জানতে চাইল, গাছ আর নেই বুঝি?

বিহান বলল, বাবা খুব খুশি হয়েছিলেন বাড়ি দেখে।

রানি বলল, মা কবে গত হলেন?

বিহান বলল, গত হননি। কোথাও চলে গেছেন।

রানি বলল, তোমার ঘর বেশ ঠান্ডা।

বিহান জানাল, সেই কবে একটা চামচিকে ঢুকেছিল।

রানি চিৎকার করে ওঠে, কোথায়?

বিহান আঙুল তুলে দেখায়, ওইখানে। ওই যে দরজার ফ্রেম আর দেওয়ালের মাঝখানে প্লাস্টার-খসা ফাঁকে পিসবোর্ড গোঁজা, ওইখানে। বোধহয় বেঁচে নেই। সাত বছর তো হয়ে গেল ওরকমই আছে।

টি ভি-র ফায়ার প্লেসে আগুনের আলো, চড়চড় শব্দ।

রানি নগ্ন হাতে পিসবোর্ড খুলে দেয়। আলো নিভিয়ে দেয়। চামচিকে বেরিয়ে উড়তে থাকে।

বিহান বলে, এখনও বেঁচে আছে?

রানি বলে, ভয় সহজে মরে না।

ঘর জুড়ে ওড়ে চামচিকে। বিহান আর রানির ঘর ছোট হতে থাকে। পাক খায়, হাজার হাজার পাক। ফায়ার প্লেসে কাঠ পোড়ার শব্দ। আগুনের আলোয় ডানা বিশাল মনে হয়।

ভাঙা জানালার তীরে

লোকটাকে খুবই চেনা মনে হচ্ছিল বিহানের। এতদূর থেকেও, রাধাচূড়া কদম্বের মায়া পেরিয়ে, এই রাত্রির আবছায়ায় আনমনায় লোকটার প্রসরমান কপাল সে চিনে নিতে পারে। না দেখেও বলে দিতে পারে, তার জোড়া ভুরুর নীচে কবেকার বাতিল স্বপ্নের মতো পুরাবস্তুর চোখ, মোটা নাক, পুরু ঠোঁট, ভোঁতা চিবুক। এসব দিয়ে কাউকে চেনা যায় না। আসলে কিছু চিহ্ন। চিহ্ন চিনে রাখা এবং চিহ্ন দিয়ে চেনা। কোনো কোনো চিহ্নে হয়ত নৃতত্ত্ব, শ্রুতি সেইসব থাকে, বিহান অতশত বোঝে না। জানালায় পা ঝুলিয়ে বসে সে লোকটাকে দেখছিল। লোকটার সঙ্গে কোনো কোনো দিন দেখা হয় তার। দেখা হলে হয়ত কথা হয়। কথা হলে হয়ত দুঃখ হয়। দুঃখ হলে হয়ত আনন্দ হয়। মনে হয়, দেখা না হলেই ভালো হত। আর যেন কোনোদিন দেখা না হয়। তবু দেখা হয়ে যায়। দেখা হলে কথা হয়। কথা হলে দুঃখ হয়। দুঃখ হলে আনন্দ হয়। লোকটা চলে যায়। বিহান ভুলে যেতে চায়। কিছু চিহ্ন লেগে থাকে। আয়নায় দেখা নিজেরই শরীরের চিহ্নের মতন সেসব। নিজেকে তার চেয়ে বেশি চেনে কি বিহান? চিনলেও ভুলে যেতে চায়। সে চেনা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

সব কটা শিক খুইয়ে জানালাটা কবেই যে ফোকলা হয়ে গেছে। তবু বিহানের কাছে কোনো প্রাচীন রাত্রির কন্যার মুখের মতো এ জানালা। এ মুখের ভেতর শরীর ঢুকে যেতে চায় সেই ছেলেবেলা থেকেই। জানালায় উঠে শরীরটা একবার গলিয়ে গিতে পারলেই কী আরাম, কী বাতাস, কী গরম, কী ঠান্ডা, কী বন্য মদিরতা ঘুরে ঘুরে মাথার ভেতর ছড়িয়ে যায়। মা চিৎকার করতেন, খোকা পড়ে যাবি। ইটগুলো নড়বড়ে। পড়লে কেউ বাঁচাতে পারবে না। দেখিস, তোর বাবা এলে আজ যদি না বলি। ওগো শুনছ, খোকাকে ওই জানালায় উঠতে বারণ করো তো। আমার কথা একদম শোনো না। মড়াখেকো জানালাটা বন্ধ করে দিলেই হয়। আমার কোল খালি করার জন্য হাঁ করে আছে। মা আর কোনোদিন নিষেধ করতে আসবেন না। বাবাও আর কোনোদিন শাসন করতে আসবেন না। পিসিদের তখনও বিয়ে হয়নি, নিজেরা বলাবলি করত, বিহু একটা আস্ত শয়তান। এই বয়সেই যা চড়াও ভাব, বড় হয়ে খুব জ্বালাবে। বিহান বলার চেষ্টা করত, ওই জানালায় আমি ভালো থাকি। মা একবার জহির মিস্ত্রিকে অনেক বলে-কয়ে রাজি করিয়েছিলেন। মুর্শিদাবাদের শেখ জহির তখন খুচরো কাজ বন্ধই করে দিয়েছেন। চারদিকে তখন পুকুর-জলা বুজিয়ে, গাছপালা প্রতিবাদী মানুষ খুন

করে পেল্লায় পেল্লায় বহুতল হচ্ছে। বাস্তুযজ্ঞ হচ্ছে কোটি কোটি টাকার। জহির মিস্ত্রি দারুণ ব্যস্ত। তিন-চারটে কনস্ট্রাকশনের লেবার কন্ট্রাক্ট হাতে। মেহেন্দি-করা আবক্ষ-প্রলম্বিত দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে মা-কে বলেছিলেন, আপনি বললে আমি কী করে না করি। এই বাড়ি তো আমার প্রাইমারি ইস্কুল। সুধাবাবু ভরসা করে কাজ না দিলে মুর্শিদাবাদের ছোকরা কি আর জহির মিস্ত্রি হত? সুধাবাবু মানে সুধাময় পাল, বিহানের পিতামহ। সেসব বিহানের জন্মের অনেক আগের কথা। বিহানদের অ্যালবামে জহির মিস্ত্রির একটা সাদা-কালো ছবি আছে।একবার বিড়লা আকাদেমিতে বিকাশ ভট্টাচার্যের একক প্রদর্শনীতে তেলরঙের একটা কাজ দেখে চমকে গিয়েছিল বিহান। লুঙি-পরা ছিপছিপে একটি লোক দুই গ্রামীণ বাঙালিনীকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পায়ের নীচে মোজাইকের পৃথক পৃথক চতুষ্কোণ। এ যে জহির মিস্ত্রির ছবি। একতলার বাইরের ঘরের মেঝে চটিয়ে মোজাইক করার সময় বিহানের বাবা জহির ও তার দুই বউকে দাঁড় করিয়ে ছবি তুলেছিলেন। জানালা দিয়ে আসা দিনের আলোর দারুণ ব্যবহারের নমুনা হিসেবে বাবা ছবিটা অ্যালবামে রেখে দেন। সেই শেখ জহির এখন বেবাক পাল্টে গেছেন, সিনেমা-নাটকের জোতদারের মতো লাগে। তবে মা-র অনুরোধ কায়দাবাজির কথা দিয়ে তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি। রোজের কড়ারে এক মিস্ত্রি ও এক জোগাড়ে পাঠিয়েছিলেন। হঠাৎ সেদিন ভোরেই বাবার ধুম জ্বর, অসহ্য মাথার যন্ত্রণা। ভয়ে, উদ্বেগে মা মিস্ত্রিদের ফিরিয়ে দিলেন। সাংঘাতিক একটা ভুল করতে চলেছিলেন বলে তিনি আক্ষেপ করলেন। হয়ত তাঁর স্বামী মারা যেতে পারতেন, কিংবা খোকা, কিংবা বাড়ির আর কেউ। ঠাকুর করুণাময় যে খোকার বাবাকে শুধু জ্বরে ফেলে সর্তক করে দিলেন। জানালার ফোকরটা বন্ধ হলে কত বড় সর্বনাশই না হত! মা সত্যনারায়ণ পুজো দিলেন বড় করে। বাবা বললেন, আমরা অন্য কোথাও চলে যাব। বাড়ি খুঁজছি। বাবার মুখে বহুবার একথা শুনেছে বিহান। যাওয়া আর হয়নি। তাঁর বাড়ি খোঁজা কতটা ছলনা ছিল, কতটা অপারগতা, বিহান বিচার করতে চায় না। জানালায় পা ঝুলিয়ে বসে মাথার ভেতর ছড়িয়ে পড়া বন্য মদিরতায় নিজের নিষ্ক্রিয় জিতে যাওয়ার রমণীয় আনন্দ পায়।

লোকটা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে পেট্রল পাম্প। মানুষের ঘরবাড়ির রুচিহীন বোধহীন বিবেকহীন বাড়বৃদ্ধি বা নিরুপায় ঝাড়বৃদ্ধির মধ্যে জায়গাটা লক্ষণীয়ভাবে প্রশস্ত উদার। গরিব-গুর্বো সমাজে ক্যালবেলিয়ে বাড়তে থাকা জনসংখ্যার পার্সেন্টেজের ভেতর একটু নিরালা একটু উদাসীন আশ্রমিক পরিবেশ যেন। বড় হতে হতে কবে যেন এই উপমা বিহান পেয়ে গেছে। হয়ত সমাজবাদের কল্পনালতার পাতা খসার সময় তখন। বিহানের ছোটবেলার চোখে পেট্রল পাম্প ছিল থিয়েটারের মঞ্চ। বাবা যে-অফিসে অর্ডার সাপ্লাই করতেন, সেখানকার রিক্রিয়েশন ক্লাব স্টার-এ কী একটা ঐতিহাসিক নাটক করেছিল। সবাই দারুণ সেজেছিল। বাবাকে তো চেনাই যাচ্ছিল না। অফিসে কাজ না করলেও, লম্বা চওড়া ফর্সা বলে বাবাকে সাহেবের পার্ট দেওয়া হয়। হ্যাট বুট বেল্ট পরে একটা লালমুখো ফর্সা

মানুষ উৎকট বাংলায় লাফিয়ে লাফিয়ে তড়পাচ্ছিলেন। মা বললেন, তোমার বাবাকে চিনতে পারছ? একদম সাহেব। বিহান লোকটার সঙ্গে বাবার মিল পায়নি। লাইটে মিউজিকে মেকআপে সব যেন পাল্টে যায়। পৃথিবীর ভেতর অন্য পৃথিবী নেমে আসে। অবশ্য বিহানের পৃথিবী তখন কতটুকুই বা। সেই পৃথিবীর ভেতর পেট্রল পাম্প ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম, স্টেজের মতন। চারদিক থেকে জোরালো আলো পড়ছে ফাঁকা জায়গাটার ওপর। তারই ভেতর সুন্দর একটা কাচের ঘর। সেখানে নরম আলোয় একটা লোক সেজেগুজে বসে থাকে। বসে বসেই নড়ে চড়ে, চেয়ারে দোল খায়, বই পড়ে। কখনও কখনও কেউ এলে কথা বলে। কখনও বাইরে এসে দাঁড়ায়, যেখানে টবে টবে বাহারি পাতার গাছে বাগান হয়ে আছে। কখনও বাইরের আলোয় পায়চারি করে, যেখানে ছোট ছোট থামে আটকানো মোটা শেকলের টানায় সার সার লাল বালতি ঝুলে আছে। কখনও কখনও মঞ্চের সম্মুখ প্রান্তে রেলিংয়ের কাছে এসে দাঁড়ায়, যেখান থেকে সে কিলবিল পৃথিবীকে দেখে। মঞ্চের ভেতর গাড়ি ঢোকে, থামে, চলে যায়। নীল উর্দি পরা দুটো লোক সমাধিস্তম্ভের রবারের নলের হাত টেনে এনে গাড়ির নির্দিষ্ট ফুটোয় গুঁজে দেয়। কাজ হয়ে গেলে হাতটা যথাস্থানে ঝুলিয়ে রাখে। গাড়ি না এলে এরা কাচের ঘরের পাশে বেঞ্চে বসে কথা বলে। এই পার্টটাই তারা তিনজন দিনভর করে যায়। বিহানের মনে হত, কোনো ভোরে উঠে দেখবে সে মঞ্চটা নেই। তার অনেক মনে হওয়ার মতো এটাও মেলেনি। দিব্য আছে পেট্রল পাম্প। শুধু সিঁদুর টিপের মতো কপালের গোল গোল সাইনবোর্ডের লেখা কয়েকবার পাল্টেছে। বি এ পড়ার সময়, বাসস্ট্যান্ডে দোলার চোখাচোখি হলে বুকটা যখন ধড়াস ধড়াস করে উঠত, কতবার বিহান ভেবেছে, একটি কথা জিজ্ঞেস করবে বলে দোলাকে পেট্রলপাম্পের নিরালায় নীরবতায় ডাকবে। ডাকতে পারেনি। শ্যামার সঙ্গে পেট্রল পাম্পের গা ঘেঁষে রাধাচূড়ার নীচে কয়েক মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়েছিল বিহান। বিকট গন্ধে শ্যামার গা গোলায়, বমি করে, ভাঙা ভাত টুকরো সব্জি হলুদ লালা জল দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে।

পিসিদের তখনও বিয়ে হয়নি, জানালার হাঁ-মুখের পাশে গরমের সন্ধ্যায় চেয়ার এনে বসে ট্রানজিস্টর বাজিয়ে তাদের অদ্ভুত বলাবলি বিহানের কানে এসেছে। পল্লিমঙ্গল গোছের আসরে চাষিভাইদের জন্য সার ও বীজের নানাবিধ কথাবার্তা বা তবলা ও হারমোনিয়মের পাড়াটে বাজনে 'ফুল দলে সে চলে গেল দুলে দুলে' গোছের গানের ভেতর পিসিদের ভাঙা ভাঙা কথাবার্তা ছিল রহস্যের ঘরবাড়ি: রুমাবৌদি বাবুঘাটে নৌকো চড়ে, বিন্নির বাবা এক বিধবার কাছে যায়, সুদক্ষিণার তালুর চুল ফাঁকা হয়ে গেছে, খুশিদির বর মিতাকে ঝাড়ি করেছে, নেপালদা এখন কাশীর কোবরেজ করছে। বিহান সেইসব ঘরবাড়ির কাছে ছুটে এসে জানতে চেয়েছে। পিসিরা বলত, বড্ডা পাকা ছেলে তো! কী দরকার তোমার বড়দের কথায়? স্কুলে গিয়ে বদ হচ্ছে। মা-র কাছে বিহান পিসিদের রহস্যময় কথোপকথন ও বকাঝকা নিয়ে বলে বকুনি খেয়েছে, তুমি দোতলায় যাও কেন? মুখ ব্যথা হয়ে গেছে বারণ করে করে। তবু তুমি যাবে!

এই জানালার হাঁ-মুখের পাশে বসে বিহানের বাবা নাটকের মধ্যে থাকতেন। কখনও চড়া পর্দায় আবেগের স্পুটনিকে ভেসে ভেসে দূর কোনো অভিপ্রায়ে চলে যেত দীর্ঘ সংলাপ। কখনও দরদী উচ্চারণে কাছের মানুষের সঙ্গে সুখ-দুঃখ বিনিময় করত। কখনও তীব্র ক্রোধে ফেটে পড়ত। চমকে মা হেসে ফেলতেন, দানীবাবু। মা যে খুব নাটক দেখেছেন তা নয়। তাঁর বাবার কাছে শুনেছেন শিশির ভাদুড়ি, অমরেন্দ্র দত্ত, অহীন্দ্র চৌধুরী, যোগেশ চৌধুরী এইসব নাম। দানীবাবু নামটা মা-র মনে গেঁথে গিয়েছিল। কখনও নিচু স্বরে, ফিসফিসিয়ে, শান দেওয়ার শব্দে বাবা উচ্চারণ করতেন, ভয়ংকর ষড়যন্ত্র। বিহান ভয় পেত। ষড়যন্ত্রের সাফল্যে বাবা হাসতেন। ক্রূর হাসি, বিস্ফারিত চোখ, শক্ত মুঠোর ভেতর কোনো অস্তিত্বের পিষ্ট হতে থাকা— বিহান এ-দৃশ্য সহ্য করতে পারত না। পালাত। মা-কে বাবা জিজ্ঞেস করতেন, খোকা কিছু বলেছে আমার অভিনয় সম্পর্কে? মা জবাব দিতেন, ভয়ে পালিয়ে এসেছে। আমারই ভয় করে। ও তো বাচ্চা। এসব কথায় বাবা হয়ত তৃপ্তি পেতেন। তাঁর অভিনয় দর্শকদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে, যেমন তিনি চান, সেটাই তো বিরাট সাফল্য, সেটাই তো একজন অভিনেতার পুরস্কার। বাবা কোথায় অভিনয় করেন, কোন দলে, এমনকী মা-ও জানতেন না। জিজ্ঞেস করলে বাবা জবাব দিতেন না। বিহান বড় হয়েও দেখেছে, ওই জানালার পাশে হাঁটতে হাঁটতে সেই অভিনেতা একা একা বিড়বিড় করছেন। অস্পষ্ট সে সংলাপ, জড়ানো, যেন নিজেকেই বলছেন, যেন কাউকে শোনানোর আর প্রয়োজন নেই, নেই দর্শকের শ্রোতার প্রতিক্রিয়া জানার কোনো লোভ, সাফল্যের উৎকণ্ঠা নেই, বরং যেন গোপন করতে চান নিজস্ব আনন্দকে, যেন কাউকে ভাগ দেবেন না। বাবা তখন অন্য নাটকে লিপ্ত।

বিহানের বাবা কি পেট্রল পাম্পের রঙ্গমঞ্চ দেখেছিলেন? তিনিও কি এইখান থেকে দেখতেন ওই কাচের ঘর, আলোর পরিধি, গাড়িদের আসা যাওয়া? কাচের ঘরের ভেতর সাজুগুজু করা লোকটাকে? ওই উর্দিপরা দুটি লোককে? তিনি কি প্রতিস্পর্ধায় নিজস্ব মঞ্চ তৈরি করতে চেয়েছিলেন জানালাবর্তী এই পরিসরে? বিহান ভেবে ভেবে জবাব পায়নি, শুধু কিছু অনুমান, কিছু হ্যাঁ, কিছু না।

পেট্রল পাম্পের পাশে, রাধাচূড়ার এপারে, আলোর পরিধির বাইরে ভুষো কম্বলের মতো অন্ধকারে খুবই চেনা চেনা লাগা লোকটা জল ছেড়ে এল। জামা-প্যান্ট ঠিক করে নিল। আলোর সীমানায় দাঁড়িয়ে শরীর টানটান করল। একলাফে ঢুকে পড়ল আলোর ভেতর। মাইকেল জ্যাকসন কি এভাবে হাঁটে? শরীর ভেঙে ভেঙে? আসলে শরীরটা যে সত্যিই ভাঙা, টুকরো টুকরো, রসের জোড়ে অখণ্ড মনে হয়, সেটা বোঝাতেই হাত পা কোমর কাঁধ গলা মুণ্ডুর বিচ্ছিন্নতা দেখাতে দেখাতে হেঁটে যাওয়া? শরীর ভাঙতে পারলেই যে নতুন ভাষার খোঁজ মেলে সেকথা বোঝাতে এ ভাবে হাঁটা? নাকি প্রতিবন্ধিতা? ল্যাংড়া হারু হাঁটলে শরীর এভাবে ভেঙে যেত। নাকি সুস্থতার অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধিতাকে চিহ্নিত করা? উপরের আঁটোসাঁটো সুস্থতাকে উপহাস করা? লোকটা এভাবে হাঁটতে হাঁটতে, এটা যদি নাচ হয়, নাচতে নাচতে

পেট্রল পাম্পের রেলিংয়ের বাইরে, মঞ্চের সম্মুখভাগে বেশ কয়েকবার এ-মাথা ও-মাথা ঘুরে নিল। অসমবেত দর্শকদের প্রণাম জানাল, অভিবাদন গ্রহণ করল। এক প্রান্তে ছুটে গিয়ে দেখল কেউ আসছে কি? একইভাবে অন্য প্রান্তে। যেন কারও আসার কথা আছে। সবাইকেই কারও-না-কারও জন্য অপেক্ষা করতে হয়, অপেক্ষায় অস্থির হতে হয়। কিন্তু এভাবে কপালে হাত রেখে নজর দূরগামী করতে হয় কি? আসলে এটা চিহ্ন, অপেক্ষার, অপেক্ষার অস্থিরতার। ওয়েটিং ফর গোডো-র বাংলা মঞ্চরূপে আসাদুজ্জামান নূর এভাবে ঈশ্বরবাবুর জন্য অপেক্ষা করেছেন। কেউ আসেনি, লোকটা কী আর করবে ভেবে উবু হয়ে বসে দু-মুঠো বালি তুলে উড়িয়ে দিল। বিহান অবাক, ওখানে বালি থাকার কথা নয়। ওখানে ইট-সিমেন্টের কর্কশ ফুটপাথ। লোকটা বালি ওড়াতে লাগল। বিহান দেখতে থাকল। তার ভালো লাগে। তবে কি সমুদ্র সৈকত? দিঘা, চাঁদিপুর, পুরী, জুহু? বা পাম বিচ বা বিদেশি সিনেমায় গৃহীত সুন্দর সুন্দর সৈকতের ছবি? যেখানে মেয়েরা সুসংগত নিরাবরণে রোদ পোহায়, যেখানে ভলিবল ফুটবল খেলা হয়, যেখানে সমুদ্রের হাওয়া সব সম্পর্ক কেবলই এলোমেলো করে দেয়, নক্ষত্রের নীল রাতে যুবক-যুবতীরা যেখানে গান গায়, গানে গানে কথা কয়, কাঠের আগুনে ঝলসে নেয় মাংস, পানীয় থাকে মাদকতাময়, শ্যাওলা-সুবজ তাঁবুর ভেতর নেমে আসে ঘুম। লোকটা কি সমুদ্র দেখতে পাচ্ছে? ফুলে ওঠা জলের মাথায় তুষার অবগুণ্ঠন, নাকি নিস্তরঙ্গ বিস্তার অনন্ত অবধি? লোকটা পা টেনে টেনে হাঁটতে থাকল, যেন বালিতে তার পা বসে যাচ্ছে। সে মাথা দোলাতে লাগল, যেন সুরে পেয়েছে। তালে তালে হাত দোলাতে লাগল, যেন তার ভেতর অর্কেস্ট্রা বসেছে। হয়ত তার মনে পড়েছে বা রক্তের কোষাগার থেকে উঠে এসেছে কোনো সুর. যা এই সমুদ্র শব্দ বাতাস ও রাত্রি ও কারও জন্য অপেক্ষা করার সঙ্গে মানানসই। হয়ত সে নিজেই সুর রচনা করছে, অপেক্ষার সময় সুরের জন্ম হয়। লোকটা শঙ্খচিলের মতো ডানা উড়িয়ে ভাসতে চাইল। তবে কি সে সমুদ্রপাখির গান শুনেছে? আইস স্কেটিংয়ে মেয়েদের একপায়ের ডগায় পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক রেখে ললিত পাখির মতো ভেসে যেতে দেখেছে বিহান। লোকটা ভাসতে পারছে না। নরম বালির মাটি তাকে টানছে। লোকটা কি হাঁপিয়ে গেল? বয়স হয়েছে। এ-বয়সে ফুসফুস কতটা দম দিতে পারে। ইচ্ছের ধকল কতটা নিতে পারে! লোকটা হাঁটু মুড়ে বসে থাকে ক্লান্তির মতন। কার জন্য অপেক্ষা করছে? অপেক্ষার সব লক্ষণ বাঞ্ছিত নারীর আভাস দেয়। কোনো পুরুষ বন্ধুর জন্য স্বাভাবিক পুরুষ এভাবে উদ্বেল হয় না। অবৈধ উপার্জনের সুখ শরীরে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে বটে, তবে তার রকমটা অন্য। আরবসাগরের তীরে অপেক্ষমান মাফিয়াদের হাসি-টাসির ছবি দেখা যায়, সেখানে এই মগ্নতা থাকা সম্ভব নয়। লোকটা কোনো নারীর প্রস্তাব পেয়েছে হয়ত। কিছুক্ষণ পরে ক্লান্তি থেকে নাচের ভঙ্গিমায় উঠে দাঁড়ায়। তার হাতের আঙুল, বাহু, গ্রীবা, চিবুক, চোখ ও কোমর, জানু, পা অসংখ্য মুদ্রা ফুটিয়ে তুলতে থাকে। বিহান মুদ্রা চেনে না, অভিব্যক্তির চিহ্ন চেনে না। সে শুধু রূপ গড়ে ওঠা আর ভেঙে যাওয়ার খেলা দেখে। সে অনুমান করতে পারে,

কোনো রূপ প্রার্থনার, কোনোটি প্রত্যাখ্যানের। কোনো রূপ পরাক্রমের, কোনোটি পরিতাপের। ছোট বড় দলের শ্যামা চিত্রাঙ্গদায় এইসব রূপ বিহান দেখেছে। কিন্তু লোকটি সেইসব প্রাথমিকতা থেকে পর্বে পর্বে এগিয়ে, আলোর সীমান্ত ছেড়ে কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে, পেট্রল পাম্পের সমাধিস্তম্ভ-কাচের ঘর-টবের বাগানের আশ্রমিকতায় কিছু ব্যঞ্জনা মূর্ত করে, মঞ্জুশ্রী-রঞ্জাবতীর কুমারী মাটির কান্নার স্মৃতিতে বিহান প্রদীপ্ত হয়। আশ্চর্য গতি ক্ষিপ্রতা স্থিতি পেলবতা আর্তি আকুলতায় লোকটাকে একাধিক মনে হয় বিহানের। যত দেখে, মুগ্ধ হয়। লোকটা বয়সহীন, বহমান। তার নাচ দেখে একটি রাধাচূড়া ঝরেনি, একটি শ্বেতকরবী উড়ে আসেনি। একটি গাড়ি দাঁড়ায়নি। একটি পুলিস অন্যমনস্ক হয়নি। একটি জানালা খোলেনি। কোনো কালিদাস কৃত্তিবাস নেমে আসেনি। বিহান দেখে, লোকটা যেন সঙ্গিনী পেয়েছে। তাকে সে জড়িয়ে আছে। সংলগ্ন হয়ে একসঙ্গে পা ফেলছে। ভালোবাসা হলে যেমন হয়, কখনও এ ওর ওপর কখনও ও এর ওপর নেমে আসছে। এ নাচে ততটা রূপ নেই, যতটা জীবন। সহজ। শিশিরের জল আর সুরে হাতে হাতে ধরে ঘুরে ঘুরে নাচ। পুরনো ক্ষেতের গন্ধে এইখানে ভরেছে ভাঁড়ার।

বিহান কোনো মানুষীর কোলে মানুষটির মরে যাওয়ার চিহ্ন দেখল।

অপ্রকাশ্য সিঁড়ি নেই

ভিকিদের বাড়ি দিবাকরের কাছে একটা অসংলগ্ন সিরিয়াল। যা বর্ষার দুপুরে হেমন্তের বিকেলে, জ্যোৎস্নায় বা অমাবস্যায়, মন-খারাপের সোমবার যা মন ভালোর শনিবারে একেক রকম ব্যঞ্জনা পায়।

সেই বাড়িতে এত সহজে প্রবেশাধিকার পাওয়া যাবে, শুধু প্রবেশাধিকার নয়, চিরদিনের সম্ভাব্য দখল কায়েম হবে, সেই বাড়িতে বিজড়িত হবে দিবাকর, এ কথা ভেবে সে এতটাই খুশি হল যে, চিৎকার করতে পারলে ভালো হত, জোরে গেয়ে উঠতে পারলে ভালো হত, অন্তত হাত-পা ছুঁড়ে লাফিয়ে নেচে উঠতে পারলেও। সে কিছুই পারে না, অদিতির একটা চুম্বন চাইল। অদিতি দিল না। বলল, সবুরে মেওয়া ফলে। অদিতি দিতেই পারত, মেহগনির দুপুর বেশ নির্জন, বৃষ্টি হয়ে থইথই ঝরার আগে নিজেকে প্রস্তুত প্রসক্ত করে অনেকটা নীচে নেমে এসেছে কালো মেঘ, ভাদ্রের ঝোপঝাড়ে জমে আছে সহৃদয় অন্তরাল। দিল না তো বয়েই গেল দিবাকরের। ইচ্ছা করলে অদিতিকে জাপটে ধরে অনেক চুমো খেতে পারত, সে ইচ্ছে করতে দেয় না। ভাবে, সবুরে মেওয়া ফলে-র মতো পাতি কথাটা না বললেই পারত অদিতি। কিছু না বলে যদি চোখের ইঙ্গিতে থামিয়ে দিত, আরও বেশি খুশি হত দিবাকর। অদিতি কি পাতি নয়? কিন্তু এখন ভাবন। এদিকে গড়াতে দিতে চায় না সে। এখন উৎসবের সময়।

ভিকির মা বলেছেন, বাড়িটা পড়ে নষ্ট হচ্ছে। কে দেখবে বলো, সিমি এখানে থাকবে না। বান্টি ওকে হায়দরাবাদ নিয়ে যাবে। বিপুল যা করল, তোমরা সবই জানো, এরপর মেয়েটা এখানে থাকে কী করে! টিয়া এখন ছোট। জানি না কী করবে। আমার তো চার্চের কোয়ার্টারেই বাকিটা জীবন কাটাতে হবে। আমিও তা-ই চাই। ফাদার বলে দিয়েছেন, এরপর কিছু হলে তিনি আর দায়িত্ব নিতে পারবেন না। দিবা, ওই বাড়ি আমার স্বপ্নের, আমার অনেক সুখদুঃখ দিয়ে তৈরি, ওই বাড়ি ছাড়া বাঁচার কথা আমি ভাবতে পারি না, আবার ওই বাড়িতে টিকতেও পারি না। তুমি যদি নাও, এর চেয়ে ভালো কী আর হয়। তোমাকে আমি জানি। বাড়িটা যেমন আছে, তেমনি রেখেই রক্ষা করবে তুমি, আমি জানি। শুধু ভিকি যদি কোনোদিন আসে ওকে থাকতে দিও। মনে হয়, ও আর বেঁচে নেই। তবু যদি ..। চোখের জলের ভারে প্রৌঢ়া

স্তব্ধ হয়ে যান। নিজের স্বপ্নসাধের বাড়িটি ধ্বংস থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব দিবাকরকে এত সহজ করে বুঝিয়ে দিতে পেরে তিনি আর কথা খুঁজে পান না।

দিবাকর প্রৌঢ়ার সামনে দাঁড়াতে পারছিল না। নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছিল, বিবেকহীন মনে হচ্ছিল, ফন্দিবাজ ধান্দাবাজ ইতর মনে হচ্ছিল। মহিলার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তাঁর বাড়ি দখল করার ষড়যন্ত্র করেছে সে। এরকম অজস্র ঘটনার কথা মনে পড়ে তার, মানুষের বিপন্নতাকে কাজে লাগিয়ে কত মানুষ যে অর্থবান যশোবান হয়েছে, মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে কত মানুষ সফল কৃতকার্য হয়েছে, ইতিহাসের পাতায় তাদের মার্জিত মুখে দেখা যায়, জীবিত যশস্বীদের গোপন বৃত্তান্তে তাদের পাওয়া যায়, এমনকী দিবাকরের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যেও সেইসব ইতর আছে। দিবাকর ইতর হতে চায় না। জীবনে সফল হওয়ার চেয়ে সৎ থাকা বোধহয় বেশি দরকারি। সততা কি কোনো সাফল্য দিতে পারে না? আবার অন্য ভাবনাও আসে। ভিকিদের বাড়িতে এখন কেউ থাকে না। কেউ না থাকলে যা হয়, অযত্নে নষ্ট হচ্ছে। বেশিদিন ফাঁকা থাকলে নানাবিধ দুষ্কর্মের ঠেক হয়ে যাবে। দরজা জানালা এখনও যে লোপাট হয়নি, সেটা হয় দুষ্কৃতীদের অজ্ঞতা, নয়ত খদ্দেরের অভাব আছে। গত সপ্তাহে অদিতি যখন প্রস্তাব দিল, তারকাঁটা লাগানো তালাবন্ধ বাইরের দরজায় দাঁড়িয়ে দুজনে দেখেছে, আগাছায় ভরে গেছে বাগান, ইট-বাঁধানো পথের পারে সার-সার টব লুপ্ত গেরস্থালির ধূসর নোটিস। দিবাকর হয়ত বাড়িটা আবার বাসযোগ্য করে তুলতে পারে। পুরনো দিন ফেরানো যাবে না ঠিকই, পুরনো শ্রী কিছুটা ফেরানো যেতে পারে। বাড়িটা অবিকল রেখে নতুন চরিত্র দেওয়া যেতে পারে। মধ্যরাতে গিটার বাজিয়ে পুরুষ-রমণীর স্বাধিকারপ্রমত্ত গান দিবাকর ফেরাতে পারবে না, সেই বাড়িতে বিদ্যাচর্চার একটা ছোটখাট ঠাঁই বসাতে পারে। হ্যাঁ, এতে দিবাকরের স্বার্থ আছে। স্বার্থ ছাড়া মরা-বাড়ি আগলাতে যাবে কী জন্যে? স্বার্থ মানে সবসময় ধান্দা নয়।

অদিতির যুক্তিতে জোর পাওয়া গেল, ও বাড়ি কেউ ভাড়া নেবে না। কেন নেবে বলো? কবেকার শালগুঁড়ি, তক্তা আর টিনের বাড়িতে কে বাস করতে যাবে? বসবাসের জন্য মানুষের শক্তপোক্ত বাড়ি লাগে। সংসারের ওজন তো কম নয়, ধকল তো কম নয়। মশলা পিষতে এখন হামানদিস্তা বা শিলনোড়া লাগে না ঠিকই, পেল্লায় কড়াইয়ে জামাকাপড় সেদ্ধ করে না কেউ, সিন্দুকে টাকা রাখে না, যতই হালকা আধুনিক হোক, গেরস্থালির তবু একটা ওজন থাকেই। আলমারি লাগে, শো-কেস লাগে, খাট বা ডিভান লাগে, ওয়াশিং মেশিন লাগে, সিলিন্ডার তো কম ভারী নয়। ওসব ও বাড়িতে তুললে মচমচিয়ে ভেঙে পড়বে। আরও বড় কথা, ঘরবাড়ি হল মানুষের নিরাপত্তা, নয়ত তাঁবু খাটিয়েই থাকতে পারত। ও বাড়ির কাঠের দেওয়ালে দু-কোপ মারলেই ফাঁক হয়ে যাবে। দিনকাল যা পড়েছে, কাঠের বাড়িতে লেফ্‌টেনান্ট জেনারেলও থাকার ভরসা পাবে না। সুতরাং তুমি ছাড়া ও বাড়ি কেউ ভাড়া নেবে না। বাড়িটা নিয়ে তোমার গল্প-টল্প আছে, তাই নিচ্ছ। তুমি তো আর থাকতে যাচ্ছ না। এবার যদি বাড়িটা না নাও, কিছুদিনের মধ্যেই দেখবে তক্তা খুলে বাড়ি হাওয়া হয়ে যাচ্ছে।

এরপরও দিবাকর নিজের ভূমিকা সম্পর্কে একেবারে সন্দেহমুক্ত হতে পারেনি। ভিকির মা অসহায় বলেই তো সে সুযোগ নিতে পারছে। ভিকি যদি স্বাধীন দেশের স্বপ্নের তাড়নায় নিরুদ্দেশ না হত, যদি বিপুলদা সিমির সঙ্গে লাম্পট্য না করত, যদি এই পরিবারের বন্ধুরা একে একে সরে না যেত, প্রৌঢ়া কি তাঁর সাধের বাড়ি ছেড়ে চার্চের কোয়ার্টারে উঠতেন? যে জীবন তাঁকে মানায় না তা কি মেনে নিতেন? প্রাণের তরঙ্গ থেকে ডোবার নিষ্প্রাণতায় আত্মসমর্পণ করতেন? তাঁর অসহায়তার সুযোগ নিয়ে কেউ তক্তা চুরি করবে, কেউ জুয়া বা মদের ঠেক বানাবে, পুলিস তোলা তুলবে, কেউ মধুচক্র বসাতেও পারে, দিবাকর সেখানে বই পড়া কেনাবেচার লাইব্রেরি-কাম-সেলস কাউন্টার খুলতে চায়। কিন্তু মোদ্দা ব্যাপার, অসহায়তার সুযোগ নেওয়া। তফাত নেই, বাহানা যা-ই হোক। গরিব শিশু-শিক্ষার্থীদের শারীরিক পুষ্টির মহৎ বাহানায় যেমন হাজার হাজার কুইন্টাল চাল গম ফাঁক করে দেওয়া হয়। বাহানার খামতি নেই। দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না।

কিন্তু দিবাকর শেষ পর্যন্ত অসহায়তার সুযোগ নেওয়ার সিদ্ধান্তে স্থির হয়। কারণ: এক, আকৈশোর স্বপ্নের বাড়িটা নষ্ট হয়ে যাক, এটা সে চায় না। দুই, সেই বাড়ির মালিক হতে পারছে সে। তিন, বই নিয়ে অফুরান আড্ডার একটা স্থায়ী জায়গা করা যেতে পারে। চার, অদিতির সঙ্গে তার সম্পর্ক যৌথ চিন্তা যৌথ কাজের মধ্যে দিয়ে পেকে উঠলে ভালো হয়। দুজনে দুজনকে বুঝতে পারবে, মিল না হলে ভেঙে যাবে।

অদিতির পাশে দিবাকর মেহগনির ছায়ায় অনেকক্ষণ হাঁটল। কোথাও বৃষ্টি হচ্ছিল। ঠান্ডা আসছিল। কালো মেঘ যেন আরও নেমেছে। ঝরতে শুরু করলে সহজে ফুরোবার নয় এ মেঘ। অদিতির কোন তাড়া নেই। বৃষ্টিকে ভয় নেই। ভিজে যাওয়াকে সংকোচ নেই। দিবাকরের ভালো লাগল। অদিতি ঘোরের মধ্যে আছে। ভিকিদের বাড়ি পাওয়ার খুশি ঘনিয়ে উঠেছে ওর ভেতরে। দিবাকরের কথা বলতে ইচ্ছে করে। নিজের কেমন লাগছে সেটা অদিতিকেই বিশদে বিস্তারে বলতে চায়। পারে না। অদিতিকে ছুঁতেই পারে না। হয়ত দিবাকরের চেয়ে ঢের বেশি খুশি আর স্বপ্নের আলোকপথে আছে ও। তাই যেন হয়। এখনই বৃষ্টি নামুক। তুমুল তুমুল বৃষ্টি। এখন উৎসবের সময়। ওরা হাঁটতে থাকে। বৃষ্টি নামে না।

২

এ শহরে কাঠের বাড়ি আর নেই। এখন যেখানে পুরসভার 'পান্থনিবাস' হয়েছে, ছোট কাছারির দক্ষিণে, খুব ছেলেবেলায় দিবাকর দেড়-দু-খানা দেখেছিল বলে মনে করতে পারে, তাও ভাঙাচোরা। সেখানে একজনই থাকত, সে পাগল, আকাশে তীক্ষ্ণ আঙুলে আঁকিবুঁকি কাটত। সেসব কবে মিলিয়ে গেছে। ভিকিদের বাড়ি এ শহরে একেবারে অন্যরকম। কাঠের বলে একটা প্রাচীন-প্রাচীন ব্যাপার আছে ঠিকই, কিন্তু সেই প্রাচীনতা যেন কাঠের মলাট, ভেতরে রঙের ফোয়ারা, নিমফুলের গন্ধ, জাদুর বাক্স লিপস্টিকের আগুন, গিটারের সুর, মাতালের

গান, প্রভু যিশুর ছবি, বড়দিনের কমলালেবুর মতো হলুদ নিটোল মসৃণ আদর, আরও কত কিছু। বারান্দায় গরমের ছুটির দুপুর জুড়ে ক্যারম খেলতে খেলতে দিবাকর দেখেছে পর্দায় ওড়ে বিরাট বিরাট পাতা আর ফুল, পর্দার ওপর থেকে কোনো এক মেয়ের হাসি গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে, এ ঘর থেকে সে ঘর হয়ে ভিতরকার কোনো ঘরে ভারী পায়ে হেঁটে যায় কেউ। ভিকিকে এসব জিজ্ঞেস করলে উত্তর মেলে না, যেন ও শুনতে পায় না। নির্ভুল টিপে লাল ঘুঁটি পকেট করে এগিয়ে যায়। দোতলার বারান্দায় বসে থাকেন নীল শিরার শীর্ণ বৃদ্ধ, তিনি কথা বললে সব উচ্চারণ বেঁকে দুমড়ে, বিকলাঙ্গ হয়ে আতঙ্কের আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়ে। তিনি ভিকির দাদু। একবারই তাঁকে খুব কাছে থেকে দেখেছিল দিবাকর। খাটে শুয়ে আছেন তিনি, চোখ বন্ধ, অসম্ভব সাদা মুখ, হাসি লেগে আছে ঠোঁটে, তিনি মারা গেছেন, দিবাকরের জীবনে প্রথম মৃত্যু দেখা। মা খুব বকেছিলেন, সাবান ঘষে স্নান করে, লোহা কামড়ে, আগুন ছুঁয়ে, দাঁতে তুলসীপাতা কেটে ঘরে ঢুকতে হয়েছিল দিবাকরকে। ভিকির মরা দাদু অনেক বেশি জীবিত হল দিবাকরের কাছে। এতদিন যে আর্তনাদ শুনেছে, দূর থেকে দেখেছে নীল শিরার হাতের বিক্ষোভ, দেখেছে কেদারায় পড়ে থাকা শুকনো বাঁশপাতার শরীর, মৃতের হাসির সঙ্গে সেসব জুড়ে ভিকির দাদু স্যামুয়েল মণ্ডল একটা চরিত্র হয়ে উঠতে থাকলেন, যা ভিকির কাছে শোনা লালমাটিয়ার নির্মম শিকারের গল্পের অকথিত করুণ পরিণতি। সব শিকারই বোধহয় শেষ মুহূর্তে স্মিত হেসে জিতে যায়। স্যামুয়েল মণ্ডল নিহত পশুপাখির কাছে শিখেছিলেন সেই শেষ মার। ভিকির প্রপিতামহ কলিন ফিয়ারের কোনো ছবি নেই। তিনি কৃষ্ণাঙ্গ রমণী ভানির সঙ্গে যৌন সম্পর্কের জেরেই ভিকির প্রপিতামহ, একথা দিবাকর পরে জেনেছে। তাতে গল্প আরো ঘনায়। ভিকির দিদিমা বেঢপ মোটা, বেঁটে, স্কার্ট পরে ঘুরে বেড়ান। অরণ্যদেব কমিকসের গুরানের বউ হলে তাঁকে সবচেয়ে বেশি মানায়। প্লাস্টিকের গাদাগুচ্ছের লাল-নীল-হলুদ-সবুজ-মেরুন গোল গোল ক্লিপ মথায় এঁটে অদ্ভুত ইংরেজিতে কথা বলেন। তাঁর মেয়ে অপরূপা। বাইশপল্লির দুর্গাঠাকুরের মতো মুখ। আটপৌরে শাড়ি মনে হয় তাঁরে ছদ্মবেশ! ভিকির বাবা জাদুকর। কালো পোশাকে, কাঁধে কালো চাদর এঁটে তাঁকে ঘরের ভেতর হাত নাচিয়ে হাঁটাহাঁটি করতে দেখছে দিবাকর। তিনি নাকি ভীষণ রাগী। এক জোড়া আত্মা পোষা আছে তাঁর, তারা নিমগাছে থাকে, জাদুকর ডাকলে ঘরে আসে, জাদুকরের সঙ্গে দূরে দূরে যায়। জাদুর কালো বাক্সে একটা কালো লাঠি আছে, যার দিকে তাকালে আয়ুব খানের মতো মিলিটারি বা গ্রেটা গার্বোর মতো অভিনেত্রীও বিবশ হয়। একেবারে মা বসানো মুখ সিমির। পাড়ার প্রবীণাদের চোখেই এ দেখা শিখেছে দিবাকর। ভিকির দিদি হিসেবেই সিমিদি বলা। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, একটা কপটতা নিজেই আয়ত্ত করেছে দিবাকর। বয়স যে কপটতা শেখায়, অসভ্য অথচ আসল মনটাকে লুকোতে শেখায়, সিমিকে দেখেছে সে নারী হতে, স্তনের উত্থানসহ আর যা যা লক্ষণ আছে, এমনকী চুলের আড়ালে ঘাড়ের নির্জন কামনাভূমির বিস্তার, সিমির শরীরে সে প্রথম জেনেছে নারী কাকে বলে, ডেকেছে 'সিমিদি' , যেভাবে দিদিকে ডাকতে হয়। ক্যারমে পার্টনার হিসেবে দিবাকরই প্রথম পছন্দ ছিল সিমির। কারণ, ভিকি চুরি করে, খেলার নিয়মকানুন মানে না। দিবা ভালো।

টিপ ঠিক করে দিতে গিয়ে দিবাকর কবে যেন জেনে গেল সিমির আঙুল আর পাঁচটা আঙুলের মতো নয়, সেখানে নরম তাপ ঘিরে থাকে, পাশ ফিরে বসার সময় স্কার্টের চাঞ্চল্যে দেখেছে সে সিমির জঙঘার ছায়া। সেসব দেখা ছোঁয়ার লোভ খেলাচ্ছলে বাড়তেই থাকে। না পেলে দুঃখ হয়, ক্রমে রাগ হয়। সেই সিমি বিপুলদার পাল্লায় পড়ল। দু-বেলা ব্যায়ামাগারে ভারী ভারী ডাম্বেল আর লোহার চাকতি তুলে পেশি ফোলানো বিপুলদাকে কী করে যে ভালো লাগল সিমির! হয়ত স্বাস্থ্যেই প্রকৃত সুখ ভেবেছিল সিমি। ভিকিদের বাড়িতে দিবাকর কোনোদিন বারান্দা ডিঙোতে পারেনি। বিপুলদার অধিকার ছিল সর্বত্র। যে বাড়িতে সবাই গাইতে পারে, সিমি আর ভিকি তো বটেই, কথা নেই বার্তা নেই ভরদুপুরে উঠোনে বসে গেল গিটার নিয়ে, ওদের বাবা একটু বেশি রাতে অন্ধকারের পেটে নতুন সূর্য তৈরির স্তব্ধতায় শিশুর মতন হাসেন কাঁদেন গান করেন বাণী বাঁধেন, ভিকির মা-র মুখে শুনেছে দিবাকর, এবং অতুলনীয় ভিকির মা, হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার সময় এক নিদ্রাহীন রাতে সম্ভাব্য প্রশ্নের মুখস্থ করা উত্তর কতটা মনে আছে তা পরখ করার জন্য একা হাঁটতে হাঁটতে দিবাকর শুনেছে 'কী ধ্বনি বাজে গহন মনোমাঝে', ভিকির মা গাইছেন, এ গান আর কেউ গাইতে পারে না, গহন রাত্রির হৃদয় জুড়ে বেজে ওঠা ধ্বনির মাঝে দাঁড়িয়ে থাকে দিবাকর, একটা কান্না তাকে মূর্ছিত করতে চায়, ভিকির মা এতটুকু বাড়িয়ে বলেন না যে এ-বাড়ি এসরাজের কাঠের তৈরি, সেই বাড়িতে কিনা খ্যানখেনে গলার বিপুল পালোয়ান। নিরাপত্তার অভাববোধ করেছিল কি ভিকিরা? তার জন্য সিমিকে ভেট দেওয়া? হয়ত উপায় ছিল না। অনেক মরুলতা দেখেছে দিবাকর ভিকিদের বাড়িতে। আরব্যরজনীর মেয়েদের মতো তীক্ষ্ণ সুন্দরী তারা, শরীরে বাতাসের কাঁপন, সূর্যে বা জ্যোৎস্নায় হেঁটে গেলে অলংকার ভেঙে ভেঙে ছড়ায়, মেহগনির ছায়ায় এরা শীতরাত্রির আগুনের মতো জ্বলে, মরুপ্রান্তরে দিক্‌ভ্রান্ত বণিকের চোখে সবুজ লতার মতো ভেসে ওঠে, ঘোরানো সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে তীব্র রঞ্জিত ঠোঁটে এরা ছুঁড়ে দেয় জ্বলন্ত ভাবা, দূর থেকে দিবাকর এসব দেখেছে, মাঝে মাঝে আসত এরা, ভিকি বলেছে, বাবার খেলার সহকারী, এরা এলে দিবাকরকে ভিকি বাড়িতে আসতে বারণ করে, সে সময় দল বেঁধে অচেনা যুবকরা আসে। বারান্দা পর্যন্ত যেটুকু বা যাওয়া যেত শেষ হয়ে গেল স্বাধীন ভূখণ্ডের জন্য ভিকি কাউকে কিছু না জানিয়ে চলে গেলে। দিবাকর দেখেছে ভিকির বাবাকে মরে যেতে এবং আরও কিছু যা মরে যাওয়ারই মতো।

৩

শেষ পর্যন্ত অদিতি এল। থালিবালার মতো রূপবতী লাগছে ওকে। প্রদীপের সলতে তুলে দিতে ও যখন ঝুঁকল, ওর ওপরের অনেকটা অনাবৃত সৌন্দর্য কোমরের নীচে বসনাঞ্চলের অবরোধ ভেঙে মন্দিরগাত্রের কোনো কামিনীকে ডেকে দিল। যিনি উদ্বোধন করতে এসেছেন, শুভ্রবাস শুভ্ররোম এই মানুষটি পরমানন্দে হাজার হাজার বছর ধরে উদ্বোধন করে চলেছেন, যেন উদ্বোধনের জন্যই তাঁর জন্ম, তিনি অদিতির কামরেখার একটা মুদ্রণ মাথার ভেতর তৈরি করছিলেন। প্রদীপটা নিজে নিজেই জ্বলে উঠল। চারদিকে হাততালি। এত লোক এসেছে

দিবাকর খেয়ালই করেনি। মেহগনির দূর শূন্যপথ থেকেও হাততালি আসতে থাকে। অদিতি সেই উদ্বোধকের পাশে দাঁড়িয়ে গান গাইল। রবীন্দ্রসঙ্গীতই হবে হয়ত। ভিকির মা চেয়ার থেকে উঠে অদিতিকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁকে হয়ত কেউ গান গাইতে অনুরোধ করেছে তিনি গাইলেন। দিবাকর শুনতে পাচ্ছে না। সে শুনতে চায়। শোনার চেষ্টা করে। কিন্তু শব্দ বা সুরের ভগ্নাংশও তার কানে পৌঁছয় না। সে দেখে, রূপকথা-উপকথা- লোককথার সোভিয়েত বইয়ের মনখুশি শেল্‌ফের পাশে টিয়া দাঁড়িয়ে। কত বড় হয়ে গেছে। উজ্জ্বল একটা বইয়ে ডুবেছে টিয়া। সুশীলদাকে দেখল দিবাকর। রাজনীতি-ইতিহাসের বইয়ের শেল্‌ফ থেকে টেনে নিচ্ছেন দেশভাগের ডকুমেন্টেশন। ঘাড় ফিরিয়ে তিনি ভিকির মা-র গানে কিছুক্ষণ নিশ্চল হলেন। 'বিনোদন' শিরোনামের শেল্‌ফের সামনে বেশি ভিড়! এই শেল্‌ফটাই বড়। দেশি-বিদেশি জনপ্রিয় লেখক-লেখিকাদের বই ঠাসা। অদিতি বলেছিল, বিনোদনের বদলে 'অন্ন দাও' লিখলে ভালো হত। বই পড়ার উপযোগিতা নিয়ে এক বক্তা বলতে শুরু করলেন। ইনি খুব বক্তৃতা দেন। সব বিষয়েই বলতে ভালোবাসেন। ডাক পেলেই বলে যান। আগে কলেজে ছিলেন, এখন কাগজে আছেন। অনেকেই চেনে। দিবাকরের সঙ্গে অবশ্য পরিচয় নেই। ছবি উঠছে বক্তার, শ্রোতাদের। মিডিয়া এসেছে। একটি মেয়ে ক্যাসেটের মতো কিছু এগিয়ে দিল বক্তার দিকে। তিনি হাত বাড়িয়ে নিলেন। বস্তুটির গায়ে জড়ানো ফিতে খুলতে খুলতে বক্তা বলতে থাকেন। একটির পর একটি গিঁট খোলা এবং বলার মধ্যে খেলা তৈরি হয়। দিবাকর দেখল বহুদূর থেকে লোক আসছে। গ্রাম-গঞ্জ থেকে আসছে, মেঠো পথ ধরে আসছে। পালতোলা জাহাজ টমাস ড্যানিয়েলের ড্রইংয়ের মতো ঝাপসা দাঁড়িয়ে আছে। পথ জুড়ে নরম আলো। কফির টেবিলে তুমুল তর্ক জুড়েছে যুবকরা। কী নিয়ে তর্ক তা শুনতে পায় না দিবাকর। মনে হয় ওরা ভাগবখরা বা গোষ্ঠীকথার তর্কে মাতেনি। কোত্থেকে হঠাৎ তিনটে মারকুটে লোক ঢুকে পড়ে এক শ্রোতাকে তুলে নিয়ে গেল। শ্রোতাটি ম্রিয়মান, হয়ত সিরিয়াস বলেই উচ্ছ্বলতা নেই। দিবাকর চেনে না, চেনা-চেনা মনে হয়। কপালের দু-পাশ ফাঁকা হয়ে চূড়ায় কেশগুচ্ছে ঠেকেছে। পুরু গোঁফ, নম্র। কোলে ব্যাগ নিয়ে বসেছিল। দুটো লোক শ্রোতাকে খাটিয়ায় বেঁধে শুইয়ে শববাহক হল, আরেকটি লোক, অপেক্ষাকৃত বেশি তাগড়াই, শ্রোতাকে পিষতে থাকল। লোকটার শরীরের চাপে সে ফেটে গেলে যাবে। বিপুলদা এল। একজনকে তুলে দিয়ে সভার মাঝখানে চেয়ার নিয়ে বসল। পুষ্পস্তবক তার হাতে দিতেই সে নামিয়ে পায়ের কাছে রাখল। ভিকি এসেছে। নিমগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। তার কালচে-সবুজ পোশাকে জায়গাটা অন্ধকার। সেই অন্ধকারে পারুল বোনের মতো ফুটে আছে ভিকির মুখে। সিমি নাকি? টিভিতে মদের বিজ্ঞাপনের বোতলের এপার থেকে দেখা ওপারের সুন্দরীর বাঁকাতেরা বিকলাঙ্গের মতো লাগে সিমিকে। দিবাকরের ভয় করে। আরও লোক আসছে। মড়কে যেমন আসে, যেমন দুর্ভিক্ষে। আসছে, না পালাচ্ছে? কোথাও কি বাসযোগ্য নেই, এখানেই পালিয়ে আসছে? বন্যা তাড়া করছে? মিলিটারি তাড়া করছে? সশস্ত্র স্বজন তাড়া করছে? নাকি দেশভাগ, সাম্প্রদায়িকতা, রাজনীতি? মানুষে মানুষে গাদাগাদি

হয়ে আছে যেদিকে তাকানো যায়। ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখে সিমি দিবাকরকে দেখছে। বেঁটে বিদ্‌ঘুটে বাঁকা পা বের করে এত ছোট স্কার্ট কেন যে পরেছে সিমি। উগ্র কামাত্মক নাচ কি ওকে মানায়? জাদু খেলা কি ওকে মানায়? একটা একটা করে বই জানালা দিয়ে উড়ে যায়। দল বেঁধে উড়ে যায়। কাকের মতো সব। এত কালো যে কষ্ট হয় দেখতে। আরও যত কাক বসে আছে, উড়ে যায়। দিবাকরের বুক মুচড়ে কে যেন কাঁদে। কান্নার প্রচণ্ড চাপ পাঁজরা-শিরা বেয়ে গলায় জমে। জমতে থাকে। একটা চিৎকার হয়ে ফেটে পড়ার মাঝ মুহূর্তে দিবাকর জেগে যায়।

কপাল মাথা ঘাড় গলা ভিজে গেছে। শরীর অসাড়, ভারী। সবকিছু ঠিকঠাক আছে বুঝে একটা স্বস্তি শিরায় শিরায় ছড়ালে অসাড়তা ভাঙে। ওই তো নীল আলো জ্বলছে। সে ঘাড় ঘোরায়। ওই তো খোলা জানালায় আকাশের নীড়ে নক্ষত্রের ভিড়। সে পাশ ফেরে। এই তো কোলবালিশ । যার সঙ্গে সে আজ রাতেও কথা বলেছে। এই তো লাইটার। আজ রাতেও আগুন দিয়েছে। ওই তো সাজানো আছে সব বই। ওই তো টেবিল চেয়ারগুলি। ওইখানে তো ভাত ফোটানোর ঘর। ওইখানে জামাকাপড়। সারাদিন সে যেমন একা ফাঁকা বইঘরে বসে থাকে, রাতেও তেমনি। তাহলে এত ভয় পেল কেন?

দিবাকর ঘড়ি দেখল। তিনটে পঁচিশ। এখনও ঢের দেরি। কিন্তু ঘুম শুষে নিয়েছে আতঙ্ক। সে বিছানা ছেড়ে জানালার কাছে গেল। বাইরেটা অন্যদিনের চেয়ে আরও বেশি হাহাকারের মতো লাগল। আরও মেহগনি কাটা হয়েছে রাস্তা চওড়া হবে বলে! ভেবে লাভ নেই। দিবাকর বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। উঠোনের নিমগাছে রাত্রি দেখে, প্রকৃতি দেখে। তার-কাঁটা লাগানো দরজা, বেড়া নেই দেখে সে অবাক হয়। এতটাই চওড়া হবে রাস্তা। সে সিঁড়ির দিকে এগোয়। একতলার বারান্দা ভাঙা পড়েছে কিনা উন্নয়নের হাতে, দেখবে বলে এগোয়। সিঁড়িও নেই। মাটি থেকে শরীর পেঁচিয়ে ওপরের দিকে উঠে যাওয়া, একটি মানুষের স্বপ্ন যেভাবে ওঠে, প্রত্যাশা যেভাবে ওঠে, মতবাদ যেভাবে ওঠে, যেভাবে মাটি থেকে মানুষ নিজেকে ঘিরে ঘুরে ঘুরে আকাশের দিকে মাথা তোলে, সেই মেরুদণ্ডী সিঁড়িটা নেই। যে সিঁড়ি দিয়ে ভিকিরা নিরন্তর ওঠানামা করেছে, যে সিঁড়ির শীর্ষে দাঁড়াতেন ভিকির মা, যে সিঁড়ির পাকে পাকে পুষ্পিত শাখার মতো দাঁড়াত আরব্যরজনীর মেয়েরা, সেই সিঁড়িও নিয়ে গেছে উন্নয়ন। আর কোনো সিঁড়ি নেই ভিকিদের বাড়িতে। এ বাড়িতে অনেক রহস্যের গন্ধ পেলেও দ্বিতীয় কোনো সিঁড়ি পায়নি দিবাকর। কোনো অপ্রকাশ্য সিঁড়ি নেই। ভিকিরা এতটাই খোলামেলা ছিল। গোপন সিঁড়ি না থাকাটা দিবাকরের আরও একবার ভালো লাগে। কী হবে সিঁড়ি দিয়ে। একতলার কফি কর্নার কবেই বন্ধ হয়ে গেছে। দোতলার বইঘরে কেউ আসে না। অদিতিও কবেই আসা বন্ধ করে দিয়েছে। সেসব বুঝেই সিঁড়িটা নিয়ে গেল উন্নয়ন!

স্বপ্নকস্তুরী

জলের হৃদয় থেকে নিজস্ব উদ্যমে ভেসে উঠেছিল অরুণ প্রতিহার। সে রাতে সর্বাচ্ছাদনকারী অমাবস্যা ছিল। আদর্শলিপির অসংখ্য বাণীর মতো, যেমন 'সদা সত্য কথা বলিবে', 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু' এইরূপ আরও আরও মৃত কথাসকল অর্থহীনভাবে জ্বলছিল, অর্থহীন কেননা, ব্যবহারিক থেকে অন্তত লক্ষ মাইল দূরে তাদের আলো থেমে যায়, কেননা, আকাশের শোভা ছাড়া তাহাদের অন্য অর্থ নাই, 'সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি তারায় তারায় খচিত', আমাদের কালো টিনের চালে এত ফুটো তবু আলো আসে না, অতএব সে রাতে পাতালপ্রতিম অন্ধকার ছিল। অন্ধকারের যে ব্যক্তিগত আলো থাকে, তা অরুণ প্রতিহারের জানার কথা নয়, তার জীবন যেভাবে বাহিত হয়েছে তার সবটাই ছিল দিনমান: স্পষ্টতার মধ্যে যে মিহি অস্পষ্টতা থাকে, প্রত্যক্ষতার মধ্যে যে সূক্ষ্ম অপ্রত্যক্ষতা থাকে তাও নেই। তার জীবনের প্রারম্ভে কিছু মহৎ ব্যক্তি, কথা ও গান যে আলোর ডালি সাজিয়ে দেয়, সেটাই বহন করতে করতে হঠাৎ সে খুন হয়ে যায়। অন্ধকারের আলোকপথে যে মহাজনরা নিঃশব্দ সঞ্চরণে অভ্যস্ত, অরুণ প্রতিহার তাদের দলে কখনও ভেড়েনি। আলোর যে ব্যক্তিগত অন্ধকার থাকে, তা অরুণ প্রতিহার হয়ত জানত না, জানলেও বিশ্বাস করত না। তপোক্লিষ্ট বুদ্ধের ছবির অস্থিরপঞ্জরের চেয়ে ঢের প্রত্যক্ষ ছিল তুলনামূলকভাবে নাদুস-নুদুস অরুণ প্রতিহারের ভেতরটা তার আকৈশোর লালিত নতুন পৃথিবীর স্বপ্নের আলোয়। তার কাছে আলো আলোই, অন্ধকার অন্ধকার, দ্বৈততা নেই, দ্ব্যর্থকতা নেই, একমাত্রিক। কিন্তু সেই আলোর পথিক জলের হৃদয় থেকে ভেসে উঠল অমাবস্যার রাতে। তখন তার নিজস্ব উদ্যম থাকার প্রশ্নটা নেই, যেহেতু সে তখন সাত দিবারাত্রির লাশ, ফুলে কিম্ভূতকিমাকার হয়ে গেছে শরীর, যা সে টুকটুকে লাল দিন পেড়ে আনবার জন্য প্রস্তুত করেছিল, আগামী দিনের নন্দিনীদের হাতে রক্তকরবী তুলে দেবে বলে যা সে কিশোরের মতো বা চে গুয়েভারার মতো সজীব রাখতে চেয়েছিল। কানাপুকুরের পোকারা পচা মাংস খেয়েছে উচ্ছৃঙ্খল স্বৈরাচারীর মতো। কিন্তু সেইসব স্বৈরাচারী যতটা উচ্ছৃঙ্খল ততটা শক্তিশালী নয়, পাড়াগত বা লোকাল কমিটিগত ক্ষমতাশালী বলে এখানে-সেখানে খুবলে খুবলে খেয়েছে, পরিকল্পনা বা ধারাবাহিকতার পরিচয় রাখতে পারেনি। তাই অরুণ প্রতিহার অর্ধেক চেনা অর্ধেক অচেনা নতুন শরীরে ভেসে উঠল। তার গলায় কোমরে পায়ে বাঁধা দড়ির অন্য প্রান্তে 'কল্যাণী' মার্কা থান ইট পর্যাপ্ত পরিমাণে বাঁধা ছিল। এত ভার বয়ে লাশের ভেসে ওঠার কথা নয়, অবিশ্বাস্য ব্যাপার,

ভাসমানতার বিজ্ঞান-বহির্ভূত কাণ্ড, এবং সে নাকি মাথা ও পায়ের দুই প্রান্ত সামান্য উঁচু করে নৌকার মতো ভাসছিল।

অরুণ প্রতিহার, অর্ধেক জীবনেই যার জীবনান্ত হয়ে গেল, বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে, বছর তিনেক আগে বিয়ে করেছিল, বছর খানেক আগে কন্যার পিতা হয়েছিল, বছর সাতেক আগে চাকরি পেয়েছিল, এই সংক্ষিপ্ত ও সাদামাটা জীবনে সে এক বর্ণও নিজস্ব উদ্যম দেখায়নি। চাকরিটা পেয়েছিল পার্টির সূত্রে, পার্টির ভারী বর্ষীয়ানদের সঙ্গে বাবার চেনাজানার সূত্রে, এবং পার্টির পুরনো লোক বলে কমিয়ে-সমিয়ে দু-লাখ টাকা ঘুষের সূত্রে, যেহেতু ঘুষ ছাড়া চাকরি হয় না, ঘুষ সবসময় খারাপ নয়, পার্টির কল্যাণে ব্যয়িত হলে খারাপ হবে কেন, পার্টির কল্যাণ মানে জনগণের কল্যাণ, জনগণের স্বার্থেই তো কাজকর্ম দালানবাড়ি দিশ-বিশটা গাড়ি, এবং যেহেতু ঘুষ এখন প্রধানতম শাস্ত্রীয় আচারবিধি, বাবার অকাট্য যুক্তি ছিল এই যে, মধ্য বা নিম্নমেধার ছেলেমেয়েদের উপার্জনের সবচেয়ে পবিত্র পথটি হল ঘুষ দিয়ে চাকরি জোগাড় করা, না হলে প্রতি পদে এত অপবিত্রতার সঙ্গে আপস করতে হয় যে জীবনে বেঁচে থাকাটা যন্ত্রণা মনে হতে পারে এবং সেই মনে হওয়ার মতো খারাপ কিছু হয় না। স্কুলজীবনে স্বাধীনতা সংগ্রামের হিড়িকে যিনি জেলে গিয়েছেন, পরবর্তীকালে বাম আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সচেতনভাবে রাজনীতি করেছেন, যিনি বস্তুবাদ শিখেছেন অতিক্লিষ্ট জীবনযাপনের ভেতর থেকে, সেই রামপদ প্রতিহারের যুক্তিশৃঙ্খল অস্বীকার করার হিম্মত হয়নি অরুণ প্রতিহারের বা সে হয়ত ভেবেছিল যে এটা আদর্শবাদিতারই শিক্ষা।

অরুণ প্রতিহারের বিয়ে হয় তার বাবা ও বাবার অগ্রজস্থানীয় এক বিশিষ্টজনের উদ্যমে। সরকারি চাকরি, যার কাছে ব্যবিলনের রানির শাল মলিন বস্ত্রখণ্ড; যা কর্ণের কবচকুণ্ডলের চেয়ে ঢের অভেদ্য সুরক্ষা; যা স্বর্গের অপ্সরাদের চেয়েও কামিনী, কেননা বয়স যত বাড়ে, রূপ ও লীলা তত খোলে; যার গন্ধের কাছে মৃগনাভি তুচ্ছ; যার বিশেষণে থাকে জনসেবকের বিনম্রতা, প্রশাসনে থাকে মোগাম্বোর হাসি; যার বহিরঙ্গে সুবচনসমুচ্চয়, অন্তরঙ্গ ধান্দাময়; যা ভূতের রাজার তিন বরের চেয়ে ঢের এফেক্টিভ; এবং যা পাওয়া সালভাদর দালির ভাবনার মতো আপাত অবিশ্বাস্য ব্যাপার। এর প্রভাবে যা হওয়ার তাই হল: দূরদূরান্তে দিকদিগন্ত প্রান্তসীমান্ত থেকে আত্মীয়স্বজন ও তাদের আত্মীয়স্বজন ও তাদের আত্মীয়স্বজন ও তাদের প্রতিবেশী সহকর্মী সহযাত্রী সহকারীদের বিবাহযোগ্যা সুন্দরী শিক্ষিতা সুবর্ণা সুকণ্ঠী সুভদ্রা গৃহকর্মে সুনিপুণার বয়স এবং শরীরের মাপ এবং জাতপাত-গোত্র-গণ সম্বলিত দেহচ্ছবি ঝরতে থাকল রামপদ প্রতিহারের তক্তপোশে। রামপদবাবু বেকার ও বিবাহযোগ্যার সংখ্যানুপাত বিচারে বসেছিলেন কিনা জানা যায় না, কিংবা সেখান থেকে দ্বিচারিতা ও ব্যাভিচারের অসহায় জগৎটি দেখেছিলেন কিনা, কিংবা এটাই সহজ বাস্তবতা বলে মেনে নিয়েছিলেন কিনা তা জানার উপায় নেই, কারণ রামপদবাবু সরকারি বামপন্থী, সত্য গুলিয়ে দেওয়ার কারসাজি তাঁকেও শিখতে হয়েছিল। যে কুয়াশা 'কপালকুণ্ডলা'য় নবকুমারদের নৌকো দিশাহীন করেছিল, তার চেয়ে কিছু লঘু ও আলোকবিম্বিত কুয়াশাময় প্রদেশ নেমে এল রামপদ

প্রতিহারের তক্তপোশে, চারপাশে। সে এক অরণ্যপ্রান্তর, রাত্রি আর দিন যার অস্থির পেণ্ডুলাম, জ্যোৎস্না আর দিবালোক কুয়াশার স্তরে স্তরে খেলা করে, কখনও জ্যোৎস্না নীচে কখনও দিবালোক, অগণন বৃক্ষ সেই প্রেমমধুরে মেতে বারবার হারায় হারাতে চায়, অন্ধকারের কুঞ্জে লুকোনো জ্যোৎস্নার খোঁজে ডুব দেয় বৃক্ষসকল, সে এক অরণ্যপ্রান্তর, মোহনবিভ্রম। রামপদ প্রতিহার সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না। পাত্রীপক্ষদের কাছ থেকে নানারকমের অফারের বজরা আসছিল। জামাইবাবাজিকে কেউ ফ্ল্যাট দিতে চায়, কেউ ব্যবসার শেয়ার, কেউ একাধিক গাড়ি, কেউ শহরের দূরে অদূরে রিসর্ট বানিয়ে দিতে চাইল: মেয়ে-জামাই মাঝেসাঝে গিয়ে থাকবে, বছরভর ভাড়া খাটাবে, ধুম লেগেছে পর্যটনে, নিরিবিলি জায়গার বড় অভাব। ছেলের জন্য মেয়ে খুঁজতে এতটা দিশাহীনতায় পড়তে হবে, রামপদ প্রতিহার ভাবতেই পারেনি। এবং তিনি সেই কুয়াশায় একা হয়ে যান: খোকার মা-কে বলা যাবে না, মেয়েমানুষের পেটে কথা থাকে না; খোকাকে বলা যাবে না, ওর বুদ্ধি সুদ্ধি পাকা নয়, ভালোমানুষ গোছের; কাছাকাছি কেউ নেই যার সঙ্গে পরামর্শ করা যায়, যার বিবেচনা চাওয়া যায়, যাকে বিশ্বাস করা যায়। রামপদ প্রতিহার নিজে যে জীবন কাটিয়েছেন, সেখানে এর সমাধান নেই, সেটা সাবেক ইস্কুলমাস্টারের জীবন, সেখানে সমাজ বেশি, নীতিকথা বেশি, ঋজুতা বেশি। কিন্তু সেখানে কি সমাধান সত্যিই নেই? যে কৃচ্ছ্রতায় তিনি দিনাতিপাত করেছেন, সেটাই কি সমাধান বলে দেয় না? ছেলের চাকরির জন্য ঘুষের টাকা জোগাড় করতে তিনি কম হেনস্থা হননি। সেই হেনস্থাই এনে দিল সরকারি চাকরি অর্থাৎ নিরাপত্তা, গৌরব, মর্যাদা। এবার পছন্দসই একটা মেয়েকে আনা যাবে ছেলের বউ করে, সঙ্গে মিলবে টাকা ফ্ল্যাট গাড়ি ব্যবসা। ঘুষের টাকা জোগাড় করা গেল বলেই না এসব হতে পারছে। ঘুষ না দেওয়ার আদর্শে যদি তিনি অটল থাকতেন, কী ভয়ংকর অনিশ্চয়তা অসহায়তা আর অসম্মানের মধ্যে গোটা পরিবারকে পড়তে হত ভাবা যায় না। তাঁর আদর্শবাদ খোকাকে চাকরি দিতে পারে না, তাঁর নীতিনিষ্ঠ জীবন পরিবারকে নিরাপত্তা দিতে পারে না, প্লেইন লিভিং অ্যান্ড হাই থিংকিংয়ের বাকতাল্লা তাঁদের উপহাস ছাড়া কিছুই দিতে পারে না। ধরা যাক, রামপদবাবু আর কিছু না হোক, দীর্ঘকালের পার্টি-ঘনিষ্ঠতার সুবাদে ছেলের চাকরির ব্যবস্থা করতে পারলেন, তাহলেও সরল ও সামাজিক একটা সিদ্ধান্তে আসা যেত। এমন তো নয় যে সেভাবে কারও চাকরি হয়নি। প্রচুর ভাগ্নে-ভাগ্নি ভাইপো-ভাইঝিকে জনগণের করের স্থায়ী হিস্‌সাখোর বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা পাইয়ে দেওয়ার ঘোরকৃষ্ণ অধ্যায়। সে রকম পেয়ে গেলে অন্তত দীর্ঘ বন্ধুত্বের, একটি আদর্শের সূত্রে অন্তত পাশাপাশি থাকার, একই দলের অন্তত অনুরাগী পরিচয়ের সম্মান হিসেবে মেনে নেওয়া যেত। তা হয়নি। রামপদ প্রতিহারের খারাপ লেগেছিল এ কথা ভেবে যে, গুণ নয়, যোগ্যতা নয়, কী কী পাওয়া যাবে, তার ভিত্তিতে একটি মেয়েকে পুত্রবধূরূপে বাছাই করাকে তিনি বিচক্ষণতা মনে করছেন। একটা প্রতিরোধ হয়ত গড়ে উঠেছিল, কিন্তু সেটা ভেঙে গেল এই ভাবনায় যে, তাঁর মেয়ে থাকলে পাত্র পেতে তিনিও সাধ্যের দূর বাইরে গিয়ে কত কিছু দিতে বাধ্য হতেন। ভাগ্যিস নেই। এরা

দেয় কীভাবে? এত টাকা পায় কীভাবে? রামপদবাবু রোজগার করতে পারেননি, ওরা পেরেছে। এই ওরা আগেও ছিল, এখন আরও বেশি আছে। কোনো প্রস্তাব সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা অতএব মূর্খতা।

সব কুয়াশা একদিন সাফ করে দিল জেলা কমিটির প্রবীণতর নেতার চিঠি। 'শুনলাম পুত্রের বিবাহ দিতে চলেছ। বাবাজীবন আমাদের সরকারে কাজ পেয়েছে। তোমার রাজনৈতিক জীবনের পুরস্কার তুমি পেলে। তাহার বিনিময় রূপে নয়, তোমার ন্যায় আদর্শবান ব্যক্তির যোগ্য কর্ম বলে বিবেচনা করে তোমার নিকট থেকে একটি উপকার প্রত্যাশা করতে পারি। আমাদের দলের নিবেদিতপ্রাণ সংগঠক নিরঞ্জন চক্রবর্তীর কন্যাকে তোমার পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করতে পারো। নিরঞ্জনের বৈষয়িক অবস্থা সুবিধের নয়। কন্যাটি লেখাপড়ায় ভালো শুনেছি। পরে ব্যবস্থা হতে পারে। তুমি নিরঞ্জনের সঙ্গে কথা বলিও। ভুলিও না এই সরকার জনগণের সরকার। সংগ্রামী অভিনন্দন সহ—'। চিঠি পড়ে রামপদবাবু ক্ষুব্ধ হন, কেননা, পত্রলেখকের নাতিনাতনি ইংরেজি মাধ্যমে লেখাপড়া করে পুঁজিবাদী দেশে ঘর বেঁধেছে, তখন তিনি নিরঞ্জনের কথা ভাবেননি, আর এখন রামপদর ওপর জরবদস্তি। কিন্তু রামপদ প্রতিহার যে দৃশ্যত হাসিমুখে নিরঞ্জনের মেয়েকেই পুত্রবধূ করে আনেন, হয়ত ভেবেছিলেন যে, পরে ব্যবস্থা হয়ে যাবে, যেহেতু সরকার হাতে আছে।

অরুণ প্রতিহারের নিজস্ব উদ্যমের একমাত্র প্রমাণ, তার বাবা হওয়া। জনক হতে সে দেরি করেনি। অবশ্য নিন্দুকেরা তাকে এই ক্রেডিটও দিতে নারাজ। তাদের যুক্তি, ওটা সবাই পারে। আমাদের চাকরি নেই, তাই করছি না। স্পনসর দাও, এখ্খুনি বানিয়ে দিচ্ছি। এই যে করছি না, এটাই বরং ক্রেডিট। অরুণ প্রতিহার কোনো সময়ই উল্লেখযোগ্য ছিল না। বেপাড়ায় খেলার মাঠে ওকে নিয়ে যাওয়া হত ক্রান্তি সঙ্ঘের সমর্থক বাড়াতে। রাত-বিরেতে ডাকা হত গরিবের মড়া পোড়াতে। হাসপাতালে রোগী ভর্তির জন্য সুপারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে ভিড় লাগে, তাই অরুণকে লাগে। সরস্বতী পুজোর প্যান্ডেলে রাতপাহারার লোক লাগে, তাই অরুণকে লাগে। রবীন্দ্রজয়ন্তীর জন্য তক্তপোশ আনতে বাঁশ পুঁততে লোক লাগে, তাই অরুণকে লাগে। অরুণকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট মতন কবিতা পড়তে দেওয়া হয়। শ্মশানবন্ধুদের লিস্টে অরুণের নাম লিখে দেওয়া হয়। দিওয়ালির জলসায় অরুণকে ভলান্টিয়ারের ব্যাচ ও পাঁউরুটি-আলুর দম দেওয়া হয়। অরুণ প্রতিহার কিন্তু সব কাজই সমান মনোযোগে করত, কেননা তার বিশ্বাস ছিল, এ পথেই মানুষের ভালো হবে। মানুষের ভালো হওয়ার ভাবনাটা তাকে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে দেয়নি বটে, সোজা ও সজীব রেখেছিল। সেই ক্যাব্‌লা অরুণ সরকারি চাকরি পেয়ে গেলে পুষ্করিণী আলোড়িত হয়। মালটা তলে তলে এত! বাপ্পোৎ কোন দাদাকে ধরল! ও নয়, ওর বাপ ধরেছে! পার্টিটা তো বৃদ্ধাবাস হয়ে গেছে! পোস্টার মেরে মিছিল করে রিগিং করে চাকরি হয় না। বুড়ো নির্ঘাৎ মাল খাইয়েছে। নোটের কাছে সব দাদা বোকাচো—। এবম্বিধ বিচার বিশ্লেষণ বিক্ষোভ বিপ্রতীপতা পুষ্করিণীর জল আদ্দির পাঞ্জাবির গিলার মতো অজস্র মিহি ভাঁজ সৃষ্টি করে

অচিরেই মিলিয়ে যায়, তবে অরুণ প্রতিহারের ওজন বাড়ে। অনেকেই তার বন্ধু, প্রকারান্তরে ঘনিষ্ঠ শত্রু। এক বৈঠকে তাকে ক্রান্তি সঙেঘর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব নেওয়া হলে সে এ পথে মানুষের ভালো হবে ভেবে রাজি হয়ে যায়। বিবাহ অরুণ প্রতিহারের ওজন আরও বাড়ায়, কেননা কিছু প্রাচীন নেতা ও আধুনিক আমলা তার বিয়েতে হাজির হন। সে এক অভাবিত নক্ষত্র সমাবেশ, কানাপুকুর কোনোদিন ভুলবে না, কৃষি-শিল্প-বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতি ও স্বাস্থ্যবান সুখীমুখী জনগণের বিজ্ঞাপনের মতো একটি সন্ধ্যা নেমে এসেছিল।

সেই অরুণ প্রতিহার হঠাৎ নিখোঁজ। ক্রান্তি সঙেঘর সদ্য সাজানো বাগানওয়ালা বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে কোথায় গেল, তখন রাত ৯-৪৫, শনিবার। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রটনা হল, বিপক্ষীয় দুষ্কৃতীরা অরুণকে তুলে নিয়ে গেছে। সন্ত্রাসের রাজনীতি। ওরা এভাবে আমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বানচাল করতে চায়। অনেক রাতে মিছিল বেরল প্রতিবাদের, প্রত্যাঘাতের। গুঁড়িয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও। জনমনে সাহস সঞ্চারের। রুখছি, রুখব। পরদিন রবিবার, বন্‌ধ ডাকা হবে কিনা আলোচনা হল। বন্‌ধের দিন ছুটির মেজাজ থাকে, ছুটির দিনে বন্‌ধের মেজাজ থাকবে। রবিবার বিকেলে কানাপুকুরের মাঠে সভা ডাকা হল।

অরুণ প্রতিহার তখন জলের নীচে শোয়ানো।

২

মরণ রাজবংশীর বউয়ের বিচিত্র একটা ব্যাধি আছে। ডাক্তার-বদ্যি করা হয়নি, গেলেই তো কমপক্ষে পঞ্চাশ টাকা খসবে, তার ওপর ওষুধ কিনতে হয় তো পুঁজিই খসে যাবে। কামাক্ষ্যা-ফেরত কামেশ্বরের থানে নিয়ে গিয়েছিল মুক্তোর মা : বড় বড় ডাক্তার-উকিল ইস্তক বাবার পায়ে লুটোচ্ছে, এক চিমটে সাদা মাটি খাচ্ছে, টান টান খাড়া হচ্ছে ; কামেশ্বর দু-কথা শুনেই বলল, স্বপ্নকস্তুরী, অনেকের আছে, কারও ধরা পড়ে. কারও পড়ে না, পেশেন্ট যা ভাবে তা নাভিকুণ্ডলীর ভিতর ঢুকে যায়, পরে কাঁচা মৌরির মতন গন্ধ বেরয়, পেশেন্ট জাগ্রন্তে ও ঘুমন্তে সেই গন্ধে বিবশ হয়ে এমন কাণ্ড করে যা কাণ্ডজ্ঞানে করে না, গন্ধটা অন্য কেউ পায় না তো তাই সামাল দেওয়া যায় না, কী বলি, জয় গুরু, চরণে অপরাধধমেব খণ্ডিত্তা ক্রিয়া ক্ষমে কুরু, নাম লিব না, সিনেমা ওয়ার্ল্ডের এক ছিপলির স্বপ্নকস্তুরী হয়, বাপ-খুড়োকেও পুরুষমানুষ মনে করে নির্বস্ত্রা করে দিত, তোমার তো তেমনটা হওয়ার কথা নয় মা, বলে কামেশ্বর মরণের বউয়ের বুক ও উরুর যেখানে চোখ বেঁধায় সেখানে হাত-পা রেখে মরণ ঘুমোতে ভলোবাসত, মাথা আর নাভির সুড়ঙ্গটা জ্যাম করে দিতে হবে, দু হপ্তা চাপ থাকলেই ভেঙে যাবে, পুরনো আমের সঙ্গে স্বপ্ন বেরিয়ে যাবে, বলে কামেশ্বর দু চিমটে মাটি তুলে এক চ্যালার হাতে দেয়, চ্যালা পুরিয়া করে বলে, দশ টাকা, কামেশ্বর বলে, পরপর দুটো শনিবার মাঝরাতে উলঙ্গ হয়ে খাবে মা, বটগাছের নীচে ছায়ার ফাঁকে ফাঁকে কামেশ্বরকে এত ছোটলোক লাগছিল যে মরণের বউ সেই পুরিয়া রাস্তায় ফেলে দেয়। একবার ভেবেছিল

মিনসেপালের ডাক্তারখানার ওষুধ বানায় যে রবি, তাকে কস্তুরী না ধন্তুরির ব্যাপারটা বলা যেতে পারে, ছেলেটা ভালো, তাছাড়া ও মরণের জাত, রাজবংশী, খোঁজখবর নেয়, কিন্তু বলা আর হয়নি। রোগটার এমনিতে কোনো জ্বালা-যন্ত্রণা নেই, শুধু ঘুমের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে মরণের সঙ্গে কথা বলা, মেলার মাঠে চলে যাওয়া, ঝুমকোকাটা কিনে দেওয়ার জন্য বায়না করা, বা ছেলেকে কোলে নিয়ে নাগরদোলা চাপা— এইসব শখভরানি করতে করতে ঘুম ভেঙে গেলে সে দেখে ঘর থেকে দূরে কোথাও দাঁড়িয়ে আছে, চারদিক নিশঝুম। মরণ গলায় দড়ি দেওয়ার কয়েক মাস পর তাকে ব্যাধিটা ধরে। লোকটা টের পেতে দেয় নাই যে পেটের ভেতরে মরার ফন্দি এঁটেছে, সেই রাতেও ভরা আদর করেছিল, জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়েছিল। মরণেরও কি স্বপ্নকস্তুরী ছিল? থাক না ব্যাধিটা, তবু তো মরণের সঙ্গে থাকা যায়, মেলার মাঠে তার হাত ধরে হাঁটা যায়, অন্য পুরুষকে মনে ধরে না।

এসব কথা এত বিশদে জানে না কানাপুকুরের বাসিন্দারা। এটুকু জানত যে মরণের বউয়ের মাথায় ছিট আছে। মরণের মৃত্যুর পর বাড়াবাড়ি হয়েছে। রাস্তা চওড়া হবে বলে সরকারি জমি থেকে উৎখাত হওয়ার ঘটনায় মরণ কিছুটা অসংলগ্ন হয়। তবে কানাপুকুরের বাসিন্দারা আর পাঁচজন উচ্ছিন্নের মতো নীল আকাশের নীচে পৃথিবী আর পৃথিবীর 'পরে নীল আকাশের মাঝখানে উদোম করে দেয়নি মরণের পরিবারকে, বাস্তুহারা রাজনীতির স্মৃতি মুছে ফেলে উন্নয়নের রাজনীতির চকমায় ফালতু করে দেয়নি মরণের পরিবারকে, উন্নয়নশীল পাড়ার প্রান্তে যেখানে আবর্জনা ও অন্ধকার সেইখানে অস্থায়ী ঘর বেঁধে থাকতে দিয়েছিল, ঘরের দোরে মাছ আসবে বলে। রোজ কি বাজারে যাওয়া যায়, ঘুম থেকে উঠতে না উঠতেই অফিস দাঁত খিঁচোয়, বিদেশি পুঁজি লগ্নি হবে বলে কর্মসংস্কৃতি নামক রামচাপ তৈরি হচ্ছে, আগে তো বিদেশি পুঁজি দূর হটো-র স্লোগান এরাই দিত, পরদেশি পরদেশি যানা নহিঁ। কর্মসংস্কৃতি না হলে পরিকাঠামো উন্নত হবে না, পরিকাঠামো উন্নত না হলে বিদেশি লগ্নি হবে না, কর্মসংস্কৃতি আনতেও যে পরিকাঠামো লাগে, বাস-ট্রেন ঠিকঠাক সময়ে ঠিকঠাক গতিতে চালাতে হয়, ট্রাফিক পুলিসের তোলাবাজি বন্ধ করতে হয়, প্রাইভেট আর মিনিবাসের ড্রাইভার-কন্ডাকটরদের দুষ্কর্মে পার্টিগত কৌশলগত স্নেহদান বন্ধ করতে হয়, সরকারি বাস হোক না তা পাণ্ডুরাজার ঢিবি খুঁড়ে পাওয়া প্রত্নবস্তুর মতো তবু তো পথে নামাতে হয় যেমন বিরোধী দল বন্‌ধ ডাকলে হই হই করে নামানো হয়, সেসব নেই, হবেও না কিছু, মাঝখান থেকে আমাদের খাওয়া-দাওয়ার পিণ্ডি চটকানো, রোজ কি অম্বের বরফ ব্রহ্মচারীর বড়ি মুখে রোচে না পেটে সহ্য হয়, একটু তাজা মাছ, চারাপোনা, মৌরালা, পুঁটি, চাঁদা, লোকাল মাছ খেতে কী যে ভালো লাগে, বাঙালি তো, মাছ-ভাত রসিয়ে খেতে না পারলে বাঁচা অর্থহীন, চর্যাপদের হিসেবে হাজার বছরের খাদ্যাভ্যাস ও সংস্কৃতি ধ্বংস করে কর্মসংস্কৃতি খাড়া করা যাবে কি? মরণ ও মরণের বউ লোকাল মাছ বেচে।

অরুণ প্রতিহারের দেহ যে রাতে ভেসে উঠল, সেই সর্বাচ্ছাদনকারী অমাবস্যায় মরণের বউ খয়রা মাছ মাথায় নিয়ে কানাপুকুরে গিয়েছিল। এবং সে দেখে পুকুরে একটা ডিঙি।

ডিঙিতে মরণ আছে কিনা দেখতে সে পাড় থেকে জলে নামে। মরণ বলেছে, ডিঙিতে বউকে নিয়ে গরালির খালে মাছ ধরতে যাবে। সে বউকে ডাকে। বউ স্পষ্ট দেখতে পায়। ডিঙির দিকে যেতে বউ জলে নামে। এবং ঠান্ডা জলে মরণ হারিয়ে যায়। শীতে কেঁপে উঠে বউ বোঝে, স্বপ্নকস্তুরী তাকে টেনে এনেছে। এই বিবরণ ক্রান্তি সঙ্ঘ সমবেত চিন্তাশীলরা অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দিতে পারে না। তারা জানে, মরণের বউয়ের বিচিত্র ব্যাধি আছে। সে গভীর রাতে 'পারশে মাছ যায়' বলে হাঁকতে হাঁকতে হাঁটে। যেমন সে সকালে হাঁকে। কোনো জানালা থেকে কখনও কখনও তার সম্বিৎ ফেরানোর চেষ্টা হয়, কখনও হয় না। পুকুরে মড়া ভাসছে দেখে সে যে চিৎকার করে উঠেছিল সেকথাও বলে। কথায় কথায় সে স্বপ্নকস্তুরী সারানোর চেষ্টার কথা জানায়। একঘর লোক উন্মুখ হয়ে তার বর্ণনা শোনে। কিন্তু সে কি সবটা বলতে পারে? বলা কি যায়? মরণের সঙ্গে ঘুরতে তার যে কী ভালো লাগে সে কথা কী করে বলে? সে যে আসলে স্বপ্নকস্তুরী সারাতে চায় না সে কথাই বা কী করে বলে?

সহসা একটি প্রশ্ন উঠল সভায়: বডিটা যে অরুণ প্রতিহারের তা সেই অন্ধকারে তুমি বুঝলে কী করে? তুমি তো বলছ, পিচকালা রাত ছিল, গাছপালাও দেখা যাচ্ছিল না। তাছাড়া বডিটা ভাসছিল পাড় থেকে দূরে।

কিছুক্ষণ সভা নিস্তব্ধ রেখে মরণের বউ জবাব দিল, আপনি বোধহয় মড়ার কথা বলছেন। আমি কিছু চিনি নাই। সে আপনার মড়া হতে পারত, আপনার বাপের মড়া হতে পারত, মায়ের হতে পারত। ভগবান সহায়, হয় নাই। যখন বুঝলাম ডিঙিটা আসলে মড়া, ভয়ে ছুটে পালালাম। পথে নেপালিটা ধরল। লোকটা ভালো। বাঁশি ফুঁকে আমাকে ঘরে পৌঁছে দিল।

এই প্রশ্নে হত্যাকারী খোঁজার চেষ্টা আছে, এভাবেও বলা যায়, হত্যাকারী খোঁজার চেষ্টা থেকে প্রশ্নটা উঠে এসেছে, বাংলা অনুবাদে ডিটেকটিভ কাহিনি পড়া ও টিভি চ্যানেলে দাঙ্গাহাঙ্গামা খুনখারাপি লুঠপাট বোমাবুলেট অপহরণধর্ষণ আগডোম বাগডোম হলোম্যানডেমোম্যান ইত্যাদি বেজায় দেখে যে গোয়েন্দা-বুদ্ধি স্টক হয় তা পাড়ার কাজে লাগানোর ইচ্ছা হতেই পারে, কিন্তু মরণের বউ যেভাবে জবাবটা দিল তাতে দ্বিতীয় প্রশ্ন আর ওঠেনি।

৩

অরুণ প্রতিহারের ঘটনা উচ্চতর পর্যায় থেকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা হয়। সেই উচ্চতর পর্যায় যে কী বা কীসের তা অস্পষ্ট। কানাপুকুরের বাসিন্দারা বলাবলি করে, হায়ার লেভেল এটা নিয়ে আর কথাবার্তা চায় না। হায়ার লেভেল শব্দবন্ধ যেহেতু ইংরেজি তাহা দ্বারা বাংলা হইতে সমধিক গুরুতর ও বিপজ্জনক বুঝায় হয়ত। এবং হায়ার লেভেল বিপজ্জনক বলেই মাননীয় এবং হায়ার লেভেল বিপজ্জনক জেনেই তার নেকনজরে থাকতে চাওয়া সাধারণ

মানুষের ধর্ম। কিন্তু হায়ার লেভেল যখন একাধিক হয়, মান্যতা একচ্ছত্র বা অবিসংবাদী থাকতে পারে না। অমুকদার লোক, তমুকদার লোক বা অমুকদার পকেট, তমুকদার পকেটে তা ভাগ হয়ে যায়। অরুণ প্রতিহারের ক্ষেত্রে তাই হল। প্রথমত তার মৃত্যুকে নিছক দুর্ঘটনা বলে চালানোর সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা হয়। কোনোভাবে পড়ে গিয়ে থাকবে—এরকম রটনা হয়। কানাপুকুর এলাকা উন্নয়নের তাপে মরুভূমি ও তারপর বহুতলের জঞ্জাল হওয়ার আগেই অরুণ প্রতিহার সাঁতার শিখেছিল, শিশু না হলে কানাপুকুরে ডুবে যাওয়া অসম্ভব, অদৃশ্য টানে ডুবিয়ে মারার কোনো মিথ কানাপুকুরের নেই ইত্যাদি জেনেও বাসিন্দারা আপাতত শান্তিকল্যাণের স্বার্থে রটনার বিরুদ্ধে যায় না। পেচ্ছাপ করতে গিয়ে মাথা ঘুরিয়ে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেস্‌লো হয়ত। আত্মহত্যা বলে সন্দেহ ছড়ানোর চেষ্টাও হয়। তবে সেটা খাওয়ানো যায়নি। অরুণ প্রতিহারের জীবনে আত্মহত্যার কারণ বা কোয়ালিটি ছিল না। তাছাড়া, আত্মহত্যা নিয়ে কথা বলতে লোকজন কেমন ভয় পায়, আক্রান্ত বোধ করে। এরপর এল হায়ার লেভেলের চাপ, মানে ব্যাপারটা ভুলে যেতে হবে। সব মৃত্যুই কোনো-না-কোনো ভাবে শোকের কারণ, ব্যস ওই পর্যন্ত। হায়ার লেভেল কেন এ কথা বলল? বোতলে দৈত্য থাকার খবরটা হায়ার লেভেলকে জানিয়ে তাকে দিয়ে বলানো হল। ক্রান্তি সঙ্ঘের সঙ্ঘতা নেই বুঝেও যারা এতদিন সঙ্ঘই শক্তি বলে প্রাণপণে কপচেছে, সেই সুকোদা, সুবোদা, সুমোদা, সুনোদা, সুধোদা আরও বহু হায়ার লেভেলের ছায়াতলে দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে সত্যান্বেষণের দাবি জানাল। তারা এইসব বলল: সত্য জানতেই হবে, সত্যকে চাপা দেওয়া মানে মিথ্যার রাজপথ তৈরি করা, সত্য কখনও চাপা থাকে না, বৃহত্তর স্বার্থে আমাদের সত্যটা বের করতেই হবে, সত্যের সঙ্গে আপস নয়। কাচের বোতলের সংহতি সতর্ক হাতে ব্যবহারের কথা হঠাৎ যেন সবাই ভুলে গেল। তাদের কথাবার্তা লিওনার্দো দা ভিঞ্চির পাঁচশো বছর আগে লিখে যাওয়া উপলব্ধির মতো শোনাল: আগুন মিথ্যা ও প্রতারণাকে ধ্বংস করে এবং সত্যকে রক্ষা করে। সত্য হল সোনা। কালের একমাত্র কন্যা হল সত্য। সত্যের আছে আগুন। মিথ্যার আছে মুখোশ।

কিন্তু কেলোটা এখানে যে, কে সত্য কে মিথ্যা, কে আগুন আর কে মুখোশ, কে বলবে?

সুন্দরবনের বাঘ তো সবাই নয় যে মিডিয়াকে এড়িয়ে চলবে, অরুণ প্রতিহারের খুন হওয়ার ঘটনাটি প্রথমে একটি সংবাদপত্রে প্রশ্নাকারে তোলা হল। শিরোনাম ছিল এই : 'কানাপুকুরে রহস্যময় মৃত্যু, পিছনে প্রমোটার চক্র?' সূত্র 'এলাকার মানুষ', 'স্থানীয় বাসিন্দা', 'নাম গোপনের শর্তে বিশিষ্ট সমাজসেবী'। তাতে রহস্যময়তা বাড়ে। এ কোন সভ্য স্বাধীন দেশ যে পরিচয় গোপন রাখতে হয়? পরিস্থিতি এতটাই খারাপ? সমাজবিরোধীদের হাতে চলে গেছে সমাজ? ভালোমানুষদের কথা বলার জায়গাটুকু নেই? খেলা জমে যায়। ঝাঁপিয়ে পড়ে আর আর সংবাদপত্র। খবরটা ধরতে হবে, খাওয়াতে হবে। মানুষকে সচেতন করার মনোভাব অল্প শতাংশ হলেও কাজ করে। বৈদ্যুতিক মাধ্যম ঘটনাস্থল: কানাপুকুর,

আশশ্যাওড়া, পাকুড়, ক্রান্তি সঙ্ঘ, বহুতল, নির্মীয়মান কাঠামো, রুমালের মতো মাঠে ক্রিকেটের বনসাইয়ের ফুটেজ নেয়; লোকও ধরে ক্যামেরায়, কিন্তু তারা ত্রস্ত, পলানিয়া। গুপ্তস্থান থেকে যারা সংবাদমাধ্যমকে ব্যবহার করেছিল, তদের লক্ষ্য ছিল প্রমোটার চক্র নামে অতিনিন্দিত ও অনির্দিষ্ট শত্রুর দিকে দায় ঠেলে দেওয়া। তাতে মানুষ প্রমোটার চক্রকে অমানবিক ও অসম্ভব ক্ষমতাসম্পন্ন গণ্য করে, সস্তা সচিত্র পুরাণে তারকা বা পুতনা রাক্ষসীর আদলে অতিদানবিকতার ছায়ামূর্তি তৈরি হয় এবং প্রমোটাররা নিরাপদে থাকে, কারণ তারা আর পাঁচজন মানুষের মতোই দেখতে, তারা সুবোদার বাড়িতে আড্ডা দেয়, সুকোদাকে গাড়ি দেয়, সুধোদাকে নার্সিংহোমের পার্টনার করে নেয়, সুমোদার বোনের বিয়েতে হেভি গিফ্‌ট দেয়, তারা রবীন্দ্রসঙ্গীতের জন্য খরচাপাতি করে, বাংলা গানের জন্য চাঁদাপত্তর দেয়, বাংলার পুজোর জন্য মোটা মাল ছাড়ে, বাংলা সংস্কৃতির জন্য হেভি ডোনেশন দেয় এবং বছরে কয়েকটা দিন দারুণ দারুণ পাঞ্জাবি লাগায়, তারা হাসিখুশি, মিশুকে, দরদী, এমনকী রঘুভাইয়ের দোকান থেকে গোটা পাউচ মশালা মুখে ঢালে ও নীচের ঠোঁট বাটির মতো করে কথা বলে। মেঘ বা মিডিয়ার আড়াল থেকে বাণ মারার আরও কয়েকটা উদ্দেশ্য অনুমান করা যায় : ১. এতদিন যারা প্রমোটারের সেবা পায়নি, অথচ পাওয়া উচিত ছিল, তারা জানিয়ে দিল যে এভাবে আর চলবে না। ২. এতদিন যারা প্রমোটারের দানা খেয়েছে, কিন্তু আরও বেশি চায়, তারাও বুঝিয়ে দিল যে হম কিসিসে কম নহিঁ। ৩. হায়ার লেভেলের নির্দেশ ফালটুস করে জানিয়ে দেওয়া হল যে, আমরাই আসল হায়ার লেভেল। ৪. জানিয়ে দেওয়া হল যে, শীঘ্র একটা রফায় আসা দরকার, নইলে সব ধান্দা ফেঁসে যাবে।

অরুণ প্রতিহারের মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনার এই বাঁক অপ্রত্যাশিত ছিল। নিখোঁজ হওয়ার তথা খুনের রাতে যে দলবদ্ধতায় বিপক্ষীয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কামান দাগা হয়, তাতে পুকুর থেকে নিজেরাই অরুণ প্রতিহারের বডি তুলে অনায়াসে বিপক্ষীয় দুষ্কৃতীদের হাতে যুবনেতার মৃত্যু বলে চালানো যেত। পরিকল্পনা সেইরকম ছিল। ভেস্তে গেল কেন? খুনের প্রমাণগুলি নষ্ট হয়ে গেলে বডি তোলার বুদ্ধিতে ইট বেঁধে রাখা হয়েছিল। তোলা হল না কেন? বডি তুলতে রাজি হয়নি অনেকে। ভয় পেয়েছিল। অরুণের পচা ফোলা শরীরের কথা ভেবে আঁতকে উঠেছিল। মৃতদেহের সামনে দাঁড়ালে ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা আছে বুঝেছিল। তারা চেয়েছিল, কোটি কোটি পোকা ওই দেহ দ্রুত খেয়ে শেষ করুক। তারা চেয়েছিল, ওই দেহ কোনোদিন যেন কেউ না দেখে। অনেকে এই ভেবে রাজি হয়নি যে, তারা তো খুনে সরাসরি জড়িত নয়, তুলতে গিয়ে জড়িয়ে যেতে পারে। যারা করেছে তারা তখন দায় স্বীকার করবে বা অভিযুক্তদের বাঁচাতে আসবে এমন ভাবাটা অপরিমেয় গাণ্ডুমি। বরং অন্যকে ফাঁসানোর সাফল্যে 'সোনার বাংলা'য় পার্টি দেবে। অনেকে তাদের নিজস্ব হায়ার লেভেল কী বলে কী করে তার অপেক্ষায় ছিল। ক্রান্তি সঙ্ঘ যে ভেতরে ভেতরে চিড়ফাড় হয়ে গেছে তা সূর্যালোকপ্রাপ্ত হয়ে গেলে কোনো গভীর রাতে কাকপক্ষীর অগোচরে বডি তোলার মতো কাজে পারস্পরিক বিশ্বাস অটুট থাকে কীভাবে? যে যার নিজের কথা ভেবে, নিজের

ফিউচারের কথা ভেবে, বেণী না ভিজিয়ে স্নানের কথা ভেবে, যে যার গোষ্ঠী রক্ষার কথা ভেবে, গোষ্ঠীই আসল শক্তিদাতা বুঝে আত্মরক্ষামূলক খেলার ছক নেয়। এখন মনে হয়, ইট বেঁধে ডুবিয়ে রাখাটা চরম মূর্খামি হয়েছে। তখনই বিপক্ষীয় দুষ্কৃতীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যেত। আসলে পুলিসের ওপর আস্থা রাখা হয়নি। ভেস্তে যাওয়ার আরও একটা কারণ, বিপক্ষে দুষ্কৃতী আর কই?

প্রত্যাশার পরিধির দূর বাইরে থেকে কানাপুকুরের শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের তরফে দেওয়া একটি বিবৃতি অরুণ প্রতিহারের মৃত্যুজনিত ঘটনাপ্রবাহকে নতুনতর বাঁকে ঠেলে দেয়। হয়ত বাঁক বলা যায় না, নিজেদের জমি বাঁচাতে বাঁধ তুলে জলস্রোত রুদ্ধ করতে গিয়ে পুরো ব্যাপারটাই ঘেঁটে দেওয়া হল। বিবৃতিব বক্তব্য এরকম: অতি প্রাচীন কাল হতে কানাপুকুর শান্তিপ্রিয় এলাকা। বাইরে থেকে এখানে বহুবার অশান্তির বীজ বপনের চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সেইসব চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়েছেন এখানকার সচেতন সতর্ক জনগণ। তাই কানাপুকুরের সামাজিক মানুষ নির্ভয়ে বস্তি স্থাপন করছেন, শান্তির নীড় গড়ে তুলছেন। কানাপুকুর এখন সর্বাত্মক উন্নয়নের দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি এক যুবকের দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর ঘটনা কেন্দ্র করে আবার তৎপর হয়েছে চক্রান্তকারীরা। মৃত্যু নিয়ে নোংরা রাজনীতি হচ্ছে। স্থানীয় মানুষ এর প্রতিক্রিয়ায় বিপন্ন বোধ করছেন। এলাকার শান্তিপ্রিয় মানুষ এই কথাটাই বলতে চান যে, যুবকের মৃত্যু দুর্ভাগ্যজনক ও বেদনাদায়ক হলেও ব্যক্তিগত বিবাদের পরিণতি। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, যুবক অবৈধ উপায়ে চাকরি পেয়েছিল। তারই জেরে যুবক কারও কারও শত্রু হয়ে পড়ে। অন্যায় চাপা থাকে না। ঘুষ দিয়ে চাকরি পাওয়ার দলেরই কেউ তাকে খুন করতে পারে। কোনও যোগ্য প্রার্থী ব্যর্থ হয়ে হতাশা থেকে এই চরম পথ বেছে নিতে পারে। শোনা যায়, বিয়ের পর যুবক কিছু জটিল সমস্যায় পড়ে। তার স্ত্রীর ব্যর্থ প্রণয়ী বদলা নিতে পারে। মোটা পণ নিয়ে বিবাহের পরিণামেও এই নৃশংস ঘটনা ঘটতে পারে। কারণ যাহাই হউক, তাহা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। কানাপুকুরের জনজীবনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই।

একদল এই বিবৃতিতে খুশি হল এই জন্য যে, শান্তিপ্রিয়রা দুর্দান্ত চাল দিয়ে ঘটনাটাকে নন-ইস্যু করে দিয়েছে। এরপর কেউ ব্যক্তিগত ব্যাপারে কৌতূহল দেখালেও তাতে নৈতিক-রাজনৈতিকতার আঁচ থাকবে না। অন্য দল এই বিবৃতিতে দারুণ খুশি হল এই জন্য যে, শান্তিপ্রিয়রা চরম হঠকারিতা করে ফেলল। ওরা অরুণ প্রতিহারকে তার মৃত্যুর জন্য দায়ী করতে গিয়ে রামপদবাবুকেই অসম্মান করেছে এবং এরপর দু-একটা মোক্ষম প্রশ্ন তুললে এরা পালিয়ে কূল পাবে না। শান্তিপ্রিয়দের কোনোভাবেই জিততে দেওয়া যাবে না, কারণ একবার জিতে গেলে শুধু কানাপুকুর ভরাটেই তা সীমাবদ্ধ থাকবে না, অন্য গোষ্ঠীগুলোকে সাইজ করা হবে, কারও কারও ওপর হেভি রোলার চালানো হবে, তাই তারা ধীরে-সুস্থে আক্রমণের পথ বেছে নিল। দুটি প্রশ্ন তুলে দিল তারা: এক. অরুণ প্রতিহার অবৈধ উপায় চাকরি পেয়েছে এটা আগে বলা হয়নি কেন? চাকরি পাওয়ার পরই অরুণ প্রতিহারকে সঙ্ঘের যুগ্ম-সম্পাদক করা হল কেন? ধরা যাক, প্রথমে তথ্যটা জানা যায়নি। যখন জানা গেল তখনই

সরানো হল না কেন? এটা কি মানা যায় যে খুনের পরই তার অবৈধ উপায়ে চাকরি জোগাড়ের ব্যাপারটা ধরা পড়ল? নাকি সব জেনেও চেপে যাওয়া হয় অন্য কারণে? দুই. অরুণ প্রতিহারের মোটা অঙ্কের পণের বিয়েতে নেতারা হাজির থাকেন কীভাবে? অর বিয়ে তো হয় পার্টির এক প্রবীণ দুঃস্থ নেতার মেয়ের সঙ্গে।

শান্তিপ্রিয়রা বুঝল, চালটা ভুল হয়ে গেছে। মারাত্মক ভুল। সবাইকে বাঁচানোর কথা ভেবে চাল দেওয়া হলেও সেই সবাই আর এক সবাই নয়। প্রতিটি সবাই নিজেকে বাঁচিয়ে অন্যকে ফাঁসাতে চায়। সম্মিলিতভাবে মোকাবিলা করার চেতনা নষ্ট হয়ে গেছে।

অতঃপর শুরু হয়ে গেল হননপ্রবণ খেলা। সুরোদা সুবোদার কীর্তি ফাঁস করে তো সুবোদা সুরোদার কর্ম জানিয়ে দেয়। ঝুলি থেকে বেরিয়ে পড়া অজস্র বেড়াল নিজেদের রক্তাক্ত করতে থাকে। দেখা গেল, শান্তিপ্রিয়রা শান্তি সম্পর্কে বহুবিধ মত পোষণ করে। মিডিয়া যথেচ্ছ ব্যবহৃত হতে থাকল। মিডিয়াই খেলা জমিয়ে ক্ষীর বানিয়ে দিল। টি ভি চ্যানেলে বহু মুখ পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে হাজির হল। জানা গেল, পুকুর লাগোয়া মাঠ বেচতে বাধা দিচ্ছিল অরুণ প্রতিহার। খুন হওয়ার আগে ক্রান্তি সঙ্ঘের বৈঠকে সে একদম একা হয়ে গিয়েছিল। তাকে সরানোর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয় সেই বৈঠকেই। সে জানত, তবু ভয় পায়নি। সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত হলেও সম্মতি আদায়ে গণতান্ত্রিক জবরদস্তি ছিল। উন্নয়নের দৌলতে পুকুরসহ জমির দাম ৪ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। প্লট হলে আরও উন্নয়ন। সঙ্ঘকর্তাদের উন্নয়ন। এরকম উন্নয়নের আবহ নষ্ট করতে কেউই চায়নি। কানাপুকুরের জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে, পাকুড়ের পাতায় রোদ ছুঁয়ে ছুঁয়ে, সাজানো গোছানো সার সার বহুতল সমাধি ছুঁয়ে ছুঁয়ে ক্যামেরা ঘোরে। ক্রমে ব্যাপারটা জৌলুস হারায়। তখন সবাই একযোগে বিবৃতি দেয়, সামান্য একটা ঘটনা নিয়ে মিডিয়া বাড়াবাড়ি করছে। সব কিছুই পণ্য বানাতে গিয়ে মিডিয়া নীতিবোধ হারিয়েছে। শেষ সাক্ষাৎকারে মরণের বউ মিডিয়াকে বলে, স্বপ্নকস্তুরীর টানে আমি বুঝলাম, জলের নীচে একটা চেনা মানুষ আছে। জেগে উঠলে তার সঙ্গে ভাসব আমি। খয়রা মাছ যায়। চাঁদা মাছ যায়। পোকা মানুষ খায়। কত পোকা, কিলবিল করে, মানুষ খায়। ডিঙি ভাসে। দূরে চলে যাব। পুকুরপাড়ে ক্যামেরা তাকে এমন করে ধরে যেন মরণের বউ জলে ভাসছে। আততায়ীদের সন্দেহ হয়, মরণের বউ তবে কি হত্যাকাণ্ড দেখেছে? তাদের উপদেষ্টারা অনুমান করে, মরণের বউ ঝঞ্ঝাট হতে পারে। উপদেষ্টারা বিরোধীরা বোঝে, মরণের বউকে মরতে হবে। কানাপুকুরের বাসিন্দারা জানল, অরুণ প্রতিহার শেষ পর্যন্ত উদ্যমহীন ছিল না।

৪ ক

সি ব্লকের মৈত্রেয়ী দেবী সে রাতে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে চেয়েছিলেন। কর্তা অফিসের কাজে বাইরে। ছেলে হোস্টেলে ফিরে গেছে। কাজের মেয়ে মুনমুন দু-দিন ছুটি নিয়েছে। মন খারাপ করা একা লাগাটা কাটাবেন বলেই মৈত্রেয়ী দেবী ১০টা নাগাদ খাওয়া-দাওয়া

সেরে মশারি টানিয়ে শুয়ে পড়েন। কিছুক্ষণের মধ্যে মাথার ভেতর ঝিমুনি ছড়াতে থাকে। মিহি ধোঁয়া ওড়ে। ঘুম আসার এই পর্বটা তাঁর চেনা। দিঘির ওপর জ্যোৎস্নার সরের মতো এই আচ্ছন্নতা, সরের ভেতর ঘুম স্বপ্ন অন্য পৃথিবী। কিন্তু তাঁর ঘুমের ইচ্ছেটা ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় মুছে গেল। মনে হল, এই আচ্ছন্নতাই ভালো। দিঘির ওপর জমা জ্যোৎস্নার সরের আবছা আলোয় নিজেকে দেখতে সাধ হল তাঁর। স্বামীর কথা নয়, ছেলের কথা নয়, নিজেরই ছেঁড়া ছেঁড়া ছবি নিয়ে এই আধো-জাগরণে থাকতে চাইলেন তিনি: বেনেপুকুর বিদ্যাপীঠে শীতের সকাল, কলাপাতা বেয়ে টিনের চালে শিশির পড়ছে টুপটুপ, সদ্য-কাচা গরদের কাপড়ের মতো রোদ পড়েছে দালানবাড়ির দক্ষিণ কোণে, খদ্দরের চাদর মুড়ে দাঁড়িয়েছেন ভাবিনীদি, হয়ত একটু বাদেই ঘণ্টা বাজাতে হবে, গণেশ বাহাদুরের ছেলে পেয়ারা গাছের ডালে হলুদ-ধোয়া জলের মতো টিয়া পাখির খাঁচা ঝুলিয়ে দিল, বড়দি কেড্‌স সু আর টুপি পরলে কে বলবে সেক্রেটারির স্মরণসভায় উনি 'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু' গেয়ে সবাইকে কাঁদিয়েছিলেন, সুধাদির বর চলে গেছে, যজ্ঞিডুমুরে বাসা হয়েছে টুনটুনির, বাসক গাছের পাশে গোল চাতালে ক্লাস নাইনের মেয়েরা আড্ডা দেবে টিফিনে, সুবজ জলের পুকুরে লম্বা ঢোঁড়া সাপ দুলে দুলে চলে গেল, ছুটির ঘণ্টা বাজলে ট্রাম লাইনের ওপারে পূরবীদির প্রেমিক দাঁড়ায়, শ্যামলীর লাল উলের বলটা সিঁড়ি ভেঙে গড়িয়ে যাচ্ছে, জিতেন্দ্রর মতো একটা ছেলে ঝাল মটর-চুরমুর-হজমি গোলি নিয়ে আসে আজকাল, রাস্তা থমকে লম্বা মিছিল যায়, ছাত্র ধর্মঘটের দিন স্কুলের গেটে পতাকা ওড়ে, গোলোকধামের কড়ি খোয়া গেলে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে খুশিপিসি, কৃষ্ণাদির বাবা ইনসুলিন নেয়, ভাদ্র মাসে সম্বন্ধ এলে মা কথা বলতে নারাজ, শুকনো কুলের ঝুড়ির ভেতর নাক ডুবিয়ে বসলে রূপকথার রাতের মতো গন্ধ মেলে, সুনুকাকিমা হাসিপিসিকে লেপের ভেতর জাপটে ধরে ঝাঁকায়...। মৈত্রেয়ী দেবী বিছানা ছেড়ে পায়ে পায়ে ড্রয়িংরুম পেরিয়ে বারান্দায় থেমে যান। জালের এপার থেকে তিনি সমুদ্রের মতো কালো আকাশের দিকে তাকান। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে তিনি একটা আলোর আভাস পান। বহু সমুদ্রের দূর থেকে আসা সেই আলো লেগে কয়েকটা মৃত নক্ষত্র শিশিরের মতো জেগে ওঠে। আলোকরেণু ওড়ে বাতাসে। রেণু জমে জমে একটা স্পষ্টতা বিমূর্ত হয় মেঘের গায়ে। হঠাৎ ঢোল-কাঁসির শব্দে আলো ষাঁড়াষাড়ির বানের মতো ভেঙে পড়ে। জেগে ওঠে ডিঙি। আশ্চর্য সাদা। তার দু-প্রান্তে সূর্য ও চন্দ্র বাঁধা। ডিঙির ভাসমানতায় তারা দোলে। ডিঙির গায়ে নীল কালপুরুষ, সপ্তর্ষি। পুরোভাগে দুটি চোখ মৈত্রেয়ী দেবীর চোখে চোখ রেখে ভেসে যায়। সূর্যের আলোয় সবাক সেই চোখের ভাষা মৈত্রেয়ী দেবীর চোখে গুহাচিত্রের মতো লেগে থাকে।

৪খ

ই ব্লকের মানস মজুমদার সে রাতে ৯টা নাগাদ বাড়ি ফিরছিল। তখন টিভি-র সামনে মা ও মেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। কোনো হিন্দি সিরিয়াল চলছে হয়ত। এ সময় এরা খুব ব্যস্ত

থাকে। কথা বললে বিরক্ত হয়। সে অফিসের জামাকাপড় ছেড়ে পাজামা গলিয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়ে। বাথরুমের কাজ দ্রুত হয়ে যায়, কারণ বেশ শীত পড়েছে এবং ঠান্ডা লেগে প্রাক-সর্দির লক্ষণগুলো সে টের পাচ্ছে। হাত-পা মুছতে মুছতে নিজের ঘরে ঢুকে চাদর খুঁজতে গিয়ে দেখে বিছানার ওপর সেটা তেমনই পড়ে আছে যেভাবে অফিস যাওয়ার আগে ছেড়ে গিয়েছিল। দুটো বই এবং নোটবুক তেমনই অগোছালো। মানস মজুমদারের মাঝে মাঝে নোট করার বাতিক চাপে। তখন নিষ্ঠার সঙ্গে কাজটা করে। এখন সে সার্জেন্ট বাপি সেনের মৃত্যুর ঘটনা নোট করছে। পুলিসেরই ৫ কর্মীর পাশবিকতায় খুন হলেন বাপি সেন। তিনি এক তরুণীকে নিগ্রহ থেকে বাঁচাতে গিয়েছিলেন। সরকার ব্যাপারটা এমনভাবে দেখাত চাইছে, যেন অভিযুক্ত ৫ পুলিসই দোষী, বাকি সব সন্ত। সব সরকারই এরকম করে। ডান বামে ভেদ নেই, অন্যরকম করা সম্ভব নয়। কারণ, রাষ্ট্র, বলা হয়, মানুষের জন্য, তা চালায় পুলিস-মিলিটারি। বিরোধীপক্ষ পুলিস-মিলিটারির কাজের সমালোচনা করতে পারে, যেহেতু তাদের হাতে রাষ্ট্রযন্ত্র নেই, কিন্তু ততক্ষণই, যতক্ষণ তারা বিরোধী আসনে বসছে, যেমন অতীতে বামরা সুযোগ পেলেই পুলিসের আদ্যশ্রাদ্ধ করত আর এখন পাদোদক পরিবেশন করে। এস ইউ সি-র মেয়েগুলোকে প্রকাশ্য রাস্তায় পুলিস যে মনুষ্যধর্ম থেকে লক্ষ মাইল সরে গিয়ে অর্ধনগ্ন করে লাঠিপেটা করল, তার প্রতিবাদে অতীতের বামপন্থীরা পর পর বাংলা বন্‌ধ ডাকা থেকে, কর্মসংস্কৃতির দফারফা করে দেওয়া থেকে আরও অনেক কিছু সংঘটিত করে ভোট পর্যন্ত ইস্যুটা জীয়ন্ত রাখতেন, যেমন তাঁরা অসীমা পোদ্দারের ক্ষেত্রে করেছিলেন। আজ তাঁরাই লকআপে মৃত্যু নিয়ে কেউ কথা বললেই চটে যান। পুলিসি নির্যাতনের বিরুদ্ধে কোথাও প্রতিবাদ দেখলেই সেই প্রতিবাদকে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত বলে চিহ্নিত করেন। বাপি সেনকে সেই রাষ্ট্রীয় প্রশ্রয়পুষ্ট ঘাতকরাই মেরেছে, মারাই যাদের কাজ। এঁদের সুরক্ষা দেওয়া সরকারেরই দায়িত্ব। বাপি সেনের মৃত্যুর ঘটনা আরও একটি কারণে প্রতীকী, যে তরুণীকে বাঁচাতে বাপি সেন প্রাণ দিলেন, সেই তরুণী আত্মগোপন করেছেন। সন্ত্রাস এখন এতটাই ভয়ংকর। বামফ্রন্টের শরিকি দলগুলোর নেতাদের হাতে-গরম বিদ্রোহী প্রেস কনফারেন্স বা সভা-টভায় সত্যোচ্চারণ এবং নিচুস্তরে কর্মীদের বিবাদ ও মৃত্যুর ঘটনাও নোট করে মানস মজুমদার, যেমন করে এন ডি এ-র শরিকদের ঝগড়াঝাঁটি। কিন্তু এটা তো নিয়মিত করে না। হঠাৎই কয়েকটা দিন পরপর, তারপর আজ নয় কাল হবে, তারপর বন্ধ, কী হবে করে? তার চেয়ে ভালো মনে করে গান শোনা, বই পড়া। আজ সকালে সে বাপি সেনের মৃত্যুর সেটের পাতায় সংযোজন হিসেবে লিখেছে: সন্ত্রাস তো আছেই, তরুণীটি সুবিধের নয় হয়ত। শহর-শহরতলিতে এরকম মেয়ে হাজারে হাজারে ছড়িয়েছে যারা ছেলেদের খেলায় এবং খেলার শেষ তক যেতে পারে না; দম ফুরিয়ে যায়। টিভি আর জার্নালের সিরিয়াল-বিজ্ঞাপন দেখে শেখা জীবনযাপনের জোর আর কতটুকু! যে-কোনো প্রসাধন ক্রিমের মতোই তা অসার। বাইরে মারকাটারি, ভেতরে বলহরি।

১৩৭. স্বপ্নকস্তুরী

মানস মজুমদার নিজের ঘরটা আরেকবার খুঁটিয়ে দেখে। সে যা ভালোবাসে, গান বই ছবি একটু সুগন্ধ কয়েকটি জামাকাপড়, এইসব নিয়ে কবেই নিজের কফিনে বন্দি হয়ে গেছে সে। নিজেই বানিয়েছে, নিজেই সাজিয়েছে। বিসমিল্লা বা বিলায়েত শুনতে শুনতে, জীবনানন্দ পড়তে পড়তে একদিন সে মরে যাবে, গণেশ হালুইয়ের মননময় নিসর্গে চোখ রেখে।

চা-বিস্কুট দিয়ে গেল মায়া, হয়ত বিজ্ঞাপনের ব্রেক কিংবা আরেকটা শুরু হতে কিছু দেরি আছে। মানস মজুমদার শিবকুমার শর্মা ও হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়ার যুগলবন্দি ক্যাসেট চালিয়ে আলো নিভিয়ে দেয়।

বাঁশি আর সন্তুরের সুরে কত বিমূর্ত ছবিতে দৃশ্যে আবহে স্বপ্নে চৈতন্যে সময় জড়ানো পটের মতো খুলে যেতে থাকলে মানস মজুমদার বারান্দায় দাঁড়ায়। আকাশে ভাসমান আলো তার চোখ টেনে নেয়। সে দেখে, একজন মানুষ উড়ে যাচ্ছেন, তাঁর চোখ-মুখ মাটির দিকে, চেনা-চেনা লাগে সেই মুখ, কিন্তু চিনে ফেলা যায় না, তাঁর শরীর চিত্রিত, আদিম লতাগুল্ম ও সুখ সাধ বৈরাগ্যের সবুজ হলুদ খয়েরির বিচিত্র দাগ ও ছোপছোপ অতিশয় প্রাচীনতা দিয়েছে। তাঁর উড়ন্ত শরীর ক্রমে জলযান হয়ে যায় এবং তা নিঃশব্দে অনিবার্যতার দিকে এগিয়ে যায় গণেশ পাইনের 'হারবার' ছবির জলযানের মতো।

৪গ

এ ওয়ান ব্লকের সুকুমার গাঙ্গুলি ওরফে সুকোদা সে রাতে বাড়িতে ঘনিষ্ঠদের নিয়ে আলোচনায় বসেন। পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে, যেন আল কায়দার হাতে চলে গিয়েছিল দেশটা, কোনো কথা বলা যাচ্ছিল না, কাউকে বিশ্বাস করা যাচ্ছিল না, এতকালের সহকর্মীদের বিশ্বাসঘাতক মনে হচ্ছিল। যেদিন মিডিয়ার বাড়াবাড়ির নিন্দা করে সঙ্ঘবদ্ধভাবে বিবৃতি দেওয়া সম্ভব হল, সুকোদা সেদিন স্বস্তি পেলেন কান্দাহারের পতনের খবরের মতন। অতঃপর এই সঙ্ঘবদ্ধতা ধরে রাখতে তাঁরাই যত্নবান হলেন, যাঁরা বিশ্বাস করেন যে সঙ্ঘবদ্ধতা ধরে রাখা যায় না। তবু পরিস্থিতি যতক্ষণ না আগের মতো হচ্ছে, ততক্ষণ যেভাবেই হোক ধরে রাখতেই হবে। সেজন্যই ক্রমাগত নিজেদের মধ্যে বসতে হবে। আবার যে বসা দরকার তা প্রতিটি বসায় বারবার বলতে হবে। কী কথা হল সেটা বড় কথা নয়, বসা হল। এভাবেই ভাঙনের চিড়ফাড়গুলো বাইরের চোখে মুখে ফেলা যাবে।

সুকোদা এতই জনপ্রিয় যে তাঁর চেয়ে দশ বছর বড়রও তিনি 'সুকোদা'। 'দা' শব্দটি মান্যতা শ্রদ্ধা সমীহা অর্থে তাঁর নামের অবিভাজ্য অংশ হয়ে গেছে। তাঁকে কেউ সুকো বলছে এটা ভাবাই যা না। এখানে মান্যতা যেন বাধ্যতামূলক, দা না বলা যেন বৈরিতা। সুবোদা, সুরোদা, সুধোদা প্রমুখের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। নামের সঙ্গে দা লাগিয়ে ডেকে ঘনিষ্ঠ হওয়ার একটা গ্রাম্য চল আছে বাঙালিদের মধ্যে। এটা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যাঁকে ডাকা হয় তিনি পছন্দ করেন। দাদা ব্যাপার আর কী! একবার বিশ্বভারতীতে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতপরিচয়

এক বয়স্ক ভদ্রলোক অম্লান দত্তকে 'অম্লানদা' বলে ডাকেন। অম্লানবাবু জবাব দেন, আপনি কবে আমার ভাই হলেন জানি না তো! সুকোদা সুবোদারা সেরকম বলেন না, মানুষের সঙ্গে থাকতে হয় তাঁদের। সুকোদার বাড়িতে সেই সন্ধ্যায় বসেছিলেন সুবোদা, সুরোদা, সুধোদাও। সুরোদার ঠান্ডা লেগেছে, বেশ কয়েকবার হাঁচলেন। সুকোদা বললেন, দিকে দিকে নাগিনীরা ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস। সুধোদা বললেন, সব বিষয়েই রবীন্দ্রনাথের লেখা আছে। যেমন, চরণ ধরিতে দিও গো আমারে, নিও না নিও না সরায়ে। বলুন তো সাবজেক্টটা কী? বলে দিচ্ছি, কুস্তি। সুরোদা বললেন, আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে-র হিন্দি তর্জমা কী? মেরি গর্দান উঠাকর পটক দে তেরা টেংরি পর। সুধোদা বললেন, এটা চালু আছে। তবে অনুবাদটা বোধহয় কোস্তাকুস্তির নয়। প্রসঙ্গ উঠল নীরেনদার। হিন্দি না জেনেও যিনি চটকল মজুরদের অবিসংবাদী নেতা হতে পেরেছিলেন। ওঁদের কথাই আলাদা। আমি তো বারবার বলি, ভাষা কোনো ব্যাপার নয়। দেখতে হবে, আপনি ওদের কথা বুঝছেন কিনা আর আপনার কথা ওদের বোঝাতে পারছেন কিনা। ব্যস। দরকার কমিউনিকেশন। ভাষা না জেনেও মনের কথা পড়ে নেওয়া যায়। আসলে সংলাপ গড়ে তুলতে হয় মনের ভাষার মাধ্যমে। তবে ভাষাও দরকার। শ্যামলবাবুর বক্তৃতা শুনতে লোক ভিড় করত কেন? অত সুন্দর ভাষায় কজন বলতে পারে? ওটা দরকার মধ্যবিত্ত এলাকায়। বক্তৃতা এক সময় কোন হাইটে উঠেছিল! বক্তৃতা শুনে শ্যামলদার প্রেমে পড়েছে অনেকে। ওরকম একটা কথা চালু আছে। শ্যামলবাবুর প্রতি পার্টি সুবিচার করেনি। বাদ দিন। এটা বিতর্কের সময় নয় বন্ধু। কেন পরিমলবাবুর কী হল? বাদ দিন। সামনে কোনো কর্মসূচি নেই। ব্রিগেড অনেকদিন হয়ে গেল। শীতের খাবার নিয়ে একটা প্রোগ্রাম করা যায় না?

এ সময় বারান্দার জালে শক্ত কিছুর ধাক্কা লাগার শব্দ শোনা যায়। সুকোদা দৌড়ে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে যান। সবাই জিজ্ঞাসা করেন, কী? জবাব নেই। সবাই জিজ্ঞাসা করেন, কী হল? জবাব নেই।

তাঁরা দেখেন, কানাপুকুরে ভেসে ওঠা ডিঙিটা বারান্দা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে, যেভাবে জেটিতে স্টিমার লাগে। অরুণ প্রতিহারের ঝুলে থাকা হাত দুটো যেন নোঙর। তার মাথা ও পায়ের দিকটা অল্প অল্প দুলছে, যেমন ঢেউয়ে দোলে। আর ডিঙি থেকে একাধিক হাত-পাওয়ালা জেলির মতো থকথকে শরীরের কৃমির মতো শাদা লুচির মতো গোল গোল পোকা নামছে। এটা রূপকথা নয়, নীতিকথা নয়, জাদুবাস্তবতা নয়, তাহলে পোকাগুলো এককভাবে বা দলগতভাবে চরিত্র হয়ে উঠত, তাহলে পোকাদের গায়ে উর্দি থাকত, তাহলে পোকারা যুদ্ধবিদ্যা জানত, এটা বাস্তব, রাশি রাশি পোকা ডিঙি থেকে নেমে কষ্টেসৃষ্টে জাল গলে ভেতরে ঢুকতে থাকে। কিছু পোকা থপ থপ শব্দে মাটিতে পড়ে যায়, গলে যায়। পোকারা খেতে এসেছে, ডিঙি থেকে নামছে, ওরা খাবে।

কাকবেলা

গরালির খাল থেকে চরণের ডাঙা পর্যন্ত লোকালয় ছানতা করে তিন জিপ আর পাঁচ ভ্যান ভর্তি পুলিসের হরেক মাপের অফিসার, কনস্টেবল, উর্দি, বুট, তকমা, আগ্নেয়াস্ত্র, খিস্তিখেউড়, বারফট্টাই, চুকলিবাজির বিশাল বাহিনী ধোঁয়া আর ধুলো ওড়াতে ওড়াতে সেতু পেরিয়ে গেল। কেব্‌ল লাইনে দিনভর খুনখারাপি হরণধর্ষণের বিশ্বায়িত বিনোদনের হিমঘরের মালের মধ্যে লোকাল টাটকা জিনিস অধিবাসীরা ভালোই খায়। বিশেষ করে কেসটার চিত্রলতা আছে, গুণ্ডামি-মালকড়ি-রাজনীতি ছাড়াও টেকনোক্রাট-ব্যুরোক্রাটের মিশেলে এক অনাস্বাদিত খাদ্যদ্রব্যের মোহমায়া পেয়ে যায়।

তখন হয়ত ধূসর অন্ধকারে ত্রস্ত কাক ছোট ছোট উড়ানে কোথায় আলো দেখে নিচ্ছে কিংবা মেঘলা দুপুরের ঠান্ডা বাতাসে গাঁজার মাঠে ইন্ডিয়ান পার্লামেন্ট খেলছে শালিখের দল।

তখন হয়ত পাখিমামা সুমিতেন্দ্র পত্রনবীশ বারান্দায় হাঁটতে হাঁটতে বলে উঠলেন, কোন বনেতে কটার বাসায় বাড়ছে ছোট ছানা/ডাহুক কোথায় ডিম পেড়েছে তার নখের আগায় জানা।

ধানবাদ থেকে বাবার চিঠি পায় সায়ম। লিখেছেন, সঞ্জয়ের কাছে শুনলাম, তুমি টাউন লাইব্রেরির সম্পাদকের সঙ্গে বিবাদ করেছ। শুনে আমি শঙ্কিত। ওরা অসম্ভব ক্ষমতাশীল। ওদের সংগঠন আছে। ওদের হাত কতদূর যায় তুমি জানো না। ওরা তোমাকে একঘরে করে দিতে পারে, তুমি যে দু-চারজন শিক্ষিত মানুষের বাড়ি যাও সেটা বন্ধ হতে পারে, তোমাকে নানাভাবে অপমান করতে পারে, তোমার ইন্টারভিউ লেটার আটকে বা মাঝপথে ফেলে দিতেও পারে, প্যানেলে তোমার নাম শেষ মুহূর্তে ধ্বংস করতে পারে। সঞ্জয় বলল, তুমি নাকি লাইব্রেরিতে কিছু সিরিয়াস বই আনার জন্যে চাপ দিচ্ছিলে। যা সব বই কেনা হয়, বেশির ভাগই রাবিশ বলেছ তুমি। আমি তোমার চিন্তাকে সমর্থন করি, কিন্তু কাজের বিরোধিতা করি। যা ভাবো, সেটা না করাই ভালো। চিন্তাশক্তিকে প্রখর রাখো, আচরণকে সময়োপযোগী করে নাও। তুমি ভেবো না যে লাইব্রেরির বই সম্পর্কে তুমি একই এরকম ভেবেছ। অনেকেই ভাবে, বলে না। তুমি হয়ত জানো না যে, লাইব্রেরির বই কেনা হয় পয়ঃপ্রণালী দিয়ে, যার পঙ্কিলতা ও দূষণ থেকে সমাজ কোনোভাবে রেহাই পেতে পারে না। তোমাদের সম্পাদক হয়ত সেই প্রণালীর বাসিন্দা। পার্টির বই কেনার বাধ্যবাধকতাও আছে লাইব্রেরির পরিচালকদের।

সুতরাং কী দরকার! আমি তোমাকে ভালো বই কিনে দিতে পারিনি। দু-বেলা ঠিকমতো খাবারই জোটাতে পারিনি। আমি অনুতপ্ত। আশীর্বাদ করি, তোমার সন্তান যেন প্রচুর ভালো বই পায়। সেই আর্থিক যোগ্যতা যেন তোমার হয়।

সল্ট লেক থেকে অরূপ ঘটক বলছি। হ্যাঁ বলুন। খুব সুন্দর সুন্দর গান বাজাচ্ছেন। পালদা। আমাকে পালদা বলেন শুধু ভাটপাড়ার বৈদ্যনাথ মজুমদারমশায়। উনি জানিয়েছেন, ওঁর বয়স সেভেনটি-সিক্স । আপনারও কি সেইরকম ঘটকমশায়? না না, আমার ফিফটি-ফোর। তাহলে আমার চেয়ে সামান্য জ্যেষ্ঠ। বলুন, অরূপবাবু, গানের কথায় আসা যাক। বলি কী, পুরনো দিনের বাংলা গান কী ভালো ছিল! হুঁ। যত শুনছি মন ভরে যাচ্ছে। কবেকার গান আজও বার বার শুনতে ইচ্ছে করে। এখন তো সব হাগ্গুলুপ্পু বাজিয়ে বাঁদরামি চলে। কাজের কথাটা বলে ফেলুন। বলি কী, একটা দেশাত্মবোধক হয়ে যাক। আমাদের সময় দারুণ একটা গান ছিল, ওই যে, ও আমার দেশের মাটি তোমার পায়ে লুটাই মাথা। অরূপবাবু, আপনাদের সময়ে, আমাদের সময়েও স্কুলে পড়া ভুল করলে মাস্টারমশাই বেঞ্চের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখতেন। এখনই ভুলটা শুধরে নিন।

মিতুলদির গান শুনতে পায় সায়ম। গরালির খাল পুবের বাঁকে নদী নদী ভাব, ডিঙি আসে, ভাসে, গাংচিল ওড়াউড়ি করে, সজনের ডালে মাছরাঙা ঝুঁকে থাকে, ধৈর্যের ভারসাম্যের ছবি হয়ে দাঁড়ায় বক, আকাশের বাঘের মতো কোড়ল চিল বিশাল ডানায় ঝপঝপিয়ে নেমে এসে তীক্ষ্ণ কঠিন আঙুলে পাকড়াও কাতলা নিয়ে উড়ে গিয়ে বসে অশথের চূড়ায়, তুমুল বৃষ্টি আর হাওয়ায় ঝাপসা ছবি থেকে ঝলসে ওঠে গভীর সবুজ, ভূমধ্যসাগরের জলজ উদ্ভিদের সঙ্গকামনায় অস্থির হয়ে ওঠে বাংলার কলমি কচু বোধকুমারী, রাতের অন্ধকারে চরাচর জুড়ে গোটাকতক আলো ভেসে বেড়ায় পবিত্র গ্রন্থের স্মৃতির মতো, শকুন্তলার হারানো আংটির খোঁজে জল আর অন্ধকার তোলপাড় করে কতিপয় ধীবর, মিতুলদি, এ কী লাবণ্যে পূর্ণ দেহ, আলোকের স্তম্ভিত ঝরনাধারা মিতুলদি গায়, সুদূর কোন নদীর পারে/ গহন কোন বনের ধারে/ গভীর কোন অন্ধকারে হতেছ তুমি পার।

সায়মের দিদিমা সুনয়নী দেবী রামায়ণ পড়েন, আলোচনা করেন। জানালায় হেমন্তের দুপুর বা চৈত্রসংক্রান্তির সন্ধ্যা। তাঁর সুরেলা পাঠ থেকে ছবির পর ছবি ফুটে উঠতে থাকে: জটায়ু নামেতে পক্ষী গরুড়নন্দন।/ দূর হইতে শুনিল সে সীতার ক্রন্দন।/ আকাশে উঠিয়া পক্ষী চর্তুদিকে চায়/ দেখিল রাবণ রাজা সীতা লয়ে যায়। জটায়ুকে দেখে সীতা কান্নায় রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, আর্য জটায়ু! দেখ এই দুরাত্মা রাক্ষস আমাকে অপহরণ করছে। এই দুর্মতি অত্যন্ত ক্রুর, বলবান ও গর্বিত। এর হাতে অস্ত্রশস্ত্র আছে। তখন গিরিশৃঙ্গাকার প্রখরতুণ্ড বিহঙ্গ বললেন, রাবণ! আমি সত্যসঙ্কল্প, ধর্মনিষ্ঠ ও মহাবল। আমি পক্ষিগণের রাজা, নাম জটায়ু। আমার সমক্ষে এইরূপ গর্হিতাচরণ উচিত নয়। কোনো বোধ নাই তোর রাজা দশানন/ কোন জ্ঞানে করিলি পরস্ত্রীহরণ। তোর মতো পাপাচারী দেবযান বিমান লাভ করল কীভাবে? তোর মতো দুর্বৃত্ত রাজৈশ্বর্য লাভ করল কীভাবে? তোর মতো অহিতবুদ্ধি প্রজাপালন করে কীভাবে? রাবণ, আমি বহুকাল পৈতৃক পক্ষিরাজ্য শাসন করছি। আমার বয়স ষাট হাজার

বছর। আমি বৃদ্ধ, তুই যুবা, তোর হাতে শরাসন সর্বাঙ্গে বর্ম, তুই নভোরথে উড্ডীন। তথাপি আমি তোর কুকর্মে বাধা দেব। দুই পাখা পসারিয়া আগুলিল বাট।/ রাবণেরে গালি দিয়া মারে পাখসাট।/ কী কব হয়েছি বৃদ্ধ ঠোঁট হইল ভোঁতা।/ নতুবা ফলের মতো ছিঁড়িতাম মাথা। সভ্যতার সেই প্রাচীন পর্বেও লুণ্ঠিত হয়েছে নারী, বাধা দিয়েছে পাখি, প্রকৃতির প্রতীক। অকুতোভয় জটায়ু...। কাহিনি চলে।

বড়মামা সুধীরেন্দ্র পত্রনবীশের আর্তনাদ শোনে সায়ম। একদা যিনি দক্ষিণ ও উত্তর বাংলার মাইল মাইল জুড়ে চলমান থেকেছেন,. পাস-করা বাঙালিরা অনুপ্রাসের কেরদানি করে 'কাকদ্বীপ থেকে কালিয়াচক', 'খড়গপুর থেকে খড়িবাড়ি' ইত্যাদি যে বলেন তা সুধীরেন্দ্রের জীবনে অনেকটাই ঘটনা, পুলিস যখন শিলিগুড়িতে তাঁর থাকার খবর পেয়েছে, তখন তিনি সিউড়িতে, 'পত্রপুটে'র দোতলার পশ্চিমের ঘরটাই হয়ে উঠেছে তাঁর শেষ জীবনের পৃথিবী, ইতিহাস, স্বপ্ন, সংকল্প। বালিশে ভর দিয়ে হাড্ডিসার শরীরটা বহু কষ্টে খাড়া করতে করতে সুধীরেন্দ্র বলতে থাকেন, তোমরা আমার কষ্ট কোনোদিন বুঝবে না। তোমাদের বলা বৃথা। মাটি বোঝে, পাথর বোঝে, গাছ বোঝে। তোমরা বোঝো না। তোমরা বিশ্বাস করো না যে আমার কষ্ট হয়, মাথার ভেতরটা জ্বলে যায়, শিরায় শিরায় আগুন, মাথায় যেন ধুনুচি, পুড়ে যায়। মিতুল, তুই আমাকে বিশ্বাস করিস না। তুইও চলে যাবি আমাকে ছেড়ে! কে আমাকে স্বস্তি দেবে? আমি যে আর সহ্য করতে পারি না। মিতুলদি এসে টেবিলের ওপর রাখা বই খুলে পড়তে শুরু করে, ঝরঝরিয়া বটতলীর মসজিদ। পাহাড়শ্রেণীর বুক চিরে একটা নালা পশ্চিমদিক দিয়ে সমতলভূমিতে পড়েছে। বিপ্লবীদের মাথার ওপর সুনীল আকাশ। বুকের নীচে পাহাড়ের লাল মাটি। মনে যুদ্ধের সাধ। শত্রুসেনাকে পরাস্ত করার জন্য বিপ্লবী তরুণদের উত্তেজনা চরমে। মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করার পরমলগ্ন সমাগত। দেশপ্রেমিক বীরেরা ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা ভুলে গেলেন। বিপ্লবীদের দৃষ্টি পাহাড়ের নীচের দিকে। তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন, গুর্খা সৈন্য কাতারে কাতারে ছোট ছোট গাছের আড়ালে আড়ালে পাহাড় বেয়ে ক্রমে এগিয়ে আসছে। যুদ্ধ মানেই জীবন দেওয়া-নেওয়া র পালা। জেনারেল বল দেখলেন, শত্রুসৈন্য রাইফেলের গুলির পাল্লার মধ্যে এসে গেছে। তিনি নির্দেশ দিলেন, ফায়ার। পাহাড়ের বুকে প্রতিধ্বনি হল। গর্জে উঠল বিপ্লবীদের অস্ত্র, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। সুধীরেন্দ্র ঘুমিয়ে পড়েন, শিশুর মতো।

একটা অদ্ভুত মন্তব্য করে সেজমামা সুখেন্দ্র পত্রনবীশ দু-একদিনের জন্য 'পত্রপুট' স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন। দিদিমা পুরাণ পড়েন না, বড়মামা আর্তনাদ করেন না, পাখিমামা পাখির কথা বলেন না, মিতুলদি গান গায় না। গোটা বাড়ি যেন পুকুরের পাঁকে ডুবে থাকা কবেকার হবিষ্যির মাটির হাঁড়ি। বড়দার সঙ্গে মিতুলের বাজে সম্পর্ক আছে। না হলে বড়দা মিতুলের বিয়েতে এত আপত্তি করবে কেন? সেজমামাকে বেশি হলে পাঁচ-সাতবার দেখেছে সায়ম। কলকাতায় থাকেন। বড় চাকরি করতেন। ছেড়ে দিয়েছেন। ব্যবসা করেন। সরকার বলতে যাদের বোঝায় সেরকম মন্ত্রী-আমলার সঙ্গে বিশ্বাস ও বিনিময়ের সম্পর্ক আছে। সেই সূত্রে প্রচুর সম্পত্তি করেছেন, দুর্নীতিদমনের ভাষায় যাকে বলে, হিসাব-বহির্ভূত। তিনি খেলা

উপলক্ষে, পুজো উপলক্ষে, জলসা উপলক্ষে, বন্যা উপলক্ষে, ভূমিকম্প উপলক্ষে দান করেন। বিভিন্ন জায়গায় তাঁর নাম ও ছবি দেখা যায়। পোশাক-আশাক মূলত সাদা, স্যুটগুলো রঙিন। গণতন্ত্র বলতে যে রাজনীতি-সম্পৃক্ত মানুষজন বোঝায়, সেখানে তাঁর মান্যতা আছে। সায়মকে তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন, সব ক্ষীর কলকাতায়। গরালিতে থেকে হবেটা কী? যদি গরালিকে ভালোবাসো, কলকাতায় কামাও, এখানে ঢালো। সেজমামার তীক্ষ্ণতা এড়ানো যায় না। ব্যর্থ মানুষের জীবনে অনেক গল্প থাকে, ভেজা ভেজা, পবিত্র পবিত্র, ধূপের গন্ধ-টন্ধ ছাড়ে, পুণ্যির পাপড়ি-টাপড়ি ওড়ে। কাজের লোকদের গল্প নেই, কাজটাই পরিচয়। সে-সব শুনতে খুব একটা ভালো লাগার কথা নয়। তোমার অন্য মামাদের মতো আমার জীবনে গল্প নেই। প্রচণ্ড পরিশ্রম, প্রচণ্ড টেনশন, নিদ্রাহীন রাত আর স্বস্তিহীন দিনের কথা শুনতে তোমার ভালো লাগবে কি? জনগণ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া সোজা, বাস্তব থেকে সরে যাওয়া সোজা, সেটা তো দায়িত্ব থেকে পালানো। কল্পিত স্বর্গ মূর্খের ঠিকানা, আমার নয়। দিদিমার অসুস্থতার সময় বাড়িতে তাঁর হকের ভাগ পাকা করতে এসেছিলেন সেজমামা। গরালিতে আমি থাকব না, আমার পরিবারেরও কেউ আসবে না, তাই বলে আমার প্রাপ্য তোমরা মেরে দেবে? তোমরা জীবনে কিছু করতে পারোনি বলে আমাকে কেন বঞ্চিত হতে হবে? এ যুক্তি প্রতারকের বা ভিখিরির। তোমরা তো তেমন নও। বড়মামার সঙ্গে মিতুলদির অবৈধ সম্পর্ক থাকার সম্ভাবনা ব্যাখ্যা করে উজ্জ্বল হেসে, হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন, পাড়ার লোকজন তাঁকে নমস্কার করতে লাগল, তাঁর কাছাকাছি আসতে ঠেলাঠেলি করতে লাগল, ভিড় বাড়তে থাকল, জানালায়-বারান্দায় মেয়েরাও স্থির হল, তিনি, নানাভাবে সবাইকে ছুঁয়ে গেলেন।

ধানবাদ থেকে চিঠি আসে বাবার: কল্যাণীয়েষু, সঞ্জয়ের কাছে শুনলাম, তোমাকে টাউন লাইব্রেরির পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন স্বয়ং সম্পাদক। তুমি ফিরিয়ে দিয়েছ। তোমার যুক্তি কী আমি জানি না। হয়ত অসাধুতার সঙ্গে তুমি থাকতে চাও না। হয়ত তোমার চিন্তা গুরুত্ব পাবে না বলে নিজেকে দূরে রাখছ। এটা যদি যুক্তি হয়, আমার তাতে সায় নেই। তুমি ভুল করছ। নিজেকে বিচ্ছিন্ন করছ, অপ্রয়োজনীয় করছ। দূরে থেকে তুমি কিছুই করতে পারো না। একরকমের তৃপ্তি পেতে পারো। সেটার কোনো মূল্য নেই। কিন্তু পরিচালকমণ্ডলীতে গেলে দু-একটা হলেও ভালো বই কেনার কথা বলতে পারতে। দু-চারজনকে বোঝাতে পারতে। না-ই বা থাকল তোমার কথা, একটা গ্রহণযোগ্যতা তৈরির সুযোগ পেতে। পদের এখানে অনেক গুরুত্ব। পদে থাকলে পাহাড়, না থাকলে বালিহাঁসের পালক। তোমার কাছে ঘুরঘুর করবে লোকজন। তারা কী ভীষণ বিনীত। তোমার হয়ে কাজ করবে, তোমার হয়ে কথা বলবে, লড়াইও করতে পারে। নিজের গোষ্ঠী তৈরি করতে পারো। তাহলে জোর আরও বাড়ে। কিছু পাইয়ে দেওয়ার মতো জায়গায় তুমি আছো বলেই এটা সম্ভব। ক্ষমতাহীন মানুষের ভালো ভালো কথা নিয়ে লোকে ঠাট্টা করে, ভদ্রতাবশত করুণা করে। তুমি বলবে, টাউন লাইব্রেরির পরিচালকমণ্ডলীব সদস্য— এ আর এমন কী পদ। মানছি, খুবই ছোটখাট ব্যাপার। কিন্তু এসব জায়গাই পাঠশালা। শেখার সুযোগ অনেক। চুপচাপ

দেখবে, অন্য সদ্যস্যরা কীভাবে নিজেদের লোককে পাইয়ে দেয়, বিনিময়ে নিজেরা পায়। দেখবে, কী সৌজন্যপূর্ণ আচরণে আপত্তিকর কাজকর্ম করে যায়। দেখবে, তারা নিজেদের কাজকর্মের পক্ষে কীভাবে যুক্তি সাজায়। দেখবে, তারা দারুণ কথা বলে। এ-সবই শেখার। জীবন গঠিত হয়। ধরো, তুমি পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য হয়েছ। লাইব্রেরির সদস্য হওয়ার জন্য কাউকে অ্যাক্নলেজ করার অধিকার তোমার আছে। এটা একটা সম্মান। কাউকে ছোট মাপের হলেও অনুগ্রহ দেওয়ার মতো জায়গা তোমার হয়েছে। দেখবে, তুমি সামাজিক মর্যাদা পাচ্ছ। বিশেষ করে বই-টই জড়িত ব্যাপার তো। দেখবে, সাধারণ পাঠক কোনো বই সম্পর্কে তোমার মতামত জানতে চাইছে। অর্থাৎ তুমি মতামত দেওয়ার জায়গায় পৌঁছেছ। যেহেতু তুমি পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য, তোমার কথা ফেলনা নয়। এ সময় কোনো সংকীর্ণতা দ্বারা চালিত হওয়া উচিত নয়। পরিচালকমণ্ডলীর অন্য সদস্যদের দেখে শিখে নাও কী বলতে হয়, কীভাবে বলতে হয়। তাদের চেয়ে ভালো বলা অভ্যাস করো। খেয়াল রাখবে, তুমি বুদ্ধিজীবী হতে চলেছ। তাই ভারসাম্য রাখতে শেখা খুব দরকার। একদিন তুমি সে জায়গায় পৌঁছবেই, যখন তুমি যে-কোনো বইকে নস্যাৎ করে দিতে বা মহৎ করে দিতে পারো। বৈষয়িক দিকটাও বিবেচনা করবে। কিছু রগরগে উপন্যাস বা বহু-বিজ্ঞাপিত বইয়ের সবসময়ই একটা চাহিদা থাকে। সেরকম বই কোনো পাঠক বা পাঠিকাকে ভেতর থেকে পাইয়ে দিলে। সবাই এই কর্ম করে। তোমার লজ্জিত হওয়ার কারণ নেই। ভেতর থেকে পাইয়ে দেওয়া তোমাকে বিশেষ ক্ষমতাবান হিসেবে পরিচিত করে। অনুগৃহীতেব সংখ্যা বাড়ে। পাড়ার মধ্যবিত্ত পরিবারে খাতির-যত্ন মেলে। দু-চারজন পাঠিকার সঙ্গে সম্পর্ক হতে আপত্তি কী। বড় হচ্ছ, এই বয়সে নারীসঙ্গ, সঠিকভাবে বললে নারীশরীর, লাগে। লাইব্রেরির বই কেনায় তোমার ভূমিকা থাকবে না কেন? সেখানে কমিশনের ভাগ তোমার প্রাপ্য। গোপনে কমিশনের ভাগ নিচ্ছ, আর ২৫ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ভাষণ দিচ্ছ—এ ছবি আমি দেখতে পাই। আশীর্বাদ করি, জীবনে বড় হও, সফল হও।

'মালঞ্চে পুষ্পিতা লতা অবনতমুখী,/ নিদাঘের রৌদ্রতাপে একা সে ডাহুকী/বিজন-তরুর শাখে ডাকে ধীরে ধীরে/বনচ্ছায়া-অন্তরালে তরল তিমিরে।' গরালির খাল ধরে পশ্চিমে হাঁটতে হাঁটতে এক বৈশাখের দুপুরে আবৃত্তি করেছিলেন পাখিমামা সুমিতেন্দ্র পত্রনবীশ। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কার কবিতা বলতে পারিস? সায়ম চারটি লাইন আবার শুনতে চাইল। 'মালঞ্চে পুষ্পিতা লতা', 'নিদাঘের রৌদ্রতাপ', 'বিজন তরু', 'বনচ্ছায়া অন্তরালে' শুনতে শুনতে তার রবীন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথ মনে হয়। রবীন্দ্র-অনুসারী অন্য কেউ হতেও পারেন। গোটা কবিতা শুনলে অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু পাখিমামা অনেক চেষ্টা করেও পুরোটা মনে করতে পারেন না। তাঁর স্মৃতি খুবই জোরালো। তবু হাঁটতে হাঁটতে নানাভাবে আলো ফেলেও হারিয়ে যাওয়া পঙ্ক্তিগুলো উদ্ধার করতে পারলেন না। সায়ম হয়তো রবীন্দ্রনাথ বলেই দিত, খটকা লাগল 'তরল তিমির'-এ। পাখিমামা বললেন, শুনতে পাচ্ছিস? ডাকছে। লালন ফকিরের মতো। লালন ফকিরের গলা শোনেনি সায়ম। শুনেছে কি পাখিমামা? সম্ভব নয়। লালনের গানে পৃথিবীর মাটিতে ছায়াময় এক পৃথিবীর কথা বলছেন কি পাখিমামা? সেটাই কি

'তরল তিমির'? আমরা তাঁকে চিনি প্যাঁচার কবি রূপে। 'প্যাঁচার ধূসর পাখা উড়ে যায় নক্ষত্রের পানে', 'আমরা বেসেছি যারা দীর্ঘ শীতরাত্রিটিরে ভালো,/ খড়ের চালের পরে শুনিয়াছি ডানার সঞ্চার:/ পুরনো প্যাঁচার ঘ্রাণ;অন্ধকারে সে কোথায় আবার হারালো', বা বিখ্যাত সেই 'আট বছর আগের একদিন'-এর 'থুরথুরে অন্ধ প্যাঁচা এসে বলেনি কি: বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে?/ চমৎকার!/ ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার! জানায়নি প্যাঁচা এসে এ তুমুল গাঢ় সমাচার!' পাখিমামা একটু থামতেই সায়মের ভেতর সূর্যোদয়ের মতো উঠে এল, 'পিপুলের গাছে বসে পেঁচা শুধু এক/ চেয়ে দ্যাখে;সোনার বলের মতো সূর্য আর/ রূপার ডিবের মতো চাঁদের বিখ্যাত মুখ দেখা।' পাখিমামা হাততালি দিলে গরালির নির্জন প্রান্তরে বেজে বেজে ছড়িয়ে যায়। তখন খালের দু-পাশে জলাভূমি দুপুরের রোদে তপ্ত শ্বাস ফেলত। অশরীরী যন্ত্রণা যেন কাদায় শুয়েও স্বস্তি পেত না। সেইসব দুপুরে কোকিলও ডাকত পেশাদার বিরহীর মতো। পাখিমামা বলতেন, কোকিল তো খুব বিখ্যাত, আর সস্তা কবির মতো জনপ্রিয়। আহাম্মকরাও তার গানে মুগ্ধ হয়, বধিররা তার সুরের প্রশংসা করে। ঘুঘুর ডাক শোনো। পৃথিবীর মূল সুর বিষণ্ণতা আছে ওর বুক জুড়ে। মা-র কাছে শুনেছি, ঘুঘু নাকি কেঁদে কেঁদে নিজের ছেলের মৃত্যুর কাহিনি বলে। গুগুগু গুগুগু/ আপত পুত বুকে থু/ হতী পুত পিট্টে থু/ গুগুগু। ঘুঘু ছিল রূপসি নারী। প্লাবন থেকে বাঁচতে নিজের ছেলেকে বুকে আর সতীনের ছেলেকে পিঠে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে জলে। স্বাভাবিক সাঁতারে বুক থাকে জলের নীচে। তাই জলে দমবন্ধ হয়ে কখন নিজের ছেলে বুক থেকে খসে গেল। সতীনের ছেলে বেঁচে রইল। এই দুঃখেই সেই নারী ঘুঘু হয়ে যায়। সব শোকভারাতুর নারী নাকি ঘুঘু হয়। বাঁশঝাড়, বেতবন, কড়ুই, শিমূল, আম, বেলগাছে ঘুরে ঘুরে কাঁদে। নিজের ছেলে মানে দেশজ সংস্কৃতি মরে গেল। পিঠে চেপে বেঁচে রইল বহিরাগত সংস্কৃতি। এ কান্না কোনোদিন থামার নয়। হাঁটতে হাঁটতে বাঁশের সেতু পেরিয়ে রফিক, আসাদদের শিমুলতলিতে যেতেন পাখিমামা। চরণের ডাঙা থেকে কবে কোন গহর আলি জমি ছিনিয়ে নিজের নামাঙ্কিত করেছিল বলে ধর্ম-দলীয় হিংসায় শিমূলতলি পুড়িয়ে দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। তারাই আজ সংস্কৃতি চালায়। দিদিমার গলায় 'সোজনবাদিয়ার ঘাট' শোনে সায়ম: থেকে থেকে বনের মাঝে ডাক দিতেছে হুতুম পাখি,/ নিশীথিনীর তিমির বুকে গাঢ়তম তিমির পাখি। তরল তিমির থেকে গাঢ়তম তিমিরে পৌঁছয় সায়ম।

হেমন্তের কাকভোরে, কাকের ঘাড়ের মতো ঘষা অন্ধকারে 'পত্রপুট' ছেড়ে মিতুলদি চলে গেল। নিজের হাতে সুটকেস গুছিয়ে, কাঁধের ঝোলায় টুকিটাকি জিনিস ভরে, কী-ই বা আছে তার নেওয়ার, যা আছে তা নেওয়া যায় না, এই জানালা, এই বারান্দা, এই থামের সারি, একতলার চাতালে ঝরা বকুল, আমের বোলের গন্ধ, শিরীষের ঝিরিঝিরি, কদমের ছায়া, দিদিমার পুরাণ-পাঠ, জর্দার সুবাস, গরালির জলে আহ্নিকগতি— কিছুই নেওয়া যাবে না, অথচ কিছুই ভোলা যাবে না, তেমন সার্টিফিকেট-টিকেট তো নেই যে পাখির ছানার মতো আলগোছে নিতে হবে, ভঙ্গুর কিছুই নেই অথবা সবটাই. মিতুলদি এইসব ভাবতে ভাবতে হয়ত সুটকেস গুছিয়েছিল কিংবা নিজেকে লণ্ডভণ্ড করার প্রাক্-মুহূর্তে দাঁড়িয়েছিল, বুঝেছিল

তার অনেক আছে কিন্তু সে নিঃস্ব, সারারাত হয়ত হেঁটেছিল এই বারান্দায়, এই জানালায়, পূর্ণতা ও নিঃস্বতার মাঝখানে হেঁটে হেঁটে নিজেকে খুঁজেছিল, তার কেউ নেই যে এটা-ওটা নেওয়ার কথা বলবে, তার কেউ নেই যে এটা-ওটা না-নেওয়ার কথা বলবে, তার কেউ নেই যার কাছে সে বিদায় নেবে, তার কেউ নেই যে বিদায় জানাতে এগিয়ে আসবে, দিদিমা জেগে আছে, পাখিমামা জেগে আছে, বড়মামা নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে, কোনোদিন ভাবেনি সে এ বাড়ি থেকে চলে যেতে হবে, কিন্তু সে যাবেই, এভাবে না গেলেই ভালো হত, অন্যভাবে যাওয়া কি সম্ভব ছিল, মিতুলদি একা শূন্য হাতে, শূন্যতা রেখে চলে গেল। দূরে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল মিতুলদির ঘর সংসার বৈধতা। বাংলার নরম নদীর মতো সায়মের চোখের জলে ডিঙি ভেসে গেল। মিতুলদির কি অন্যভাবে যাওয়া সত্যিই সম্ভব ছিল না? না-ই বা হল আর পাঁচটা মেয়ের মতো বিবাহ-উৎসব, গায়ে হলুদ, কন্যাসম্প্রদান, মন্ত্র, আহুতি, শয্যা-তোলা, আহার-ভোজন, হাসিরাশি, মিতুলদিকে ওসব মানায় না, সেই সম্পর্কে মিতুলদির বিশ্বাস নেই যা বাইরের অনুষ্ঠান দিয়ে প্রগাঢ় করতে হয়, তবু এটুকু তো হতেই পারত, দিদিমা তাকে আশার্বাদ করলেন, শীর্ণ আঙুলে থুতনি ধরে চোখে চোখ রেখে অভয় দিলেন, একতলার চাতাল পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন পাখিমামা শুভকামনায়, আগামীদিনের কাছে পৌঁছে দিল সায়ম সাবালক ভাইয়ের সম্পন্নতায়, এটুকু হতেই পারত। বড়মামাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতেই হত, না হলে যাওয়া যেত না। তিনজনই জেগে, তিনজনই জানে, তবু মেয়েটাকে একা চলে যেতে হল। পাখিমামা ভেবেছে, এভাবেই ওরা যায়। ওর বাবা সুরেন্দ্র পত্রনবীশ স্বীকৃতির আশায় গিয়েছিলেন। কেউ শুনল না, কেউ জানল না, কেউ কিছু বলল না, এভাবে কতকাল গান গাওয়া যায়। ওরা ভাবে, ফিরে আসবে। হয় মাথার ভেতরে থাকা পথরেখা হারিয়ে ফেলে, নয়ত ওড়ার ক্ষমতা হারায়। মিতুলও ফিরে আসার কথা ভাববে। পারবে না। দিদিমা ভেবেছে, এটা অপহরণ। মিতুল নিজেকে অপহরণ করেছে। গ্রহণের সুখ পেতে স্বেচ্ছা-অপহৃতা হয়েছে। নিজেরই অপহরণকারী প্রবৃত্তির ক্রোড়সঙ্গিনী হয়েছে সে। এরকম হওয়াই স্বাভাবিক। সায়ম ভেবেছে, তাকে বাঁচাতেই মিতুলদি পালাল। সায়মের ভেতর মিতুলদির শরীর ঘিরে যে দুর্নীতি বড় হচ্ছে, সেটা হয়ত মিতুলদি টের পেয়েছিল। সায়মকে সে নষ্ট করতে চায়নি। নষ্ট-অনষ্ট সম্পর্কে মিতুলদির ধারণা কি এতটাই চিরাচরিত? সায়ম ভেবেছে। মিতুলদি হয়ত বুঝেছিল, সায়মের পক্ষে তার সঙ্গে লিপ্ত হওয়াই স্বাভাবিক, হোক না আত্মীয়, মিতুলের পক্ষেও তাই, সেই স্বাভাবিকতাকেই ভেঙে দিতে সে চলে গেছে। অজ্ঞাতপরিচয় কোনো পুরুষের সঙ্গিনী হল সে, যে-সম্পর্কটা অস্বাভাবিক, তবু তা বৈধ, সামাজিক। বড়মামা জেগে উঠে 'মিতুল, মিতুল' ডেকে সাড়া পাননি। তাঁকে কিছুই জানানো হয়নি। তিনি অনেকক্ষণ শূন্য দেওয়ালে তাকিয়ে থাকেন। তারপর নিজেই বই টেনে নেন। পড়েন। বিপ্লবীরা দেখলেন পাহাড়ের গা ঘেঁষে একটি খাল ধীরগতিতে এগিয়ে চলেছে। তাঁরা প্রাণভরে জল খেলেন। বিশ্রাম নিলেন। তারপর পুনরায় যাত্রা শুরু করলেন। বড়মামা যন্ত্রণা নিয়ে একা।

গরালিপুর তখন প্রেসার কুকারের বাষ্পের দেশ। ভাপে সেদ্ধ হচ্ছে জীবন যৌবন তোশক বালিশ কসমেটিকস কূটকচাল ধর্মগ্রন্থ। সরকারি ত্রাণের মতো আকাশে মেঘ ঝুলে

আছে প্রায় এক সপ্তাহ। স্থানীয় আবহাওয়া দপ্তর বলছে, বর্ষণের সম্ভাবনা নেই। শরীরের পচা গন্ধে পাউডার মেরে মানুষ ভরসা খোঁজে বিশ্বাসযোগ্য বিবিসি, সিএনএন-এ। ভোরের জানালায় তাকালেই রাশি রাশি বৃষ্টির বিপুল সুসংবাদ নিয়ে নেমে আসা মেঘ দেখে মন নেচে ওঠে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেঘ একটু একটু করে সরে যায়, দূরে যায়, এ কী কৌতুক, শৃঙ্গারের নয়, ডিভোর্স না দেওয়া স্বৈরিণীর খেলার মতো। এর চেয়ে প্রচণ্ড রোদে পুড়ে যাওয়া, ঝলসে যাওয়া ঢের ভালো, এর চেয়ে ঢের ভালো জলে ভেসে যাওয়া। একটা অদ্ভুত বাষ্প শরীরটা পাকে পাকে জড়াচ্ছে, শরীরের ভেতর ঢুকে পেশী মেদ মজ্জা হাড় শিথিল নির্জীব মৃত করছে। একটা দুঃসহ যন্ত্রণা মাথার কোষে কোষে স্নায়ুতে তপ্ত শিকের মতো খোঁচাচ্ছে। জানালা দিয়ে সায়ম করুণাহীন মেঘের আকাশ দেখছিল। হঠাৎই গঞ্জের ধার থেকে উঁচু হইচই উঠে এল। বছর পনেরো আগে, তখনও পাঁচ-সাতটা সিপাই, এক-আধটা এস আই, আর চারটে সাইকেল, খাটিয়া, টেবিল, চেয়ার, উনুন-হাঁড়ি-কড়াই-খুন্তি, বিস্তারিত গামছা-লুঙ্গি-লেঙ্গট নিয়ে ফাঁড়ি বসেনি,. এ রকম হইচই মাঝেমধ্যেই শোনা যেত। কোনো স্কুলের ছেলেরা বা ক্লাবের ছেলেরা হয়ত খেলায় জিতে ফিরছে। এখন তো মাঠই নেই, প্রমোটার খেয়েছে, পার্টি খেয়েছে, পুলিস খেয়েছে, সব খেয়েছে। হয়ত গঞ্জে চোর ধরা পড়েছে। এখন চোর ধরা পড়ে না, ধরলে বিপদ আছে। চণ্ডীতলায় যাত্রা বা কবিগান হয়ত জমেছে। এখন সেসব আর হয় না। গাজনের চড়কে সন্ন্যাসীরা হয়ত ঝাঁপ দিচ্ছে। সেসব আর হয় না। এ পাড়ায় সে পাড়ায় লড়াই বাধলেও এরকম হইচই হত। এখন গুলির শব্দে এ গোষ্ঠী সে গোষ্ঠীর হিসেবনিকেশ হতে থাকে। এখন টিভি-তে অতিদূর দেশের খেলা দেখে মানুষ চেঁচায়। এখন ভোটের হুল্লোড়ে চেঁচামেচি হয়। পুলিস ফাঁড়ি বসার পর সব বেআইনি কাজকর্ম নীরবে সংসাধনের অনুমোদন পেয়ে গেছে। উঁচু হইচইয়ের কারণ অনুমানের চেষ্টা করে সায়ম। অনুমান করার প্রক্রিয়ায় সায়ম বুঝতে পারে, আসলে সে কিছু ঘটনার কথা মনে করছে, ইতিহাসের দ্বারস্থ হচ্ছে। অনুমানের অন্য একটা আবছা দিকও উঁকি দিয়েই মিলিয়ে যায়, তা হল, তোলাবাজ-খুনে-মন্দিরওয়ালা-মসজিদওয়ালা-ধর্ষণকারী-প্রমোটার-পেডলার-দালাল-খোচর ইত্যাদি ইতর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মারখাওয়া সাধারণ মানুষ চরম মার দিতে পথে নেমেছে এবং এদের রক্ষাকর্তা পুলিস ও প্রশাসনের সঙ্গে অনিবার্য যুদ্ধ বেধেছে, কিন্তু এটা শুভকামনা শুভস্বপ্নের বেশি সত্য নয়। বরং বাস্তব থেকে একটা সম্ভাব্যতা পাওয়ার চেষ্টা করে সায়ম। বছর পাঁচ-সাত আগে বটতলায়, স্কুলফেরত একটি মেয়ের উপর চড়াও হয় কিছু ছেলে। পথে বহু লোকজন ছিল, তাদের শিক্ষাদীক্ষা উন্নততর চিন্তাভাবনা উৎকৃষ্ট বাচনপদ্ধতি ছিল। কিন্তু মেয়েটার সাহায্যে কেউ এগিয়ে আসেনি। মাতৃভাণ্ডারের রোয়াকে বসে জুতো সারাই করতে করতে রামদাস ব্যাপারটা লক্ষ করে ও প্রতিবাদ জানায়। ছেলেগুলো রামদাসকে তোল্লাক্যালান পিটিয়ে তার ডানহাতের তিনটে আঙুল কেটে ফেলে। রামদাসের অপরাধ, সে আঙুল তুলে ছেলেদের শাসিয়েছিল। ছেলেগুলো আদিম ও অবিচক্ষণ বলে মারপিটকাটাকাটির লাইনে গেছে। রামদাস প্রৌঢ় অন্ত্যজ দবিদ্র। সুতরাং তার ওপর হিন্দি বা বিদেশি ছবির অ্যাকশনে আনন্দতুরঙ্গমে পাঞ্চ, কাট, ফ্লাই, কিক, টিক চালিয়ে এবং শরীরের দু-চার-পিস আলগা করে রক্তপাত ঘটিয়ে বেশ একটা

সন্ত্রাসের বাতাস তৈরি করেছে। বন্দুকের নল হইতেই ক্ষমতার জন্মের প্রাজ্ঞতা থাকলে ওরা অক্লেশে রামদাসকে নিখুঁত নামিয়ে দিতে পারত। তাতে ক্ষমতার আরেকটি কেন্দ্রের জন্মসংবাদও ঘোষিত হত। যাই হোক, এরকম ঘটনার পর গরালিপুরের কোথাও কোনো শব্দটব্দ হয়নি। সায়মের মনে পড়ে, স্কুলে ঢুকে গোকুল বসুকে ভোগ করে দেয় কয়েকটি ছেলে। দুটো ফুটো, মাথায় এবং বুকের বাঁদিকে। অমন যে গোকুল, একশো কেজির ওপরে লাশ, কালীর বারোয়ারি আর ইটভাটায় লেবার সাপ্লাই করে কোটিপতি, তবু হাইস্কুলের ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্টের চাকরিটা ছাড়েনি;তরুণদের সঙ্গে, শিক্ষার সঙ্গে, সংস্কৃতির সঙ্গে থাকার গর্ব করত, বেসিকালি কালচার্ড ফ্যামিলির ছেলে তো, গব্বরের স্টাইলে শ্রমিক দিবসের সভায় ও রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যায় ভাষণ-টাসন দিত, শরিকি দুষ্টামিতে গতবার টিকিট না আটকালে এম এল এ হওয়া ঠেকায় কে, সেই গোকুলকে ব্ল্যাকির মাত্র দুটো ছোবলে দোতলার বারান্দায় ফেলে রেখে সিঁড়ি দিয়ে নেমে লন পেরিয়ে সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল ছেলেরা। গোকুল নাকি আগে দু-চারজনকে মায়ের ভোগে করেছে। আদি কমিউনিস্ট পার্টি এটা নিয়ে দুটো সন্ধ্যা মাতামাতি করার চেষ্টা করে, তবে জমাতে পারেনি, শহরের নেতা আনা যায়নি, অপূরণীয় ক্ষতির দ্ব্যর্থক দীর্ঘশ্বাস ভেসেছিল বাতাসে। হ্যাঁ, খালপাড়ের বসতি উচ্ছেদের সময় কিছুটা হইচই হয়েছিল। সায়ম মনে করতে পারে, গরালিপুর ম্যান্দামারা হয়ে গেছে বলে রাগ দেখিয়েছিল উচ্ছেদবিরোধীরা। মানুষের কী হল, এত অন্যায়েও রা করে না? শরীরে বেঁচে থাকার লক্ষণ কই? এ কি মরা মানুষের দেশ? এইসব শুনে-টুনে কিছু লোক বার খেয়ে ক্ষুদিরাম হওয়ার পুরনো অভ্যাসে উচ্ছেদের দিন খালপাড়ে প্রতিবাদী জমায়েত করল। সকাল থেকে দেশাত্মবোধক সংগ্রামমুখী জীবনমুখী গান-টান হল। কিন্তু, গত কুড়ি বছর যারা নদীর ভাঙন থেকে উঠে আসা মানুষজনকে খালপাড়ে বসিয়েছে, সংগ্রামই জীবনের সারসত্য, বিপ্লবই মানুষের মুক্তির পথ ইত্যাদি বুঝিয়েছে, তারা যখন বুলডোজার, ডাম্পার সুপারহ্যামার এবং সশস্ত্র পুলিসবাহিনী ও শান্তির আবেদন নিয়ে সেই মানুষজনকে উৎখাত করতে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখন হইচই উঁচু হওয়ারই কথা হয়েছিল। তারপরই শান্তিকল্যাণ বধিরতা। সে রকম কোনো ঘটনা আজ ঘটতে পাবে? সায়মের বিশ্বাস হয় না। গায়ে জামা গলিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে। ভাপে সেদ্ধ হচ্ছে গরালিপুর। আকাশে ময়লা মেঘ চাপ হয়ে আছে। হাঁটতে হাঁটতে বটতলা, চণ্ডীতলা, গঙ্গের ধার এবং ফিরে আসা। কোথাও কোনো অস্বাভাবিকতা নেই, সব ঠিকঠাক চলছে, বরং অন্যদিনের চেয়ে একটু বেশিই নীরব। মামুলি কথার মামুলি জবাব দিতেও যেন অনীহ লোকজন। এখন কথা বলা যায় না, কথা বলার সময় নয়। কারণ ফিসফিস দুটি বাক্য: আজ ভোরে যে-মাফিয়াকে তুলে নিয়ে গেছে পুলিস, তার ডায়েরিতে মুখ্যমন্ত্রীর নাম, ফোন নম্বর পাওয়া গেছে। নীরবতা নিস্তব্ধতা এত উঁচু হতে পারে যে হইচই বলে ভ্রম হয়? মেঘ-চাপা গরালিপুরে গরম বাষ্পই বাতাস।

রথ বেরোলে ট্রাফিক জামের সম্ভাবনার কথা ভেবেই শুঁড়িপাড়া রোড দিয়ে ঘুঘুডাঙার দিকে গাড়ি ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বকুলতলা রোডে দুপুরের পর থেকে গাড়ি চলাচল বন্ধ। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন, রথ যদি অন্যের পথ আটকে দেয়, সেটা কি আর জনরথ থাকে?

দু-দশজনের হাতে সেটা রথের রশি হলেও বাকিদের কাছে রথের ফাঁস। না, জল জমার আশঙ্কা নেই। বৃষ্টি হচ্ছেই না। বাইপাসে সকালের দিকে কিছুটা যানজট ছিল। ভোরে তিনটে কলিসন হয়। এখন পরিষ্কার। দুর্ঘটনায় মৃত্যুর খবর নেই। পথ নিয়ে ভালো গান বাজান। পথে এবার নামো সাথী পথেই হবে পথ চেনা। 'পথ ও পথিক' নামে রবীন্দ্রসঙ্গীতের হেভি কালেকশন আছে। একটা ফোন ঢুকছে। দেখা যাক। হ্যালো...হ্যালো...আপনার কথা আমাদের কানে পৌঁছচ্ছে না।

কালিয়াচক থেকে বাবার চিঠি আসে এক পউষের বিকেলে। লম্বা লম্বা ছায়ার খাটিয়ায় শোয়ানো 'পত্রপুট' কবেকার ফ্যাঁসা বেনারসির মতো আলোয় শরীর মুড়ে যেন অন্তিম যাত্রার অপেক্ষায় ছিল। আশ্চর্য এক পোস্টম্যান চিঠিটা দিয়ে গেল, যাকে সায়ম কোনোদিন দেখেনি, যার বয়স বোঝা খুব কঠিন, সব চুল সাদা নরম ঘন, কৃষ্ণসাগরের মতো মুখ, চোখ আর হাসি যেন তিনটে দ্বীপ, উচ্ছল শরীর-ভাষা, সাইকেলের গতিতে তার পিঠের জামা ফুলে উঠেছিল। এ সময় কোনোদিন পোস্টম্যান আসে না। এখন ডাকঘর শুনশান হওয়ার সময়। মাস্টারমশাই হয়ত ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পে নতুন আমানতের হিসাব খাতায় তুলছেন নিরিবিলি নিস্পৃহ আলো জ্বেলে। কাজের সময়ের সীমানা স্বেচ্ছায় লম্বা করে এ কোন অবাস্তবিক। বাবা লিখেছে, চিঠি দিতে দেরি হল। ধানবাদের কারখানা থেকে ছাঁটাই হয়ে শিলিগুড়িতে চুক্তির চাকরি জুটিয়েছি। সেল প্রমোট করতে না পারলে ঘাড়ে ধাক্কা। তবে বেতন ভালো। এবং সেই কারণেই অধস্তনদের প্রচুর সম্মান শ্রদ্ধা ভক্তি স্তুতিভজনা পেয়ে থাকি। দারুণ লাগছে। মিথ্যে বলতে পারার চেয়ে শ্রেষ্ঠ গুণ আর হয় না, এটা বুঝতে কেন যে এত দেরি হল আমার! খোকা এতদিন যা তোমাকে বলেছি, নিজে করতে পারিনি। কেন? কোন অলীকে বিশ্বাসে, কোন কুসংস্কারে, কোন অর্কমণ্যতায়, কোন প্রতিবন্ধিতায়? খোকা, আজ গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, আমার মালিক একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, উত্তরবঙ্গে তাঁর স্বনামে বেনামে দশ-বারোটা সংস্থা আছে। একদা ব্যাঙ্কের কেরানি ছিলেন। কয়েক কোটি টাকা জালিয়াতির দায়ে ধরা পড়েন। এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে কোটি টাকা খাইয়ে প্রমাণাভাবে ছাড়া পান। ইচ্ছে করলে চাকরিতে ফিরতে পারতেন। ফেরেননি। হৃত সম্মান পুনরুদ্ধারে তিনি দেশের কাজে ব্রতী হন। বাকিটা উপকারী প্রাণীর রচনার মতো: এক কর্মবীর, দানবীর, চিন্তাশীল, বিদ্যোৎসাহী, সমাজসেবী, নীতিপরায়ণ মানুষের কাহিনি যা হামেশাই ফলাও করে ছাপা হয় এবং বলা হয় যে, ইহার সব কিছুই মানুষের উপকারে লাগে। কয়েক কোটি টাকা ঝাড়তে পেরেছিল বলেই না এসব হল। ওটাই ভিত, তার ওপর দাঁড়িয়ে মেঘ-মাথা সৌধ। যাই হোক, এতদিনে মনে হয় একটা হিল্লে করা গেছে। সমাজের বড় বড় লোকজনের সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে। এরা স্বচ্ছ ও সৎ মানুষ, স্বপ্নটপ্ন দেখায় না, বাঁজা কথা বলে না, পার্সেন্টেজ ঠিকঠাক হলেই নির্বিঘ্নে কাজ হয়ে যাবে। তুখোড় সন্ন্যাসী সওদাগর। এদের কাছে মিথ্যে চলে না। সেটা লোয়ার লেবেলে,. যেখানে এক-একটা আইটেম ধরে রূপকথার জগৎ তৈরি করতে হয়। তুমি বলতেই পারো, আমি লোচ্চা হয়ে গেছি। আমি বলব, আমি ভালো আছি। তোমার মা ভালো আছেন। যে অনিশ্চয়তা আমাদের সারাজীবন তাড়া করে বেরিয়েছে, আমাদের সম্পর্ক নষ্ট করেছে, তার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি।

অনেক আগেই একটা হতে পারত, পঁচিশ-তিরিশ বছর আগেই। মর্যাদায় বাঁচতে পারতাম। মূল্যাবোধের ন্যাতা-নেংটি জড়িয়ে মানবিকতার অলীক ভরসায় কারও কৃপার করুণার পাত্র হতে হত না। দুর্মর আদর্শের পীড়নে মৃতবৎ বাঁচতে হত না। খোকা, ঘাড়ে ধাক্কা আমি আর খাব না। এখন যেসব কাজ করতে হচ্ছে তার গ্রহণীয়তা মান্যতা অনেক বেশি, নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র। নিজের স্বার্থে আমাকে রক্ষা করবে প্রশাসন। এভাবে পাঁচ বছর চললে কয়েকটা নিজস্ব ধান্দা বানিয়ে নিতে পারব। শেষ জীবনটা সুখে আনন্দে সপরিবারে বাঁচতে চাই। খোকা, সঞ্জয়ের কাছে শুনেছি, আমার চিঠিতে তোর বিরক্তি হয়। হতে পারে। কিন্তু ভেবে দেখ, বাবা হয়ে ছেলেকে আমি কীভাবে গভীর দুঃখে ঠেলে দেব? অর্থহীন, মানহীন, মর্যাদাহীন, প্রতারণাময়, লাঞ্ছনাময়, উপহাসময় ভবিষ্যতের দিকে যেতে দেব? নিজের সন্তানকে ফেকলু বানাব? খোকা, এটা কি হতে পারে না, নিজের রক্তে থাকা স্বপ্নের দোষের আতঙ্ক থেকেই চিঠি লিখেছি? তোকে দোষমুক্ত শুদ্ধ রাখতে চেয়েছি। খোকা, এটাই হয়ত সত্য, ওইসব লেখার মধ্যেই আমার প্রস্তুতি ছিল। যুক্তির আয়োজন, লোচ্চা হওয়ার মহড়া ছিল। অন্ধকার হয়ে গেছে, গাছের বাকলে পাতার শিরে ফুলের গর্ভে জমে থাকা অন্ধকার নেমে এসেছে, দিঘির তল থেকে উঠে এসেছে অন্ধকার, মাটি ফুঁড়ে বাতাসে উড়ছে, চিঠির অক্ষরগুলো ঝাপসা হয়ে যায়, সায়ম আর পড়তে চায় না, বাবার মুখ দেখতে পায়, ভালো থেকো।

এ এক কঠিন প্রশ্ন। মহাভারত দ্বিখণ্ডিত হয়ে আসছে। দিদিমার ঘর থেকে হাঁপানির টান আর মহাভারতের কথা মিলেমিশে অন্ধকার বাতাসে ঘুরে বেড়ায়। দেবাসুরযুদ্ধের পর ইন্দ্র ত্রিলোকের অধিপতি হয়ে নানা স্থানে বিচরণ করতে করতে পূর্বসমুদ্রের নিকট বক ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হলেন। বক পাদ্য অর্ঘ্য আসনাদি নিবেদন করলে ইন্দ্র বললেন, আপনার লক্ষ বৎসর হয়েছে, চিরজীবীদের কী দুঃখ আমাকে বলুন। বক বললেন, অপ্রিয় লোকের সঙ্গে বাস, প্রিয় লোকের বিরহ, অসাধু লোকের সঙ্গে মিলন, পুত্র-দারাদির বিনাশ, পরাধীনতার কষ্ট, ধনহীনতার জন্য অবমাননা, অকুলীনের কুলমর্যাদা, কুলীনের কুলক্ষয়— চিরজীবীদের এইসব দেখতে হয়, এর চেয়ে অধিকতর দুঃখ আর কী আছে? ইন্দ্র আবার প্রশ্ন করলেন, চিরজীবীদের সুখ কী তা বলুন। বক উত্তর দিলেন, কুমিত্রকে আশ্রয় না করে দিবসের অষ্টম বা দ্বাদশ ভাগে শাকভক্ষণ-— এর চেয়ে অধিক সুখ কী আছে? আপন গৃহে শাকমাত্র পাক করে জীবনধারণ করলেও তা-ই সুখ। পরস্য তু গৃহে ভোক্তুঃ পরিভূতস্য নিত্যশঃ।/ সুমৃষ্টমপি ন শ্রেয়ো বিকল্পোহয়মতসতাম। পরগৃহে অপমানিত হয়ে সুস্বাদু খাদ্য ভোজনও শ্রেয় নয়। রাত্রি ঘনায়। কুকুর ডাকে। পথের ধারে বেকার ছেলে গুমটি খুলে ক্যাসেট-সিডির বিকট হিন্দি গান বাজায়। দিদিমার গলা শুনতে পায় সায়ম। নিজের অর্জিত শাকান্নে তৃপ্ত থাকা মহত্বের গুণ। কিন্তু যখন ধর্ম লোপ পায়, লোকে পরস্পরকে বঞ্চনা করে, অনাবৃষ্টির ফলে খাদ্যাভাব হয়, জীবিকার সমস্ত উপায় দস্যুর হস্তগত হয়, সেই আপৎকালে কীভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা উচিত? শরশয্যায় ভীষ্মকে প্রশ্ন করেন যুধিষ্ঠির। ভীষ্ম বিশ্বামিত্রের কাহিনি বলেছিলেন। ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের সন্ধিকালে দ্বাদশবর্ষব্যাপী ঘোর অনাবৃষ্টি হয়েছিল। কৃষি ও গোসম্পদ নষ্ট হয়ে যায়, চোর ও রাজাদের উৎপীড়নে গ্রাম নগর জনশূন্য হয়, মানুষ ক্ষুধিত হয়ে পরস্পরের

মাংস খেতে শুরু করে। সেই সময় মহর্ষি বিশ্বামিত্র স্ত্রী-পুত্রকে কোনো জনপদে ফেলে রেখে খাদ্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। একদিন তিনি চণ্ডালবসতিতে হাজির হয়ে দেখেন, ভাঙা কলস, কুকুরের চামড়া, শুয়োর আর গাধার হাড়, মৃত মানুষের বস্ত্র চারদিকে পড়ে আছে। কোথাও খাদ্য নেই। সহসা তাঁর চোখ পড়ল সদ্যোনিহত কুকুরের মাংস। ভাবলেন, প্রাণরক্ষার জন্য চুরি করলে দোষ হবে না। রাতে চুরি করতে গিয়ে চণ্ডালদের হাতে তিনি ধরা পড়লেন। পীড়নের ভয়ে আত্মপরিচয় দিয়ে বিশ্বামিত্র বললেন, ক্ষুধায় মৃতপ্রায় হয়ে আমি তোমার কুকুরের জঘনমাংস হরণ করতে এসেছি। আমার বেদজ্ঞান লুপ্ত হয়েছে, আমি খাদ্যাখাদ্য বিচারে অক্ষম, অধর্ম জেনেও আমি চৌর্যে প্রবৃত্ত হয়েছি। চণ্ডালরা সেই ধর্মাগ্রণীকে মাংসভক্ষণ থেকে নানারূপে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করল। সেই ধর্মাত্মাকে রক্ষার জন্য সাধ্যমতো আবেদন-নিবেদন করল। কিন্তু প্রাণরক্ষা ধর্মরক্ষারই অঙ্গ, এই যুক্তিতে বিশ্বামিত্র কুকুরের মাংস নিয়ে বনে চলে গেলেন। সপরিবার ভোজন করলেন। আখ্যান শেষ করে ভীষ্ম বললেন, বিপদাপন্ন হলে বিদ্বান লোকেরও যে-কোনো উপায়ে আত্মরক্ষা করা উচিত। জীবিত থাকলে তিনি বহু পুণ্য অর্জন ও শুভলাভ করতে পারবেন।

মিতুলদি সারা দুপুর জুড়ে কী খুঁজছিল? বিছানার চাদর উল্টে উল্টে, তোশক সরিয়ে সরিয়ে, টুটা-ফুটা জাজিম ঘেঁটে ঘেঁটে কী খুঁজেছিল? কুলুঙ্গির ধূসরতা, পূর্বপুরুষের ছবির পেছনে ঘন মলিনতা দু-হাতে মেখে কী খুঁজেছিল? খাটের সিংহ থাবা পায়ার ভার বহু ক্লেশে তুলে গোল শ্বেতপাথরের ওপর কী খুঁজেছিল? সাপের খোলস? মিতুলদিকে বার বার কবিতার মতো একটা লাইন বলতে শুনেছে সায়ম। সাপের খোলসের মতো পড়ে আছে নদী। বিপুল বৃষ্টির পূর্বাভাস থেকে ঝিরঝির জল ঝরছিল, জানালায় গাছের ব্যাকুল ছায়া, গরালির খাল থেকে বাতাস আসছিল। মিতুলদি চেয়ারে দাঁড়িয়ে তাক থেকে 'পুষ্পলতার বাকসো' লেখা তোরঙ্গটা যখন পাড়ল, সায়ম দেখেছিল শরীর কাহাকে বলে, শরীরের ভাঁজে ভাঁজে খাঁজে খাঁজে দাগে দাগে ভাগে ভাগে যে শরীর থাকে, তাহাই শরীর। বাকিটা তো অস্তিত্ব মাত্র, নানাবিধ সম্পর্কের টানে পৃথিবীতে আসে যায়, স্নেহ পায়, ভালোবাসা পায়, শ্রদ্ধা পায়, হয়ত প্রেম-ট্রেমও পায়। শরীরের কোনো সম্পর্ক নেই, কোনো বশ্যতা নেই, সমাজগঠনের আগেকার পতাকার চিহ্নই তার পরিচয়। এইসব ভেবেছিল সায়ম। এই প্রথম? অসম্ভব। একদিনে এসব ভাবনা আসে না। পুষ্পলতা মিতুলদির মা। তিনিই প্রথম এ-বাড়িতে নিজের বাক্স করেন। স্বামী সুরেন্দ্রর সঙ্গে তাঁর এ ব্যাপারে ঠিক বিতণ্ডা নয়, বিতর্ক হয়। সুরেন্দ্রর যুক্তি, তোমার নিজস্ব তো অনেক কিছুই আছে, কেউ হাত দেবে না, তবু এভাবে নিজের বলে দাগানোর কী দরকার? পুষ্পলতার যুক্তি, দরকার বলেই দাগিয়েছি। নইলে নিজের বলে ভরসা পাই না। সুরেন্দ্রর যুক্তি, এর মূলে আছে অবিশ্বাস, সন্দেহ। পুষ্পলতার যুক্তি, তোমার ব্যাখ্যার মূলে আছে প্রভুত্ব আর ভয়। সুরেন্দ্রর যুক্তি, নিজেকে প্রতিপক্ষ হিসেবে ভাবতে পারার মধ্যে স্বাধীনতার সৌন্দর্য আছে বটে, তবে অযথা বৈরিতা ডেকে আনাকে কখনোই সুন্দর বলব না। পুষ্পলতার যুক্তি, অন্যের নিজস্বতা অস্বীকার করার অর্থই স্বৈরাচার, তা সে যত নরম মিঠে দরদী শব্দে করা হোক। সুরেন্দ্রর যুক্তি, নিজস্বতা ভেতরের জিনিস। সেটা এত স্থূলভাবে

দেখানোর নয়, আর নিজস্বতা কারও স্বীকার-অস্বীকারকে ভয় পায় না। পুষ্পলতার যুক্তি, ভয় পায় না বলেই তো নিজের জায়গা ঘোষণা করেছে আর তাতে প্রভুরা ভয়ে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছে। এভাবে 'পুষ্পলতার নিজের বাকসো' ঘিরে একটা অমীমাংসিত বিতর্ক দীর্ঘ সময়-সময়ান্তরে কেবলই জাল প্রসারিত করেছে। সায়ম তখনও এ-বাড়িতে আসেনি। মিতুলদির মুখে শুনেছে এসব। মিতুলদি বলত, শেষ পর্যন্ত কেউই হারেনানি, জেতেননি। মা বোধহয় এক ধরনের বিপন্নতা থেকে নিজের ব্যাপারটা আড়লে রাখতে চেয়েছিলেন। গরমের দুপুরে, শীতের বিকেলে, সরস্বতী পুজোর ভোরে, পূর্ণিমার রাতে মাকে মিতুলদি দেখেছে নিজের বাক্স খুলে বসতে। সত্যি বলতে কী, তাতে কিছুই ছিল না। রাজার আমলের গোটাকতক পাইপয়সা, আধলা, আনি, দুয়ানি, চারানি, পেতলের ছোট্ট গণেশ, বাপের বাড়ির কয়েকটা চিঠি, এক জোড়া কাপ-ডিশ, দুধের খালি কৌটো দুটো, বিয়েতে পাওয়া নরেন দেবের মেঘদূত, বটতলার ব্রতকথা, আর কয়েকটা ফুলতোলা রুমাল। খাটের তলা থেকে টেনে ধুলো ঝেড়ে বাক্স খুলে বসাটা যে পুষ্পলতার কাছে পরম সুখের ব্যাপার ছিল তা মিতুলদি ছোটবেলাতেই বুঝেছে। কী পেতেন মা? সুখ। অতীতের, মৃত স্বপ্নের মুখ দেখার সুখ, স্বপ্ন জমিয়ে তোলার স্বপ্নের সুখ। মিতুলদি যখন স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ে, সুরেন্দ্র পত্রনবীশ দেশান্তরী হন, আর ফেরেননি। কেউ বলেন, স্বীকৃতির খোঁজে, কেউ বলেন, স্বপ্নের খোঁজে, কেউ বলেন, নিজেকে ব্যর্থ বুঝে, কেউ বলেন, ওটাই ছিল নিয়তি। অনেকদিন অপেক্ষার পর পুষ্পলতা স্বামীর গানের খাতাগুলি, নাটকের খাতা কয়েকটি, রঙিন সুতোর কাজ-করা শখের পাঞ্জাবি আর কাশ্মীরী শাল নিজের বাক্সে ঢুকিয়ে রাখেন। তখনই বাক্সটা কিছু ভারী হয়। পুষ্পলতার মৃত্যুর পর আরও ভারী হয়ে বাক্স উঠেছে তাকে। মিতুলদি কোনোদিন সায়মের সামনে বাক্স খোলেনি। কী আছে ওতে? কিচ্ছু না। এত ভারী? মড়া খুব ভারী হয়। বলে মিতুলদি হাসতে হাসতে ঝাড়পোছ করে তুলে রাখত। এই নামানো ও তোলা বহুদিন ধরে দেখেছে সায়ম, নিজে বড় হয়েছে বুঝে নামিয়ে বা তুলে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়ে মিষ্টি সুরেলা হাসির প্রত্যাখ্যান পেয়েছে, মিতুলদির নিজের বাক্স ওটা, এ দেখা একটা অভ্যাস হয়ে যাওয়ার কথা, অভ্যাসে নতুনত্ব থাকে না, কিন্তু তারই মধ্যে সে কবে যেন মিতুলদির শরীর আবিষ্কার করে ফেলে, এক মহাদেশ, যা মেঘাবৃত, যা উর্মিবেষ্টিত, যা পলায়নপর, যা হননোদ্যত। এই মহাদেশ দেখার লোভ কবে যে সায়মকে আবিষ্ট করল, ক্রমে দখল করল, কবে যে সায়ম বুঝতে পারল তার সীমাবদ্ধতা, অসহায়তা. কবে যে পাপ-অপাপের কুয়াশা কাটিয়ে বেরিয়ে এল, সেসব বহুযুগের গান, প্রাচীন পালার খাতা, যার মর্ম জানা হয়ে গেছে। কিন্তু সেদিন মিতুলদি কী খুঁজেছিল? সাপের খোলসের মতো পড়ে আছে নদী। যে আলমারি ভীষণই পরিপাটি, অতি-পরিমিত জিনসপত্র নিয়ে ছিমছাম, কোনো ভার নেই, আবেগ নেই, যন্ত্রণা নেই, তারও দরজা হাট করে দাঁড়িয়েছিল মিতুলদি। দেওয়ালের শেল্‌ফ একেবারেই ফাঁকা, শুধু নীচেরটায় ফিনাইলের শিশি, ছেঁড়া চটি, ছাতার কাপড়, নষ্ট ছিটকিনি, কাটা বালব ছাড়া আর কিছু নেই, সেখানে অনেক দাঁড়াল মিতুলদি। খুঁজতে খুঁজতে মিতুলদি ভিজে যায়। তার সেই শরীর সায়মের গলা টিপে ধরে। সায়মের নাভির নীচে ধুনুচি জ্বলে ওঠে। পায়ের একটু দূরে থমকে আছে নাচ,

হাতের একটু দূরে, সায়ম ছুঁতে পারে না। সাপের খোলসের মতো পড়ে আছে নদী। খাট থেকে নামার সময় পায়ের বুড়ো আঙুলে জড়িয়ে মিতুলদির শাড়ির কিছুটা ফেঁসে গেল। শবগন্ধ, কুশাসন, ন্যায় ও বিস্মৃতি— বলতে বলতে মিতুলদি আভাঙা শরীরে দোতলার দক্ষিণে সুধীরেন্দ্র পত্রনবীশের ঘরে চলে গেল।

গরালিপুরে তিনি এত জনপ্রিয়, তা হঠাৎই টের পেলেন সুখেন্দ্র পত্রনবীশ। এই টের পাওয়া তাঁর ভেতরে পুরনো ক্ষত বিষিয়ে দেয়। গরালিপুর একদিন তাঁকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে বর্জন করেছিল। ত্রাণের তেরপল-কম্বল ঝেড়ে দেওয়া মন্ত্রীর সঙ্গে সুখেন্দ্রর হবনবানি গরালিপুরের মানুষ ভালোভাবে নিতে পারেনি। 'পত্রপুট'-এর মতো জনদরদী বাড়ির ছেলেকে চোরের ঘনিষ্ঠ হতে দেখে মানুষ কষ্ট পেয়েছিল। 'পত্রপুট' সে-অর্থে কখনোই অভিজাত পরিবার নয়। প্রজার সর্বনাশ করে নটীবিলাসের কিংবদন্তি নেই। লেঠেল লাগিয়ে খুনখারাবির বীরগাথা নেই। সম্পত্তি নিয়ে রক্তপাতের ইতিহাস নেই। কোনো সাহেবসুবোর পদার্পণ ঘটেনি এ-বাড়িতে। কোনো ধর্মাবতার কখনও এ বাড়িতে ধ্যানস্থ হয়নি বা অলৌকিক মন্তব্য করেনি। বাঘ-সিংহ মারার ঐতিহ্য নেই। শিক্ষামূলক বা নারীজাগরণপ্রয়াসী কোনো পত্রিকা-টত্রিকা করার কথা এ-বাড়ির পূর্বপুরুষেরা ভেবেছিলেন বলে শোনা যায় না। নেহাৎই সাদামাটা, আর পাঁচটা ভদ্র পরিবারের মতোই গসিপহীন। গরালিপুরে প্রথম আসেন মুনীন্দ্রনাথ পত্রনবীশ। কম পয়সায় বেশি জায়গা-জমি নিয়ে গাছগাছালি রোদবৃষ্টির সঙ্গে নিরিবিলি জীবনযাপন ভালোবেসে। অনেকেই যখন গ্রামজীবনের জন্য লিখিত হাহাকার করছে আর শহরে প্রকৃত ঘর-বাড়ি গড়ছে, মুনীন্দ্রনাথ তখন উল্টোপথে হেঁটেছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র সুধীন্দ্রনাথের সময় এই দালান তৈরি হয়। তিনি ছিলেন ডাক্তার। পত্রনবীশদের কিছু গল্প এই সুধীন্দ্রনাথকে ঘিরেই আছে। তাঁর বাড়ি তৈরির কাজে স্থানীয় মানুষ স্বেচ্ছাশ্রম দেয় বলে জানা যায়। তিনিই বাড়ির নাম রাখেন 'পত্রপুট'। সুধীন্দ্রর চার পুত্র সুধীরেন্দ্র, সুরেন্দ্র, সুখেন্দ্র ও সুমিতেন্দ্র। জনদরদী ভাবমূর্তিটা সম্ভবত ডাক্তারবাবুর আমলেই হয়। পরে আর কেউ ডাক্তার না হলেও মানুষের সঙ্গেই ছিলেন। ছিটকে গেলেন সুখেন্দ্র। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী নিস্তরঙ্গ রেখা তাঁর অসহনীয় মনে হয়েছিল। অনেক পরে চলে যান সুরেন্দ্রও, তবে সে-যাওয়া অন্যরকম। সুখেন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন, পুরনো ভাবমূর্তি মৃত্যুকালীন সংকীর্তনের বেশি সান্ত্বনা দিতে পারে না। নতুন সময়ের ভাবমূর্তি তৈরি হচ্ছে ক্ষমতার বৃত্তে। ঠিকই বুঝেছিলেন সুখেন্দ্র। গত তিরিশ-চল্লিশ বছরে 'পত্রপুট' ছিন্নপত্র হয়ে গেছে। বাতিল হয়ে গেছেন সুধীরেন্দ্র, সুমিতেন্দ্র। এখন গরালিপুর শুধু তাঁরই কথা বলে, তাঁর বুদ্ধি, শ্রম, নিষ্ঠা, সাহস ও স্বপ্নের কথা বলে, তাঁকে আদর্শ করার কথা বলে। গরালিপুর স্বীকার করে যে, সুখেন্দ্র তাদের গর্ব। একদিন যারা তাঁকে আঘাত করেছিল, তারাই এখন পুজো করে। সুখেন্দ্র ইচ্ছে করেই সেসব প্রসঙ্গ তোলেন না, থাক না একটু ক্ষত জীবনসংগ্রামের চিহ্ন হয়ে। একদা জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া দলের ঘনিষ্ঠ সুখেন্দ্র আজ সাম্যবাদী দলের উপদেষ্টা— এতে নিজের মতাদর্শের কোনো রূপান্তর নেই, সবটাই চলেছে ক্ষমতার আবহমান ধারায়, সুখেন্দ্র শুধু নৌকো বদলেছেন মাত্র। যারা তাঁকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলেছিল, তাদের যদি একটু আপশোশ হয়, হোক না। যারা তাঁকে 'পত্রপুটে'র কুলাঙ্গার

বলেছিল, তারা যদি নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হওয়ার সুযোগ পায়, পাক না। সুখেন্দ্রকে ঘিরে আছে গরালিপুরের শ্রেণীনির্বিশেষ। সায়ম দোতলার বারান্দা থেকে দৃশ্য দেখে: এই লোকটা বন্যাদুর্গতদের তেরপল না পাঠিয়েই বিশ কোটি টাকার বিল বের করে নিয়েছে বলে প্রাক্তন বিরোধীরা অভিযোগ করেছিল, এই লোকটা শিল্প করার নামে জলের দরে সরকারি জমি বের করে ব্রাউন সুগারের দামে বেচে দিয়েছে বলে এখানকার বিরোধীরা অভিযোগ করেছে, শিলিগুড়িতে চা-বাগান উচ্ছেদ করে নতুন টাউনশিপ তৈরির কাজে একটা অবাঙালি ফার্মের হয়ে উমেদারি করেছে বলে সবাই জানে, এই লোকটার নাম ব্যাঙ্কের ঋণখেলাপি তালিকায় আছে বলে শোনা যায়। লোকটাকে এক প্রবীণ বুকে জড়িয়ে ধরল, কিছু তরুণ প্রণাম করল, কয়েকজন খুব কাছাকাছি এসে নমস্কার জানাল, তারাই লোকটাকে ঘিরে ফেলল যেন ভিড় কোনো প্রবলেম না করে, বহু লোক উঁচু জায়গা বেছে নিল তাঁকে ভালোভাবে দেখার জন্য, আমের বোলের মতো মুগ্ধতার নরম গন্ধে বাতাস ভরে গেল, কারা যেন স্লোগান দিল, 'সুখেনদা জিন্দাবাদ'। নষ্ট বাগানের আগাছা দেখতে দেখতে সুখেন্দ্র পত্রনবীশ দোতলায় উঠে সায়মের মুখোমুখি হতেই মনোরম হেসে বললেন, কেমন আছ সায়মবাবু? তুমি কিন্তু আমাকে প্রশ্নটার জবাব আজও দাওনি। এমন একজন জীবিত মানুষের নাম বলতে পারোনি যার কথা ভেবে আমি সৎ জীবনে ফিরতে পারি। ব্যর্থ মানুষের নাম শুনতে চাই না। আগেই বলেছি, সততা বলতে যেন ব্যর্থতা না বোঝায়। সায়মের হাত ধরেন সুখেন্দ্র। সুধীরেন্দ্রর ঘরের দিকে হাঁটতে থাকেন। বলেন, খুঁজে পাবে না। নেই। অরণ্যদেবের নাম তুমি নিশ্চয় করবে না। কমিক স্ট্রিপ থেকে নাম নিশ্চয় তুলে আনবে না। ওসব এনটারটেনমেন্ট। তোমাদের ভাবনাও তাই, সায়মবাবু। দেওয়ালে একটা ফাটলে আঙুল রেখে সুখেন্দ্র বলেন, দেখেছ, বাড়ছে? আরও বাড়বে। একদিন হেলে পড়বে। এটাই রিয়ালিটি। তুমি চোখ বন্ধ করে থাকলেও তা বাস্তব। তোমাকে আমি একটা কথা বোঝাতে পারিনি সায়ম। এটা আমার ব্যর্থতা। আমরা মিডিওকার, তুমি, আমি, এ বাড়ির সবাই। আমাদের বড় হওয়ার একটাই পথ। কোনো মতাদর্শে না ভোগা। কোনো ফিকশেসন নয়। যখন যা সামাজিক গতি তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা। তুমি অসাধারণ প্রতিভাবান হলে হয়ত সেটার দরকার হত না। হয়ত। তুমি আর পাঁচজনের মতো। আর পাঁচজন যা করে তোমাকেও তাই করতে হবে। নাহলে তুমি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তুমি বিচ্ছিন্ন হলে অন্যের সুবিধে। এই বিচ্ছিন্ন করার জন্যই পুথিতে ভালো ভালো কথা লেখা থাকে। সেসব পড়ে যদি আরাম পেতে চাও তো পড়ো, সেসব বলে সুখী হতে চাও তো বলো। জীবনের আলো নিভে আসা লোকজন হাঁটু আর মুণ্ডু জড়ো করে বসে সৎকথামৃত শুনবে। কিন্তু নিজের জীবনের আলো নিভিয়ে দিও না, প্লিজ। জীবিতের দেশে ফিরে এসো, সায়ম। জানি, তুমি আমার কথা শুনবে না। আমার বৈভব, আমার প্রতিষ্ঠা, আমার প্রভাব তোমাকে সেই রমাঁ রলাঁর কারও বাড়ির মাপ দেখে তার অসাধুতার মাপ বোঝার কথা মনে করিয়ে দেয়। রমাঁ রলাঁর কথা আমি অস্বীকার করছি না, কিন্তু উনি তো লুপ্ত পৃথিবীর প্রত্নবস্তু হয়ে গেছেন। মিউজিয়মে তাঁকে দেখে হয়ত কোনোদিন ভাবব, পৃথিবীটা একদিন এরকম ছিল। সুখেন্দ্রকে আজ কথায় পেয়েছে। গরালিপুরে স্বতঃস্ফূর্ত গণ-সম্বর্ধনা তাঁকে উদ্দীপ্ত

করেছে। গরালিপুর আজ তাঁকে বিজয়ীর সম্মান দিয়েছে। সেই পতাকা তিনি সায়মের সামনে গুটিয়ে নেবেন কেন? সায়মকেও তিনি জয় করতে চান। তাঁর জয় মানে সায়মের হার নয়। সায়মেরও জয়। সুখেন্দ্রর কথাবার্তা যত এগোচ্ছিল, বাবার স্বর শুনতে পাচ্ছিল সায়ম। অদ্ভুত মিল। বাবাকে পোলিটিকাল সাফারার মনে করে সায়ম। একটু ভুল রাজনীতি তাঁকে শেষ করে দিয়েছে। অথচ সেই রাজনীতিকেই তিনি আজও সত্য বলে বিশ্বাস করেন। নিছক ঠিক নয়, সত্য। তিনি ছেলেকে যখন সুখে থাকার পথ বাতলান, বোঝা যায় সেই পথকে তিনি কতটা ঘৃণা করেন। বাবা চিঠিতে আর্তনাদ করে ওঠেন, মিথ্যাচার জিতে গেছে, চক্রান্ত জিতে গেছে, বিশ্বাসঘাতকতা জিতে গেছে, গুপ্তচররা জিতে গেছে, হত্যাকারীরা জিতে গেছে। এসবের বিরুদ্ধে যারা দাঁড়িয়েছিল, তারা হেরো হেরো হেরো। এক আর্বান গেরিলা যখন ভোটের রাজনীতির প্রয়োজনের কথা বলে জোটে ভেড়ার তাল করে, অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা উদ্ধৃত হয় বাবার চিঠিতে— তখন তরাই ছিল, এখন ডিভান/চক্রব্যূহে লাশ হয়ে পড়ে আছে সেই ছেলে/ তুমি আজ রাজা হবে তার রক্ত পায়ে দলে/ তখন বারুদ ছিল, এখন বাগান। সুখেন্দ্রর সত্য অন্যরকম। তাঁর মতে, ইতিহাসে যেসব নাম আলোকদীপ্ত হয়ে আছে, যেসব নাম হামেশাই উচ্চারিত উদ্ধৃত হয়, তাঁরা সবাই গ্রেট ম্যানিপুলেটর। ভালো করে ঘেঁটে দেখ, আদর্শ-ফাদর্শ নয়, ম্যানিপুলেশন, যে যত ভালো পেরেছে, সে তত বেশি জিতেছে, যে পারেনি, হেরে গেছে। একটা কলম বা হাতুড়ি বা পিস্তল, যতই এফেকটিভ হোক, কী করতে পারে? শিক্ষামন্ত্রী হবে? শ্রমমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী? লাঙল হবে কৃষিমন্ত্রী? হয়েছে কোনোদিন? হতে পারে? ওসব ইমেজ বিল্ডিংয়ে হয়। সায়ম, আদর্শের ঠুলি পাবলিকের জন্য। তুমি কি পাবলিক হয়ে মরতে চাও? শোনো, তুমি লিটল ম্যাগাজিনে লেখো বলে শুনেছি। ওই লিটলওয়ালারা ঢের ভালো কথা ছাপে, আর আমার মতো খারাপ লোকের হাত-পায়ে পড়ে বিজ্ঞাপনের জন্য। দিই, বুঝিয়ে দিই, ভালো লেখা স্পনসরড বাই খারাপ লোক। এই যে লক্ষ লক্ষ টাকা দামে ছবি বিক্রি হয়, কোত্থেকে আসে সেই টাকা? সৎপথে? টাকা আছে বলেই না তারা শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক! এবার উঁচু জমি ছেড়ে নীচে এসো, এক লেখক প্রায়ই বলেন, ভালো লেখা লিটল ম্যাগাজিনেই বেরোয়, শেষ পর্যন্ত লিটল ম্যাগাজিনই টিকে থাকে। অথচ তিনি নিজে বড় কাগজে লেখার জন্য অক্লান্ত চক্কর মারেন। তোমাদের এই জগৎ সম্পর্কে আমার বিশেষ জানা নেই, তবে মনে হয় এখানেও ইতিহাসের একই স্রোত, ইতিহাসের একই সত্য। একজন অন্যজনকে বলে, সেন্টারে যেতে চাওয়া একটা লালসা, একটা কদর্যতা। যে বলছে, সে কিন্তু সেন্টারে পৌঁছনোর জন্য লড়ে যাচ্ছে। সুধীরেন্দ্রর ঘরে মিতুলদি তখন অগ্নিযুগের কথা পাঠ করছিল। চিকিৎসাবিজ্ঞান-বহির্ভূত যন্ত্রণা ধীরে ধীরে উপশম হয়ে ঘুম নামছিল বড়মামার ভেঙেচুরে দলা-পাকিয়ে-যাওয়া শরীরে। সুখেন্দ্র কোনো কথা না বলে উল্টোদিকে হাঁটতে শুরু করলেন মা-র ঘরের দিকে। দিদিমা সবে কথাসরিৎসাগর খুলে বসেছেন। সুখেন্দ্র বললেন, মিতুলের বিয়ে কি তোমরা হতে দেবে না? মামারা ওর একটা করে সম্বন্ধ আনছে, আর তোমরা ভেঙে দিচ্ছ। বড়দা যা করছে সেটা অন্যায়, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি। বড়দার অবদমিত কামের শিকার হচ্ছে মিতুল। শুনতে খারাপ লাগবে, মিতুল একটা নারী, সে যুবতী।

তাকে সহচরী করে বড়দা নিজের স্বপ্নের জগতে বাস করে। এতে একধরনের আধা-শরীরী আনন্দ হয়। ব্যর্থ বিপ্লবের কাহিনি নারীর গলায় একরকম সফলতা পায়, ভেতরে ভেতরে পুরুষের ক্ষরণ হতে থাকে। ব্যাপারটা বোঝাতে পারছি কিনা জানি না, সুস্থ শরীর যা পায়নি, কামনা সত্ত্বেও যা নিষিদ্ধ জ্ঞান করেছে, নিজেকে দমন করেছে অলীক আদর্শে, আজ সেই নারীশরীরের জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছে, বদলা নিচ্ছে প্রাকৃতিক ধর্ম। অনেক বিপ্লবী আমরা দেখেছি, যারা নিজের মা আর কালীঠাকুর ছাড়া নারীমুখ দর্শন করত না, বিয়ের পর সাত আটটা বা তারও বেশি ছেলেমেয়ের বাপ হয়েছে একদমে। এসব শুনতে খারাপ লাগে। বড়দার কামের শিকার মিতুল। মিতুলের যখন বিয়ের বয়স থাকবে না, ওর শিকার হবে সায়ম! কিছুক্ষণ পরে সুখেন্দ্র আহত বিক্ষত স্তব্ধ 'পত্রপুট' থেকে বেরিয়ে জনতার আলোয় আনন্দে ভেসে ভেসে গরালির ওপারে চলে গেলেন, খাল তখন সাপের খোলসের মতো পড়ে। সায়ম অশ্বমেধের ঘোড়ার নিশান যত দূর চোখ যায় দেখেছিল।

শ্রীকাকুলাম থেকে বাবার চিঠি পেল সায়ম। লিখেছেন, তোমার মা-কে নিয়ে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বেরিয়েছি। তুমি হয়ত জানতে চাইবে না, রাতারাতি এত টাকা আমি কী করে পেলাম। যে-কোনোদিন বিষ্ণুপুর বা মুর্শিদাবাদে যেতে পারেনি, সে হঠাৎ হাজার মাইল পাড়ি দিচ্ছে? তবু বলি, আসলে দাক্ষিণাত্য আর তেমন দূর নয়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে শয়ে শয়ে লোক চিকিৎসা করাতে রোজ আসছে। কলকাতার ডাক্তারদের ওপর ভরসা নেই। বাঙালির হুজুগ আর আতিশয্য বাদ দিয়েই বলছি, বাঁচার আগ্রহ বেড়েছে, সুচিকিৎসা পেতে চায় এবং গত পঁচিশ বছরে বাঙালি মধ্যবিত্তের হাতে বিপুল খরচ করে চিকিৎসা করাবার মতো টাকা যেভাবেই হোক এসেছে। তারা তো আর আমার মতো বোকা বা অপদার্থ নয়। শেষ পর্যন্ত আমার হাতেও এসেছে, আরও আসবে। গঙ্গার পাড় বাঁধানোর বড় একটা কন্ট্রাক্ট পেয়েছে কোম্পানি। কর্তার বিশ্বাস, সেটা আমার জন্যই পেয়েছে। আমার দায়িত্ব ছিল, কোম্পানির হয়ে সরকার আর পার্টির মধ্যে কথাবার্তা চালানো। যদিও আমি ডাইরেক্টলি এই কোম্পানির স্টাফ নই। বোঝো, আমি কতটা ধুরন্ধর হয়েছি। বোঝো, চুরিচামারির সমস্ত চুক্তি আমি নিখুঁতভাবে করেছি। এর জন্য বখশিস পেয়েছি এক লাখ, ইয়েস, আপাতত। আমার আদর-যত্ন, সম্মানের বহর ভাবা যায় না, জীবনে ভাবিনি এত সুখ পেতে পারি। পাঁচ লাখ টাকার পাথর— এহাঁ কা মাল ওহাঁ করে পাঁচ কোটি টাকা বখরা হয়ে যাওয়া, আগে ভাবলে, শিউরে উঠতাম, এখন পুলকিত হই। অক্টোবরে আরেকটা কাজ করতে হবে। একটা প্রায়-বন্ধ কারখানার জমি কেনাবেচা করতে হবে। বামপন্থী ঐতিহ্যের রাজ্য তো, খুব একটা অসুবিধা হবে না। দু-চারজন ভূতের রাজাকে খুশি করতে পারলেই জবর জবর বর মিলে যাবে। তোমাকে এসব বলে নিজের বিপদ ডেকে আনছি না তো? কীই বা বিপদ। তুমি নিশ্চয় চাইবে না তোমার মা খারাপ থাকুন। তুমি নিশ্চয় চাইবে না তোমার মা সারাদিন দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ঠাকুরের কাছে এ পোড়া জীবন থেকে মুক্তি প্রার্থনা করুন, প্রতি সন্ধ্যায় মৌনী হয়ে একশো আট বার ভুল বানানে দুর্গানাম লিখুন। উনি এখন ভালো আছেন, চোখমুখ পাল্টে গেছে। আমার প্রেসার, সুগার, কোলেস্টেরল, ইউরিক অ্যাসিড ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য যথেষ্ট সময় দেন। তোমাকে না বললে কাকেই

বা বলি! বলার দরকারই নেই। তবু বলা এই জন্যে যে, এভাবে বাঁচার কথা তো আগে ভাবিনি। বলতে পারো, স্বীকারোক্তি করে নিজের যন্ত্রণা লাঘব করা। এই স্বীকারোক্তির মতোই হঠাৎ মধ্যরাতে শ্রীকাকুলাম স্টেশনে নেমে পড়েছি। এই একটি নাম একদিন আমাদের রক্তে আগুন ধরিয়েছে। রাত জেগে জেগে দেওয়ালে দেওয়ালে লেখেছি এই নাম। সে লেখার পেছনে কতটা যুক্তি ছিল, কতটা আবেগ, কতটা প্রচার, কতটা অন্ধতা, সেই তর্কে যেতে চাই না। আমি তো ছিলাম শুদ্ধ পবিত্র। আমরা। আমাদের আকাঙক্ষায় কোনো ধান্দা ছিল না, ক্ষমতার স্পৃহা ছিল না, ভোগের মতলব ছিল না। শোষিত পীড়িত মানুষের জন্য একটা প্রশ্নহীন কল্যাণকামনায় আচ্ছন্ন ছিলাম। পাওয়া নয়, নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার ছিল সেই যুগ। আজ শোষিত পীড়িত শব্দগুলি শুনে কেউ সন্দেহ করতেই পারে। কিন্তু তার জন্য সেই সময় দায়ী নয়। সেই সময়ের নিষ্ঠা ঐকান্তিকতা নিয়ে মতলববাজ ছাড়া কেউ প্রশ্ন তুলবে না। আজ যখন বলা হয়, সে দশক মুক্তির ছিল না, যুক্তিরও ছিল না, হতে পারে, তবে সে দশক চুক্তির ছিল না, যে চুক্তি খাল কেটে কুমির ডেকে আনে, যে চুক্তি ১৫ শতাংশ মানুষের ভোগের কথা ভাবে, যে চুক্তি নদীর পাড় বিপন্ন করে আমার জীবন সম্পন্ন করে। শ্রীকাকুলামের মাটিতে দাঁড়িয়ে সেই শুদ্ধ পবিত্র দীপ্ত জবাকুসুমসঙ্কাশ মহাসময়কে প্রণাম জানালাম।

বড়মামা শরীরটা কোনোক্রমে উপুড় করে, বালিশে বুক চেপে, হাতের ভরে মাথা তুলে অগ্নিযুগের কথা পড়ছেন, সায়ম দেখেছিল। শুনেছিল, কর্ণফুলি নদীর ব্যালেস্টাইন ঘাটের কাছে রজত সেনের বাসা। বিপ্লবীরা রজত সেনের বাড়ি গেলেন। রজতের মা বিনোদিনী সেন বিপ্লবীদের মাসিমা। তিনি সকলকে আশ্রয় দিলেন। রজত সেন বাড়ি এসেছে, এ খবর পুলিস সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গেল। বিপ্লবীরা খেতে বসেছেন। রজতের ছোট ভাই দৌড়ে এসে খবর দিল, পুলিস আসছে। ভাত আর খাওয়া হল না। থালার ভাত থালায় পড়ে রইল। বিপ্লবীরা বেরিয়ে পড়লেন। কর্ণফুলির ঘাটে একখানা সাম্পান বাঁধা ছিল। মাঝি নেই। বিপ্লবীরা সাম্পান চালাতে লাগলেন। পুলিস লঞ্চ নিয়ে ধাওয়া করল। প্রাণপণে সাম্পান চালিয়ে বিপ্লবীরা অপর তীরে পৌঁছে গেলেন। তীরে এসেই দৌড়তে শুরু করলেন। পুলিস গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলল, ওরা ডাকাত। ওদের ধরো। গ্রামবাসীরা বিপ্লবীদের তাড়া করল। একজন গ্রামবাসী দেবপ্রসাদ গুপ্তের কাঁধে দা দিয়ে সজোরে কোপ মারল। দেবপ্রসাদের ডান হাত ঝুলছে। পেছনে তাড়া করছে পুলিস। সামনে ইটপাটকেল ছুঁড়ছে গ্রামবাসী। ক্ষেতের ওপর ছুটছেন বিপ্লবীরা। তাঁদের পথ ক্রমেই সংকীর্ণ হচ্ছে। ঘিরে ফেলছে গ্রামবাসীরা। 'ডাকাত ডাকাত' চিৎকারে আশপাশের গ্রামের মানুষও ডাকাত ধরতে ছুটে আসছে। অন্ধকার এসে বিপ্লবীদের আত্মগোপনের সুযোগ দিল। সেই অন্ধকারে পুলিশ ডাকাত খোঁজে। গ্রামবাসীরা ডাকাত খোঁজে। আর মাতৃভূমির মুক্তিসাধনার ব্রতে যাঁরা ঘরের সুখ, মায়ের স্নেহ, প্রিয়ার সঙ্গ ছেড়ে দুঃখ-ক্লেশপূর্ণ অনিশ্চিত জীবনকে বরণ করেছেন, সেই বিপ্লবীরা আরও অন্ধকার, আরও অরণ্য, আরও গুহা খোঁজেন।

১৫৭. কাকবেলা

আরে, তুমি এলে কোত্থেকে? এই অকালে, এই অদেশে? হিজলের জারুলের শিরীষের ছায়া কবেই সাফ হয়ে গেছে। এখন পাথর আর রোদের প্রাণান্তকর খেলা। আনারসের বাগান কবেই লোপাট। নেই বাঁশবন, নেই সুপুরির সারি, নেই বেতের ঝাড়, নেই পাতা ঝরার শব্দ, নেই ঝরাপাতার মাটি, নেই জলাজমির বাতাস। তবু তুমি এইখানে এলে কেন বাপু? আর কি মরার জায়গা জোটেনি তোমার? সেইরকম সেজে এসেছ, লেজে কাজল মেখে, আলতায় পা ডুবিয়ে। সেই গান ধরেছ? বোঝা বা শোনার মতো মনই নেই। হৃদয়ের সমাধিক্ষেত্রে এসেছ তুমি শ্যামা! এই যে দেখছ চরাচর জুড়ে জানালা কপাট বারান্দা পাঁচিল, সবই সমাধিসৌধ। একদিন তালগোল পাকিয়ে বিশাল ঢিবি হয়ে যাবে। তা তুমি কি বাপু হাজার হাজার বছরের সাজ নিয়ে এসেছ হৃদয় জাগাবে বলে? শোনো, এই ঘরে এসে বোসো। পুরনো ঝাড়ির মেঝে স্যাঁৎসেতে, ঠান্ডা। ভালোই লাগবে। কার্নিশে পা পুড়ে যাবে, তুমি যা সুখী পাখি, রোদে তো বেরোতেই না। ছায়ায় ছায়ায় ঘুরতে যাতে রং না জ্বলে যায়। ঝোপের ভেতর পাতার শীতল মঞ্চে বসে গান গাইতে। এখন যদি তুমি এই সর্বখাকি রোদে, আগুনের গোলাছোঁটা বাতাসে উড়ে উড়ে গান গাও, লোকে ভাববে ভিখিরি এসেছে। মাফ করো বলতে পারে, দরজা বন্ধ করে দিতে পারে, কুকুরও লেলিয়ে দিতে পারে। দু-চার পিস ধান্ধামূলক দরদী আছে, যারা তোমার গান ক্যাসেট করে নাম কিনবে, মালকড়ি কামাবে, এক পয়সা রয়্যালটি দেবে না। মানুষের এই স্বভাবে তুমি দুঃখ পেতে পারো। তোমাদের স্বতঃস্ফূর্ত পাঠশালা ব্যর্থ হয়ে গেছে ভেবে কষ্ট পেতে পারো। কী দরকার? এর চেয়ে ঢের ভালো নয় কি অন্য কোনোখানে চলে যাওয়া? কোথাও কি এখন নদী নেই, জলাভূমি নেই, সবুজ নেই, বৃষ্টি হয় না, আকাশ পাল্টে পাল্টে ঋতু আসে না, ঋতু পাল্টে পাল্টে জীবন বয়ে চলে না? সবখানেই কি সবকিছু অবরুদ্ধ হয়ে গেছে, সব দেশই কি আত্মরক্ষামূলক পরমাণু বোমার তাপে বসে আছে? শ্যামা, তুমি বাথরুমে যাবে কি? তোমার তো দিনে দু-চারবার গা ধোওয়ার বাতিক আছে। বলি কী, শোনো, আমাকে সিনিক ভেবো না, পারো তো মুছে যাও, লুপ্ত হয়ে যাও। এখানে সঙ্গিনী পাবে না যে একটু প্রেম করবে, সন্তান করবে। আর যদি থাকতেই হয়, কাক হয়ে যাও। রূপের বালাই নেই, গানের বালাই নেই। সারাদিন কা কা করবে, উচ্ছিষ্ট খাবে, খাবারের জন্য দুয়ারে দরজায় জানালায় ঘুরঘুর করবে, তক্কে তক্কে থেকে ছোঁ মেরে নেবে। খাওয়া ছাড়া দিনভর কোনো কাজ নেই, অনন্ত লোভে ঠোঁট বেঁকে পুড়ে পৃথিবীর বীভৎসতম রাত্রির মতো কালো হয়ে আছে। কোনো চরিত্র রেখো না, অহংকার রেখো না, অভিমান রেখো না শ্যামা, গড়পড়তা হয়ে যাও। বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনের কেউ আক্রান্ত, আহত বা মৃত হলে এক-আধ ঘণ্টা বিক্ষোভ সমাবেশ কোরো। সে সময় ডাস্টবিনে মড়া ইঁদুর নজরে পড়লে বা পচা কুকুরের খোঁজ পেলে সমাবেশ ছেড়ে চলে যেও। শ্যামা, তোমাকে পিণ্ডিখেকো কাক বলে সব উপকথা ভেঙে মনে নেব।

সায়ম পাখিমামার সংলাপ শোনে। পাখি গান গায়।

অস্ত্রপ্রপাত

টিলার ওপর জ্যোৎস্নায় জানোয়ারটা দুর্বিনীত দাঁড়িয়েছিল। এরকম অনেকেই দাঁড়ায়, ইতিহাসে এরকম অনেক রাষ্ট্রনায়ক আছে, রাষ্ট্রনায়কদের আমচা-চামচা আছে, খুদে মনসবদাররাও দাঁড়ায়, যারা গণতান্ত্রিক রাজা বা রানীকে কাঁচা মেয়েমানুষ বা তাজা মরদ সাপ্লাইয়ের মতো অকথ্য কাজকর্ম করে, তারাও দাঁড়ায়। এই দাঁড়ানোর মধ্যে সময়ের প্রতিভূ হয়ে ওঠার অহংকার থাকে। বিকর্তন জানোয়ারটাকে আপাদমস্তক নগ্ন দেখতে পাচ্ছিল। উপরের অবস্থা সবসময় রণকৌশলগত সুবিধাজনক হয় না। উপরে জ্যোৎস্না ছিল, নীচে ছিল ঝোপঝাড়ের তিমিরবিভ্রম। লতাগুল্মের গন্ধ পরমাত্মীয়র মতো বিকর্তনের পাশে দাঁড়িয়েছে। শক্ত মাটির ব্রাত্য বামন গাছগাছালির মন নরম মাটিরই মতো। কীটপতঙ্গ কোলাহল না থামিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রেখেছে। চারপাশের এই বন্ধুতা বিকর্তনের কাছে নতুন নয়! টারজান যেমন পাখির বা বাঁদরের ডাকে পেয়ে যায় হিংস্রতা শত্রুতার খবর, পাহাড়ি ইঁদুর যেমন বন্দি টারজানকে গুহা থেকে বেরনোর পথ দেখিয়ে দেয়, অনেকটাই তেমনই। বিকর্তন জীবনে অপাংক্তেয়দের ভালোবাসা ঢের পেয়েছে। জানোয়ারটা আচমকা এক ধাক্কায় টিলা থেকে বিকর্তনকে ছিটকে দিয়েছিল। তার হাত-পা ভাঙতে পারত, মাথা ফাটতে পারত, চোখ নষ্ট হতে পারত, পাঁজর জখম হতে পারত, রক্তক্ষরণে সে মরে যেতে পারত। বাঁচিয়েছে গাছপালা মাটি। যেন তাকে কোলে লুফে নিয়েছে। বিকর্তন জানোয়ারটার সামগ্রিক অস্তিত্ব, তার ক্লেদাক্ত অতীত, প্রতারণা, চক্রান্ত, করুণার দম্ভ, অনর্গল মিথ্যাচার সবই সেই জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখল। প্রতিবন্ধ মরে গেছে ভেবে জানোয়ারটা লম্বা তম্বি ছুঁড়তেই ঝোপ থেকে বিতর্কন গুলি চালাল। নিশানা কপাল থেকে নড়েনি। প্রথমে একটা চিৎকার, তারপর গোঙানি, তারপর স্তব্ধতা হুড়মুড় শব্দে নীচে রাতের নদীতে আছড়ে পড়ে। অসাধুতার বর্ণমালা এভাবে নীরব হয়ে গেলে ঝোপ ছেড়ে বেরিয়ে আসে বিকর্তন চাঁদ। গুলির শব্দে ত্রস্ত পাখিরা আর ডেকে উঠছে না। বনস্থলী আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। হেমন্তের হিমে ঘন জ্যোৎস্না গড়াচ্ছে গাছের মাথায় মাথায়। গাছগাছালির মোহিনী লজ্জার মতো অনন্ত মসলিন মনে হয় জ্যোৎস্নাকে। কনকদুর্গা মন্দিরের চাতালে বসে বিকর্তন। শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। উত্তেজনার পর ভেতরে ভেতরে একটা ক্লান্তি ছড়িয়ে যায়। হাত-পা ছড়িয়ে আকাশমুখো শুয়ে থাকতে ভালো লাগে। কেউ যেন

বলল, আবার একটা খুন করলে বিকে। বিকর্তন তেমনি শুয়ে শুয়ে নিশ্চিন্ত গলায় জানায়, আরেকটা শিকার।

লেপের ভেতর চন্দ্রাবলী আরও তাপ চেয়ে শিকারের গল্পের জন্য পুরুষকে জাপটে কিছুক্ষণ উঁ উঁ উঁ উঁ করলে বিকর্তন কনকটিলার কাহিনি বলেছিল। সে তত ভালো বলতে পারে না, যতটা ভাবতে পারে, দেখতে পারে, বুঝতে পারে। বলতে গেলেই গুটিয়ে ছোট হয়ে যায় লম্বা কাহিনি। দু-চার কথার পর ফুরিয়ে যায়। কত কিছুই যে বলা হয় না। সেইসব না বলা কথা মাথার ভেতর, রক্তের ভেতর আলোশরীর নিয়ে জেগে উঠে ছায়া হয়ে যায়। বিকর্তন ধরতে পারে না। কনকটিলার ঘটনার রাতে জ্যোৎস্না ছিল ঈশ্বরীর ভূমিকায়। সে-কথা সে কীভাবে বোঝাবে। জ্যোৎস্না অত ঈশ্বরী না হলে জানোয়ারটাকে সে চিনতেই পারত না। সে কীভাবে বোঝাবে, জানোয়ারটার উর্ধ্বাঙ্গে নিম্নাঙ্গে চক্রান্তের উল্কিগুলি স্পষ্ট করে দেখেছিল সেই ঈশ্বরীর চোখ।

চন্দ্রাবলী বলল, অরণ্যদেবের ক্ষিপ্রতায় বিদ্যুতও টেঁড়স। অরণ্যদেব রাগলে বাতাস টুইস্টার হয়। অরণ্যদেবের খুলিচিহ্ন দেখে খারাপ লোক খাবি খায়।

কনভেন্টে পড়া মেয়েটির শরীর আগুনের মালসা হয়ে বিকর্তনের বুকে উঠে এসেছে। বাঁ হাতে গলা জড়িয়ে ডান হাতে চুলের মুঠো ধরে ছোট ছোট ঝাঁকুনি দিচ্ছে। তলপেটে ঘষছে উরু। তলপেট থেকে নীচে নেমে গূঢ় চাপে আবার উঠে আসছে। বিকর্তন চন্দ্রাবলীর পিঠে হাত রেখে বলল, কনকটিলায় সে-রাতে আর কেউ ছিল।

কে? প্রশ্ন করে চন্দ্রাবলী থামেনি। বিকর্তনের ঠোঁটে নেমে এসে পুরুষকে ও নিজেকে একটা অগ্ন্যুৎপাতের জন্য অস্থির করতে থাকে।

কোনোক্রমে বিকর্তন জবাব দেয়, আমার প্রপিতামহী। বিকর্তন জানে. এরপর অন্তহীন অশ্বখুরের শব্দ ছুটতে থাকবে। সে তার প্রপিতামহী সম্পর্কে আরও বলতে চায়। কতটুকুই বা আর বলতে পেরেছে। তার প্রপিতামহীর জীবন শুধু এটুকু নয় যে, চন্দ্ররেখার মৃতদেহের সামনে প্রণত হয়েছিল সাত অশ্বারোহী। তারা অস্ত্র নামিয়ে রেখে আপসে ভাগ করে নিয়েছিল সেই দেহ যা তাদের কামনায় আজও অমিত প্রণয়িনী। সাত অশ্বারোহী সূর্যাস্তের পর তাদের চামড়ার থলের ভেতর বনৌষধির প্রলেপে সাত দেহখণ্ড নিয়ে সাত দিকে অন্ধকারে অন্তর্হিত হয়েছিল। তাদের আর কোনোদিন কেউ দেখেনি। চন্দ্রাবলী জানে না, চন্দ্ররেখা এভাবে সাত প্রপিতামহীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। বিকর্তন বলতে চায়। চন্দ্রাবলী এখন ধাবমান অশ্বখুরের অনুভবে প্রায় উন্মাদিনী।

মাটির উৎপত্তি হয়, জল দেখা দেয়, একটু একটু করে প্রাণ জন্মায়, পরিবেশ কথা বলার উপযোগী ঠান্ডা হয়। বাতাসে আসন্ন সবুজের গন্ধ পায় বিকর্তন। চন্দ্রাবলীর কপাল থেকে ভেজা আলোল অলকগুচ্ছ সরিয়ে দিতে দিতে বলে, আমার পিতামহ আয়ুর্বেদজ্ঞ হয়েছিলেন।

দুই

সে এক প্রপিতামহীর কাহিনি। যাঁর খোঁজে বিকর্তন চাঁদের পিতামহ লাল চাঁদ জীবনের অনেকটা বনে বনে কাটিয়েছেন।

জনশ্রুতি এই যে, চন্দ্ররেখা যখন সপ্তদশী, কোনো পলাতক বাঘের পশ্চাদ্ধাবন করে তিনি দেশান্তরী হন। তাঁর জন্মভূমি, জন্মসূত্র, শিক্ষাসাধন, রাগ-অনুরাগ সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। এটুকু অনুমান করা যায়, তিনি সাহসিনী ছিলেন, বলশালিনী ছিলেন, এবং অস্ত্রবিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন। শিকারে তিনি নিয়মিত যেতেন কিনা জানা যায় না।

জনশ্রুতি এই যে, চন্দ্ররেখা বাঘের পেছনে ছুটতে ছুটতে খুলনা, পাবনা, নোয়াখালি, এমনকী গারো পাহাড়ের বর্ষা পর্যন্ত একা ছিলেন। সেখানে তিনি হঠাৎই এক সঘন বর্ষণ ও বজ্রাতুর রাতে নিজের জীবন সম্পর্কে অনুরাগিনী হন। পলাতক বাঘকে ধরা ও মারার ভাবনা অর্থহীন মনে হয় তাঁর। ঋতুচক্রের হিসেব থেকে তিনি বুঝতে পারেন ইতোমধ্যে তিনটি বছর পেরিয়ে গেছে। অবশ্য তিনি সেই তিনটি বছরকে ব্যর্থ মনে করেন না। কারণ, তাঁর অবিশ্রান্ত তাড়ার জন্যেই বাঘ কোথাও থিতু হতে পারেনি, এক মুহূর্তের জন্য স্বস্তি পায়নি। অপরাধ করার সাহস পায়নি। বাঘ সম্পর্কে চন্দ্ররেখার একাগ্রতা হারানো ও নিঃসঙ্গতা বোধের অন্যতম কারণ এক সন্ন্যাসী, যাঁর কণ্ঠে 'মেঘদূত' শুনেছিলেন চন্দ্ররেখা। এটা হওয়া স্বাভাবিক যে, তিনি 'মেঘদূত' শোনার পর বর্ষণমন্দ্রিত রাতে ধূসর শূন্যতার থেকে জীবনের নতুন অর্থের সঙ্কেত পান। তিনি তো এর আগে বেশ কয়েকটা বর্ষা-বসন্ত একা দিব্যি কাটিয়েছেন, তখন তো কষ্ট পেতে হয়নি। আসলে 'মেঘদূত' চন্দ্ররেখার মনে সঙ্গবাসনা তৈরি করেছিল। তিনি কয়েকটি নিশিদিন-জোড়া বর্ষণ শেষে সন্ধ্যাপরিণামী আলোয় 'মেঘদূত' শোনেন, যেখানে সব স্বপ্নের মৃত্যুর খবর দেশ-দেশান্তরের ঘরে-গেরস্থে পৌঁছে দিতে মেঘের কাছে আবেদন করা হচ্ছে, এবং সেই 'মেঘদূত' সন্ন্যাসী ক্রমেই রচনা করে চলেছেন। সন্ন্যাসীর পর্ণকুটিরে হাজির হন চন্দ্ররেখা। পাহাড় থেকে তখন জল নামছে। কলকল শব্দের ভেতর পর্ণকুটির ভাসছে। চন্দ্ররেখা উঠোনে উঠলেন। তারপর একমাত্র সিঁড়ির ধাপে। তারপরই সন্ন্যাসীর একান্ত পরিসরে। পর্ণকুটির বলতে সমতলে যা বোঝায় তেমন নয়, পাহাড়ের খাঁজে ডিঙির মতন। চন্দ্ররেখার বসন-ভূষণ সম্পর্কে জানা যায় না। রূপকথার মতো কোনো আবরণ নিশ্চয় ছিল।

জনশ্রুতি এই যে, ডিঙির কোলে চন্দ্ররেখা ও সন্ন্যাসীর নানা বিষয়ে আলোচনা চলে। প্রথমে বিষয় ছিল স্বপ্নের মৃত্যু, যা মেঘদূতে সন্ন্যাসী বলেন, পরে স্বপ্নের জন্ম, জন্মের সংস্কার, সংস্কারের দেশকাল ইত্যাদি পেরিয়ে এক অসহায়তার মধ্যে, এক বিমূঢ়তার মধ্যে, স্থবিরতার মধ্যে পাক খেতে থাকে। দিন যায়, রাত যায়, আরও দিন আরও রাত, সন্ন্যাসী ক্রমশ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। মৃত স্বপ্নের অসংখ্য শব-সংবাদ জীবনের পথ-প্রান্তর জুড়ে ছড়ায়। চন্দ্ররেখা ও সন্ন্যাসিনী পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিতেই পারতেন। দেননি। অন্তত একটি স্বপ্নের ভ্রূণের গর্ভের ভেতর তাঁরা বেঁচে উঠতে চান। এই বেঁচে উঠতে চাওয়ার মূলে কাজ করেছে হাজার বছরের

সৃষ্টিপিপাসা, সৃষ্টিসুখ। আলিঙ্গন, চুম্বন, পেষণ, মন্থন-জাত আহ্লাদের যে সুমধুর স্মরণ মাটির গভীর থেকে গভীর বাতাসে লিপ্ত আছে, কৃষি পশুপালন বাণিজ্য সন্ধি বিগ্রহে যে সুখের স্মরণ মৃত্যুহীন হয়ে আছে, তাকে সযত্নে এড়ালেও সৃষ্টিপিপাসা থেকেই যায়। পাহাড়ের খাঁজে, জলের কলকল শব্দে ভেসে থাকা ডিঙির মতো পর্ণকুটিরে চন্দ্ররেখা ও সন্ন্যাসী পরস্পরের পিপাসার মধ্যেই একটি স্বপ্নের জন্ম দিতে থাকেন। হঠাৎই বাঘ এসে হাজির হয়।

স্বপ্নের অন্তঃসত্ত্বা চন্দ্ররেখাকে দুর্বল ভেবেছিল পলায়নপর বাঘ। স্বপ্নের গন্ধ বাঘ চেনে। সুখের গন্ধ বাঘ চেনে। চন্দ্ররেখা ভেবেছিলেন, তিনি বাঘকে তাড়া করছেন। বাঘ পালাচ্ছে। এটা ঘটনা। এটাও ঘটনা যে, বাঘ চন্দ্ররেখাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। নিজে পালাতে পালাতে অনুসরণকারীকে দূরে আরও দূরে অচেনা দুর্গমে নিয়ে যেতে পারার আনন্দ আছে। বাঘ যখন খেয়াল করল যে পশ্চাদ্ধাবনকারিণী নেই, তার আনন্দ চোট খায়, সে পালানোর মধ্যে মজা পায় না। তিন বছর ধরে তাড়া খাওয়ার হাত থেকে মুক্তি ও নিরাপত্তার আনন্দও তার বিরস মনে হয়। সে পশ্চাদ্ধাবনকারিণীকে খুঁজতে থাকে। এবং খুঁজতে খুঁজতে স্বপ্নের সুখের তাজা গন্ধ পায়। জল খেতে এসেছিল বাঘ। ওপরে দেখে, মেঘের চাঁদের ছায়ায় আলোয় একটা কুঁড়েঘর দুলছে। গন্ধ আসছে সেই ঘর থেকে। বাঘ চুপিসাড়ে, দীর্ঘ নজর রেখে সুখাবিষ্ট স্বপ্নের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিল। মুহূর্তে সন্ন্যাসীকে আক্রমণাত্মক দেখে সে পিছু হটে। শুরু হয় আরেক পলায়ন পর্ব।

তিন

তোমাকে কেউ হিংসা করে? বিকর্তনকে জিজ্ঞাসা করে চন্দ্রাবলী।

ঘৃণা করে।

কেন?

আমি আইন-কানুন মানি না। বেআইনি অস্ত্র রাখি। আমার রক্তে হিংস্রতা আছে। খুনখারাবির ধাত আছে। আমি ঠিক সামাজিক মানুষ নই। বিকর্তন বলে।

চন্দ্রাবলী বলল, আমার বেশ লাগে। অস্ত্র ছাড়া তোমাকে ভাবতেই পারি না। জন্তু-জানোয়ার মেরেছ বলেই তুমি সামাজিক।

বিকর্তন এই ভালো লাগার কথা প্রথম শুনছে না। অনেকেই তার বন্দুকের হাতের প্রশংসা করেছে। অনেকেই বলে, সেবার বিকর্তন এল বলেই তো বাঁচলাম। আর কটা দিন দেরি হলে বাঘের পেটে যেতে হত। যে যাই বলুক বিকর্তন আমাদের ভগবান। অনেকেই বলবে, তাদের হাটবাজার চাষবাস রক্ষা পেয়েছে বিকর্তনের দয়ায়। অনেকেই বলবে, সমাজ বিপদে পড়লে বিকর্তনের বন্দুক লাগে।

সেসব বলার অনুভূতি একরকম। আর চন্দ্রাবলীর বলাটা একেবারেই অন্যরকম। উপকৃত মানুষ কৃতজ্ঞতা জানাবে, অসহায় মানুষ ভরসা করবে, এটা স্বাভাবিক। চন্দ্রাবলী

তো তাদের দলে নয়। বিকর্তনের শিকারের গল্পে মেয়েটা মজে গেল কেন ব্যাখ্যা করা কঠিন। অরণ্যদেব বা টারজানের আবেশ বা আর্জান সর্দারের রোমাঞ্চ বা জিম করবেট ও অ্যান্ডারসনের সাহসিকতা হয়ত চন্দ্রাবলীকে বিকর্তন সম্পর্কে আগ্রহী করেছিল। তার বন্ধুরা যখন পাঠ্যবইয়ের ভেতর মুম্বাইয়ের নায়কদের ছবি রাখছে, টুকটাক শরীর খেলছে, ভবিষ্যতের কথা ভেবে বড়লোকের ছেলে ধরছে, বা মন দিয়ে কেরিয়ার করছে, চন্দ্রাবলী বিকর্তনকে নিয়ে মেতে উঠল। কে বিকর্তন? কেউ জানে না। বংশ আর ঘরবাড়ি দিয়ে যেখানে মানুষ চেনা হয়, সেখানে বিকর্তন বস্তুত পথের ছেলে। তার সম্পর্কে যা জানা যায়, তা হল, দুনিশার হাটে বাঘ মেরেছে, রানিসুখবান্ধায় বাঘ মেরেছে, বদ্যিগড়ে বুনো হাতি মেরেছে। যারা বনে যায়, যারা উৎপাতে পড়ে, তার সাহায্য নেয়। তাকে ভাড়া-খাটা বন্দুকবাজও বলা হয়।

চন্দ্রাবলী বলল, আমি তোমাকে হিংসা করি।

কেন?

তুমি চিতাবাঘের গান শুনেছ।

বিকর্তন হাসে। বুঝতে পারে, মেয়েটা সোনাগাঁর জঙ্গলে চিতাবাঘ আর বাঘিনীর ঘটনা শুনতে চাইছে। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে সুগঠিত আর সুন্দর চিতাবাঘের গলাটা ভীষণ খারাপ, বড়ই কর্কশ। অথচ সেই চিতাবাঘই খেলার সময় গানের মতো সুরেলা তরল স্বর ঝরায়। প্রণয়ের কী মাহাত্ম্য। প্রণয়িনী সেই স্বরে আত্মসর্মপণের জন্য অধীর হয়ে ওঠে।

বলো তো কজন শুনতে পারে পুরুষ চিতার গান? মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হতে পারে সেই গানে? সবাই ক্লাব করে, পার্টি করে, জলসা করে, মেলা-টেলা করে, ছক্কা পাঞ্জা করে। সেভাবেই জীবনকে সদর্থক করে তুলতে চায়। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলে বা ওয়াইল্ড লাইফের সিডি রমে হিংস্র পশুদের যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম দেখা ও শোনা জীবনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি মনে করে।

চন্দ্রাবলীকে কথায় পেয়েছে। উঠোনে ছড়ানো দুপুরে হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছে। ও হয়ত সবটা ঠিক বলছে না। সবাই কেন জঙ্গলে যাবে? সবাই কেন জেনেশুনে একই সঙ্গে জীবন ও মৃত্যুর অনুগামী হবে? জীবনকে ভালো লাগার বহু পথ আছে। যার যেমন অভিরুচি, বেছে নেবে। সবার মাপ তো একরকম নয়। তবু মেয়েটাকে বাধা দিতে চায় না বিকর্তন। উঠোন জুড়ে দুপুর জুড়ে চন্দ্রাবলী হাঁটে।

চিতার উপদ্রবে আতঙ্কিত সোনাগাঁর মানুষ সেবার বিকর্তনকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। রাতে ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করেও ঘুমোনো যাচ্ছে না। দিনে ক্ষেতে যাওয়া যাচ্ছে না, হাটে যাওয়া যাচ্ছে না। কষ্টে-সৃষ্টে বাচ্চাদের একটা স্কুল করা হয়েছে গাঁয়ে। আশপাশের গাঁয়ের ছেলেমেয়েরাও পড়তে আসে। সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে। সেবাকেন্দ্র বন্ধ। নার্স আসে না। পোস্টাপিসের লোকও ঢুকছে না। তা, বিডোসাহেবকে খবর দাও না। শিকারী পাঠিয়ে দেবে। আমি মারতে গেলে, পুলিস আমায় ধরবে। আগের দিনকাল নেই যে ন্যায়-অন্যায় উচিত-অনুচিত ধরে বিচার হবে। এখন সব আইনকানুন ধরে চলে। মানুষের চেয়ে আইনকানুন

বড় হয়েছে। ওরা বলল, সরকারের শিকারীদের সঙ্গে জন্তু-জানোয়ারের সাঁট আছে। ওরা কেউ কাউকে দেখেও দেখে না। বলছি কী, সরকারের লোক তিন রাত মাচায় বসে কাটাল, আর দিনের বেলা বাঘ দু-দুটো বাছুর নিয়ে গেল, লক্ষ্মীসার আড়তে হামলা করল। অগত্যা যেতেই হয় বিকর্তনকে। যে বিকেলে বিকর্তন সোনাগাঁ পৌঁছল, তার আগের রাতে ধবলীর বাছুর নিয়ে গেছে বাঘ। খুঁজতে খুঁজতে হদিশ মিলল নদীর ধারে ডুমুরের ঝোপে বড় বড় পাথরের আড়ালে ভুক্তা বিশিষ্ট বাছুরের এবং বেশি দূরে নয় বাঘ ও বাঘিনীর, জারুল গাছের নীচে সঙ্গমরত। বাঘিনী ঘাসের ওপর সামনের দু-পা ছড়িয়ে বসে। পুরুষ-চিতা অল্প সময়ের তফাতে বারবার সঙ্গম করছিল। চরম মুহূর্তে পুরুষটি যেন গান গাইছিল। নারী-চিতা একই জায়গায় বসে আদরের আশায়। প্রতিবার সঙ্গম শেষে পুরুষ কয়েক লাফ দিয়ে ঘুরে আসে। এরাই সেই আতঙ্ক, সেই আততায়ী। বিকর্তন গুলি চালাতে পারেনি। জঙ্গলের ন্যায়কে সে খুন করতে পারে না। কৃষ্ণপক্ষ, পঞ্চমীর রোগাপটকা চাঁদ গাছের মাথায় লেগে আছে। দূরে ঝিঁঝির ডাক প্রাণপণ চেষ্টায় স্তব্ধতার আগ্রাসন রুখে দিচ্ছে। বিকর্তন নিশ্চিন্ত ছিল, বাঘ অথবা বাঘিনী কিছুক্ষণের মধ্যে অবশিষ্ট বাছুরের কাছে আসবে। ঠিক তাই, বাঘটা এল। বাঘিনী তখন জারুলের নীচে মন্থর পায়ে হাঁটছে। হঠাৎ কোত্থেকে আরেকটা পুরুষ-চিতা লাফিয়ে পড়ল আহারমগ্ন বাঘটার ওপর। বিকর্তন ভয়ে শিউরে উঠল। পাথরের খাঁজে নিজেকে লুকিয়ে যতটা সুরক্ষিত ভেবেছিল, তা নয়। দ্বিতীয় বাঘটা বাঁদিকে থেকেই এসেছে। ডানদিকে নদীতীর অপেক্ষাকৃত ফাঁকা ফাঁকা। সামনের দিকটা বিকর্তনের চোখের ওপর। বাঁদিকে জঙ্গল ঘন হচ্ছে। বাঘটা জঙ্গল থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারত। বাঘ আর বাঘিনীর খেলার দৃশ্যে মুগ্ধ বিকর্তন সতর্কতা থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। দুটো বাঘের গর্জন, দাপাদাপি, সংঘর্ষে জঙ্গলে যেন আদিমতম হিংসা নেমে এল। বিকর্তন বুঝতে পারে, সে দৃঢ়তা হারাচ্ছে। অনেক মেহনতে নিজেকে ঠিক রাখে। এসময় একটু শিথিল হলেই মৃত্যু ঘটে যেতে পারে। লড়তে লড়তে বাঘ দুটো নদীর জলের কাছাকাছি চলে গেল। এবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দুটোকেই শেষ করে দিতে পারে বিকর্তন। কিন্তু গুলি চালাতে তার সংস্কারে বাধে। সঙ্গমরত বাঘ ও বাঘিনীকে সে মারার কথা ভাবতে পারেনি। এত সুখের সময় দুঃখের কারণ হয় কোন মহাপাতক! কিন্তু এখন তার সামনে অন্য সমস্যা। প্রথমে কোনটাকে সে গুলি করবে? দুটি পুরুষ যোগ্যতা ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে লড়ছে। কেউ হার মানার পাত্র নয়। আহত বিক্ষত রক্তাক্ত হয়ে তারা লড়ে যাচ্ছে। শক্তির অহংকার কারও কম নয়। আত্মমর্যাদা কারও কম নয়। মরে যাবে, তবু কেউ পালাবে না। এই যুদ্ধে বিকর্তন অসমীচীন পক্ষপাতে কেন একটিকে হারিয়ে দেবে? যদি দ্বিতীয়টি গুলি করার আগেই লাফ দিয়ে মিলিয়ে যায়? ধরা যাক, বিকর্তন দুটোকেই মারল, কিন্তু তাদের শক্তির ফয়সালা তো হবে না। সঙ্গিনীর জন্য, অধিকারের জন্য তারা তো লড়ছে, সেটা অন্যায়ভাবে শেষ করে দেওয়া হবে। বিকর্তন হঠাৎ খেয়াল করল বাঘিনী কোথাও নেই।

প্লিজ স্টপ। এরপর চন্দ্রাবলী আর শুনতে চায় না। বিকর্তনকে নিজের শরীর দিয়ে, শুভেচ্ছা দিয়ে ঘিরে ফেলে প্রণয়িনী।

চার

অস্ত্রক্ষতে গতপ্রায় যে অশ্বারোহীকে গ্রামবাসী কবিরাজের বাড়িতে হাজির করেছিল, তিনি অর্ধস্ফুট উচ্চারণে শুধু লালচাঁদ নামটি বলতে পারেন। বিকর্তনের পিতামহ তখন ওষধি প্রস্তুতে ব্যস্ত ছিলেন। হামান-দিস্তায় গুঁড়ো হচ্ছিল ফলমূল। রোদে শুকোচ্ছিল শেকড়-বাকল। বিরাট কড়ায় তৈরি হচ্ছিল ক্বাথ। ছাত্ররা হাতে-হাতে শিখছিল প্রস্তুত প্রণালী। কবিরাজ হিসেবে লালচাঁদ দিশ-বিশটা গ্রামে স্বনামধন্য, অশ্বারোহীর মুখে লালচাঁদ শোনামাত্র তারা কবিরাজের কথাই ধরে নেয়। একজন আহত অসুস্থ মানুষের পক্ষে কবিরাজের খোঁজ করাই স্বাভাবিক। লালচাঁদ দুপুরে সাধারণত রোগী দেখেন না। কিন্তু চরমাবস্থার খবর পেলে বা যন্ত্রণাকাতর রোগী দুয়ারে হাজির হলে তিনি ফেরান কীভাবে। আর, এই অজ্ঞাতপরিচয় সংজ্ঞাহীন ক্ষতবিক্ষত বর্ষীয়ান মানুষটির চিকিৎসা না করা তো বিবেকহীনতা।

যেন চারদিক থেকে আক্রান্ত হয়েছিল অশ্বারোহী। ছিন্ন পোশাকে রক্তস্রোত শুকিয়ে আছে। ক্ষতগুলি বিষিয়ে উঠেছে। আঘাত-কাল বহুদিন আগেকার বলে অনুমান করেন লালচাঁদ। হয়ত সংজ্ঞালুপ্ত দেহ কোথাও পড়ে ছিল। কিংবা আক্রমণকারীরা তাঁকে বন্দি করে ফেলে রাখতে পারে। অশ্বারোহীর প্রতিপক্ষকে কেন আক্রমণকারী ভাবছেন লালচাঁদ? মর্মান্তিক ক্ষতগুলি তাঁকে অশ্বারোহীর প্রতি অতিরিক্ত সহানুভূতিসম্পন্ন করে তুলেছে? প্রতিটি রোগীকে সহানুভূতিতে দেখতে হয়। সাধারণ রোগ হলেও কোনো রোগীর যত্নে যেন অবহেলা না থাকে। এ শিক্ষা লালচাঁদ পেয়েছেন তাঁর গুরুর জীবনযাপন থেকে। আমৃত্যু যেন তিনি এ শিক্ষায় স্থিত থাকতে পারেন। যেন তাঁর জীবনযাপন থেকে ছাত্ররা এমনটাই শিখতে পারে। অশ্বারোহীর আঘাতের ব্যাপকতা ও গভীরতা এবং ক্ষতে পচন দেখে তিনি অতিরিক্ত সহানুভূতি বোধ করতেই পারেন। অশ্বারোহী যেভাবেই হোক শেষ পর্যন্ত আক্রান্ত এটা ঘটনা। কিন্তু তিনি অশ্বারোহীর প্রতিপক্ষকে আক্রমণকারী কেন ভাবলেন? এই অশ্বারোহী যে আক্রমণকারী নন সেটা কীভাবে ধরে নেওয়া হল? যদিও আহত মুমূর্ষু ব্যক্তির ভূমিকা বিচারের সময় এখন নয়, তবু লালচাঁদের মনে হয়, অশ্বারোহী আক্রান্ত, তাঁকে নৃশংসভাবে আঘাত করা হয়েছে, তিনি আরও নৃশংস আঘাত প্রতিহত করেছেন, যৌথ হনন প্রয়াস একা হাতে রুখেছেন।

ধরাধরি করে অশ্বারোহীকে বহির্বাটী থেকে অভ্যন্তরে একটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। পচা গন্ধে ভনভনিয়ে আরও মাছি আসছে। লোকজনও আসতে শুরু করেছে খুনখারাবির গল্পের গন্ধে। এরপর পাইক-পেয়াদা আসবে। কোটালও আসতে পারে। দুষ্কৃতী সন্দেহে পাকড়াওয়ের জন্য চাপাচাপি করতে পারে। রোমাঞ্চকর গল্পের খোঁজ করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার তাগিদ বড্ড বেশি বড় হয়ে আহত ব্যক্তিকে মেরেও ফেলতে পারে। অভ্যন্তরের ঘর

যদিও অনেকটা নিরাপদ। অনুমতি ছাড়া রাজপুরুষও কোনোদিন লালচাঁদের বাড়িতে ঢোকার ঔদ্ধত্য দেখায়নি।

কিন্তু কিছু অসুবিধাও ছিল। আহত অশ্বারোহীর সঙ্গে কবিরাজ মশায়ের সম্পর্ক আছে ধরে নিয়ে পাবলিক জনশ্রুতি ও অনুমান ঘাঁটাঘাটি শুরু করল এবং সমাজ নামে যে নির্বোধ আহাম্মক জনপিণ্ড আছে তা লালচাঁদের বাড়ির সামনে পাহারায় বসল।

ক্ষতমুখ কোথাও শুকনো রক্তজবার মতো কালচে নরম, কোথাও পচে থকথকে হয়ে আছে, কোথাও মাংস বেরিয়ে ঝুলছে। লালচাঁদ নিজের হাতে পরিচর্যা করতে লাগলেন। ক্ষত পরিষ্কার, ওষুধ তৈরি, প্রলেপ লাগানো, পথ্য প্রস্তুত ও অন্যান্য সেবা সবই নিজে করেন। অশ্বারোহী সংজ্ঞাহীন। কখনও কখনও কয়েক মুহূর্তের জন্য চোখ খোলেন। লালচাঁদ তাঁর চোখের ভাষা বুঝতে চান। যন্ত্রণার বহুবিধ রেখা ছাড়া তিনি আর কিছু পান না।

বাড়ির বাইরে অপেক্ষমান পাবলিক অশ্বারোহীর স্বাস্থ্য বিষয়ে এতটাই উদগ্রীব যে লালচাঁদকে দু-বেলা বুলেটিনের ব্যবস্থা করতে হল। কিঞ্চিৎ উন্নতি-অবনতি, পূর্বমতো, নতুন উপসর্গ দেখা দিয়েছে, নাড়ি ক্ষীণ হয়ে আসছে ইত্যাদি বুলেটিন দিয়ে তিনি মৃত্যুর ভূমিকা রচনা করেন। উদ্দেশ্য ছিল, মৃত্যুপথযাত্রী অশ্বারোহী সম্পর্কে পাবলিক হয়ত অশ্রদ্ধাবাচক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকবে।

চিকিৎসায় অশ্বারোহীর শরীর সাড়া দিল তৃতীয় দিনেই। ক্ষতের সংক্রমণ আয়ত্তে এল। ধীরে ধীরে শুকোতে লাগল। যন্ত্রণার রেখা মুছে মুখে এখন অনেক শান্তি। কিন্তু চেতনা ফেরে না। শরীর পৃথিবীতে রেখে কোন অতলে তিনি ডুবেছেন। মাঝেমধ্যে দু-একটা বুদ্বুদ ভেসে ওঠার মতো তাঁর চোখ খোলে, আবার মিলিয়ে যায়।

অনেক রাতে অশ্বারোহীর পাশে চুপচাপ বসে থাকা লালচাঁদের নতুন ভালোলাগা হয়েছে। কেশশ্মশ্রু-সমাচ্ছন্ন এই পুরুষ কে? ইনি কি রাজসিক না রাজদ্রোহী? কোথা থেকে এসেছেন? কেন তাঁর এই দশা? ইনি কি পলায়নকারী, না পশ্চাদ্ধাবনকারী? লালচাঁদের নাম জানলেন কীভাবে? এসব প্রশ্নের উত্তরে লালচাঁদ নিজের অমীমাংসিত পরিচয় পাবেন বলে বিশ্বাস করেন। আরও ভালো লাগে ভাবতে যে, অশ্বারোহীর শরীরে অরণ্যের আদিম গন্ধ, হাজার হাজার বছরের উদ্ভিদের ছায়া, পাহাড়ি নদীর উচ্ছ্বাস, শার্দুল ও শত্রু তাঁকে থামাতে পারে না, তিনি বিদ্রোহী, রাজার শাসন তাঁকে ছুঁতে পারে না, নিজস্ব বিচারবোধে দৃপ্ত তিনি, অহংকারে অনুনয়ে ক্ষমতায় ক্ষমায় পরিপূর্ণ তিনি চলেছেন। এই অদম্য যাত্রায় লালচাঁদ খুঁজে পান তাঁর মাতৃকার জনশ্রুতি, যিনি বাঘের পশ্চাদ্ধাবন করেন সারাজীবন। ভাবতে ভাবতে অশ্বারোহীর পাশে ঘুমিয়ে পড়েন।

এক বিকেলে, শেষ হেমন্তের সূর্যপোড়া ছাই অন্ধকার হয়ে ঝরছিল মাঠে-ঘাটে, বিবিধ বক উড়ে যাচ্ছিল, পাখিদের গলায় বাজছিল বিষাদ, অশ্বারোহী চোখ মেললেন, উঠে বসলেন, যেন তাঁর ঘুম ভাঙল, তিনি জল চাইলেন, অঞ্জলি ভরে ভরে চোখ মুখ দাড়ি চুল ভেজালেন। বললেন, তুমি লালচাঁদ? তোমার মা আমাকে খুঁজতে এসে পড়বে। চন্দ্ররেখার সঙ্গে আমার

শেষ দেখা হয় বহুনারী বনে। ওকে বলে, তুমি আমাকে বাঁচিয়ে তুলেছ। জেনে হয়ত খুশি হবে।

ঘোড়ার পিঠে দ্রুত চলে যেতে থাকা পুরুষের দিকে তাকিয়ে থাকেন লালচাঁদ। এই কি সেই বাঘ?

পাঁচ

বিকর্তনের আয়ুর্বেদজ্ঞ পিতামহর কাহিনি সম্পর্কে অদ্ভুত নির্লিপ্ত চন্দ্রাবলী। তিনি বনৌষধি চিনতেন, তাদের ব্যবহার জানতেন, রোগ নিরাময় করতেন. ভালোমানুষ ছিলেন—যেন এসব কিছুই নয়। চন্দ্ররেখার ছেলে হওয়া তাঁকে যেন মানায় না। সম্ভবত তিনি সেই পলায়নপর বাঘের সন্তান ছিলেন। চন্দ্ররেখা তাই ছেলেকে ত্যাগ করেন। অথচ ওই আয়ুর্বেদজ্ঞ মানুষটি কত দূরে দূরেই না গেছেন সাত অশ্বারোহীর খোঁজে। কাউকেই পাননি। পেয়েছেন প্রায় একইরকম সাতটি উপাখ্যান। পলাতক বাঘ ও দুটি অস্ত্রপ্রণীত মানব-মানবীর কথা।

চন্দ্রাবলী বলে, জঙ্গলের আদিবাসীরা জানে, মজবুড়ো জানে, গুরান জানে, ঔষধির হদিশ ও গুণাগুণ। ওরা পুরুষানুক্রমে আহত অরণ্যদেবের সেবা করে, অস্ত্রক্ষতে পটি দেয়, অচৈতন্য অরণ্যদেবের গন্ধ-চিকিৎসা করে, অরণ্যদেবকে মৃত্যুহীন রাখা তাদের কাজ। এর জন্য তারা একরকমের গর্ব অনুভব করে। বাট দা ম্যাটার ইজ অরণ্যদেব, মিস্টার ওয়াকার। যিনি জঙ্গলকে জঙ্গল হতে দেননি। যেখানে দুষ্কৃতী, সেখানেই অরণ্যদেব। যেখানে ছক্কা-পাঞ্জা, সেখানেই অরণ্যদেব। মানুষ বিপদে পড়লে, জঙ্গলে উপদ্রব দেখা দিলে চাকের বোলে অরণ্যদেবের কাছে খবর পৌঁছে যায়। তাঁর গতি বিদ্যুতের চেয়ে ক্ষিপ্র। তিনি কথা বলেন পশুপাখি কান পেতে শোনে। তিনি রাগ করলে মেঘ গর্জন শোনা যায়। তাঁর অস্ত্র কোনোদিন ভুল করে না। আমরা সবাই অরণ্যদেবের জন্য বাঁচি।

বিকর্তন জানে, চন্দ্রাবলীর এই যুক্তিক্রমে লালচাঁদরা ইতিহাসের গৌণ চরিত্রমাত্র। প্রধান হলেন চন্দ্ররেখা এবং তাঁর সাত অশ্বারোহী পুরুষ! আর লালচাঁদ তো পলাতক বাঘের চিকিৎসা করেছিলেন।

কনকটিলার জানোয়ারটাকে মারার পরই বিকর্তনকে অদ্ভুত ফিসফাসের মধ্যে পড়তে হয়। ভাষাটা বোঝা যাচ্ছে, অর্থটা অন্যরকমও হতে পারে। যারা খুব স্পষ্টবাদী, তারা এইটুকু বলে, জানোয়ারটাকে মারা ঠিক হয়নি। লোকাল কমিটি, জোনাল কমিটি ইনভলভড। বিকর্তনের অস্ত্র কেড়ে নেওয়ার দাবি এর আগে একবার উঠেছিল। বাঘের চামড়া বেচাব চক্করে থাকা পুলিস অফিসার ফ্যাসাদে পড়ে বিকর্তনকে ফাঁসিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু এবার বাঘ নয়, পুলিস অফিসারও নেই। এবার অস্ত্র কেড়ে নেওয়া নয়, বিকর্তনকে শায়েস্তা করার চাপ তৈরি হল। যারা ওর সঙ্গে নিয়মিত কথা বলত, তাদের অনেকে কথা না বলে বুঝিয়ে দিতে চাইল, বিকর্তন অন্যায় করেছে, একজন অন্যায়কারীর সঙ্গে কথা বলা যায় না। অনেকে কথা বলতে চাইল না এই কারণে যে, তাদেরও সমস্যায় পড়তে হতে পারে। কেউ

কেউ আলগোছে সতর্ক করে সরে পড়ল। কিন্তু সবাই একবাক্যে বলছে, জানোয়ারটাকে আর সহ্য করা যাচ্ছিল না। বাকিটা ফিসফাস হয়ে ছড়াতেই তাকে।

চন্দ্রাবলীকে বিকর্তন বলেছিল, লালচাঁদ চন্দ্ররেখার খোঁজে বেরিয়েছিলেন বলেই তো সাত অশ্বারোহীর কাহিনি জানা গেছে। বহনারী বনে গিয়ে যখন তিনি শুনলেন, এক বর্ষীয়সী সেখানে একা থাকতেন, তিনি সশস্ত্র ছিলেন, হঠাৎই তিনি মারা যান এবং সাত অশ্বারোহী এসে আপসে তাঁর দেহ টুকরো করে নিয়ে যায়, লালচাঁদ এরপর সব শেষ ধরে নিয়ে থেমে যেতে পারতেন। বরং তিনি গারো পাহাড় থেকে খোঁজা শুরু করলেন। সেই আয়ুর্বেদজ্ঞ আরোগ্যের উপাদানের সঙ্গে বহন করেছেন কিছু প্রশ্ন। যাদের উত্তর তিনি পাননি, পেয়েছেন কিছু কাহিনি।

চন্দ্রাবলী বলেছে, লালচাঁদ সম্পর্কে আমার অভিমত এরপরও একই থাকছে। তিনি পলায়নপর ছিলেন।

জনমত বলে একটা ব্যাপার আছে, সেটা দু-চারজন তৈরি করে, বাকিদের কিছু করার থাকে না। সেই জনমত বিকর্তনের বন্দুকের বিরোধিতা করল, বন্দুক যে কী ভীষণ ক্ষতিকর তা শব্দ চুনে চুনে প্রচার করল। অতীতে যাঁরা বিকর্তনের হাতে বন্দুকের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব নিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন, তাঁরাও শব্দের প্যাঁচ-পয়জারে অন্যরকম কইতে লাগলেন। বন্দুকের শাসন চলতে দেওয়া যায় না, বন্দুকের ওপর শাসন চাই। সভ্যতার সংবিধানের ধারা-অনুচ্ছেদ দিয়ে বিকর্তনের মুক্ত বন্দুক বন্দি ও বৈধ করা হল।

এরপরই কয়েকদিনের মধ্যে বিকর্তনকে বেশ কয়েকটি শিকারের ফরমায়েস দিল কর্তৃপক্ষ। এবং সবকটি ক্ষেত্রেই বিকর্তনের গুলি ফস্কাল। তার চোখ স্থির থাকে না, লক্ষ্য সরে যায়, টার্গেটের ওপর ছায়া নেমে আসে, হাত কাঁপে, সে ভয় পায়।

ঘরের বাইরে একটা উঁচু জায়গায় রাখা ছিল খাবার। দুটো কুকুর গন্ধে এসেছে। নাগাল পাচ্ছে না। তাদের তাড়ানোর কেউ নেই। দরজা বন্ধ করে ঘুমোচ্ছে চন্দ্রাবলী। রাতের আকাশের নীচে বিতর্কন বৈধ বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে থাকে।

প্রাচীন অসিখেলা

নিরাপত্তারক্ষীর মতো শমিতের গায়ে লেগে ছিল টেবিলল্যাম্প। ব্যাপারটা একসময় অস্বস্তিকর বিরক্তিকর, এমনকী নিজের গোপনীয়তার পক্ষে আপত্তিকর মনে হওয়ায় সে নিভিয়ে দিল, যেন তাড়িয়ে দিল। ঠিক তখন জানালা গলে জামগাছের ছায়া নিয়ে শ্রাবণ পূর্ণিমা ডিভানে ছড়িয়ে দিল তার বিবাহ-বার্ষিকীর ধবংসস্তূপ, যা আসলে অন্ধকার, নানা আকারের আলোর তাপ্পি দিয়ে ঘেরা, জোড়া।

আইস পট হাতড়ে বরফের টুকরো পায় না শমিত। তবে শীতলতায় হাত ডুবিয়ে বসে থাকতে মন্দ লাগে না। আরামই হয়। হয়ত ঠিক আরাম নয়, যন্ত্রণা কখনও যে উপভোগ্য হয়, সেইরকম।

আজ কি বেশি খাওয়া হয়ে যাচ্ছে? এইখানে একটি চেয়ারে বসে আরেকটি চেয়ারে পা তুলে ঘড়িতে ০১.২২-র তথ্যে, মাথার ওপর নেমে আসা হাওয়ায়, বেঙ্গল স্কুলের ছবিওলা ক্যালেন্ডারের পাতার মর্মরে, শমিত বুঝল, শরীর আরও ভারী হচ্ছে। কোনারকের ভেঙে পড়া পাথরের মতো স্থবিরতা চাইছে। অথচ সন্ধেবেলা, যখন সদ্য-কেনা বোতল শহুরে মানুষের পাতি স্বপ্নের মতো সুদর্শন মোড়ক থেকে বের করে গ্লাস আর আইস পট নিয়ে বসেছিল, শমিতের উদ্দেশ্য ছিল কিছু একটা করার।

পড়া-টড়া এখন আর হয় না। পুরনো অভ্যেসের টুকরোটাকরায় মাঝে-মাঝে সে বই কেনে বটে, না হলে নিজেকে ভেতর থেকে গরিব-গরিব লাগে, বই কেনাটা বোধহয় এক ধরনের টোটকা, কিন্তু দু-দশ পাতার বেশি পড়া এগোয় না। আজ সারাদিন নিজেকে ছুটিতে রেখেছিল শমিত। প্রত্যেক বছর এই দিনটিতে রাখে। দুপুরে ঠিক করল, যে বইটা একটি মেয়ের স্বাধিকারপূর্ণ আত্মজীবনী হিসেবে বিপুল প্রচার পাচ্ছে, হই হই বিক্রি হচ্ছে, প্রখ্যাত এক প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী যে বইটিকে অভূতপূর্ব বলেছেন, পড়তে হবে। না-পড়াটা অনেকদিন পর তার অপরাধ মনে হতে থাকল। মনে হল, ঘটনাবর্ত থেকে পালানো মানে নিজেকে ঠকানো। কিন্তু পড়তে পড়তে সে হতাশ হয়। কী একপেশে, কী একঘেয়ে লেখা। এটা ঠিক, মেয়েরা আত্মীয়ের হাতেই প্রথম ব্যবহৃত হয়। তাদের শারীরিক আড়ষ্টতার সুযোগ নিয়ে ক্ষুধার্ত পুরুষ লাম্পট্য করে। এটাও ঘটনা, শ্মশ্রু ও পেশির উদ্‌গম বয়সে বহু তরুণ বয়স্ক আত্মীয়ার কাছে শেখে যৌন-দুর্নীতি। ব্যভিচার তো অনস্বীকার্য অপরাজেয় সত্য। তাই বলে

সব কিছু যোনি দিয়ে দেখার মানে হয় না। তাতে বাহাদুরি থাকতে পারে, বিচার নেই। শমিত উঠে শেল্‌ফের মাথা থেকে নিয়ে এল আল মাহমুদ। 'এ ঘুরে দাঁড়ানো নয়, শুধু আভূমি আনত হয়ে থাকা/ দৃশ্যের আঘাত থেকে মুদে রাখা চোখের প্রতিভা/ চোখ বড় সাংঘাতিক রক্তের প্রান্তর ছুঁয়ে থাকে— / নিসর্গ নিবদ্ধ করে দেখে নেয় নারী আর নদীর নিতল।/ ধরে রাখা মাছ পাখি পশু আর পতঙ্গের প্রসঙ্গ সকল/ সমস্ত সম্বন্ধ সূত্র ভেদ করে আনে তীব্র চাক্ষুষ প্রমাণ।' দুপুর থেকে বিকেল গড়ায় 'সোনালি কাবিন'-এ। সারা বিকেল জুড়ে পুব থেকে ছুটে আসা ভেজা হাওয়ার মিষ্টিমধুর খেলা, সুপুরি কাঁঠাল নিম সজনের ডালে উদ্বিগ্ন অস্থিরতা, সাদা মেঘের সংস্কৃতি, একটি নির্জন ছায়া থেকে আরেকটি নির্জন ছায়ার দিকে পুকুরের জল ছুঁয়ে কোনাকুনি উড়ে যাওয়া বক, নীল ফড়িংয়ের অস্পষ্ট অভিপ্রায়, করবীর ডাল আর শ্যাওলা ধরা পাঁচিলে টুনটুনিদের কৌতুক এইসব দৃশ্য বেঁচে থাকা সম্পর্কে একধরনের স্নিগ্ধ চরিতার্থতা তৈরি করে। শমিত আল মাহমুদের কবিতা পড়ল : 'বোধের উৎস কই, কোনদিকে?/ আমাকে রাখতে দাও হাত/একবার স্পর্শ করি শিশ্নে, সহ্যগুণে, প্রেমে/ রক্তের ভিতর দিয়ে একবার দেখা যায় যদি/ বিশাল মিনার সেই, লোকে যাকে পুরুষার্থ বলে।'

শমিত আচ্ছন্ন ছিল। চোখ খুলল যখন আলো ফুরিয়ে আসছে। পশ্চিম আকাশে অত্যাশ্চর্য চিতার মহিমান্বিত ধোঁয়ার মতো লাল মেঘ।

রিমি ফিরল। নিশ্চয় একা নয়।

ছোটবেলার বড় হরফের রামায়ণে দেখা খোঁপা-বাঁধা তারকা রাক্ষসীর ভয়প্রদ ইলাস্ট্রেশন সহসা শূন্যে দেখল শমিত। হুবহু সেই মুখ, সেই হাঁ, সেই নাক, চোখের গহ্বর ও কপাল। জল থেকে মাথা তুলে তারকা লঙ্কাভিমুখী উড়ন্ত হনুমানকে গিলতে উদ্যত। রাক্ষস রমণীর সেই প্রকাণ্ডতা বীভৎসতা খুঁটিয়ে দেখল শমিত। হলুদ লাল কমলা ও সোনা রঙে রমণী আকর্ষণীয়। নিখুঁত ঠোঁট, যার ব্যবহারে দুমড়ে দিতে পারে বোধিবৃক্ষের গুঁড়ি; পারিপাটি দাঁত, যা উপড়ে ফেলতে পারে সমস্ত সম্পর্কের শেকড়;আগ্রাসী হাঁ, যা হাজার হাজার বছরের অন্ধকার পাকস্থলীর দিকে নিয়ে যায়; সমৃদ্ধ খোঁপা, যা খুললেই পৃথিবীর প্রথম যুগের রাত্রি নেমে আসে। হলুদ মেঘের ছিন্নভিন্ন এক টুকরো বালুচরি সেই হাঁ মুখ যেন উগরে দিল।

রিমি বলল, দেখো তো আমায় কেমন লাগছে?

দরজার ফ্রেমে দাঁড়ানো রিমি। ঘন নীল ঢিলেঢালা ট্রাউজার। নীল ডোরা-কাটা সাদা গেঞ্জির ওপর নীল জ্যাকেট। রিমি দু-হাত তুলে ভাঁজ করে মাথার পেছনে নিয়ে কোমরে কাঁধে সামান্য বঙ্কিমতা এনে দাঁড়িয়েছে। ফ্যাশনের ছবিতে মডেলরা এরকম দাঁড়ায়। ট্রাউজার আর গেঞ্জির মাঝখানে ফর্সা চিরল পেট, যার কেন্দ্রে স্পর্ধাপূর্ণ নাভি।

শমিত বলল, বেশ ভালো। নতুন কিনলে বুঝি?

পাইরেট দিয়েছে।

সুন্দর লাগছে। তুমি কিছু দিলে?

ফান্ড শর্ট। হাজার পাঁচেক টাকা দেবে বাবা? ও একটা সোর্ড কিনবে।

সোর্ড? কী হবে?

অনেক পুরনো নাকি। পাইরেট কলেক্ট করতে চায়। টাকাটা পেলে ওকে প্রেজেন্ট করতে পারি।

পাইরেট কোথায়?

আমার ঘরে।

পাইরেট মানে প্রীতম। রিমির বন্ধু। সম্প্রতি ওর সঙ্গেই রিমি বেশি মিশছে। ও কি গার্গীর মতো হয়ে উঠছে? বা গার্গীকে ঘৃণা করে আরও ভয়াবহ? শমিত ভয় পায়। গার্গীর ছায়া মুছে ফেলতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে শমিত। সদুপদেশ দিয়ে নয়, পুরনো মূল্যবোধ ভেজা কাপড়ে তাজা রেখে নয়। শমিত বিশ্বাস করে, জীবনে একটা স্থির জায়গা দরকার। না হলে জীবনটা উপভোগ করা যায় না। রিমি বলে, জীবনে অনিশ্চয়তাই সবচেয়ে উপভোগ্য। পাথর-চাপার নীচে হাজার বছর বাঁচা কি কোনো সুস্থ মানুষ ভাবতে পারে? শমিত বিশ্বাস করে, জীবনভর অস্থিরতা অনিশ্চয়তার সঙ্গে উপভোগের কোনো সম্পর্ক নেই। জীবনটা এত বড় যে এক জায়গায় দাঁড়ালে অনুমানও করতে পারবে না। বাবা ও মেয়ের এইসব কথোপকথন কোনোদিনই হয়নি। নিজের আচরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছে শমিত। রিমি বুঝিয়ে দিয়েছে ওর মতো করে। তিমিরকে রিমি একদিন বলেছিল, প্রেম হল মানসিক দুর্বলতার লক্ষণ। ঈশ্বরে বিশ্বাস থেকে প্রেমের দূরত্ব সামান্যই। আমি ভাগ্যবান যে ঈশ্বর আমাকে সেই বিশ্বাস দেয়নি।

গার্গী তখন শমিতকে খুনের চেষ্টা করে। রিমি তখন ক্লাস টেন-এ পড়ছে। নিজেরই গাড়িতে শমিত ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল পাশে বসা প্রিয় বন্ধু নীলাদ্রির হাতে। নীলাদ্রির ছুরি তার কাঁধ পিঠ পেট মুখ বরাবর বিদ্ধ করেছে ভয়ংকর আক্রোশে। নীলাদ্রির হাতে ছুরি দেখার আগে পর্যন্ত শমিত আক্রোশের অস্তিত্ব টের পায়নি। পরে বুঝেছে। নীলাদ্রি বারবার বলছিল, গার্গীকে আমার চাই। গার্গীর আমাকে চাই। শমিত খুন হয়নি। সে যে কীভাবে বেঁচেছে, সেটা কিছু মানুষের সহানুভূতি, সহযোগিতা, আর চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতি ও চিকিৎসকদের দক্ষতা নিষ্ঠার ইতিহাস। শমিত ভেবেছিল পুলিশকে সব বলবে। কিন্তু নিজেকে বড্ড বেশি ছোট করা হবে বুঝে পাল্টে ফেলেছে ভাবনা। এত বড় ভালোবাসাকে প্রতিশোধ ভুলে অপমান করা উচিত? গার্গী নীলাদ্রির সঙ্গে চলে গেছে।

রিমি যত বড় হয়েছে, শমিতের ভয় তত বেড়েছে। যদি গার্গীর কুটিলতা হিংস্রতা ওকে পায়? গার্গীর রক্ত ও গার্গীর অপরাধ যদি ওকে তাড়া করে বেড়ায়? যদি নিজের অনুভবকে, ইচ্ছের সততাকে কোনো সংস্কারে কোনো অপরাধবোধে চাপা দিতে গিয়ে ভুল পথে চলে যায়? কিন্তু শমিত কীভাবে রিমিকে বাঁচাবে? সামাজিক সংস্কারে ওকে ঠেসে ফেলতে পারবে না শমিত। ওর ইচ্ছে-অনিচ্ছের গোড়া নির্মূল করে অসহায় আতঙ্কসর্বস্ব মেয়েমানুষ বানাতে

পারবে না। নিজের মতোই বেড়ে উঠুক রিমি। তবু যে বাবা হিসেবে মেয়েকে বিপন্মুক্ত রাখার ইচ্ছে শমিতের অনেক যুক্তির চেয়ে বারবার বড় হয়ে ওঠে।

রিমি যখন বাবার কাছে ওর এক বান্ধবীকে বিয়ে করার প্রস্তাব রাখল, শমিত বিমূঢ় হয়েছিল। কেন তুমি বিয়ে করতে চাও না? মা-কে এখনও ভালোবেসে? নিজেকে সাধুপুরুষ ভেবে? এভাবে মহৎ আদর্শবান হতে চাও? নাকি আমার কথা ভেবে? শমিত উত্তর খুঁজে পায়নি। শুধু বলেছিল, না, এটা হয় না। কেন হয় না? শমিতের জবাব নেই।

আজ ৩০ শ্রাবণ। শমিতের বিয়ের দিন। বিয়ের স্মৃতি নয়, গার্গীর স্মৃতি নয়, একটা ভয় তাকে চেপে ধরে। তার বিয়ের রাতেই যে-ভয়ের জন্ম। কিংবা যা তার স্বভাব ছিল, বিয়ের রাত থেকে অবয়ব পেয়েছে।

ডিভানে ধ্বংসস্তূপ নড়ে-চড়ে।

পাইরেট বলল, তোমার মা-র জন্যে আমার কষ্ট হয়। জীবনের মাঝামাঝি পৌঁছে ভয়ংকর একটা সিদ্ধান্ত নিতে হল। রিমি, সরি টু সে, ইয়োর ফাদার ইজ এ হামবাগ, অ্যানাদার এডিশন অফ মোগাম্বো। আই ডাউট, হি ইজ ইনকেপেবেল, অ্যান্ড এ পার্সন লাইক ইয়োর ফাদার বিলিভস ইন ফোর্স অ্যান্ড টেরর। তোমার মা-কে অভিনন্দন জানাব, তিনি শেষ পর্যন্ত আনওয়ান্টেড হাজব্যান্ডকে ভেঙে দিতে পেরেছিলেন।

রিমি চিৎকার করে ওঠেনি। তুমি একটা মূর্খ বলে প্রীতমকে আক্রমণ করেনি। দুর্ব্যবহার করে নিজে সরে যায়নি। আগে সে কয়েকবার এরকম করেছে। গার্গীর অপরাধকে সহানুভূতির চোখে দেখতে দেখতে শমিতকেই প্রকৃত অপরাধী সাব্যস্ত করে তাদের বুদ্ধিসুদ্ধি সম্পর্কে ঘোর সন্দেহ আছে রিমির। সুরঞ্জন এভাবেই ভেবেছিল, মৈনাক এভাবেই ভেবেছিল, এমনকী মেধাবী-চিহ্নিত তিমিরও। রিমি কারও কাছে মীমাংসা চায়নি। শুধু ঘটনাটা বলেছিল। কোনো অপরাধবোধ বা কর্তব্যবোধ থেকে নয়। তার ব্যক্তিজীবনের ভয়ংকর একটি অভিজ্ঞতা হিসেবে। সুরঞ্জন, মৈনাক, তিমির শমিতের নিন্দা করেছে। ওদের বক্তব্য,গার্গীর এ ছাড়া বাঁচার উপায় ছিল না। রিমি বুঝেছে, এভাবেই এখন ভাবা হয়। এটাই ট্রেন্ড, ফ্যাশন। মেয়েদের পক্ষ নিতেই হবে। প্রগতিশীলতার ছাপ্পা লাগানোর সহজ পদ্ধতি। কিছুদিন আগেও যেমন মেয়েদের সব দোষের মূলাধার করা হত, এখন ঠিক তার উল্টো। প্রতিক্রিয়া আর কী। নিজের বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ থাকবে না? সত্যকে জানার আগ্রহ থাকবে না? ছাপ্পা হারানোর ভয়ে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকবে? প্রীতম কোনো মন্তব্য না করলেই পারত। মা-বাবাকে হিংস্র রক্তাক্ত বিচ্ছেদে তাদের সন্তানকে কতটা লাঞ্ছিত পীড়িত হতে হয়, সেটা ভেবেই রিমিকে সহানুভূতি জানাতে পারত প্রীতম। বলতে পারত, তুমি তো কোনো দোষ করোনি, রিমি। আমরা তো কোনো দোষ করিনি। তবু কেন আমাদের শাস্তি পেতে হয়? নরম কোমল শৈশব-কৈশোরের সবচেয়ে গভীর গূঢ় সম্পর্কে কেন বিষাক্ত ক্ষত নিয়ে বাঁচতে হয়?

রিমি বলল, মা খুব ভালো গাইতেন। যখন ছোট ছিলাম, মা-র গান ছাড়া আমি নাকি ঘুমোতাম না। বড় হয়ে মা-র গানে অনেক রাত জেগে থেকেছি। স্কুলের মেয়েরা দল বেঁধে গান শুনতে আসত আমাদের বাড়িতে। মা-কে ঘিরে ছিল আমাদের পঁচিশে বৈশাখ, দীপাবলি, দোল।

প্রীতম বলল, গার্গীর দুর্ভাগ্য যে একটা খুনির সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। তোমার দুর্ভাগ্য যে একটা খুনির ঘরে জন্মেছ।

রিমি বলল, আমার বাবা খুব ভালো গল্প বলতেন। নদীর গল্প, মাছের গল্প, পরির গল্প...

ওরকম অনেকেই বলে।

ভালুকের গল্প, সিংহের গল্প...

ওসব তো চটি চটি বইয়ে গাদাগুচ্ছ মেলে।

সত্যবানের গল্প, হরিশচন্দ্রের গল্প...

নিজে তো মহিষচন্দ্র।

ইডিপাসের গল্প, আন্তিগোনের গল্প,,,

লোকটা একসময় বই-টই পড়ত মনে হয়।

কোনো পূর্ণিমায় একা পাখি সারারাত ডেকে ডেকে ভোরে ধানের খেতে লুটিয়ে পড়ে। তার ঠোঁট সোনা হয়ে যায়। চাষি-বউ শিশির তুলে পাখির মুখে ফোঁটায় ফোঁটায় দিলে কে যেন ধানের আড়াল থেকে বলে ওঠে, রাতে কেন সাড়া দাওনি? চাষি-বউ চারপাশে কাউকে দেখে না। নরম করতলে পাখিকে বুকের কাছে ধরে চাষি-বউ দাঁড়ায়। শিশির-ভেজা ঠোঁটে চুমু দিয়েই প্রথম রোদে আবিষ্কার করে সোনা। মুহূর্তে আঁচলে চেপে কষে বেঁধে ফেলে পাখিটাকে।

চাষি-বউটাই কি শমিত?

ক্লাইটেমনেস্ট্রার কাহিনি জানো প্রীতম? কেন সে স্বামীকে খুন করেছিল? কেন সে স্বামীর ভাইয়ের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল?

সেটা নিয়তি।

রিমি বলে, অনেক রাতে নীলাদ্রি এল। মা ওকে নিয়ে ঠিক এর পাশের ঘরটায় ঢুকেছিল। ওরা ফিসফিসিয়ে কথা বলছে। নীলাদ্রির গলা, হান্ড্রেড পার্সেন্ট। মা-র গলা, ভুল হয়নি তো? শক্ত কিছু একটা মাটিতে পড়ল যেন। মা-র হাসি। নীলাদ্রির অট্টহাসি। সব থেমে গেল। বেশ খানিকটা সময় কাটল। নীলাদ্রির গলা, নলি ফাঁক করে দিয়েছি।

প্রীতম বলল, হরিব্‌ল্‌।

রিমি বলল, বাবাকে খুন করার ধারাবাহিক বিবরণী মা-কে শুনিয়েছিল নীলাদ্রি। বাবা নাকি প্রাণভিক্ষা চেয়ে কেঁদেছিল।

নীলাদ্রিটা মানুষ নয়। শুয়োরের বাচ্চাকে কুপিয়ে মারা উচিত। তোমার মা একটা খুনিকে এতটা বিশ্বাস করল? আই ডাউট হার ইন্টিগ্রিটি।

রিমি বলল, প্রীতম, আমি হয়ত কিছুই জানি না। নীলাদ্রি মা-কে কী বলেছে, আমার জানার কথা নয়। সন্তানের কাছে মা কেন নিজের কুৎসিত চেহারাটা প্রকাশ করবে? আমার ধারণা, আমি এভাবে ভেবেছি। বাবা তো কিছুই বলে না।

পাইরেট বলল, তোমার বাবা বড্ড বেশি ভালোমানুষ।

টেবিলে পড়ে আছে তরবারি। ঝিলমের স্রোতের মতো বাঁকা। খাপে ঢাকা। খাপের গায়ে নকশা। বাতাসের আর্দ্রতা ও কালের লাঞ্ছনা ছুঁতে পারেনি প্রাচীন ধাতুর সততাকে।

রিমি আর পাইরেট কি অসি খেলছে? রিমির হাতে আলোর ঝলকে সিঁড়ির তলানিতে থমকে যায় শমিত। আজ বেশি পান হয়ে গেছে। ভয় থেকে পালাতে গিয়ে সে যেন ভয়েরই মুখোমুখি পড়েছে।

আশ্চর্য খেলা ঘটে যেতে থাকে। পিতামহের চওড়া থামের আড়ালে লুকিয়ে শমিত দেখে যায়। রিমি তরবারি নিয়ে পাইরেটকে আক্রমণ করছে। পাইরেট পিছলে পিছলে যাচ্ছে। দুজনেই হাসছে। ঘর জুড়ে খেলা। বিছানায় ডিগবাজি খয়ে পাইরেট ছিটকে গেল খাটের ওপারে। রিমি এক লাফে খাটে উঠে তরবারি চালাল। মাথা নিচু করে তরবারি এড়িয়ে রিমির পা জাপটে ধরল পাইরেট। রিমি কি পাইরেটকে মারতে চায়? এত জোরে তরবারি চালাল কেন? পাইরেটের লাগতেই পারত! রিমি কি হিংস্র হয়ে উঠেছে? পাইরেটের বাহুডোরে বিছানায় গড়াল রিমি। তরবারি দূরে সরিয়ে পাইরেট রিমির ঘাড়ে বুকে মুখে চুমু দিতে থাকল। না, ওরা মারতে চায় না। শান্তি! দারুণ ওদের খেলা। চিৎ হয়ে থাকা রিমি পাইরেটকে জড়িয়ে মাথা তুলে টেনে নেয় মিলনকামী ঠোঁটে। রিমির চুলের ভেতর ঢুকে পড়ে রদ্যাঁর ভাস্কর্যের মতো বলিষ্ঠহাত। বাবা হয়ে মেয়ের এ ধরনের দৃশ্য দেখা অনুচিত ভেবে শমিত চোখ বোজে। এভাবে কোনোদিন উঠে এসেছে নারী তার মিলনকামনার দিকে? কোনোদিন এত নিপুণ আবেগে সে-ও কি নেমেছে কোনো নারীর মুখে? রিমির সুখ দেখতে তার লোভ হয়। রিমির প্রেম দেখে সে সুখী হতে চায়। মন্থর ছবির মতো রিমি ও পাইরেট পরস্পরকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সারা শরীরে চুম্বন করতে থাকে। রিমির কোমর থেকে নেমে হাঁটু গেড়ে বসে পাইরেট আরও নীচে নেমে যাচ্ছে যখন, রিমি তরবারির দিকে হাত বাড়ায়। পাইরেট বলে ওঠে, ফাউল। রিমি চিৎকার করে, নো। গো অন। পাইরেট রিমির তলপেটে মুখ গোঁজে। রিমি দু-হাত ছড়িয়ে মাথা ঝাঁকায়। অসম্ভব। শমিত মেয়ের যৌনাচরণ দেখবে এটা হতে পারে না। সে চোখ সরায়। রিমির নীল জ্যাকেট পড়ে আছে মেঝেয়। পাইরেটের জামার হাত ঝুলছে খাটের কোণে। হৃদয়হীন ক্ষুধার সহবাসের চড়ায় আটকে যাওয়া নৌকো থেকে লাফ দিতে চেয়েছিল শমিত। পারেনি। মাথার ভেতর ভয় কাজ করছিল। অবিচারের ভয়? গার্গীর প্রতি অবিচার হয়ে যাবে? কেন ভেবেছিল সেরকম? গার্গী তো ভাবেনি। ভয়গ্রস্তরাই আসলে ওভাবে ভেবে থাকে। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য? হতে পারে। অপরিচ্ছন্নতার ভয়, অনৈতিকতার ভয়। নৌকো থেকে লাফিয়ে স্রোতে বিপর্যস্ত হওয়ার ভয়? হতে পারে। যদি আরও কঠিন পাষাণে সে আছড়ে পড়ে? হতে পারে। আসলে তার ইচ্ছেটা ভয়ের প্রভাবে অস্থি-মজ্জা-পেশিপূর্ণ

হয়ে উঠতে পারেনি। ভয়টা ভুলেরও। অনির্ণেয় আত্মবিশ্বাসে, অপরিমেয় স্বপ্নে আবেগে, শুদ্ধ তার বাসনায় ব্যবহারিকের পরামর্শ তাচ্ছিল্য করে জীবনে প্রাত্যহিক প্রায়শ্চিত্ত ডেকে আনার ভুলটা শমিত কোনোদিন ভুলতে পারেনি। আত্মবিশ্বাস এবং স্বপ্ন ও আবেগও ভুল প্রমাণিত হয়েছিল। নিজেকেই, শমিত নিজেকেই ভীষণ ভয় পায়। রিমির ভয় নেই। বাবার উত্তরাধিকার সে এড়াতে পারে। গার্গীর মতো হল রিমি? শমিত দেখে, ওরা ঠোঁটে ঠোঁট বুকে বুক লাগিয়ে বিছানা ছেড়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। ওদের খেলার নিয়ম কী? মুহূর্তের জন্যও ছাড়াছাড়ি হওয়া যাবে না? রিমির কোমর জড়িয়ে আছে পাইরেটের হাত। রিমির হাত জড়িয়ে আছে পাইরেটের কাঁধ। ওরা নাচে। ঘুরে ঘুরে নাচে। ওরা নেচে যায়। শমিতেরও ইচ্ছে করে। হৃদয়ের ভিতর কোনো সঙ্গীতের মূর্ছনায়, অশ্রুত সুরের আবেশের ভিতর, নিরুচ্চার কথার ভিতর কোনো নারীর সঙ্গে তারও নাচতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে সমুদ্রের হাওয়ায়, প্রাচীন মদের মতো শুদ্ধতায়, এক নিবিড় রমণীর হাত ধরে নেচে নেচে বালি ও জলে মিশে যেতে। শমিত কি অতৃপ্ত যৌন ক্ষুধার শিকার হল? মেয়ের যৌন দৃশ্যে বসে আছে এক বিকারগ্রস্ত প্রৌঢ়? রিমি গেঞ্জি খুলছে। তার সাদা শাণিত গা থেকে জোর করে সরে গিয়ে দু-হাতে চোখ টিপে ধরে শমিত। এটা পাপ। এভাবে থামের আড়ালে বসে থাকতে থাকতে সে টের পায়, বুকের ভিতর গরম বালি উড়ছে, যেন সে কোনোদিন কোনো নারীকে উন্মোচিত হয়ে দেখেনি, যেন সে কোনোদিন কোনো নারীকে জেগে উঠতে দেখেনি, যেন তার কোনোদিন কোনো নারী ছিল না, নেইও, তীব্র হাহাকার তার কণ্ঠনালীতে ধাক্কা মারে, জলে ভরে যায় চোখ। সে ঝাপসা দেখে, দু-হাত ডানার মতো ছড়িয়ে রিমি ডান পায়ের ওপর ভর রেখে বাঁ পা পেছন দিকে অল্প অল্প করে সরিয়ে নিচু হচ্ছে। ঠোঁট ছুঁয়ে আছে পাইরেটের ঠোঁট। পাইরেট ঝুঁকছে তারও ডান পা একটু একটু করে পিছিয়ে যাচ্ছে। দারুণ ব্যাপার। শমিত উঠে দাঁড়িয়ে থামে ঠোঁট রেখে দু-হাত ডানার মতো ছড়িয়ে দেয়। পাইরেটের হাতের আড়ালে রিমির স্তন। শমিতের নিজের হাত দুটো বড্ড ভারী। শরীরটাও। পায়ের ওপর শরীর নিয়ে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। সে বসে পড়ে। দেখে, পাইরেট টলে গেল। দুটি শরীরের মুহূর্তের বিচ্ছিন্নতা থেকে এক ঝটকায় রিমি নিজেকে সরিয়ে তরবারি তুলে পাইরেটের হাতেমারল। পাইরেট আর্তনাদ করে বলল, ওক্কে! ইয়োর স্কোর। ঘাড়ের চামড়ার ওপর পনি টেল আছড়ে নেয়। রিমি ঠোঁট এগিয়ে দেয়। পাইরেট ঠোঁট দিয়ে তা গ্রহণ করে। আবার খেলা শুরু। ওরা নাচে। পাইরেটের হাতের ক্ষত থেকে রক্ত ঝরে। মদ খাওয়ার সুবিধে, ক্ষতগুলোর ওপর শান্তির প্রলেপ পড়ে, রক্তগুলো ভয় দেখায় না, তরবারিগুলো ভয়ংকর মনে হয় না।

প্রাচীন রাত্রির কন্যা

ঝড় আর জলের কারবার শুধু নয়, আরও কিছু, মধ্যরাতের মাতনে বুনো গন্ধ লেগেছিল। বিছানায় আপ্লুত সায়মের মাথার কাছে খোলা জানালায় ছিল মাতনের শব্দ বর্ণ গন্ধ। ঘুমের ওপার থেকে একটা প্রসন্নতা ছড়িয়ে পড়েছিল মাথার ভেতর। সেখানে নিবিড় শান্ত জলরাশি। জলের ওপর শব্দ বর্ণ গন্ধের ছায়া। এইসব ছায়া থেকে আশ্চর্য এক শূন্যতায় ভেসে যেতে পারে সায়ম। হঠাৎই, আঁচল খুলে আকাশের গা দেখানোর আদিম আকাঙক্ষায় চারদিক আলোকাক্রান্ত হলে সায়ম কুঁকড়ে যায় এবং তখনই রাইদিদার ঘ্রাণ পায়। কাঁচা হলুদের মতো নম্র নিষ্কলুষ নিবেদিত। বিছানা ছিঁড়ে পৃথিবীতে ফিরে এসেছিল সায়ম। ছুটে গিয়ে রাইদিদার ঘরে স্তম্ভিত বিদ্যুতের আলোয় দেখল, মেঝেয় আছড়ে পড়েছে রক্ত। ডেস্কের ওপর তেমনই খোলা আছে সবুজ বই। উত্তরের সিঁড়ি তেমনই নেমে গেছে নীচে। বারান্দায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল সায়ম। উৎসবের আগের রাতে ঝড়বাদলে ঘুমোচ্ছে গোটা বাড়ি।

সায়মের বাবার ঘর থেকে আলো আসছে জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে। সবাই জানে জন্মদিনের আগের রাতটা তিনি জেগে থাকেন। কাজকর্ম করেন। তাঁর ঠাকুরদার আমলের তোরঙ্গ থেকে দলিল-দস্তাবেজ বের করে দেখেন। সমকালের ঘটনাবলি লেখেন। রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করেন। যেহেতু তাঁর জন্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, প্রাক্‌জন্ম পর্বটা যেন তিনি আজও মাতৃজঠরে ব্যস্ত থাকেন। যেন কয়েকঘণ্টা পর তাঁর পুনর্জন্ম হবে। জন্মদিনগুলো তাঁকে মৃত্যুহীন করে রাখে। আগামীকাল ভোর হতেই সুনির্মিত মঞ্চে তাঁর দীর্ঘায়ু কামনায় গান হবে, স্তোত্রপাঠ হবে, ভাষণ হবে, নৃত্যনাট্য হবে, বীণাবাদন হবে, বংশীবাদন হবে, আলেখ্যনৃত্য হবে, বিশাল স্ক্রিনে ফুটে উঠবে তাঁর সদ্য-রচিত বাণী বা কবিতা, অডিও সিস্টেমে পৌঁছে দেবে তাঁর তুবড়ে দুমড়ে যাওয়া তেজোদৃপ্ত কণ্ঠস্বর, পরিবারের সবাই মিলে নাটিকা করবে, ভূমিকা থাকবে তাঁর কণ্ঠস্বরেরও। এইসব অনুষ্ঠান হতে হতে জন্মদিন রাতের গভীরে নিবিষ্ট হয়ে যাবে।

সায়ম জানে, তার বাবা সুদর্শন মিত্র মৃত। তার দুই দাদা জানে, বাবা মারা গেছেন। তার দুই দিদি ও বোন জানে। দুই জামাইবাবু জানে, তাদের শ্বশুরমশাই প্রয়াত। মা জানতেন, তাঁর স্বামী চব্বিশে কার্তিক ভোরে সজ্ঞানে মর্ত্যলোকের মায়া ত্যাগ করে অমরধামে যাত্রা করেন। সুদর্শনবাবুর জীবিত বন্ধুরা জানেন। প্রতিবেশীরাও জানে। পুরসভার চেয়ারম্যান জানেন, তাঁর

নিজের দল ও বিরোধী দলের লোকজনও জানেন। সায়মের বিশ্বাস, প্রায় সবাই জানে বা জানেন। সুদর্শন মিত্রর মৃত্যুসংবাদ যত পুরনো হচ্ছে, তাঁর জীবিত জন্মদিনের অনুষ্ঠানে ভিড় তত বাড়ছে।

রাইদিদার ঘর অন্ধকার। কিন্তু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে রক্তের দাগ। জীবিত রক্ত। ডেস্কের ওপর খোলা বই। জানালার ওপারে ক্ষয়িষ্ণু নিমগাছ। বৃষ্টি ঝরছে।

রাইদিদা এসেছিল। সায়মের পৌঁছতে দেরি হয়েছে, অপেক্ষা করে চলে গেছে। হয়ত উঁকি মেরে দেখেছে, সায়ম ঘুমোচ্ছে। যেহেতু তার চলার শব্দ নেই, ছাপ নেই, বলা যায়, রাইদিদা আসেনি। হয়ত কালো পাড়ের সাদা শাড়িতে মাথা ঢেকে পড়েছিল ডেস্কের ওপর রাখা 'নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ'। হয়ত অস্ফুটে উচ্চারণ করেছিল, চিরল চিরল তেঁতুল পাতা/তেঁতুল বড় টক।/তোমার সঙ্গে কইতে কথা/আমার বড় শখ। কিংবা, দুই পাখি দুটি বাসা/দুটি মন দুটি আশা/দুটি কথা দুটি ভাষা/কেন এলে সর্বনাশা। কিংবা, সবুজ রঙে আঁকা মুখ হলুদ স্রোতে অস্পষ্ট অমীমাংসিত করে দিয়ে তার নীচে কবেকার বাংলা হরফে লেখা 'এক রাত্রির দেখা, তুমি প্রাণসখা' হয়ত নীরবে পড়েছিল। কে জানে কতক্ষণ ছিল রাইদিদা। কে জানে, মাথার ভেতর নিবিড় শান্ত জলে ঘুমের অধিক আচ্ছন্নতায় কতক্ষণ ডুবে ছিল সায়ম। রাইদিদা কি ডেকেছিল? তারই ছায়া পড়েছিল জলে? সায়মের আপশোশ হয়, বিদ্যুৎ চমকানোর আগে পর্যন্ত কেন রাইদিদাকে সে ভুলেছিল।

প্রায়-নীরব গলায় কেউ যেন সায়মকে ডাকল। ভেজা মাটির কলসির মতো ঠান্ডা হয়ে আছে বাড়ি। বৃষ্টি ফোঁটার শব্দে নড়ে ওঠা স্থিরতা টলটল করছে বাড়ি জুড়ে। কে যেন ডাকল, সামু! অসূর্যস্পশ্য কলার পাতে মোড়া নিষ্পাপ ফুলের মতো সেই ডাক যেন। সায়মকে এভাবে কবে কে ডেকেছে মনে পড়ে না। তার নষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত স্মৃতির কোথাও এই ডাকের ভাঙাচোরা পড়ে আছে কি না সে খোঁজে। গলাটা পুরুষের না নারীর সে সনাক্ত করতে পারে না। স্বর একান্ত হলে, মায়ায় জড়ালে নারী-পুরুষের ভেদ মুছে যায়। তবে কি রাইদিদা এখনও আছে? সায়ম কাউকে দেখতে পায় না। কোনও রং কোনো ছায়া নেই। চটচটে অন্ধকার যেখানে পৃথিবীর সামান্য আলোয ঘষে গেছে, সেখানে, রাইদিদার ঘরের সামনে বারান্দায় কোনও রহস্য নেই। উঁকি দিয়ে সায়ম দেখল, ঘর জোড়া উজ্জ্বল অন্ধকার। উত্তর-পশ্চি মের জানালাটা বন্ধ হয়ে গেছে। মেঝেয় রক্তের দাগ আর চোখে পড়ে না। আবার সেই ডাক, সামু! শব্দের উৎসে পৌঁছতে সায়ম ক্ষিপ্রতায় ঘাড় ঘোরালে বাবার ঘরের অনেকটা পর্দা উড়তে থাকা জানালায় যেন শুনতে পায়, কিছু বলবি? বাবা কি কোনোদ্দিন তাকে এভাবে বলেছিল, ভাবতে ভাবতে চোখের জলে ভেঙে পড়ার আগে নিজের ঘরে পৌঁছয়।

দুই

চিতার ক্ষুধার্ত ও আক্রমণাত্মক তলপেট উন্মুক্ত করে দাঁড়িয়েছিল দোলা। সায়মের ছোড়দির বন্ধু। দুপুরের রোদে বিচ্ছুরিত সাদা দেওয়ালে দোলার শরীর রাঙা হতে দেখল সায়ম। ভাদ্রের

আলো আকাশ আর সবুজ নিয়ে একটি জানালা খোলা। বারান্দার দিকে জানালাটা দোলা বন্ধ করে দিয়েছে। খোলা দরজা দিয়ে ক্যারম খেলার খট-খট শব্দ আসছে বড়বৌদির ঘর থেকে। একটু আগে পুকুরের ধারে বকের তপস্যা দেখছিল সায়ম। সজনের মগডালে গা শুকোচ্ছিল মাছরাঙা। করবীর ডালে চুপচাপ বসেছিল জোড়া ঝুঁটি বুলবুলি। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে দোলা সায়মের চোখ চেপে ধরে। সায়ম চমকে যায়। কোনোদিন তার সঙ্গে এই খেলা কেউ খেলেছে কি? অন্ধত্বপ্রদানকারীর হদিশ পেতে পেছন দিকে হাতড়াতে হাতড়াতে তার বিস্ময় এক গাছি চুড়ির স্পর্শে তল হারায়। কে এই মেয়ে? সুগন্ধ পায় নিঃশ্বাসে। গন্ধের সূত্রে সে খুঁজতে থাকে দৃষ্টি-আবরণকারিণীর মুখ। কিন্তু এমন কোনও মেয়েকে সে পায় না যে এই দুপুরে নির্জন ঘরে সায়মের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতার খেলায় সাহসী হতে পারে। অসহায় সায়ম বলে, আমার লাগছে। ছেড়ে দাও। সেই মেয়ে মাথা টেনে বুকে চেপে ধরে। ভয়ে সায়ম নিজেকে জবরদস্তি মুক্ত করে। একটা হাসি কলকলিয়ে ওঠে। ঘাড় ঘুড়িয়ে নিজের চোখকে সে বিশ্বাস করতে পারে না। কী সুন্দর সেজেছে দোলাদি। সায়ম দেখতে থাকে। দোলাদির হাসি শব্দ হারিয়ে চোখে মুখে চিত্রার্পিত হয়। সায়ম চোখ সরাতে পারে না। অনেক পরে বলে, দোলাদি!

দোলা চোখ আর ভুরুর ব্যবধার সামান্য বাড়িয়ে, কপালে ভাঁজ তুলে মুখ দুবার ওপর নিচ করে। সায়ম একটু সরে দোলাকে পূর্ণাবয়ব দেখে। হালকা হলুদ জমিতে সবুজ সুতোর নকশা ছড়ানো তাঁতের শাড়ি। সবুজ ব্লাউজ। সবুজ পাথরের দুল। গলার সরু চেনে অনেকটা ঝুলে থাকা ছোট্ট লকেট। সবুজ টিপ। সব মিলিয়ে দোলাদিকে অন্যরকম লাগে।

কী দেখছ?

তোমাকে।

আমাকে এত দেখার কী আছে?

দেখছি।

আগে দেখনি?

তুমি কত সুন্দর!

সত্যি?

সায়মের আরও কিছু বলতে ইচ্ছে করে। দোলাও আরও কিছু শুনতে চায়। কিন্তু কথা নেই। মুগ্ধতা ও গরিমার নদী পাশাপাশি বয়ে যেতে থাকে।

কথা বলল দোলা। কাল অনির্বাণ এসেছিল?

এতক্ষণের মুগ্ধতা ও বিস্ময়ের ডিম ভেঙে যেন সায়ম লাফিয়ে উঠল। সত্যি কেমন আছে আছে অনিদা?

ভালো।

কোথায় আছে?

জানি না। জিজ্ঞেস করা বারণ।

ও হ্যাঁ। তোমাদের বাড়িতে এল?

না।

ওই জায়গায়? জায়গাটা একদম ভালো নয়।

তুমি বড্ড ভীতু। অনির্বাণ পরোয়াই করে না। আগের মতোই হাসিখুশি। রংটা জ্বলে গেছে। চোখদুটো আগুনের টুকরো। চুল-দাড়ির জঙ্গল ডিঙিয়ে নাকটা যেন আরও উঁচু হয়েছে। আমার কী হাসি পাচ্ছিল। হাসার কি উপায় আছে! নাক দিয়ে গুঁতিয়ে দিল। আমার বুঝি লাগে না! ঘাড় ফুটো হয়ে যাবে যে! পশমের মতো দাড়ি দিয়ে আমার গাল ঘষে দিল। দস্যুকে কে সামলায়?

এসব কী বলছে দোলাদি? সায়মের চেনা অনিদার ছবির সঙ্গে মেলে না। অনিদাকে সে চেনে স্বদেশি নায়কের মতো। কথা বলে কম। যেটুকু বলে, দেশের কথা, মানুষের কথা। অসহায় বিপন্ন মানুষকে জাগাতে হবে। দোলাদির বর্ণনায় যে অনির্বাণ, তাকে চেনা সায়মের খুব জরুরি কি? ওই অনির্বাণকে মানতে সায়মের কি কষ্ট হয়? কিন্তু কিন্তু এটা বোঝার মতো তার বয়স হয়েছে যে, অনিদা মানুষ, যন্ত্র নয়, পুথি-পাঁচালির চরিত্র নয়। অনিদার ব্যক্তিগত জীবন থাকাই স্বাভাবিক। হয়ত অন্যদের চেয়ে অনিদার ব্যক্তিগত একটু বেশিই আছে। সায়ম তা জানতে চায় না। দোলাদির অনির্বাণ দোলাদির কাছেই থাক।

দোলা বলল, সীমান্তের দিকে কোনো একটা গ্রামে যেতে হবে বলে কাল রাতেই রওনা হয়ে গেল। বলল, জানতে চেয়ো না। জানতে চেয়ে দুর্বল করে দিও না। বিশ্বাস করো, আমি ভালো থাকব।

সায়মের ভালো লাগে। এসবই শুনতে চায়। অগ্নিযুগের ইতিহাস, স্মৃতিকথা, বিপ্লবীদের জীবনী পড়তে পড়তে এক সময় সে ব্রিটিশ-বিরোধী লড়াইয়ে সামিল হয়ে যেত। মনে হত, গুপ্ত সমিতির আধো অন্ধকারে সর্বত্যাগী দেশপ্রেমিকদের মধ্যে সে বসে আছে। মনে হত, সমুদ্রের তীরে দূর দিগন্তে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে আছে অস্ত্রবাহী নৌকোর অপেক্ষায়। মনে হত, টিলার পেছনে আত্মগোপন করে নির্ভুল নিশানায় সে পরপর সাদা পুলিশ গুলিবিদ্ধ করছে। অগ্নিযুগের মোহগ্রস্ত বয়সটা পেরিয়ে এলেও সে আজও স্বাদেশিক চেতনায় নিজেকে সবচেয়ে বড় করে পায়। সায়ম জানতে চাইল, অনিদা খালি হাতে এসেছিল?

কী বলো! খালি হাতে ওর চলাফেরা নিষিদ্ধ। সবসময় রিভলবার সঙ্গে রাখতে হয়। কাউকে বোলো না, ঘরে ঢুকে আমাকে জড়িয়ে ধরতেই আমার কোমরে শক্ত মতো কী যেন একটা খোঁচা মারল। প্রথমে বুঝিনি; পরে আদরের চোটে আমার পেটে শক্ত জিনিসটা চেপে বসতেই যন্ত্রণায় আঃ করে উঠি। অনি বলল, লাগল? আমি না বললাম। বলা কি যায়? তখন ওর বুকে মিশে আছি। কিন্তু ও আমাকে কোলে তুলতেই শক্ত জিনিসটা এমন জায়গায় খোঁচা মারল যে একটা চিৎকার বেরিয়ে গেল। এতক্ষণে বাবুর খেয়াল হল। বলে কিনা, আগে বলবে তো যে রিভলভারটা লাগছে! আমি ভাবলাম, অন্য কিছু। এটা আমার শরীরের অংশ হয়ে গেছে। থাকলে বুঝতে পারি না, না থাকলে টের পাই।

দোলার মুখ থেকে সায়ম অনেক আগেই চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এসব কথা যে তার শোনার নয়, দোলাদি কি বোঝে না? নিজের ভালো-লাগা সময়ের আচ্ছন্নতা নিজের কাছেই

রাখতে হয়। কিছুটা হয়ত বলা যায় প্রিয় বন্ধুকে। সায়ম তো তেমন প্রিয় বন্ধু নয়। সংহিতার চেয়ে বছর তিনেকের ছোট ভাইকে দোলাদি তার প্রেমিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মুহূর্তগুলোর কথা বলে কীভাবে? বয়সের ব্যবধান হয়ত বড় ব্যাপার নয়। সম্পর্কের যে একটা দূরত্ব থাকে। কিন্তু এই যুক্তি কতটা গ্রহণীয়? দোলাদি অকপটে বলতে পারছে। সায়মের শুনতে বাধছে। সেটা কি তার হিরো অনিদার অধঃপতন ভেবে? অদ্ভুত রুচিশীল হয়ে উঠেছে সায়ম। খোলা চোখে দেখার সাহসটাই হারিয়ে ফেলছে। দোলা বলে, সামু, তুমি রিভলভার দেখেছ?

না। আমার ভালো লাগছে না।

কেন? কী দারুণ দেখতে। চকচকে কালো। ছোট্ট, কিন্তু দারুণ তেজী। আমার হাতে দিল অনির্বাণ। কোথায় গুলি থাকে, কীভাবে গুলি ভরতে খুলতে হয়, কীভাবে ধরতে হয়, ট্রিগার টিপতে হয় দেখাল। বলে কিনা, আমায় টার্গেট করো। ভয়ে আমার হাত থেকে পড়ে যাওয়ার আগে ও ভাগ্যিস ধরেছিল।

সায়ম বলে ফেলে, রিভলভার কি খেলনা? গুলি ছিটকে বেরলে কী হত?

কী আর হত? আমি মরে যেতাম। কিংবা অনির্বাণ। নয়ত দুজনেই।

কী বললে?

কিছু না। দুজনেই বেঁচে আছি। জানো, অনির্বাণ এখন যাত্রার ডায়ালগ শিখেছে। বলে কি না, তুমি আর রিভলভার আমার কাছে থাকলে আমি কাউকে ভয় পাই না। তোমাদের বুকেই আমার জীবন ও মৃত্যু। নাটুকে গলায় এইসব বলে আমাকে রেখে পালিয়ে গেল। সামু, দেখো।

দোলা বুক খুলে দাঁড়িয়েছে। রোঁয়া ছড়ানো দুটো কদম ফুল। মাঝখানে লকেট শ্বাসাঘাতে উঠছে, নামছে। বাঁদিকের কদমের নীচে কালচে খয়েরি ক্ষত।

দ্রুত চোখ বন্ধ করে সায়ম। দোলাদির মাথা খারাপ হয়ে গেছে? অনিদার ওপর রাগে? অনিদার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার প্রমাণ দিচ্ছে? এভাবে? অনির্বাণের হাতে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য রাগ? সে নিজে কি চায়নি? না কি দোলা অন্য কিছু বলতে চাইছে?

মাথার ওপর বাতাসে পাখার ডানা ঝাপটানো ছাড়া শব্দ নেই। সায়ম চোখ খুলল। দোলাদি রাঙা হয়ে গেছে। জোড়া কদমের নীচে তলপেটে পিছলে যাচ্ছে পৃথিবীর আলো। সায়ম চোখ বন্ধ করেনি। এভাবেই কেটে গেছে কতক্ষণ।

দোলাদি নিজেকে গুছিয়ে নিতে নিতে উচ্চারণ করেছিল, তুমি আকাট নির্বোধ।

সায়ম রাতে খবর পেল, অনির্বাণ এনকাউন্টারে মারা গেছে।

কবে?

পরশু ভোরে।

তবে যে কাল অনিদা দোলাদির কাছে এসেছিল! অনেক প্রশ্ন থেকে রেহাই পেতে সায়ম অনিদার মৃত্যুটাও ভুলে যেতে চায়।

তিন

সুরঞ্জন এসেছে। খবরটা ক্যাপসুলে পুরে বাড়ির পাকস্থলীতে ঢুকিয়ে দিল সায়মের বড়দা। অচিরেই শিরা ও ধমনী ক্লান্তি অবসাদ শিথিলতা ঝেড়ে ফেলে নবযৌবনসমাগমে চাঙ্গা-মাঙ্গা হয়ে ওঠে। সুদর্শন মিত্রের জন্মদিনে প্রেরণা আবেগ উদ্যম স্বপ্ন সংকল্প মাণিক্যের ঘাটতি থাকে না। কোনোভাবে বোঝার উপায় নেই যে, ক্লান্তি অবসাদ শিথিলতা কাজ করছে। কিন্তু, সুরঞ্জন এলেই টের পাওয়া যায় যে, ওগুলো ভয়ানকভাবেই সক্রিয় ছিল।

সুদর্শন মিত্রের ৭৫তম জন্মদিনে সুরঞ্জন আসতে পারেনি। বিদেশি বিনিয়োগ আনতে সরকারি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে তাকে কানাডা যেতে হয়। সরকারের উদ্যোগের ফিরিস্তি যাতে বিশ্বাসযোগ্যতা পায়, তার জন্যই সুরঞ্জনের যাওয়া জরুরি হয়ে পড়ে। সুরঞ্জন যা বলে, যা লেখে, দেশের শিক্ষিত ও সমাজ-সচেতনদের বড় একটা অংশ তা বিশ্বাস করে। না হলে তো রামশ্যামযদুমধু কতই আছে, সরকারি প্রতিনিধিদলে ঢুকে বিদেশ ঘোরার জন্য ঝুলোঝুলি করছে। সুরঞ্জন রায় একটা ব্যাপার। সায়মের বড়দা সপ্তর্ষি সেবার আত্মীয়সমারোহে এভাবেই ব্যাখ্যা করেছিল। ব্যাখ্যায় লাবণ্য আনতে, সৌন্দর্য আনতে সপ্তর্ষি বলে, আমাদের অনুষ্ঠানে কোনো ত্রুটি নেই। সেতারের সাতটি তারই নিখুঁত। কিন্তু যে সুর বাজছে, তা অসুররঞ্জনী। ও যে আসেনি, বাবা ঠিক ধরে ফেলেছে। বলল, সুরঞ্জনের বিকল্প হয় না। আমার সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা যে যান্ত্রিক নয়, আমি যে বেসরকারি-পুঁজির অনিবার্য পুনরুত্থানের কথা বলেছি, ও-ই তো প্রথম তুলে ধরল।

বড়বৌদি বলে গেল, সামু, সুরোঠাকুরপো এসেছে। সায়ম শুনল। মিনিট দশ-বারোর মধ্যে ছোট-বৌদি বলে গেল, ঠাকুরপো, সুরঞ্জনদা এসেছে। এরপর ছোড়দি বলে গেল, সামু, সুরঞ্জন এসেছে। সায়ম বলতে চায়, তার কী করার আছে। টানা বারান্দার মাঝামাঝি বাঁক নিয়ে ততক্ষণে সবাই দক্ষিণবাড়ি চলে যায়। এভাবেই কথায় কথায় সুরঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণবাড়ি স্পন্দিত হতে থাকে। প্রায় পরিত্যক্ত আদিবাড়ির শীতলতাও ছুঁয়ে থাকে সুরঞ্জন।

সুরঞ্জন সায়মের ছোট মাসির ছেলে। মা-র হিসেবে, এক মাস আট দিনের বড়। মা-র ভাষায়, সুরো হল মাঘের উনিশে, আর সামু ফাল্গুনের আটাশে। বড়দা, ছোড়দা বয়সের গুরুত্ব বুঝে 'ভালো আছিস' 'মন দিয়ে লেখাপড়া কর' গোছের পোকা-লাগা জ্ঞানবাণী ছড়িয়ে আক্ষরিক অর্থেই সুরঞ্জনকে ফুটিয়ে দিত। ফলে সায়মের সঙ্গেই তার সখ্য ছিল বেশি। সুরঞ্জন ছোটবেলা থেকেই চতুর। একই সঙ্গে দাদাগিরি ও চামচাগিরির প্রবণতা ওর মধ্যে লক্ষ করা যায়। উত্তরোত্তর চর্চার ফলে কাজের বয়সে সুরঞ্জন এই প্রবণতাকে শিল্পে পরিণত করে। সাফল্য বলতে যা বোঝায়, তার অনেকটাই আজ ওর আয়ত্তে। সায়মের বড়দা, ছোড়দা, অন্যান্য আত্মীয় সবসময়ই ওর সম্মানের ব্যাপারে সচেতন থাকে। একটা প্রশ্নে সায়ম একবার সুরঞ্জনকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছিল। তুই নাকি আশি হাজার টাকা বেতন পাস? কীসের জন্য? ভালো কাজে সত্যিই তেমন বেতন পাওয়া যায় কি? সুরঞ্জন হেসেই জবাব দেয়, কী করে বোঝাব বল? বড়দা

একে-তাকে ধরে-করে এক জায়গায় তোকে ঢুকিয়ে দিল। তা-ও টিকতে পারলি না। ডাক্তার কী বলে? সারার চান্স আছে? বড়দা, আমার এক বন্ধু রিসেন্টলি জার্মানিতে সাইকিয়াট্রির স্পেশাল কোর্স করে ফিরল। সামুর ব্যাপারে ওর অ্যাডভাইস নিতে পারো। আমি বলে দেব। দুর্দান্ত অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার। মানুষ হিসেবেও দারুণ। অসম্ভব উইটি। বলে কী, জার্মানিতে আর হিটলার হবে না। ওরা ট্রিটমেন্ট আবিষ্কার করে ফেলেছে। আমি বললাম, তুমি ভালোভাবে শিখে এসেছ তো? আমরা সেফ থাকতে পারি। সুরঞ্জন হাসে। সবাই হাসিতে যোগ দেয়। অস্বস্তি কেটে যায়।

সুরঞ্জন খুবই চটেছিল, সন্দেহ নেই। আগে সে কখনও সায়মের মনোরোগকে আক্রমণ করেনি। সায়ম খুঁচিয়েছিল। মনে হয়েছিল, প্রশ্নটা করা দরকার। ভালো কাজের বেতন যে বেশি হতে পারে না, এই বিশ্বাস তখন তাকে ভীষণ উত্তেজিত করত।

মাইকে ঝুমুর গান শোনা যাচ্ছে। সায়মের মামাতো বোন। গলা আগের মতো নেই। তবে বেশ গাইছে। ছেলেবেলা থেকেই ও কথার মানে বুঝে গান গায়। সায়মের ভালো লাগে, একটা দিন কাছের দূরের সবাই মিলে এই যে মেতে ওঠা, এটা তো কম নয়। এই একটা দিন, সব কাজ পরে হবে বলে সবাই যে এখানে ছুটে আসে, তার দাম নানা কারণেই বেশি। টুকরো টুকরো ছড়িয়ে থাকা পরিবার অন্তত একটা দিন ঝাপসা হলেও অখণ্ডতা অনুভব করতে পারে। এই অনুভব তো মিথ্যে নয়। ঝুমুর গাইছে, ঝুমুরের মেয়ে গাইবে। সায়মের ছোটমামা শুভব্রত গুহ যৌবনে দেবব্রত বিশ্বাসের একরোখা অনুগামী ছিলেন। তিনিও গাইবেন। কত আত্মীয়কে সায়ম চেনে না, তারা বিভিন্ন অনুষ্ঠান করবে। মেজমাসির দুষ্টুমি এখনও যায়নি। দূর-অতীত গ্রীষ্মের এক দুপুরে মছলন্দপুরে গরুর গাড়িসুদ্ধ জামাইবাবুর পুকুরে নেমে যাওয়ার চমৎকারিত্ব ও প্রাণবত্তার গল্প বলতে বলতে তিনি নবীনা শ্যালিকা হয়ে যাবেন। আরও কত গল্প বলবে কত কে। এই ঐক্য, এই উৎসব, এই হৃদয়ের তাপ, প্রাণের বিভা কোন স্পর্ধায় সায়ম নস্যাৎ করবে? সুদর্শন মিত্র জীবিত নয় সেই সত্য জানে বলে?

দরজার বাইরে বড়দা বলল, সামু, সুরঞ্জন অনেকক্ষণ এসেছে। তোকে খুঁজছে।

স্পর্ধা সুরঞ্জনকে মানায়। তার নিপুণ ব্যবহার যে জানে। কিন্তু সহজ মেলামেশার মধ্য দিয়ে ও সবার আপনজন হয়ে যায়। সুরঞ্জনের কপটতা বুঝতে পেরে সায়ম যখন ওকে এড়িয়ে চলছিল, ও বলেছিল, নিজেকে তুই একা করে ফেলছিস। এভাবে বাঁচতে পারবি? সায়ম জবাব দিয়েছিল, দেখি চেষ্টা করে। সুরঞ্জন বলেছিল, টাইয়ের মতো আমার মাঞ্জা দেওয়া সপ্রতিভতাকে তুই আসল চেহারা ভাবিস। এত সহজেই মাপা যায়? তোদের একটা সুবিধে আছে, আগে থেকেই প্রতিক্রিয়াশীল বা ওই জাতীয় অর্থহীন মার্কা অন্ধের মতো লাগিয়ে যত বড় পারা যায় একটা লিস্টি বানিয়ে ফেলিস। এতে কাজটা সোজা হয়ে যায়। দুনিয়াটা ছোট করে ফেলা যায়। ছোট দুনিয়ায় নিজের বুক চিতিয়ে বলা যায়, আমরাই বড় এবং সেরা। একবারও ভাববি না, কত কিছু চেনা-জানার বাইরে রয়ে গেল? তুই আমার যে-চেহারাটাকে আসল ভাবিস, আমি সে রকম ভাবতে পারলে বেঁচে যেতাম।

সায়ম এখন ভাবে, সুরঞ্জনই ঠিক। ওর একটা আন্তরিক অনুভব আছে। বাড়ির প্রতিটি সদস্য যখন সায়মকে কুলাঙ্গার ভাবছে, মিত্র বংশের ছেলে পাগল হওয়ার ঘটনা যখন অটুট ঐতিহ্যে ফোকর তৈরি করেছে, কানাঘুষো চলছে মিত্রবাড়ির ছায়াবৃত কেচ্ছা নিয়ে, মিত্তিরদের গায়ের রং সাহেবের মতো সাদা হওয়ার কারণ নিয়ে উত্তেজক তামাশা হচ্ছে, বড়দাকে ডেকে সুরঞ্জন বলেছিল, পূর্বপুরুষদের বিশ্বাসঘাতকতার পাপ সামুকে নষ্ট করল। তোমরা সবাই নষ্ট হতে পারতে। আমাদের সন্তানরাও নষ্ট হতে পারে। সামু যে উন্মাদ, এতে ওর কোনো দোষ নেই। বড়দা বলেছিল, ওসব কিছু নয়। যৌনবিকার। একাচোরা থাকার জের। লোনলিনেস ডেফিনিটলি এ ক্রাইম। হ্যাঁ, বলতে পারো, বড়ঠাকুরদার লাম্পট্যটা পেয়েছে।

সুরঞ্জনই এসব জানায় সায়মকে। বলে, ওরাও কত সহজে মীমাংসা বের করে নিল।

ছোড়দা ঘরে উঁকি দিয়ে সায়মকে বলল, তৈরি হয়েছিস? চলে আয়। সুরঞ্জন ডাকছে।

দক্ষিণবাড়ির চাতালে সুরঞ্জনকে ঘিরে গল্প জমে উঠেছে। সাফল্যের প্রতীককে সবাই ঘিরে থাকে। সায়মের ছোটবৌদি জিজ্ঞেস করল, বিয়ে করলে না কেন, ঠাকুরপো? ছোড়দা বলল, ভাগ্যিস করেনি। বেঁচে গেছে। ছোটবৌদি বলল, আ-হা। উনি যেন মরে আছেন! সুরঞ্জন হাসল। কে যেন বলল, তোমার একটা বহুদিনের প্রেম আছে, শোনা যায়। বড়বৌদি বলল, আমিও শুনেছি। কে সেই মেয়ে? এক প্রবীণা বললেন, দ্রাক্ষালতার শিকড় সেটি, তার না জানি কতই গুণ! সায়ম একপাশে দাঁড়ায়। সুরঞ্জনের অপ্রতীত প্রেম নিয়ে কৌতূহল থেকেই যাবে। সব শুনে ও বলবে, বিবাহ একটা বিমূঢ়তা। সুরঞ্জন গেয়ে উঠল, সোলজার, সোলজার, মিঠি বাতে বোলকর দিল তো চুরা লে গয়া ...

চার

ঝুমু সায়মকে বলল, তোমার ঘরে চলো।

কেন? এই তো বেশ বসে আছি। ভালো লাগছে। সবাই কথা বলছে, হাসছে। আকাশ শরতের মতো নীল নরম হয়ে আছে। অনেকদিন পর আজ তোর গান শুনলাম। বেশ ভালো নির্বাচন।

তুমি যাবে কি?

তুই বোস না এখানে। ওই চেয়ারটা নিয়ে আয়।

না।

আবৃত্তি করছে যে শৌভিক, ও কে?

জানি না।

তোর ভালো লাগছে না?

না। চলো। ঝুমু সায়মের হাত ধরে টানে। চলো, তোমায় অনেক গান শোনাব।

দক্ষিণবাড়ির চাতাল থেকে আদিবাড়িতে সায়মের ঘর অনেক দূর মনে হয়। তার যেতে ইচ্ছে করে না। সায়ম এখন সুস্থ। সবার সঙ্গে কথা বলতে চায়। সবাইকে দেখতে চায়। কত আত্মীয়কে সে চেনে না। কতজনকে ভুলে গেছে। গত দশ-পনেরো বছরে কত বদল হয়েছে। কোনো খবর সে রাখে না। ছোড়দি চিনিয়ে দিচ্ছিল। ভালো লাগছিল। ছেঁড়া পাতা জুড়ে যাচ্ছিল। হারানো পাতার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল। সায়ম স্মৃতির পূর্ণতায় ফিরতে চায়। সামাজিকতায় ফিরতে চায়। আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব মিলে যে স্বজনমণ্ডল, সেখানেই দাঁড়াতে চায়। যদি কেউ অনুরোধ করে, সে মঞ্চে উঠে গাইবে। ঝুমু কেন বলে না? ঝুমু সবচেয়ে ভালো জানে। সায়ম মনে করিয়ে দিল, তুই আর আমি শ্রাবণের গান কতদিন গেয়েছি।

মনে আছে?

মনে পড়ছিল তোর গান শুনে। সেইসব দুপুর সন্ধ্যা ছবির মতো ভেসে উঠছিল।

এরপরও ঝুমু তাকে গাইতে বলার কথা ভাবেনি। ও কি এখনও সায়মকে অসুস্থ ভাবে? ভাবে পাগলটা কখন কী করে বসে? শুধু ঝুমু কেন, অনেকেই হয়ত ভাবে। অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে যারা আছে, তারা কি তাকে সুস্থ ভাবে? বড়দা কি সায়মকে মঞ্চে উঠতে দেবে? অনেকের মুখে সে অনুকম্পার হাসি দেখেছে। ভয়ে কেউ কেউ কাছে আসেনি, সেটাও দেখেছে। সায়ম যে এসব বুঝতে পারে, এটাই তো সুস্থতার প্রমাণ। সায়মের আনন্দ হয়। ঝুমু কেন তাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে চাইছে? কেউ কি ওকে বলেছে, পাগলটাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ঘরে নিয়ে যেতে? সে এখনও বিপজ্জনক? কিন্তু সবাই তাকে আসতে বলল কেন? সৌজন্য? নাকি উপহাস? সুরঞ্জনের কথা বলে তার অপদার্থতাকে আবার চিহ্নিত করা? অপমান? অর্থাৎ কেউ চায়নি সায়ম এখানে এসে বসুক। কিন্তু সায়মের যে যেতে ইচ্ছে করে না। প্রায় পরিত্যক্ত আদিবাড়ির ভৌতিকতায় ফিরতে ইচ্ছে করে না। মৃত বাবার ঘরের সামনে দীর্ঘায়ু কামনার পুঞ্জীভূত পুষ্পস্তবক তাকে একা পেয়ে বিক্ষত করে। সায়ম ভয় পায়। না, সে যাবে না। এই আলোয় এই আকাশে এই আনন্দে সে বসে থাকবে।

ঝুমু যেন আজ বড্ড জেদি হয়ে উঠেছে।

সামু, যদি উত্তরের সিঁড়িতে বসে আমরা আবার গান গাই। গাইতে গাইতে ছেলেবেলায় ফিরে যাই। ভীষণ লোভ হয়।

এই মেয়েটাই পাগল বলে সায়মকে বীভৎস অপমান করেছে। বড়দার জুড়িদার ছিল। বলত, ওর চোখ দেখলেই আমার বুক কাঁপে। যদি কিছু করে বসে? স্বামী-সন্তান নিয়ে ঘর করতে হয়। কিছু হয়ে গেলে মুখ দেখাতে পারব না। সায়মের হাসি পায়। তার ভালো লাগে যে, এসব ভেবে মাথাটা গরম হচ্ছে না। এই ঝুমু তার স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে বেপাত্তা হয়ে গিয়েছিল। সন্তান-টন্তান ফেলে রেখে। মাসখানেক পর ফিরে স্বামীর কাছে প্রণিপাত ক্ষমা চেয়ে ডবল মন দিয়ে সংসার করছে। ঝুমু হয়ত জানে না যে, পাগলটা এ খবরও রাখে। কিন্তু আজ ওর কী হল, উৎসব ছেড়ে আদিবাড়ির জীর্ণতায় রুগ্নতায় যেতে চাইছে? তা-ও কিনা আবার উত্তরের সিঁড়িতে, যা আসলে উত্তরহীন সিঁড়ি। তাদের ছেলেবেলায় সিঁড়িটা অন্যরকম

ছিল। কেউ চলাফেরা করে না। ওঠানামার ধাপগুলো যেন সমাধির সারি। সামু-ঝুমুর নিজস্ব খেলাঘরে সেইসব ধাপ নানা চেহারায় জীবিত হয়ে উঠত। কখনও মেঘের ভাসমানতা, কখনও পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে গতিময়তা। কিন্তু যে সিঁড়ি দিয়ে রাইদিদা কোথায় যেন চলে গেছে, যে-সিঁড়ি নাকি মাটির অনেক নীচে সুড়ঙ্গের গোপনীয়তায় মিলিত ছিল, এসব রহস্য ঘিরে ফেললে সেই সিঁড়িতে ছেলেবেলা আর তেমন নিটোল থাকে না।

দোলা এসে সায়মের পাশে বসল। আজ তোমাকে ফ্রেশ লাগছে।

আমারও তাই মনে হচ্ছে।

কখন এলে?

খানিকক্ষণ হল।

মঞ্চ টা দারুণ সাজানো হয়েছে, না?

বেশ সুন্দর।

লহরী সাজিয়েছে। আমার মেয়ে। ডিজাইনিং নিয়ে পড়ছে।

বাঃ।

আমার মেয়েকে দেখেছ?

হয়ত।

ওই যে ট্রাউজার পরা, মাথায় টুপি।

অনেক বড়।

বাবার মতো লম্বা হয়েছে।

হ্যাঁ।

আমার হাজব্যান্ডকে দেখেছ?

হয়ত।

বিকেলে আসবে। নতুন কোম্পানি লঞ্চিং নিয়ে ব্যস্ত।

তুমি অনেক সুন্দর ছিলে।

কথাটা সায়ম বলতে চায়নি। বেরিয়ে গেল। খোঁচা দিতে? সায়ম বুঝতে পারে, সে সম্পূর্ণ সুস্থ। নাহলে এই দুষ্টুমিটা করতে পারত কি? তার স্মৃতি পূর্ণতায় ফিরছে। অনেক কিছু ভুলে থাকার ভান করে সে অনেক কিছু তুলে নিতে পারছে। দোলা নিশ্চয় ভোলেনি। ও যথেষ্ট সুস্থ। অবশ্য অপরিণত বয়সের ঘটনাকে গুরুত্ব না দেওয়াই বিচক্ষণতা। তার জন্যও সুস্থতা চাই।

দোলা বলল, মনে আছে?

ও কি পাল্টা খুঁচিয়ে দিল? সায়ম বলল, নিশ্চয়। তোমার মেয়েকে এখনও সেভাবে দেখিনি।

দোলা চুপ করে যায়। জবাবটা দিতে পেরে সায়ম খুশি হয়। আকাশ বাতাস আলো মঞ্চ কলরব সে উপভোগ করে।

ঝুমু উঠে পড়ে। তোমাকে একটা কথা বলতে চাই, সামু। একা হাঁটতে থাকে। আদিবাড়ির দিকে। বারান্দা থেকে সিঁড়িতে পৌঁছয়। কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

কী হল ঝুমুর?

দোলা বলে, আমি তো কিছু বলিনি।

জানি না। সায়ম দেখল, দোতলার বারান্দা ধরে ঝুমু সম্মোহিতের মতো হাঁটছে। ছেলেবেলার স্মৃতিতে ফেরার এত ব্যাকুলতা কেন? ঝুমু এরকম নয়। জীবনের অর্থ সে জানে, পরিকল্পিতভাবে বেঁচে থাকা। নিজের রাগ ঘৃণা হাসি কান্না সিনেমার মতো নাটকের মতো উপন্যাসের মতো উপভোগ করা। জীবনকে জড়াবে কেন? আজ কী হল যে আদিবাড়ির দুঃসহ নির্জনতায়, অসহায়তায় ও একাই চলে গেল? ঝুমু কী বলবে? কোনো অনুতাপ থেকে স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে ছেলেবেলায় ফেরার চেষ্টা? হয়ত এটাও বেঁচে থাকাকে মসৃণ করার প্রক্রিয়া।

আদিবাড়ি আর দক্ষিণবাড়ি যে-বারান্দাটা জুড়েছে, তার ওপর দাঁড়িয়ে অদ্ভুতভাবে তাকাল ঝুমু। ওর চোখে মুখে অনভ্যস্ত ভাষা। সায়ম টলে যায়। পায়ে পায়ে ঝুমুর অনুগামী হয়। উৎসব ঝাপসা হতে থাকে। আলোয় চোখ জ্বালা করে। অন্ধকার শীতলতার জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে। সে ছুটতে থাকে।

ঝুমুর পাশে দাঁড়ায় সায়ম।

রাইদিদা এসেছিল। ঝুমু বলল।

সত্যি?

কালো পাড় শাড়ির ঘোমটার নীচে জুঁই ফুলের মতো হাসছিল।

আমার সঙ্গে মস্করা হচ্ছে? আঁচড়ে কামড়ে দেব, ভালো হবে? তোমাকে নিয়ে যা-খুশি তা-ই করতে পারি। হ্যাঁ, ওইটাও। ফাঁকা বাড়িতে কোনো পুরুষই কোনো মহিলার কাছে নিরাপদ নয়। আর আমি তো খিদে নিয়ে বসে আছি। তুমি এখনও সেরকম হয়ে যাওনি যে, আমার ছুঁতে ইচ্ছে করবে না। খেলবে? সাংঘাতিক খেলা।

ঝুমু উৎসববাড়ির দিকে পালায়।

পাঁচ

'এখন ঘোপ্প রাত্রি। ঘরের বাহিরে যাহা কিছু কাছে সবই ভয়। ঘরেও কি ভয় নাই? রায়বাহাদুর ইয়ার নিয়ে ফিরিলেন। মহীন্দর দুইজনকে পাকড়াও করিয়া ভিতর বাটিতে পৌঁছিয়া দিল। কটন সাহেব আসিয়াছে। ডাক পড়িল বলে।'—'নিজস্ব ধর্মগ্রন্থের'র এই পৃষ্ঠা সায়ম বহুবার পড়েছে। গোটা ধর্মগ্রন্থে এরকম দিনলিপি মাত্র কয়েকটা আছে। অধিক যা আছে, তাতে ভয়ংকর ঝড়ের অভিজ্ঞতা, শস্যবিনাশ, প্রজাদের দুর্দশা, গ্রামে গ্রামে ব্যাধির প্রকোপ, পশ্চিমা সন্ন্যাসীর সেবা, নগেন্দ্র বিদ্যানিধির রামায়ণ কথকতা, কবি কৃষ্ণানন্দের রাসপালা, মাস্টার কনকরানীর

দলের যাত্রা, ঈদের দিন ইত্যাদির টুকরো টুকরো ছবি পাওয়া যায়। এইসব ছবি থেকে কলকাতা-সন্নিহিত গ্রামাঞ্চল, তৎকালীন সংস্কৃতি, সামন্তপ্রভুর বিলাসব্যসনের তথ্য মেলে। মাঝে মাঝে বিখ্যাত বৈষ্ণব পদকর্তাদের অভিসার বিরহ কলহান্তরিতা পর্যায়ের গোটা পদ বা অংশবিশেষ আছে। রাইদিদা শশবাবুকে 'প্রজামঙ্গল' পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তাব দিয়েছিল। শশাঙ্কমোহনবাবুর সঙ্গে ছাপাখানা দেখতে ঘোড়ার গাড়িতে চিৎপুর-কলুটোলা ঘুরেছিল। শশবাবু রায়বাহাদুর হওয়ায় রাইদিদার আমোদ হয়। কেননা, 'খেতাবের জন্য সবই দিয়াছে, খেতাব না জুটিলে বাবুর বেঁচে লাভ কী।' এসব সত্ত্বেও তার অস্তিত্ব কুয়াশাচ্ছন্ন।

সায়মের বাবা ও দাদা-দিদিরা তো সরাসরি রাইদিদাকে নাকচ করে দিয়েছে। ওদের ভাষায়, বড়মানুষদের নানাবকম মেয়েমানুষের সঙ্গ পাওয়ার স্পৃহা থাকে। আগেও ছিল, এখনও আছে। অবশ্য সব বড়মানুষেরই যে থাকে তা নয়। ধরে নেওয়া যাক শশাঙ্কমোহনের ছিল। কিন্তু তাতে রাইমণি রক্ষিতার বেশি কিছু নয়। রক্ষিতারা কখনোই মূলস্রোত হতে পারে না। এরকম রাইমণি একাধিক থাকলেও নয়। মূলস্রোত হল বহমানতা। সেখানে শিক্ষা-সংস্কৃতি-কর্ম-উদ্যোগ-আদর্শ ইত্যাদির স্থান আছে। রাইমণিরা নেই। সায়মের বড় জামাইবাবু সে যুগের কনটেক্সটে একজন মহিলার পত্রিকা প্রকাশের ভাবনা ডেফিনিটলি সিগনিফিক্যান্ট মনে করে। সুরঞ্জন ঘুরিয়ে বুঝিয়েছিল, রাইমণিদের উপেক্ষা করা উচিত। ওর মতে, সায়মের মধ্যে আমরা অরণ্যদেবের মজবুড়োর ছায়া পাই। তিন-চার পুরুষের অতীত জীবিত রেখে নিজের বর্তমান সম্পর্কে মৃতবৎ থাকতে পারাটা কম কথা নয়। সায়মের মতো ছেলেদের সুবিধে আছে। ওরা একটা আইডিয়া চায়, স্বপ্ন চায়। একবার পেয়ে গেলেই সেটা নিয়ে জীবন কাটিয়ে দিতে পারে। ভেবে দেখবে না, আইডিয়াটা প্রেজেন্ট রিয়ালিটিতে দাঁড়াতে পারে কি না। এটা এক ধরনের নেশা, অ্যান্ড আই মাস্ট সে, আত্মপ্রতারণা। রাইমণির ইতিহাস খোঁজার চেয়ে নিজের জীবন গড়া অনেক বড় কাজ। সায়মের বড়দা খেই ধরে, হি গেটস সাম সেক্সুয়াল প্রবলেমস। সব বিষয়ে প্রথমে কনট্রাডিক্ট করা এবং আলটিমেটলি নিজেকে আইসোলেট করে নেওয়া. এটা অক্ষমতারই ফল।

সায়মের মনে হয়, ওরা হয়ত ঠিকই বলে। রাইদিদাকে নিয়ে তার এত ভাবাভাবির মানে নেই। শশাঙ্কমোহনের একাধিক রক্ষিতা থাকতেই পারে। তাতে তার চরিত্রের একটা লোভী বা দুর্বল দিক ধরা পড়ে, কিন্তু তার অন্যান্য কীর্তি নস্যাৎ হয়ে যায় না। রক্ষিতা রাইমণি সে যুগের প্রেক্ষিতে শিক্ষিত রুচিশীল চিন্তাশীল মহিলা। ব্যস। সে স্বাধীনচেতা ছিল এমন প্রমাণও দিনলিপিতে আছে : কল্য রাত্রিতে যাই নাই। শশবাবু মহিন্দরকে পাঠাইয়াছিল। কটন নিজে আসিয়াছিল। আমার ভালো লাগে না। ইহা স্বদেশী-বিদেশীর প্রশ্ন নহে।

কিন্তু, একটি পাতায়— শশবাবুকে সরাইতে স্যামুয়েলের দরকার কী? তিনি মহৎ হৃদয়। তাঁহার সন্তানকে রক্ষা করিব। মৃগাঙ্ককে জানাইলে উপায় করিয়া দিবে।—এই চারটি বাক্য সায়মকে নিরন্তর জেরার মুখে, লাঞ্ছনার মুখে ঠেলে দেয়। আত্মীয়রা ব্যাখ্যা বের

করেছে : সম্পত্তির লোভে রাইমণি শশাঙ্কমোহনকে খুনের চক্রান্ত করে। কোনো এক স্যামুয়েলকে চক্রান্তে জড়ায়। পরে তাকে বাদ দেওয়ার কথা ভাবে। স্যামুয়েলের সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যা ছিল। মৃগাঙ্কমোহন এ ব্যাপারে সহায়তা করে থাকতে পারে। মৃগাঙ্ক শশাঙ্কের ভাই।

রাইদিদা কি শশবাবুকে খুন করেছিল? শশাঙ্কমোহনের মৃত্যু যে স্বাভাবিক ছিল না একথা অনেকেই গোপনে মেনেছে। মৃগাঙ্কমোহনের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী রকম ছিল? স্যামুয়েলের সন্তান কে? সে কোথায়? এসব প্রশ্নের মুখোমুখি হতে চায় না কেউ। একটা বেবুশ্যেকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি! ওই পাপের খাতাটা পুড়িয়ে ফেললেই হয়। তবু কেউ পোড়ায়নি। কোনো অভিশাপপূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আছে বলে? কোন্নগর থেকে রাইদিদাকে এ বাড়িতে কে এনেছিল? এসব প্রশ্ন কেউ শুনতে চায় না।

কোনোদিন কেউ আসে না এই ঘরে। ওরা বর্জন করে ইতিহাস লোপাট করে দিতে চায়। ঘৃণা দিয়ে ইতিহাস মুছে দিতে চায়। ডেস্কের ওপর 'নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ' তেমনই পড়ে আছে। উত্তর-পশ্চিমের জানালা খোলা। ওপারে ক্ষয়িষ্ণু নিমগাছ। প্রাকৃতিক ক্ষয় এড়াবে কে?

সায়ম ভাবে, শশাঙ্কমোহনের কবল থেকে মুক্তি চেয়েছে রাইদিদা। মুক্তি পেয়েছে। তাই নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ জুড়ে গাছপালার মতো ছড়িয়ে আছে এত সবুজ পদ শ্লোক। রাইদিদা স্যামুয়েলকে পেয়েছিল। তার সন্তান কি রাইদিদারও সন্তান? সে কি সায়মের পূর্বপুরুষ? এসব প্রশ্নের উত্তর রাইদিদা জানে। তাকে আসতেই হবে।

সুদর্শন মিত্রের জন্মদিনের উৎসব শোনা যাচ্ছে। গীতি আলেখ্য হবে, নাটক হবে। ভাষণ হচ্ছে। সময়ের রক্তে মিশে যাচ্ছে সব। আরও যাবে।

রাইদিদার ঘরে বেলাশেষের আলো। পরিত্যক্ত ঘর বলেই আলো কুণ্ঠিত, কৃপণ। কোনা-কানাচ ছায়া ছায়া। তবু ডেস্কের ওপর এক মুঠো দয়ার মতো স্পষ্টতা। 'নির্জন ধর্মগ্রন্থ' এর পাতা ওল্টায় সায়ম। উল্টে যায়। পড়ে। পাতা থেকে পাতায়। রাইদিদাকে যেন ছুঁতে পারছে। নিরীহ অক্ষরে মেঘ আর বারুদ। রাইদিদাকে চেনা যাচ্ছে। পড়তে পড়তে সায়ম থেমে গেল। এটা কি আগে পড়েছে? বড্ড উঁচু তুমি। /তোমার ঘাড়ে মাথা রেখে/জিরোব যে উপায় নেই।/ তোমার পলাশ ছিঁড়ে ফেলে/আর্ত হব যোগ্য নই।/ তোমার কোনও বিস্ফোরণে/সঙ্গী হব তুমিও নেই। কবে লিখল রাইদিদা? প্রাচীন অন্ধ রাত্রি থেকে উঠে আসা ভাষার মতো জীবিত সে।

শবযান ও মোতিসুন্দরী

বাজারের শেষে রাস্তাটা যেখান থেকে চড়াই, সাইকেল ভ্যান টানতে বেশ যুঝতে হয়, নীচে ওলন্দাজ না আরমানিদের ঘর ছিল বলে পুরসভার সরু বইয়ে লেখা আছে, সেখানে ল্যাম্পপোস্টের নীচে আদিগন স্পষ্ট দেখল, নদী বয়ে যাচ্ছে। আলো পড়লে জলের ভাঁজে ভাঁজে যে-রকম জরির কাপড়ের মতো চিকচিকে ভাব তৈরি হয়, পুরসভার মরা আলোয় চিকচিকে ভাবটা ময়লা-ময়লা, তবু আদিগন বুঝতে পারে, ওখানে জল। জল মানে গভীর নদী, হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে ডুবে যাওয়া, অসহায় ভেসে যাওয়া। কয়েক মাইল দূরে কোনো জেটিতে আটকে যাওয়া তার ফোলা পচা দেহটা মাছে খাবে, কাকে খাবে, শকুনে খাবে, আর শরীরেরই ভেতর বাস করা আত্মীয়ের মতো পোকামাকড়ে খাবে। আদিগন বুঝতে পারল, সে মরতে চায় না। ঘরে বকুল দুটো বাচ্চা নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে, ইদানীং বউটা আরও বেশি নিশ্চিন্ত যে, রাজু-বিজুর বাপ আর গাঁজা খায় না, দুটো বাচ্চা মা-কে লেপটে আছে, বকুল ঘুমের মধ্যেই হাত নাড়িয়ে বাচ্চাদের ছুঁয়ে নিচ্ছে। শুধু সংসারের জন্য আদিগনকে বাঁচতে হয়? নিজের ইচ্ছে নেই? বাঁচতে তার নিজের তাগিদ নেই? ওইসব চিন্তা মাথার ভেতর কাঁচা কয়লার নীল ধোঁয়ার মতো ছড়িয়ে পড়ার আগেই সে প্যাডেলে জোরে জোরে চাপা দিয়ে গতি বাড়িয়ে নিতে চায়। যাতে চড়াইয়ের মুখে গিয়ে থমকে যেতে না হয়। সিট থেকে পাছা তুলে, শক্ত হাতে হ্যান্ডেলে ভর রেখে আদিগন একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে ঝুঁকে ভ্যান দ্রুত ধাবমান করে।

আস্তে চালা। মৃত্যুপথযাত্রী ও ভ্যানের যাত্রী মোতিবুড়ির খোনা গলায় ভাঙা ভাঙা উচ্চারণ, উৎস যদিও নির্দিষ্ট ও প্রাকৃত, আদিগনের রক্তের কণায় কণায় জমে থাকা অপ্রাকৃত স্বরের ভয়ের সংস্কারে বেজে ওঠে। এর ফলে একটা উপকার হয়, যাত্রীর কথা ভুলে নদী ও মৃত্যুর খপ্পরে পড়া আদিগনের মাথায় আবার স্পষ্ট হয় পিচের ছাল উঠে যাওয়া ঘেয়ো পথ, এই বাংলার, অনেকটা দূর যেতে হবে, হাসপাতালে। ভ্যানে শুয়ে আছে মোতিবুড়ি, বয়সের আদিঅন্তহীন বৃদ্ধা, যে আর ফিরবে না বলে সবাই জেনেছে।

ওই দূরে দেখা যাচ্ছে বিনোদের হোটেলের আলো। সারারাত জ্বলে। পতিতের ইস্কুলের সামনে পুঁতে দেওয়া হাত-পা ছাড়া মানুষের মূর্তির মাথায় আলোটা আর জ্বলে না। থানার বারান্দায় আলো আছে, ছায়া ঘোরাঘুরি করে। ঢালে পড়ে হড়হড়িয়ে নেমে যেতে পারত

আদিগন। কিন্তু সে প্যাডেল স্থির রেখে পেছনের চাকার ব্রেক আলতো চেপে রাখে। খানা-খন্দ যতটা পারে এড়িয়ে যায়। মোতিবুড়ি ভ্যানেই টেঁসে যাক, সে চায় না। যদিও, এই বিশ্বাস তারও হচ্ছে যে, বুড়ি আর ফিরবে না।

আর কোনোদিন যেন না ফেরে সেই ব্যবস্থা পাকা করতেই তো মোতিবুড়িকে আদিগনের ভ্যানে তুলে দেওয়া হল। পাড়ার লোকজনের সে কী আনন্দ। কতকাল পর, হয়ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, হয়ত দেশভাগের পর, খুন-খারাবি আর জনসেবা আর অবিরত নষ্ট সন্তান আর চড়া বাজারে খড়ের মতো বিবর্ণ হয়ে যেতে থাকা মানুষ সবুজ হেসে বলল, ঈশ্বর আছেন। নইলে যমের অরুচিও শেষটানে পড়ে। দয়া করো হে মা কালী, মা শীতলা, ওলাবিবি, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বুড়িকে তুলে নাও, আর যন্ত্রণা দিও না। কে যেন বলল, আদি শেষ কাজটা তুই কর। আমরা তোর ছবি বাঁধিয়ে রাখব।

মাস চার-পাঁচ হল ভ্যান চালায়নি আদিগন। নানারকম কাজ হবে বলে পুরসভা একটা মোটরভ্যান কিনেছিল। এখন সেটা প্রধানত লাশ বয়। বাড়িতে বার্ধক্যে মরা, হাসপাতালে রোগে মরা, আগুনে পুড়ে মরা, ফাঁসিতে ঝুলে মরা, কত রকমের মৃত্যু যে হয়, ট্রেনে কাটা, বাসে চাপা লাশও পুরসভার গাড়ি নেয়। না হলে গাড়ির খরচা ওঠে না, ধার-দেনা করে কেনা তো, সুদ বাড়ে কচুরিপানার মতো। সেবার গণপিটুনিতে এগারোটা ডাকাতের লাশ, এ কথাই বলা হয়েছিল, পড়লে আদিগনের ভালোই রোজগার হয়। বাজার কমিটি খুশি করে দিয়েছিল। সেটাই লাস্ট। তারপর ভ্যান পেয়ারা গাছে শেকলে বাঁধা পড়ে আছে।

বকুলও ভ্যানটাকে মড়ার গাড়ি বলে। কখনও রেগে-চেঁচিয়ে, কখনও কেঁদে-কঁকিয়ে এই মড়ার গাড়ির হাত থেকে মুক্তি চায়। যেন তাকে নেবে, যেন তার সন্তানদের নেবে, যেন তার সংসার নেবে বলে বসে আছে। চোখের সামনে যমদূতের মতো অষ্টপ্রহর দাঁড়িয়ে থাকলে মানুষের মনের অবস্থা কী হয়। ছেলেরা যখন খেলতে খেলতে গাড়ির ওপর চেপে বসে, বকুলের বুক ছ্যাঁৎ করে ওঠে। একা দুপুরে দাওয়ায় খেতে বসে বকুল দেখেছে, গাড়িটা মুখ ঘুরিয়ে তার খাওয়া লক্ষ করছে। যেন এটাই বকুলের শেষ খাওয়া। একা রাতে উঠোনে বেরতে ভয় করে। যেন অপদেবতারা গাড়িতে বসে আছে। আদিগন কি বকুলকে মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে শাসন করে? নাকি উঠোনে মৃত্যু বেঁধে রেখে সংসার সুন্দর করে?

আদিগনের ভ্যান 'মড়ার গাড়ি'র খ্যাতি এতটাই পেয়েছে যে, এই ভ্যানে কেউ মালপত্র আনতেও বলে না। সুদামবাবুর গোলায় ইটের মতো নিরেট জিনিস বওয়ারও আস্থা ভ্যানের নেই। কলার আড়তে ভ্যানের চাহিদা খুব। কিন্তু আদিগনের বেলায় দরকার নেই। একবার যাত্রার প্রচার করবে বলে জেলেপাড়ার ক্লাব থেকে ভাড়া করল। জানাজানি হতেই ছেলেরা পিছিয়ে গেল। ওই গাড়িতে উঠে প্রচার করবে কে, আর করলে শুনবে কে!

তবু আদিগন ভ্যানটা বিক্রি বা বিসর্জনের কথা ভাবতে পারে না। কেন? কোনো সুখের স্মৃতি কি আছে, যা তাকে বারণ করে? কোনো সাফল্য আছে কি যা তাকে গর্বিত করে? নাকি

দুঃখের স্মৃতির মতোই আদরণীয় এই ভ্যান? সদুত্তর পায় না আদিগন। তবু সে মড়ার গাড়িটা অন্তত নিত্যচলনের আড়ালে রাখার কথা ভাবে না। নিজের মৃতদেহ নিজে বওয়া যায় না। স্ত্রী বা সন্তানের মৃতদেহ বওয়ার দুঃস্বপ্ন সে দেখে না। আদিগনের মনে হয়, খুব ঠান্ডা মাথায়, একা একা, একেবারে একা থাকার মুহূর্তে সে ভেবেছে, মড়ার গাড়ি একদিন পাল্টে যাবে। জীবনের গাড়ি হয়ে উঠবে। কিন্তু কীভাবে? আদিগন জানে না।

পঞ্চায়েত ভবনের অন্ধকার পেরিয়ে শ্মশানের পথ পেরিয়ে দরগায় পেন্নাম ঠুকে আদিগন পেছন ফিরে দেখে, মাজা-ভাঙা মোতিবুড়ি ফালি চাঁদের মতো পড়ে আছে। অনেকক্ষণ সাড়াশব্দ নেই। বেঁচে আছে কিনা বোঝা মুশকিল। আদিগন বুঝতে চায় না। আর মাইলটাক হলে হাসপাতাল। হিসেব কষে প্যাডেলে চাপ দিতে হচ্ছে। যেন জোরে চলার ঝাঁকুনি না লাগে। যেন আস্তে চলার দেরিতে হাসপাতাল পিছিয়ে না যায়। গাড্ডার ফাঁকফোকর খুঁজে ভ্যানের চলন মসৃণ রাখতে আদিগনের চোখ পুরনো অভ্যাসে আবার প্যাঁচার মতো হয়ে উঠেছে।

মোতিবুড়ি নাকি রূপসি ছিল। মন্বন্তরের লোকজনের মুখে আদিগন শুনেছে। ফর্সা, লম্বা, মাথায় চুলের মেঘ, রূপসি বলতে যা যা লাগে। দলে দলে মানুষ যখন শহরে খেতে বা মরতে যাচ্ছে, মোতি গাঁয়ে এল। সেই থেকে রয়ে গেছে। তাকে নিয়ে অনেক রহস্যের গল্প, গল্পের রহস্য আছে। নোনা-খাওয়া দেওয়াল, হেলে-পড়া চালা আর সন্দেহের গর্ত ভর্তি যে আতঙ্ক থেকে সবাই মিলে মোতিবুড়িকে ধরাধরি করে ভ্যানে তুলে দিল, সেটা নাকি একসময় মৌচাক বললে মৌচাক, রসকদম বললে রসকদম, ফলের মধ্যে বেদানাও। বলতে পারো, তেমনটাই ছিল। সেইসব রহস্যের গল্প বা গল্পের রহস্যের চোদ্দআনাই আদিরসের।

এমনকী অধ্যাত্মের মোড়কের অন্ধকারেও কাম-কথা। আদিগন ঢের শুনেছে। নিজে তো সেই মোতিসুন্দরীকে দেখেনি। তাই তার ভালো লাগে এক লাবণ্যময়ীর মাটি-ছোঁয়া চুল শুকোনোর কথা, পশলা বৃষ্টিতে উঠোনের জমা জলে শেষ বিকেলের আলোয় নথ-টিকলি-সিঁদুর শোভিত মুখ ভেসে ওঠার কথা, আঁধার-ভাঙা ভোরে রমণী-কণ্ঠের গানে আলো জাগার কথা, স্তব্ধ রাতের কালো জানালায় প্রদীপের আলোয় দুটি ভেজা ভেজা ডাগর চোখে অন্তহীন নিদ্রাহীনতার কথা। সেই সুন্দরীর শুকনো খোসা ভ্যানের পাটাতনে পড়ে আছে।

মোতিবুড়িও মরতে চায় না। কত বয়স হবে? মন্বন্তর আকাল যুদ্ধ স্বাধীনতা পরাধীনতা সব পার করে বুড়ি চলেছে। চোখে পুরো দেখতে পায় না, কানে পুরো শুনতে পায় না, মাজা পড়ে গেছে, হেঁচড়ে হেঁচড়ে দুয়ার থেকে নেমে দু-হাতে মাটি খাবলে চলে, লম্বা লম্বা হাতের খলখলে চামড়া দোলে, পাটের নুড়ির মতো ক-গাছি চুল মাথার পেছনে ঝোলে, সারা গায় গু-মুত-বমি-লালার গন্ধ। মোতিবুড়ি এখন পাড়ার সবারই ঘৃণার পাত্র। তা শুধু নোংরা বলে নয়, দুর্গন্ধের পিণ্ড বলে নয়, বুড়ি যাকে-তাকে যা নয় তা-ই গালমন্দ করে। নীতীশ মাস্টারকে একদিন বলল, কচি কচি ছেলেমেয়ের মাথা চিবিয়ে বেশ নাদুস-নুদুস হয়েছিস। নারান ডাক্তারকে

একবার বলেছিল, মানুষ মেরে নিজের মরণ ঠেকিয়ে রাখো। কার্তিক পাল সাতে-পাঁচে থাকে না, তাকেই কিনা বলল, গেরস্তর বউ ভাড়া খাটে কেন, কেতো? কার্তিক পালের বউ তেড়ে এসেছিল। তাকে শুনতে হল, মিছে কথা বলিস না বউ। তোর পেটে ক্যান্সার হবে। মোতিবুড়ির ঘৃণিত হওয়ার এটাও কারণ যে, তার অভিশাপ ফলুক না ফলুক ভয় দেখায়। কে বা কারা যেন স্বপ্ন দেখেছিল, মোতিবুড়ির বিষদাঁত গজাচ্ছে। নিঃশব্দে সেই দাঁত লোকজনের পিঠে কাঁধে কামড় বসাচ্ছে। ঘৃণায় ভয়ে আতঙ্কে গোটা পাড়া পালা করে মোতিবুড়ির ঘরে খাবার পৌঁছে দিতে শুরু করে। তুষ্ট রাখতে এবং বুড়ি যেন বাইরে না বেরোয়।

মোতিবুড়ির শ্বাসটান যখন শুরু হল, খবরটা কে প্রথম আনে তা নিয়ে মতভেদ আছে, পাড়ার ঘরে ঘরে উৎসবের খুশি, স্বস্তির ফুরফুরে বাতাসে এই প্রার্থনাও উচ্চারিত হয় যে, বুড়িকে আর কষ্ট দিও না, ঠাকুর। জন্মভর যন্ত্রণা পেয়ে শেষটা বিষধর হয়ে উঠেছিল। সুখ না পেলে বিষ তো জমেই।

মোতিবুড়ি যে-সে মানুষ নয় যে, শেষটান উঠল, শরীর ঝিমিয়ে পড়ল আর পট করে মরে গেল। শেষটানের যেন আর শেষ নেই। চলছে তো চলছেই। প্রতিটি টানই শেষ মনে হয়, গলার ভেতর কফ ঘষটে বাতাস বেরোয়, পাঁজর দু-হাতে বাতাস টানে, বাতাসের শব্দে শব্দে ঘরের ভেতর প্রাণ লুকোচুরি খেলে। বাইরে রাত গভীর হয়। উৎসবের খুশি ধীরে ধীরে মুছে আসে। ঘৃণা ভয় আতঙ্ক আবার একটু একটু করে ফিরতে থাকে। লোকজন গোপনে গোপনে জোড়া পাঁঠা, বারো ঘোড়া, সিন্নি মানত করে। বুদ্ধিটা দিল নীতীশ মাস্টার। ডাকো আদিগনকে। ওর ভ্যানে মোতিবুড়িকে হাসপাতালে পাঠাও। মনকে বুঝ দেওয়ার মতো চিকিৎসার ব্যবস্থা হল। আবার মরণটাও নিশ্চিত হল। ও ভ্যানে উঠলে আর ফিরবে না। ঘরে পড়ে কদিন বাঁচে কে জানে। ঘরে মরলে অপদেবতাও হতে পারে। মোতিবুড়ি দেবী না দানবী, সে মীমাংসা তো আজও হয়নি। দাও, সবাই মিলে মড়ার গাড়িতে তুলে দাও মোতিসুন্দরীকে। হাত লাগাও, ঘেন্না কোরো না, পরিষ্কার মনে ছুঁয়ে নাও।

কত রাত হল, আদি? সাপের ঠান্ডা লেজ যেন হিলহিলিয়ে গেল আদিগনের শরীরে। পাটাতন থেকে প্রশ্নটা এল।

মোতিবুড়ি ঠিক সেইভাবে পড়ে আছে, যেভাবে তাকে তুলে দেওয়া হয়েছিল। আদিগন দেখে। মরা না বাঁচা বোঝার উপায় নেই। টানের শব্দটা শোনা যাচ্ছে না। ভ্যান থামিয়ে একবার সে যাচাই করে নিতেই পারে। কী লাভ? এটুকু সুখ, অন্তত হাসপাতাল পর্যন্ত থাক যে, সে বহুকাল পর জ্যান্ত মানুষ বইছে।

রাত কত হল?

আদিগন যেন শুনতে পায় না। সাতঘরার মোড় পেরিয়ে গেল। এত অন্ধকার যে পথ আছে কিনা বোঝা যায় না। যেন আকাশ থেকে ঝুপঝুপিয়ে নামছে অন্ধকার। মাটি থেকে ফিনফিনিয়ে উঠছে অন্ধকার। অন্ধকার চোখে-মুখে ঢুকে পড়ছে। আদিগন চোখ বুজে ধাতস্থ

হওয়ার চেষ্টা করে। যেন বুজলে যতটা অন্ধকার তার চেয়ে কিছু বেশি আলো বাইরের পৃথিবীতে এখনও আছে। যেন চোখের পাতা দিয়ে মণির ওপর জমা অন্ধকার কিছুটা মুছে নেওয়া যায়।

লক্ষ্মী হতে গিয়ে মুকুন্দর বউ আর ফেরেনি, না রে আদি! তরতাজা বউটা তোর গাড়িতে চাপল। মোতিবুড়িই কথা বলছে। আদিগনের ভালো লাগে, মানুষটা বেঁচে আছে। এই অন্ধকার বাতাসে সহস্র শাঁকচুন্নির গল্প মনে করিয়ে দিলেও সে আর ভয় পায় না। এখন সে কথা বলতে চায়। কথা শুনতে চায়। কথা চালাচালির মধ্য দিয়ে বুঝতে চায় যে, মোতিবুড়ি বেঁচে আছে, সে নিজে বেঁচে আছে। হাসপাতালে যাচ্ছে তার গাড়ি।

আদি, মনে আছে, গাছ থেকে পড়ে রামুর হাত ভাঙল। তোর গাড়িতে চেপে হাসপাতাল গেল। আর ফেরেনি। ওরম মস্ত জোয়ান, সেও মরে গেল। মোতিবুড়ি আদিকে সব মনে করিয়ে দিচ্ছে। বুড়ির খেয়ালে একটু নড়চড় নেই। শরীর বিকল, মাথার কল চকচকে। চোখ-কানসহ সর্বশরীরে পঙ্গুতা নিয়ে, ঘরে বসেই মোতিবুড়ি যেমন ঠিক বুঝতে পারত, নীতীশ মাস্টার যায়, মুকুন্দর দ্বিতীয় পক্ষ যায়, পদ্মমণির ঘরে লোক আসে, গোপীনাথের বাড়িতে ভারী-ভারী লোকজন আসে, তেমনি করেই সে আদিগনকে মনে করিয়ে দেয় মড়ার গাড়ি হয়ে ওঠার বৃত্তান্ত। আদিগন শোনে। ছোট-ছোট জবাব দেয়। মৃত্যুর গল্প বলতে বলতে জীবনের গাড়ি টানছে জেনে সে খুশি হয়।

মোতিবুড়ি, তুমি খুব সুন্দরী ছিলে?

খেঁ খেঁ করে হাসে ভ্যানের যাত্রী।

গাঁয়ে নাকি এত বড় সুন্দরী আর আসেনি?

আমি কী বলব রে পোড়ামুখো! যারা সগ্‌গে গেছে তাদের শুধো গে যা।

আদিগনের ফাজলেমি করার বাসনা হয়। কজন গেছে?

মোতিবুড়ি আবার খেঁ খেঁ করে হাসে। যারা দেখতে জেনেছিল। অত গোনাগুনতি তো নয়।

একবার দেখাবে। সগ্‌গে যেতে বড় লোভ। নকুড়বাবুর পোলে চড়তে গিয়ে ভ্যান ঝাঁকুনি খেল গর্তে পড়ে। মোতিবুড়ি খনখনিয়ে ওঠে, তুই কি আমাকেও মারবি হারামজাদা! চোখের মাথা খেয়েছিস? মাঝখান দিয়ে চল। কুচো পাথর ফেলে তাপ্পি দিয়েছে।

পোলের গড়ানটা সামলে-সুমলে নামতে নামতে আদিগন শুনতে পায়, মোতিবুড়ি বলছে, ওরা সবাই তোর ভ্যানে চাপিয়ে দিলে। আর তুই আহাম্মক একবার গাঁইগুঁইও করলি না?

কী জবাব দেবে আদিগন? তার গাড়ি যে-কোনো একদিন কাউকে বাঁচিয়ে নিয়ে ফিরবে এই বিশ্বাসটা যখন নিজের কাছেই মুছে যায়, তখন কীভাবে সে রুখে দাঁড়ায়? তার মনে হয়, সে নিজেও একটা মড়ার গাড়ি। প্রত্যেকেই তাই। মানতে চায় না। ওইটাই ছলনা, বেঁচে ওঠার ভাবনার ছলনা।

মোতিবুড়ি আর কথা বলে না। দুঃসহ স্তব্ধতায় চাকার শব্দই একমাত্র আশ্রয় হয়। এটা তো স্পষ্ট, মোতিবুড়িকে খুনের দায় সে নিয়েছে। ভাঙা ঘরে থাকলে বুড়ি বাঁচতেও পারত। তখনও তো মরেনি। মোতিবুড়ি বেঁচে থাক এরকম একটা ইচ্ছে খুব মিহি হলেও তার মধ্যে ছিল, এটা আদিগন কীভাবে বোঝাবে?

সেই শূন্যতায় স্তব্ধতায় অপরাধময়তায় রমণী কণ্ঠের উচ্ছল হাসি আদিগনকে স্তম্ভিত করে। হাসিটা যেন অনেক দূর থেকে এসে তার ঠিক পেছনে দাঁড়াল। আদিগন ফিরে দেখে, ভ্যানে বসে এক আশ্চর্য যুবতী। দুর্গার মতো, জগদ্ধাত্রীর মতো তার রূপ নয়। তবু অপরূপা। এ রূপের ছায়া আদিগন বহুবার দেখেছে। এ রূপের বর্ণনা সে জানে না এতটাই চেনা। যুবতী হাসছে। ভালোবাসার হাসি। যুবতী বলল, আদিগন, তুমি কী চাও? তোমার একটা চাওয়া মেটাতে পারি। বলো। কী নেবে?

আদিগন বুঝল, সেই মোতিসুন্দরী। দেবী না দানবী যা মীমাংসিত হয়নি। হয় ছদ্মবেশ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে, নতুবা নতুন ছদ্মবেশ ধরেছে। টাকাপয়সা চাওয়াই যায়। দেবী বা দানবী যাই হোক, টাকা সহজেই দিতে পারে। ভাবল, সোনার ভ্যান চাইবে। আর মড়ার গাড়ি বলবে না কেউ। দিকে দিকে এটা সোনার রথ হয়ে যাবে। আবার ভাবল, বাচ্চা দুটো যেন খেয়ে-পরে বাঁচে, এটুকু সে চাইতেই পারে। এ চাওয়ায় লোভ নেই। সন্তানের জন্য চাওয়ায় অসম্মান নেই। কিন্তু আদিগন কিছুই চাইতে পারে না। কোনোটাই তার নিজের চাওয়া নয়। সে যা চায় তা বলতে পারে না। আদিগন মোতিসুন্দরীকে চায়।

পোড়াপাখি

পলাশ এভাবেই তার ভাবনাটা অক্ষর শব্দের অভিব্যক্তিতে ছড়িয়ে দিচ্ছিল:

গরম সম্পর্কে এতদঞ্চলের জনজীবনের অভিজ্ঞতারাশি কয়েক খণ্ড স্বাস্থ্যবান গ্রন্থের জন্ম দিতে পারে। বিষয়টি এখনও যোগ্য ও আগ্রহীদের খোঁজে ধরা পড়েনি। খোঁজ পেয়ে নীরবে কেউ কাজ করছেন কিনা বলা কঠিন। কারণ, 'গ্রন্থসকল নীরবতার সন্তান' বলা হলেও নীরবতা বাস্তবিক অপদার্থতা গণ্য হয়। সন্তানধারণের আগে থেকেই বিস্তর হইচই ও প্রসবের পর গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে জানাতে জানাতে মরে যাওয়া এতদঞ্চলের সাধারণ লক্ষণ। আবহবিদ্ ও মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা এটাকে উষ্ণ পরিবেশের প্রতিক্রিয়া বলে চিহ্নিত করছেন। যে স্থিতি ও সমাহিতি সৃষ্টির পক্ষে জরুরি, তা এই উষ্ণতায় অসম্ভব। তবে, কাল ও রুচির মাপসই করে অস্থিরতার মধ্যেই অনায়াসে বিষয়ভিত্তিক সিরিজ লেখা যেতে পারে। যেমন, গরম ও নদী, গরম ও নগরোন্নয়ন, গরম ও রাজনীতি, গরম ও কামস্পৃহা, গরম ও আভিজাত্য, মধ্যবিত্তের গরম, কৃষিজীবনে গরম, গরমের ভূতপ্রেত, গরম ও আধ্যাত্মিকতা, লোককথায় গরম, তুলনামূলক গরম সাহিত্য ও আরও অজস্র আইটেম বা অ্যাঙ্গেল বের করা যায়। কিছু পরিসংখ্যান থাকা দরকার। যেমন, ১৯৪৬ ও ১৯৬৯-এ এখানে সর্বাধিক গরম পড়েছিল। তখন হিসেব হত ফারেনহাইটে। মার্চের মাঝামাঝি থেকে আগস্ট পর্যন্ত ওই দুই বছরের প্রতিদিনের তাপমাত্রার হিসেব ও পাশাপাশি অন্যান্য বছরের হিসেব দেখালে গরমের একটা স্বচ্ছ ছবি পাওয়া যাবে এবং এর থেকে সহিষ্ণুতার মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিও তৈরি হতে পারে। গরমে মৃত্যু, ফসলের ক্ষতি, আমের সর্বনাশ, জলাভাবে আত্মহত্যা, পরিবহন বিপর্যয় ইত্যাদির তথ্যচিত্র সংবাদপত্র ও সরকারি দপ্তরে হাঁটাহাঁটি করে উদ্ধার করা সম্ভব।

মা ডাকছে শুনে পলাশ টেবিল থেকে উঠে সিঁড়ির দিকে এগোয়। একতলা থেকে দোতলায় ওঠার মাঝপথে মা দাঁড়িয়ে আছে। আর উঠতে পারে না, শ্বাসকষ্ট হয়। অর্ধেক পথ পলাশ নেমে যায়। এইভাবে বহুদিন হল মা ও ছেলে সিঁড়ি, আবদার, অনুযোগ, ভালোবাসা, ভাগাভাগি করে নিচ্ছে।

মা-র হাত থেকে চায়ের কাপ নিয়ে টেবিলে ফেরে পলাশ। জানালা দিয়ে দেখে, সজনে গাছের চূড়ায় মাছরাঙা বসে আছে। ঘাড় গুঁজে যেন মধ্যবয়সি বেকার। মাছের আশায় তার আর উদ্যোগ নেই। আজ সকালে শুকিয়ে-আসা পুকুরে খাবলা জাল ফেলে মাছ নিংড়ে

নেওয়া হয়েছে। ঝাপানো কাঁঠাল গাছের নীচে জল যেখানে অন্ধকার, সেখানে প্রায় অদৃশ্যে জেগে আছে পানকৌড়ি। পাকা তেলাকুচ হয়ত ভোরের নির্জনতায় খেয়ে গেছে টিয়াপাখি। শ্বেতকরবীর ডালে একটু আগেও দোল খাচ্ছিল বুলবুলি। বাসকের নীচে গাঢ় ছায়ায় টুনটুনিদের কথা আর ফুরোয় না। অকারণ ব্যস্ত ফিঙে এখান-সেখান ওড়াউড়ি করছেই। পলাশ যে পাখি চেনে তা একদমই নয়। এখানে এখনও কিছু পাখি আছে। অজয় হোম বা সালিম আলির বইয়ের সাহায্য নিয়ে চিনবে অনেকবার ভেবেছে। হয়ে ওঠেনি। এই মুহূর্তে, শেষ এপ্রিল বা মধ্য বৈশাখের আকাশে, দূরে কোথাও যে পাখিটা ডাকছে, টি-টি-টি-টি-টি, পলাশ তাকে চেনে না। দুপুরে স্কুল থেকে ফেরার পথে যে পাখির ডাক সে প্রায়ই শোনে, তাকেও চেনে না। শুকনো ময়ূরাক্ষীর বুকে শাবল চালালে যে শব্দ হয়, হয়ত সেইরকম ডাক পাখিটার। ভোর বা বিকেলের দিকে যে পাখিরা আতা গাছে, কামিনী গাছে ডাকাডাকি করে, যাদের ডাক এতটাই সূক্ষ্ম ও সংক্ষিপ্ত যে মনে হয়, বাতাসে রঙের আঁচড় লাগছে, তাদেরও চেনে না পলাশ। আজ কিছুক্ষণ আগে, সাড়ে ৯টা নাগাদ, যে পাখিটার মৃতদেহ বুক-শেল্‌ফ থেকে পলাশ আবিষ্কার করল, সেটিও অচেনা। অবশ্য পাখিটা এতই ঝলসেছে যে রং বোঝা মুশকিল। গড়নও বিকৃত হয়েছে। রাশি রাশি পিঁপড়ের পেটে গেছে পাখির শরীরের আয়তন ও সৌন্দর্য, যা দেখে চেনার আগ্রহ তৈরি হতে পারে।

পিঁপড়ের গতিবিধি দেখেই তো পলাশ মৃত পাখির হদিশ পেল। প্রথমে ভেবেছিল, বৃষ্টি আসবে, পিঁপড়ে ওপরে উঠছে। ওরা অনেক আগে টের পায়। যেমন, পলাশ ছেলেবেলায় টের পেত, ওর গায়ে ঘামাচি ফুটলেই মেঘ করে বৃষ্টি নামে। যেমন, কালো-ছিটে কট্‌কটি ব্যাঙ লেবু গাছের নীচে রাতভর ডাকলেই দু-একদিনের মধ্যে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি ঝরে। বৃষ্টির ভরসায় পলাশ ঊর্ধ্বগামী পিঁপড়ের সার অনুসরণ করে বুক-শেল্‌ফের পিছনে পৌঁছে দেখে, দগ্ধ দষ্ট ভুক্ত প্রাক্তন পাখি।

এই অভিজ্ঞতা লিখে রাখতে সে কলম ধরে। ছাত্র পড়ানোর কাজের বাইরে কলমের সংস্রব নেই অন্তত বছর দশ। সুতরাং টেবিলে চেয়ারে সমাসীন হয়ে খাতা-কলম বাগিয়ে ধরে আধ ঘণ্টা ভেবে সে যা লিখেছে, এখন চায়ে চুমুক দিয়ে সেটা পড়ে নিজেই হেসে ফেলে। মস্করা হচ্ছে! গরমে শেষ হয়ে যাচ্ছে মানুষ, আর সে কিনা মজা মারছে!

২.

পলাশ কি পোড়াপাখির অভিজ্ঞতা লুকোতে চায়? প্রশ্নটা নিজেকেই। একটা অদ্ভুত কায়দা, সঙ্কট থেকে সরে সরে বাঁচার পরিশীলিত চেষ্টা, গত ২০ বছরে তার জীবনযাপনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হয়ে গেছে। সে যে ইস্কুলবাড়িতে চাকরি করতে যায়, সেটা ১৫ বছর আগেই কাছাখোলা পুরসভা কর্তৃকও 'বিপজ্জনক' ঘোষিত। যে-কোনো সময় ধসে পড়তে পারে। স্থানীয় মানুষ বিশ্বাস করতে চায় না যে বাড়িটা এখনও ভেঙে পড়েনি। তাই তারা পুত্রকন্যাদের এই স্কুলে ভর্তি করার কথা ভাবে না। আশপাশে ইংরেজি মাধ্যম প্রচুর স্কুল হয়েছে, সেখানকার শিক্ষক ও পরিচালকরা ভুলেও এই স্কুলের কথা বলে না। এমনকী এই স্কুলের শিক্ষকরাও নিজেদের

ইস্কুলের কথা যথাসম্ভব চেপে যায়। এলাকার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই স্কুলের কোনো বন্ধু নেই। থাকলেও তারা পরিচয় দেয় না। তবু স্কুল টিকে আছে শুধু নয়, একদিন উন্নতি করবে বলেও বিশ্বাস প্রচার করা হয়। অন্য স্কুলের ভালো রেজাল্ট করা ছেলেকে এই স্কুলের ছাত্র বলে সূক্ষ্মতায় চালানো হয়। পলাশ নিজে স্কুল নিয়ে মিথ বানায়। মাতৃভাষা, দেশপ্রেম, আত্মশক্তি, মানবিকতা ইত্যাদির প্রতীকস্বরূপ স্বদেশিপর্বের কয়েকটি নাম ও জীবনী বলা হয়, যারা কোনোভাবেই এই স্কুলের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, তবে তাঁদের ভাবনার প্রভাব আছে স্কুলের সংগঠন পরিচালনে। তপোবনের পরিবেশ, গুরুশিষ্য সম্পর্ক, গভীর জ্ঞানস্পৃহা, কৃচ্ছ্রসাধন ইত্যাদি যা তার শিক্ষার স্বপ্নে জুড়ে আছে, পলাশ সুন্দর করে বানিয়ে বানিয়ে বলে। এই স্বপ্নের মধ্যে তার মর্যাদাবোধ বাঁচে, পলাশ নিজেও বাঁচে। বাস্তবের সঙ্কটের মুখোপাখি দাঁড়ানোর অভ্যাসটাই সে হারিয়ে ফেলেছে। এভাবেই কি সে পোড়াপাখি থেকেও পালাতে চায়?

নাকি অন্য কারণ? পাখিটার গরম পোড়া নিয়ে কি পলাশের সংশয় আছে? এই গরমে পাখিদের ভয়ংকর কষ্ট হলেও মৃত্যুর খবর নেই। রাজস্থান, গুজরাটে ভয়াবহ তাপপ্রবাহে নরম সুন্দর পাখির মৃতদেহ পথেঘাটে ছড়িয়ে থাকার বিবরণ পলাশ কাগজে পত্রিকায় পড়েছে। পুরুলিয়া-বাঁকুড়ায় এরকম ঘটনা ঘটতেই পারে। গাঙ্গেয় উপত্যকার বাতাস এতটা হৃদয়হীন রুদ্র হয়ে ওঠার সম্ভাবনা বেশ কম। বিহারে মালভূমি অঞ্চলে নিম্নচাপ বা রুটিনমাফিক পশ্চিমী ঝঞ্ঝা বা বাতাসে জলীয় বাষ্প বা উত্তর-পূর্বে মৌসুমী বায়ুর বিস্তার ইত্যাদির অভাবে আবহাওয়া দপ্তর পূর্বাভাসের দিগন্তে বৃষ্টির নামগন্ধ না-পেলেও পাখিরা গাছের ছায়ায়, সবুজের আর্দ্রতায়, পুকুর বা ঝিলের ছোঁয়ায়, গেরস্থালি ফলের অন্তর্গত রসে বেঁচেবর্তে থাকে। দুঃসহ রোদ লেগে গাছের ডাল থেকে পড়ে গেল, বা শূন্যের উড়ান থেকে আছড়ে পড়ল মাটিতে— এরকম পলাশ দেখেনি। সুতরাং আজ সে বুকশেল্‌ফে যে পোড়াপাখি দেখল, তার দগ্ধানোর বৃত্তান্ত কি ভিন্ন নয়?

ঘুম থেকে উঠে পলাশ অন্যদিনের মতোই পশ্চিমের ঘরে বসেছিল। এ সময় ঘরটা ঠান্ডা থাকে। ফ্যান হাল্কা চালালেই গা জুড়িয়ে যায়। এই ঘর অনেকটা দূর দেখাতে পারে যেখানে এখনও কিছু গাছপালা আছে। জল খেতে খেতে এইসব গাছপালার সমাসন্ন বিলোপের কথা ভাবছিল পলাশ। তখনই চোখে পড়ে নীহাররঞ্জন রায় প্রণীত 'বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব'-র ওপরে কয়েকটা পিঁপড়ে ঘোরাঘুরি করছে। পিঁপড়েরা কখনোই খামোকা ঘোরাঘুরি করে না, পলাশ যতদূর জানে। হয়ত খাবারের টুকরো পেয়েছে, নয়ত মরা পোকামাকড়। ইদানীং এক ধরনের মিনি আরশোলা খুব দেখা যাচ্ছে, মাপে ছোট, ছিপছিপে, হাল্কা, ছটফটে। মদের বিজ্ঞাপনে মেয়েদের মতো স্লিম শরীর চাপ সইতে পারে না। একটুকুতেই চেপটে যায়। বইখাতা সরাতে পলাশ মাঝেমধ্যেই এধরনের আরশোলা পায়। হয়ত সেরকম একটা 'বাঙ্গালীর ইতিহাস'-এ চাপা পড়েছে। গতকাল পলাশ বইটা আলমারি থেকে উদ্দেশ্যহীনভাবে বের করেছিল। উদ্দেশ্যহীনভাবেই দু-একটা অধ্যায়ের অংশবিশেষ পড়েছিল। টেবিলের ওপর

বইটা হাতে নিতেই পলাশের চোখে পড়ে ৪৫০ পৃষ্ঠাটা যেন কালচে হয়ে গেছে, ঝলসালে যেমন হয়। কাগজের পোড়া জমিতে ভাঙা ভাঙা সমাধির মতো কিছু শব্দ: 'দ্বাদশ শতকের বাংলাদেশ পরবর্তী দুই শতকের হাতে যে সমাজবিন্যাস উত্তরাধিকার স্বরূপ রাখিয়া গেল সেই সমাজ জাত-বর্ণ এবং অর্থনৈতিক শ্রেণী উভয়দিক হইতেই স্তরে স্তরে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত, এক স্তর অন্য স্তরের প্রতি অবিশ্বাসপরায়ণ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একের স্বার্থ অন্যের পরিপন্থী। সে সমাজের চরিত্র শিথিল। ব্যাপক সামাজিক দুর্নীতির কীট ভিতর হইতে সামাজিক জীবনের সমস্ত শাঁস ও রস শুষিয়া লইয়া তাহাকে ফাঁপা করিয়া দিয়াছিল। [পরবর্তী কয়েকটি লাইন ছাই, শূন্য, নীরব।] সে সমাজ একান্তই ভাগ্য অর্থাৎ জ্যোতিষনির্ভর, এবং সেইহেতু সেই সমাজে প্রতিরোধের ইচ্ছা ও শক্তি অত্যন্ত শিথিল।' ঝলসানো পাতায় ঘুরছে পিঁপড়ে। মৃতদেহের গন্ধে এসেছে।

পশ্চিমের ঘরে মধ্য বৈশাখের বিকেল অনেকক্ষণ আগুনের সার্কাস দেখায়। পলাশ সেটা হাড়ে হাড়ে জানে। সকালে পড়া খবরের কাগজে বিকল্প সরকার গড়ার সম্ভাবনা সন্ধেয় সাদা হয়ে যায় আগুনের আধ্যাত্মিক স্পর্শে। দু-একজন বাজার-চালু নেতার নীল চোখ, লাল ঠোঁট, চশমার হলুদ ডাঁটি, মেরুন ফাউন্টেন পেনের ভগ্নাবশেষ কাগজে বিক্ষিপ্ত লেগে থাকে।

তবু পলাশের সংশয় হয়, 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' গরমে পোড়েনি। বেলা তিনটে থেকে দু-আড়াই ঘণ্টা টেবিলের লাগোয়া দেওয়াল কুমারী কুন্তীর চেয়েও নগ্নতায় ঠায় দাঁড়িয়ে অতি তপ্ত হয়। কিন্তু অন্য কাগজ তো এভাবে ঝলসে যায় না! পোকামাকড়ের প্রিয় খাদ্য হয়ে ওঠে না!

৩.

গরম নিয়ে পলাশের ভেতর কি মজা আছে? থাকার কথা নয়। মানুষ কষ্টযন্ত্রণা লাঘব করার জন্যে অনেক সময় মজার আশ্রয় নেয়। নিজের দুর্ভাগ্য নিয়ে হাসিঠাট্টা করে, আধিব্যাধি নিয়ে তামাশা করে। এই অঞ্চলেও গরম সম্পর্কে কিছু মজাদার কথা প্রচলিত আছে। যেমন, গরমের কোনো পোশাক নেই। পোশাকের মায়া গরমে খসে যায়। গরমই একমাত্র ঋতু যখন গরিব মানুষ চুটিয়ে প্রেম করতে পারে। গরমের প্রেম বসন্তে ফল দেয়। গরমকালেই নাকি গাড়োয়াল হিমালয় থেকে এক সাধু সুগন্ধ পাথর নিয়ে এ পাড়ায় আসে। দু-ফোঁটা জলে সেই পাথর ঘষে শরীরে লাগালে জুড়িয়ে যায়। কেউ কেউ সে-পাথর পায়, সবাই আশায় থাকে। পলাশদের বাড়ির গায়ের পুকুর নিয়ে কোনো কিংবদন্তি নেই। বকুলবিবির পুকুর নাকি বহুকাল আগে একবার শুকিয়েছিল। তখন মাটি ফুঁড়ে তিনটে হাতির শুঁড় পাতালের জলে পুকুর থইথই করে দেয়। জ্যোৎস্নার শেষরাতে গোপিনীরা বসনহীন হয়ে জলকেলি করে বলেই বকুলবিবির পুকুর চোত-বোশেখেও শুকোয় না। এইসব বিশ্বাসের মধ্যে যে আনন্দ আছে, সেটা উপভোগ করতে পারলে পলাশের ভালো লাগত।

৭ ফুট নেমে গেছে জল, নদীর বুকে হাওয়ার পায়ে খড়মের শব্দ, দূষিত জল খেয়ে মরছে মানুষ, ধানের ক্ষেতে শুকনো চারা খাচ্ছে গরু-মোষ, খরার খবর আসছে গ্রাম-গ্রামান্তর

থেকে, খাক্ হয়ে গেছে মানুষের স্বপ্ন, মৃত্যুর খবর আসছে, আত্মহননের খবর আসছে, পোড়ামানুষের প্রেতহাসি শোনা যাচ্ছে মেঘহীন দিগন্তে—এটাই তো প্রতি বছর গ্রীষ্মের আবহমান ছবি। এখানে মজার জায়গা কোথায়? তবে কেন পোড়াপাখি আবিষ্কারের পর পলাশ গরম নিয়ে মজা করার কথা ভাবল?

পলাশ কি পুড়ে যাওয়া নিয়ে গভীর কোনো প্রবন্ধ লিখতে চেয়েছিল? পরে গভীরতা একটি পরিত্যক্ত ফ্যাশন বুঝতে পেরে বিদ্রূপের লাইন নিয়েছে? গরম ও প্রেম, গরম ও রাজনীতি, গরম ও ভূতপ্রেত ইত্যাদি শিরোনাম-ভাবনার মধ্যে গরম ততটা নেই, যতটা আছে চারপাশের প্রবাহ নিয়ে বিরক্তি, জ্বালা, হতাশা।

যতদূর মনে পড়ে, বছর চার আগে পলাশদের একতলার পশ্চিমের কার্নিশে একটা পোড়াপাখি আশ্রয় নেয়, ডানা-কাঁধ-মাথা অনেকটাই ঝলসে গেছে, তার গায়ের নীল ও লাল ডোরা কোথাও কোথাও অক্ষত ছিল, তার বৃত্তাকার চোখে জলের স্বচ্ছতা ছিল, সেখানে দূর শূন্যের ছায়া স্থির দাঁড়াত এবং তখন গরম ছিল না। পেঁপে গাছের পেছনে কার্নিশে যে ছায়া যে নির্জনতা তারই বুকের ভেতর কয়েকটা বিকেলে ডানা ঝাপটে সে বাঁচার অধিকার যাচাই করেছে। পারেনি। বাটি ভরে জল দিয়েছিল পলাশ, কিছু ভেজা ছোলা, এক মুঠো ডাল। পাখিটা হয়ত খাওয়ার চেষ্টা করেছিল। পারেনি।

বামপন্থী রাজনীতির ধুন্ধুমার নেতা কানাইদা এল পুকুর ভরাটের অকাট্য যুক্তি নিয়ে। কেন্দ্রে রিক্রুটমেন্ট বন্ধ, রাজ্যের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে যথাসাধ্য হয়েছে, শিল্পপতিরা অসহযোগিতা করছে, কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, উদার অর্থনীতি দেশীয় উদ্যোগের পেছন মেরে দিচ্ছে, কোথাও চাকরি-বাকরির ছাঁটও নেই; স্বনিযুক্তি আসলে জবরদস্ত ঢপ্, পাড়ার ছেলেরা কি না-খেয়ে মরবে, বাজে লাইনে যাবে, বাজে পার্টি করবে? এখন অন্তত ৩০ কাঠা জমি আছে। প্লট করে বিক্রি করতে পারে। ৫টা অ্যাপার্টমেন্ট হতে পারে। একটা অ্যাপার্টমেন্টে ৮টা ফ্ল্যাট হলে ৪০ ইন্টু ৮ মানে ৩ কোটি টাকার ওপরে ডিল। অনেকগুলো ফ্যামিলি বেঁচে যাবে। ভালো ভালো দোকানপাট হবে। পাড়ার চেহারাটাই পাল্টে যাবে। শোন, তুই এমন কিছু করবি না যাতে আমাদের ঘরের মেয়েরা বেশ্যা হয়ে যায়। তোর এই ঘরে বসে সবুজ দেখা, পাখি দেখা, জলে আলোর খেলা দেখার বিলাস ছাড়তে হবে।

কানাইদাকে দেখে পলাশ আর অবাক হয় না। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব, শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা, আদিগন্ত পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক বিন্যাস এইসব স্বপ্ন করেই মরে গেছে। স্বপ্নগুলি প্রলোভন প্রলোভন মনে হয়। যারা প্রলোভন দেখাত, কানাইদা তাদের একজন। পলু, তুই পুকুর বাঁচাতে পারবি না। যেভাবে হোক ওটা আমরা নেবই। মানুষের বিরুদ্ধে তোর চক্রান্ত ভেঙে দেবই।

কার্নিশে পোড়াপাখি মারা গেল। অদ্ভুত সব পোকার মহোৎসব লাগল সেই মাংস ঘিরে। তখন হেমন্ত, পুকুরে বিষণ্ণতা ঝুঁকে পড়েছে বেলা ফুরোনোর ঢের আগে।

১৯৯. পোড়াপাখি

পিঁপড়ে উঠছে। যদিও আকাশে বৃষ্টির দূরতম ছায়া নেই। মাটির গভীরে কি জল-মেঘের গৌরচন্দ্রিকা পৌঁছে গেছে? পিঁপড়ে উঠছে। দুপুরে দেখল পলাশ। ফ্যানের নীচে বসে ঘামছে। শুকনো গামছা জলে ভিজিয়ে গা মুছছে মা। জানালা-কপাট বন্ধ করে মা এবার কিছুক্ষণ মহাভারত পড়বে। পলাশ স্নান করে না-আসা পর্যন্ত অবসর। বিরাটপর্বে অর্জুন হল সৈরিন্ধ্রী। নৃত্যকলাপটিয়সী। ইস্কুল বন্ধ। সাইকেল ছুটিয়ে প্রাইভেট টুইশন করছে বাস্তববাদী টিচাররা। বিনে পয়সার গরিব ছাত্রও দু-একখান রাখতে হয় নিন্দুকের মুখে নোড়া ঘষে দেওয়ার জন্যে। খোকা স্নান করে নে। জল চলে যাবে। ক্লাস এইটে 'গরমের দুপুর' রচনা লিখে মাস্টারমশাইদের তারিফ পেয়েছিল পলাশ। রোদে পুড়ে হেঁকে যাচ্ছে কাঁসার বাসনের ফেরিওলা। মুর্শিদাবাদের ভূমিহারা চাষি। জীবনের কাছে হার মানে গ্রীষ্ম, তাপপ্রবাহ। নীতীশবাবু খুশি হয়েছিলেন, তুই দেখেছিস? পিঁপড়ে উঠছে। পলাশ অপ্রত্যাশিত কোনও আড়ালে আরেকটা পোড়াপাখির খোঁজে যত্নবান হয়ে দেখে, পিঁপড়ে শুধু উঠছে না, নামছেও। একই পথে। যারা উঠছে ও যারা নামছে মুখোমুখি হতেই তারা শুঁড় দিয়ে বার্তা চালাচালি করে। ঝাউগাছের পাশে ঝুরঝুরে মাটি থেকে জানালার ধার দিয়ে কার্নিশের ওপরে উঠোনের লাইটের ইলেকট্রিক লাইন বেয়ে সোজা দোতলায়, ছাদের ধার ঘেঁষে দরজার চৌকাঠের ফোকর গলে পলাশের পড়ার ঘর, সেখান থেকে সিলিং বেয়ে ক্যালেন্ডারের পিছন দিয়ে, আলমারির পিছন দিয়ে নেমে এসে পিঁপড়ের গতিপথ হঠাৎই হারিয়ে যায়। তবে কি আলমারির ভেতর ঢুকছে? পলাশ ভালো করে তল্লাশি চালায়। বস্তুত খাঁ খাঁ আলমারির পেটে কোনারকের সস্তা বইটা তেমনই লুকোনো আছে। পিঁপড়ে নেই। খাটের পায়ার রঙ পিঁপড়ের গায়ের মতন অনেকটা। তাই কি চোখে পড়ছে না? পলাশ সব জানালা খুলে দেয়। ঢুকে পড়ে চণ্ডাল রোদ। কোথাও অন্ধকার নেই। পলাশ মেঝেয় শুয়ে পড়ে চোখ করুণ করে পিঁপড়ের হারিয়ে যাওয়া গতিপথ খুঁজতে থাকে। এ ঘর ও ঘর করে। সব ঠিক আছে, স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, বাস্তব। কিন্তু আলমারির পিছনে অবাস্তব রহস্যময়তা। বহুদিনের ঝুল মাথায় মুখে মেখে পলাশ আলমারি ঠেলে কয়েক ইঞ্চি সরায়। কিছুতেই হদিস পায় না।

পিঁপড়ের সার বারবার অনুসরণ করে আমি বুঝতে পারি, আমার শরীর ঢুকছে, আমার শরীর থেকে বেরোচ্ছে। নিশ্চয় কিছু মরছে বা মারা যাচ্ছে।

চিনিদিদিমা

জলধারার পাশে এখনও সেই বাড়িটা আছে, বিহান জানে। জলধারার নাম একটা ছিল। চিনিদিদিমা বলতেন, শামাই। তাঁর সৌন্দর্যবোধ পুড়িয়ে শেষ করে দেওয়া যায়নি। ঘর-বাড়ি গেছে, মাটি গেছে, কৃত্তিবাস-কাদম্বরী সবই গেছে, সর্বোপরি ক্ষুধা-তৃষ্ণা, বিপর্যয়ের প্রান্তিক বিন্দুতে দাঁড়িয়ে থাকা একটি জাতির কোনো সুন্দর মনের গৃহবধূকে যা যা খোয়াতে হয়, সেভাবেই তিনি বিহানের চিনিদিদিমা হয়েছেন, নাতির জন্য সুধাসাগর তীর নেই, উচ্ছলিত জীবনপাত্র নেই, সার সার ভস্মাধারের সমারোহে তিনি রেখে গেছেন শামাই। বিহান জানে, শামাই যতটা সরে, বাড়িও ততটাই। ব্যাখ্যা কিন্তু এরকম নয় যে জলধারার সঙ্গে জনপদের অবিভাজ্যতা আছে। জল ছাড়াই তো কত দেশ বাঁচে। জলের প্রতি তীব্র উপেক্ষা নিয়ে শহর সমৃদ্ধ হয়। নদীর সহৃদয়তা পেয়েও গ্রাম মরে যায়। সেই বাড়িতেও নাকি জল নেই। ইট আর পাথরের বুক ফাটিয়ে জঙ্গল বাড়ছে। পাথরের বুকের রস কারও কারও বৃদ্ধির সহায়ক! এখানে শামাই ও সেই বাড়িটির নিষিদ্ধ সম্পর্ক আছে, একজন অন্যজনকে না ঘেঁষে থাকতে পারে না, এতটাই বেহায়া। বিহান হাসে। সেও আজ বুড়ো হতে চলল। চিনিদিদিমা তো কবেই দেহ রেখেছেন।

বাড়িটা কেমন? অনেকবারই জানতে চেয়েছে বিহান। চিনিদিদিমা বলতেন, ভালো। এই ভালোর সত্যি কোনো অর্থ নেই। খারাপ নয়-এর বেশি ভালো কিছুই বোঝাতে পারে না। খারাপ ও ভালো সম্পর্কে সবার ধারণা একরকম নয়। অজস্র শ্রেণী আছে। শ্রেণী প্রধানত নির্ধারিত হয় অর্থনীতির দ্বারা, তারপর রুচি। লোভ, কপটতা, হিংসা, জিঘাংসা, প্রতিষ্ঠা, প্রদর্শন ইত্যাদিরও অনিবার্য ভূমিকা থাকে। যেমন, ভূমিহীন কৃষকের ঘরের চেয়ে পাঁচ বিঘের মালিক কৃষকের ঘর সাধারণত ভালো হয়। পুরুলিয়ার দশ বিঘের মালিকের চেয়ে বর্ধমানের তিন বিঘের মালিকের ঘর অবশ্যই ভালো। মাঝারি কৃষকের চেয়ে জমিদারের বাড়ি অনেক বেশি ভালো। জমিদারেরও অজস্র শ্রেণী আছে। তাদের ঘরবাড়ির ভালোত্ব নিয়ে রেষারেষি আছে, যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানবিক দিকগুলি অস্বীকার করে, খুব বড় জমিদারের মানবিকতা থাকলে তিনি উদার ও মহৎ বিবেচিত হন. যা একজন গরিব কৃষকের কপালে জোটে না। জমিদার বাড়ির ছেলে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে এলে বিশেষ মর্যাদা পেয়ে থাকেন। আবার, ফুর্তিফার্তার মাত্রাভেদেও বাড়ির গৌরবের তফাৎ হয়। তরুণী বধূকে খুন করে বিরাট উকিল রাখলে সেই বাড়ি বিশেষ আভিজাত্য পায়। এভাবেই ভালো ক্রমে বিস্তর জটিল হয়ে পড়ে।

চিনিদিদিমা সম্ভবত ভালো বলতে এটাই বোঝাতেন যে, বিহান যেখানে থাকে তার চেয়ে ভালো। গ্রীষ্মে তপ্ত খাপরার চাল থেকে বিছানায় পড়ে না তেঁতুলবিছে বা কাঁকড়াবিছে। চৌবাচ্চার জলের তলানি থেকে মগের কানায় উঠে আসে না শ্যাওলা ও কেঁচো। স্কুল ছুটির পর এক পেট খিদের ভাতে থিকথিক করে না পিঁপড়ে। বর্ষার দু-মাস ভেজা বালিশ ও কাঁথায় জড়িয়ে থাকে না সর্দি। সহবাসের পবিত্রতা নিষিদ্ধ পল্লির ফুল হয়ে যায় না। কিন্তু এই থাকাও যে আরও অনেকের থাকার চেয়ে ভালো! ভালো কাকে বলে তা সংজ্ঞাবদ্ধ করার চেষ্টায় হাঁপিয়ে চিনিদিদিমা কোনো বাড়ির বর্ণনা দেননি। বিহান অন্যদের মতোই ভালোর বিচারে তার শ্রেণীগত অভিজ্ঞতা ব্যবহার করবে, চিনিদিদিমা জানতেন এবং তিনি এই স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন যে, কোনোদিন বিহান নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে বাড়িটি খারাপ বলতে পারে। হয়ত তখন ভালো সম্পর্কে বিহানের ধারণা অনেকটাই উঁচু হবে। ভালো-খারাপ, ধনী-গরিব, সাদা-কালো এরকম সোজাসাপটা ভাগাভাগির দ্বন্দ্ব চিনিদিদিমা শিশুসুলভ মনে করতেন. বিহান বিশ্বাস করে।

বাড়িটা দেখতে কেমন? এ কথাও জানতে চেয়েছে বিহান। চিনিদিদিমা কখনও বলতেন, ঘড়িবাড়ি। কখনও বলতেন, মেঘবাড়ি। কয়েকবার বলেছেন, সিন্দুকবাড়ি। রহস্যময়তা কাটাতে বিহান ঘড়ি, মেঘ ও সিন্দুকের সঙ্গে বাড়িটা মিলিয়েছে। তাতে সুবিধে হয়নি। বরং তার মাথায় থাকা ঘরবাড়ির প্রচলিত আকারটাই বিপর্যস্ত হয়। আকাশের নীচে ও বইয়ের পাতায় ও গল্পকথায় সে যেসব বাড়ি দেখেছে, তাদের আদলে ব্যাপক অমিল থাকলেও একটা সাধারণ মিল আছে, তা হল, বাসযোগ্যতা। রূপকথার প্রাসাদগুলি বড্ড বেশি ছড়ানো ও খোলামেলা হলেও রাজকুমারীর স্বপ্নময় ঘুমের নিরাপত্তা থাকে। সারাদিন কোথায় যেন কাটিয়ে সন্ধের মুখে প্রাসাদে ফেরে দখলদার রাক্ষসবাহিনী। রাজা কোনো রানীর ওপর চটলে তাকে গোয়ালঘরের দুঃস্থতায় ঠেলে দেয়, অর্থাৎ রাজবাড়ি বড় সুখের বাস। বিহান মনে করতে পারে, তার দেখা বেশিরভাগ বাড়ির নামে নিবাস, নিকেতন, নিলয়, কুটির, আলয়, ভিলা ইত্যাদি আছে। বিচিত্র কিছু নামও সে মনে করতে পারে, যেমন, পথের দাবি, শেষের কবিতা, অচলায়তন, নষ্টনীড়, সপ্তপর্ণী, মেঘমল্লার, সুখসাগর ইত্যাদি। বাড়ির নামকরণের পেছনে মানুষের কতরকম ভাবনা, ভালো লাগা, আকাঙ্ক্ষা কাজ করে! বিহান যদি বাড়ি করতে পারে একসময় ভেবেছিল, নাম রাখবে 'ভাটিয়ালি'। তখন সে ভাটিয়ালির সুরে মজেছিল। রত্নাপিসিমার ঘুপচি ঘরে গণসঙ্গীতের তুমুল ঘোষণার, আজ মনে হয়, তড়পানির ভেতর রোগা-কালো শরীর ও মেঘছায়া মুখ ও বৃষ্টি-ফোঁটার মতো স্নিগ্ধ রানীবালা এক অন্তহীন হাহাকারে গেয়ে উঠেছিল, সাগরকূলের নাইয়া. ও মাঝি, অপরবেলায় কোথায় যাও বাইয়া রে। বাংলার নদী মাঠ স্বপ্ন সাধ কথা বলেছিল মেয়েটির গলায়। এই গানটাই বিহান আগে শুনেছে বিখ্যাত লোকশিল্পীর পুরুষকণ্ঠে। কলেজ সোস্যালে হঠাৎ শরীরপরায়ণ হয়ে ওঠা জমাট তারুণ্যের শিরায় শিরায় অকূল দরিয়ার অনিশ্চয়তা, দীর্ঘশ্বাস, আকুতির সংমিশ্রণে তিনি প্রবাহিত করে দেন এক তীব্র যৌনবাসনা, যার রং মৌলিক লাল। রানীবালার মাঝিতে

কি নিজেকে রাখতে চেয়েছিল বিহান? সেই রোমান্টিকতার মাঝি নৌকা ভাসাতেই পারেনি। বস্তুর স্রোত বড় কঠিন।

ঘড়িবাড়ি বলতে ঘড়িওয়ালার বাড়ি বোঝাবেন ততটা সিধে চিনিদিদিমা নন। তাহলে বিহান এরকম ভেবে নিতেই পারত যে, বিশাল একটা বাড়ির মাথায় পেল্লায় ঘড়ি, দূরান্তর থেকে দেখা যায়, মানুষকে সময় সচেতন করে, ঘড়ি তো শুধু সময় জানায় না, অনেক কথা মনে করিয়ে দেয়। বিহান এরকম ভাবতে পারে যে সময়ের পেটে গেছে কাঁটা দুটো, কয়েকটা সংখ্যা লেপটে আছে বৃত্তের গায়ে, হয়ত কিছু সংখ্যাও খসেছে। বিধবস্ত সময়ের প্রতীক হিসেবে একটি ঘড়ির কথা ভাবতে ভাবতে বিহান দেখতে পেত : দুটো হাত বেরিয়ে এসে সংখ্যাগুলো এলোমেলো সাজাচ্ছে, হয়ত এটাই যথার্থ ক্রম, যেমন ৪-এর পর ৮ এবং সময়-সমতা মানা হচ্ছে না, এটাই হয়ত ঠিক, যেমন ৭ থেকে ৮-এর দূরত্বে ৬টি দাগ ও ৮ থেকে ৪-এর দূরত্বে ৩টি। আরও মজার ব্যাপার, বৃত্তের শেষ সংখ্যা ২, অর্থাৎ ১ থেকে শুরু করে উচ্চতর সংখ্যাগুলি পেরিয়ে শেষ হচ্ছে ২-এ। ১ ও ২-এর মধ্যে মাত্র একটা দাগ, ফাঁকটা সরু, চিপা। ১ থেকে ২-এর বেশি মানুষ কখনোই যেতে পারে না। ১-এ জন্ম, ২-এ মৃত্যু। বাকিটা যা ইচ্ছে ভাবো, নইলে তো লড়াইয়ের মন বা লোভটাই থাকে না। এই ভাবনার মধ্যে ভাবালুতা আছে, বিহান টের পায়। আগে বুঝত, ভাবালুতা একধরনের বদমায়েশি। টাকা মাটি মাটি টাকা, এসেছ একা যেতে হবে একা, বিষয় রসে মজলি রে মন আসল রস বুঝলি না, জন্মদিনের বিবাস বেশে মৃত্যু তোরে নেবে এসে ইত্যাদি উদাস উক্তির পেছনে সাধারণ মানুষকে গাড়ু বানিয়ে কিছু মানুষের মালকড়ি কামানোর ধান্দা থাকে, এটা সে আজও অস্বীকার করে না। কিন্তু এখন তার কেন মনে হয় যে, শুরুর ঠিক পরবর্তী সংখ্যাটাই মানুষের চরম বিন্দু। এটা কি ব্যক্তিগত ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া? ২-এর ওপরের সংখ্যাগুলোকে সে বিদ্রূপ করতে চাইছে? সে কি মৃত্যুকে ভয় পেতে শুরু করেছে? হয়ত তা নয়। পাহাড়ে উঠলে নামতেই হয়, নইলে অসমাপ্ত থাকে ওঠা। এটা নিজের কাছে ফেরা, ফিরতেই হয়, নইলে গোটা জীবনটা বাইরে ছেঁড়াখোঁড়া পড়ে থাকে। বিহান ১ থেকে শুরু করে ১-এ ফেরার কথা ভাবেনি, ভাবা যায় না। এবার সে অদ্ভুত একটা ঘড়ির ছবি দেখতে থাকে, যার শুরু ও শেষের অন্তর্বর্তী সংকীর্ণ ফাঁক শূন্য, যেন দরজা, আর দরজার বাম প্রান্ত থেকে একটা অস্থির দিকভ্রান্ত রেখা বিক্ষিপ্ত ছোটাছুটি করে দরজার ডান প্রান্ত দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে। চিনিদিদিমার ঘড়িবাড়িটা কি দেখতে এরকম?

চিনিদিদিমার ঘড়িবাড়িতে আর যাই থাক ঘড়ি থাকতে পারে না। যে অঞ্চলের বাসিন্দাদের প্রতিটি দিন সূর্য ও তারায় বিভাজিত, যেখানে রাত্রি ছাড়া প্রহর গোনার অবকাশ নেই, সেখানে সিংহবাড়ির পেটাই ঘণ্টা যথেষ্ট। ঘণ্টা বাজার ব্যাপ্তি বুঝেই সময় অনুমানের অভ্যাস হয়ে গেছে। রাজার বিয়ে, রানীর ব্যামো, বড় ঝড়, মহামড়ক ইত্যাদি দিয়ে যারা আজীবন নিজেদের জন্মসন মনে রেখেছে, তারা ঘড়ির চুলচেরা হিসেবে মাথা খারাপ করতে যাবে কোন দুঃখে!

২০৩. চিনিদিদিমা

চিনিদিদিমার মেঘবাড়িতে সব বয়সের রোমান্টিকতা থাকতে পারে, মেঘ থাকা সম্ভব নয়। এত পরিবর্তনশীলতা, এত খেয়াল-খুশি, এত ভেসে বেড়ানো কোনো বাড়ি বরদাস্ত করতে পারে কি? এত উচ্ছ্বাস, এত প্রতারণা, এত নির্মমতা রাষ্ট্র হতে পারে, সংবিধান হতে পারে, বাড়ি নয়। তবু বিহান তৈমুর লংয়ের ছাত্র-পাঠ্য পরিচ্ছেদ থেকে মুখ তুলে মেঘবাড়ি দেখেছিল : দূর আকাশের প্রান্তে স্তরে স্তরে জমাট সাদা মেঘের মতো বাড়ি, রোদ লেগেছে সারা গায়, হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ছে গাছপালা, সরোবরের জলে ছত্রখান হয়ে যাচ্ছে সব ছায়া, পাখির ডাকের মাথামুণ্ডু নেই, যেন একটা পাগলামি পেয়েছে তাদের, পাথরের কষ্ট হয় তার ওড়া নিষিদ্ধ বলে, সে যে পাথর, তার লঘুতা থাকতে নেই, অঙ্ক স্যারেরও একইরকম কষ্ট, ফর্মুলার ভেতর তাঁকে পেতে হবে সুখ, বাইরে গেলে মস্ত গোল্লা। এটাই নিয়ম, হাওয়ায় হাওয়ায় মেঘবাড়ির চেহারা পাল্টায়, দরজা-জানালা উন্মাদ-সংশয়ী-স্বেচ্ছাচারী, এই বাড়িতে শুধু একটা ময়ূর, ময়ূরীও হতে পারে, মেঘের সিঁড়ি ও কার্নিশ ও বেদীতে ঘুরে বেড়ায়, এখানে সবকিছুই এত তাড়াতাড়ি মিলিয়ে যায় ও গড়ে ওঠে যে ময়ূর বুঝতেই পারে না সে একা। আর, ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি এলে মেঘবাড়ি আবছা হতে হতে মুছে যায়। চারদিকের গাছপালা যখন সবুজ সবুজ, মেঘবাড়ি শামাইয়ের জল হয়ে গেছে। রোমান্টিকতা একটা বড় ব্যাধি। ইহাকে চিন্তার প্যাচপেচে দশা ও ন্যাকাবোকা সর্দিমাখা গাঁড়লপনা বলা হইয়া থাকে। একদিন বিশ্বাস করেছিল বিহান। আজ বিশ্বাসের ক্ষতটা বড় জায়গা জুড়ে আছে। রেশনের মাল, স্কুল কলেজের পরীক্ষা, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ, হাসপাতাল, মহাকরণ, নির্বাচন, ট্যাক্সির ভাড়া, বাজার করা, বিধায়কের হাসি, মেয়েদের শরীর, ট্রেড ইউনিয়ন, সরকারি সাহায্য, লকআউট, বেশ্যাবৃত্তি, স্তাবকতা, ভণ্ডামি কোথাও এতটুকু রোমান্টিকতা নেই। হয়েছ কী পেছন মেরে দেবে। সুরুচি-পোশাক পরা যে লোকটাকে দেখছ ভালো ভালো কথা বলছে, বাসের ভিড়ে বা ফাঁকা জায়গায় পেলে যার-তার মাই টিপে দেয়। পকেটে পয়সা না থাকলে সুরভিত তরুণী স্তনের ছবিও পচা আলু মনে হয়। পাখির ডাক-টাক সব ভোগে। জীবনটা কঠিন লড়াই। অশিক্ষার বিরুদ্ধে লড়াই, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই, ভণ্ডামির বিরুদ্ধে লড়াই, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই, অসমতার বিরুদ্ধে লড়াই। সব ঠিক। চিনিদিদিমা ছাড়া বিহানকে প্রায় প্রত্যেকে বুঝিয়েছে। উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছে। উদাহরণগুলি চারপাশের চেনা-জানা জ্যান্ত মানুষ। কিন্তু বিহান কুপির প্রায়ান্ধকারে দিদিমার পাশে বসে গোলারুটির ভেতর দীর্ঘ চুল পেয়ে কোনো রাজকুমারীর কথা ভেবেছে। এটা কি পারভারশন ছিল। সেক্স অবসেশন? বিহান ঠিক জানে না। অস্ত্রে কাণ্ডজ্ঞানহীন জনতার ভেতর নিরস্ত্র বিহান যখন সশস্ত্র বিপ্লবের কথা বলেছে, সেটাও কি পারভারশন ছিল? কোনো অবসেশন? বিহান জানে না। শ্রেণী সংগ্রামের কথা বলতে বলতে দু হাতে লুটপাট করা আর মওকা বুঝে অধ্যাত্মমার্গী বনে যাওয়া কি পারভারশন? বিহান জানে না। রোমান্টিকতা পারভারশনের দিকে নিয়ে যায়, স্বাভাবিক ও সামাজিক জীবনযাপন থেকে বিকারের দিকে ঠেলে দেয়, ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে রিয়ালিটিকে অস্বীকার করা ও ভয় করা দুই-ই রোমান্টিকতার জোর, এসব একদিন বিহানও অন্যদের বুঝিয়েছে। প্রেমের সংজ্ঞা

অনুপম দিয়েছিল বায়ো-সেন্টো ব্রেন্ডিং। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা প্রেম নামক বোকামি বা বদমায়েশি ও বিকার অনুমোদন করে না। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা মেনেই অনুপমদের বাড়িতে বিদেশি কুকুর ছিল। স্বদেশি ঠাকুর-দেবতা প্রচুর ছিল।

বিহানের ভালো লাগে মেঘবাড়ির কথা ভাবতে। যে বাড়িতে আলো ও ছায়া সিঁড়িপথ জুড়ে থাকে, যে বাড়ির কার্নিশ গড়িয়ে রোদ ছায়ার ভেতর ঢুকে যায়, যে বাড়ির খিলানের ওপার থেকে রক্তিম আলো আসে, যে বাড়ির স্তম্ভ সরে গেলেও গম্বুজ ধসে পড়ে না, যে বাড়ির কোনো জানালা মাত্র একবার খুলে অদৃশ্য হয়ে যায়, কখনও কয়েকটি জানালা একসঙ্গে হেসে ওঠে। আর দরজা, সে তো কখনও সিঁদুর কৌটো, কখনও নীল চিঠি, কখনও মহাভারত, কখনও ব্যথাতুর যোনিমূল। মনে পড়ে, বিহান তখন একটু আধটু লেখার চেষ্টা করত, হয়নি, খরচা আছে, একটা বাড়ি ও সর্বসাধন ফেরিওলাকে নিয়ে গল্প ফেঁদেছিল। ওলাবিবিতলার ঠান্ডা জমি তখন কাঠাপিছু দেড়-দু লাখে বিক্রি হচ্ছে। ভাবা যায় না। হৃতদরিদ্র এদেশের মানুষের হাতে হঠাৎ এত পয়সা এল কীভাবে? দুর্নীতি কি এতটাই বলবান হয়ে উঠেছে যে মানুষ তার ভিত্তিতে খুশিমতন ঘরবাড়ি তৈরি করতে পারছে? কিছুকাল আগেও ওলাবিবিতলার সাপের বাসা ও ভূতপ্রেতের সংস্কার জড়ানো জমি তিন-চার হাজার টাকা কাঠার বেশি দাম পায়নি। জমির দামের ৫০-৬০ গুণ বৃদ্ধির ছাপ সাধারণ মানুষের আয়ে আছে? যদি থাকে, সেটা কীভাবে? নতুন শিল্প নেই, পুরনো যা আছে রুগ্ন, কোথাও চাকরি নেই, কর্মসংস্থান নেই, ব্যবসার হাল খারাপ। তবু কীভাবে জমির এত দাম হয়. হুড়হুড়িয়ে অবাঙালি ঢুকছে। কেন ঢুকছে? এ পোড়া বাংলা থেকে শিল্পপতিরা অন্য রাজ্যে চলে যায়, ঘরের ছেলে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়াররা ভাগ্যান্বেষণে বিদেশে বা উন্নততর প্রদেশে চলে যায়, বাঙালি বড্ড বেশি রাজনীতি করে, বাংলা ও বাঙালির গৌরবের সব জায়গা যখন নিঃশেষ হয়ে গেছে, তখনও কেন অবাঙালিরা দলে দলে আসে? যেভাবে পারে তাদের দখল বাড়িয়েই যায়? এসব প্রশ্নে সংকীর্ণ প্রাদেশিকের গন্ধ পেতে পারে কোনো দলীয় সংকীর্ণতার নাক, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার বিশ্লেষণেই এমন কিছু তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে যা ওই বাস্তবতার ধুরন্ধরদের পছন্দ নয়। আন্তর্জাতিকতার সুরচিত অলীকপ্রকাশ ঠোক্কর খেতে পারে, বিহান সর্বসাধন ফেরিওলাকে একটা পোড়ো বাড়ি পাইয়ে দিয়েছিল। গল্পের সর্বসাধন সব কিছু ফেরি করে। তার জামায় অসংখ্য পকেট, এবং সেইসব পকেটের দূর-অন্ত বিস্তার। সব রকমের লজেন্স পাবে, হাওয়াই জাহাজ পাবে, জলদস্যুদের বন্দুক পাবে, শিক্ষা পাবে, স্বাস্থ্য পাবে, গানের বই আছে, সঙ্গমের বই আছে, ন্যাসপাতি পাবে, আসল মুক্তো পাবে, বিদেশি লিপস্টিক পাবে, কচুর লতি পাবে, শ্বেতকরবীর মূল পাবে, ঝগড়া না-করা বউ পাবে, পরনারী না-দেখা স্বামী পাবে, আর কী চাই, সব সুখ দেবে সর্বসাধন। মজার ব্যাপার সর্বসাধনেরও একটা হাহাকার ছিল। সে রাণুর প্রেমে পড়ে, এটা অঘটন, কেননা প্রবাদ আছে, প্রেমে পড়লে সর্বসাধন ধীরে ধীরে তার গুণাবলি হারাবে, ক্রমে সে ব্যক্তিগত হয়ে উঠবে এবং অসুখী হবে। প্রেমে পড়ার কিছুদিনের মধ্যেই সর্বসাধম নির্জনতা খুঁজতে থাকে, নিজের সময় খুঁজতে থাকে। এই খোঁজা একটা নিজস্ব বাড়ি,

অন্তত একটা ঘরের মামুলি চতুষ্কোণে নেমে আসে। রাণুর জন্য আপসহীন নিঃসঙ্গতায় সর্বসাধন ভুলে যায় কে তাকে কালমেঘের বড়ি আনতে বলেছে, আর কে চেয়েছে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। হঠাৎই সেই প্রেমিক ওলাবিবিতলার দক্ষিণ সীমায় খুঁজে পায় পোড়ো বাড়ি। চোখের তারায় মনের অবিশ্বাস দু-হাতে মুছে সে কুতকুতিয়ে লক্ষ করে সারসার সবুজ খড়খড়ি, টানা বারান্দা, চিকের আড়াল, ফুল-পাতা কাটা লোহার রেলিং, চৌকো বাতিদান, লাল দেওয়াল, স্তব্ধতা, শূন্যতা। কিন্তু বাড়িতে ঢোকার দরজা নেই। কোথাও নেই। সিংহদুয়ার, খিড়কি দরজা কিছুই নেই। নিশ্ছিদ্র দেওয়ালের আধারে ঘরের স্তবক। এই নয় যে দেওয়াল ডিঙিয়ে ঘরে ঢোকা যাবে, এতটাই নিরাপত্তা, সর্বসাধন তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত প্রবল ইচ্ছা পুঞ্জীভূত করলে ডানার বিকাশ ঘটে ও উড়ে উড়ে সেই বাড়ির বারান্দায় পৌঁছে যায়। কিন্তু আর বেরতে পারেনি। আনন্দে ডানার ক্ষমতা হারিয়েছিল। গল্পটা লেখা হয়নি, লিখলে, বন্ধুদের পরামর্শ ছিল, সর্বসাধনের লোভ আরেকটু প্রকট করতে হবে, অপটিমিজম থাকা দরকার, যেমন রাণু তাকে উদ্ধার করেছে, এবং এটা যেন কখনোই না বোঝায় যে পার্টি সর্বসাধনকে ওপর থেকে বসিয়ে দিয়েছে।

আজ হাওয়ায় হাওয়ায় আকাশজোড়া মেঘবাড়ির বিস্তীর্ণ অভ্যন্তরে পুতুল খেলার শাড়ির মতন একটুখানি হলুদ রোদ বৃষ্টিতে ভিজে শিরীষের ডালে ঝুলে শুকোয়, গাছপালা মাঠ ছায়া জুড়ে খুশির রং সবুজ। বহুদিন পর বিহান একঝাঁক টিয়া নদীর দিকে উড়ে যেতে দেখল।

সিন্দুকবাড়ির দরজা আছে, জানালা থাকে না। ভেতরটা অন্ধকার, সুখ-শান্তি-শৃঙ্খলা-সমৃদ্ধি র কারণে। নিরেট দেওয়াল। কোনোভাবেই কেউ বাইরে থেকে বিরক্ত করতে পারবে না, এটাই সুরক্ষিত বিশ্বাস। প্রশ্ন উঠতে পারে, স্বাধীনতা নেই, গণতন্ত্র নেই? উত্তর জবাব আছে, যা পাওয়ার জন্য স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রয়োজন, সে সবই সিন্দুকবাড়িতে আছে। এভাবেই হয়ত চিনিদিদিমা সিন্দুকবাড়ির কথা বলেছিলেন। কিন্তু চিনিদিদিমা কি এতটাই পোলিটিকাল? নিজের ভাবনাপদ্ধ তিকে সন্দেহ করে বিহান। টের পায় ঘড়িবাড়ি, মেঘবাড়ি খুঁজতেও সে একইভাবে রাজনৈতিক ব্যাখ্যায় ঢুকে পড়েছে। এটা দুর্বলতা, সরলীকরণের ঝোঁক। সিন্দুকবাড়ি নিয়ে কিছু কিংবদন্তি চালু আছে বলে জানিয়েছিলেন চিনিদিদিমা। এটুকুই। সেগুলো কী, তার কোনো আভাস দিয়ে যাননি। কিংবদন্তিওয়ালা বাড়ি অনেক আছে। প্রাচীন বাড়ির কিংবদন্তি থাকবে না, এটা হয় না। বিহান শুনেছে, আদি সিংহবাড়ির প্রপিতামহী শেষ নিঃশ্বাসের আগে উত্তরাধিকারীদের জমায়েত ডেকে বলেন যে, তিনি বিবাহিত নন। যে বংশলতিকা তৈরি করা হয়েছে তাতে তিনজন সাহেবের নাম বসাতে হবে। আমার স্বামী হিসেবে পরিচিত আলেখ্যসুন্দরের নামের পাশে দ্বিতীয় বন্ধনীতে দুই সাহেবের নাম বসবে এবং আলেখ্যসুন্দরের দ্বিতীয় স্ত্রী সুধর্মার নামের পাশে তৃতীয় বন্ধনীতে এক সাহেবের নাম। আলেখ্যসুন্দরের প্রথম পুত্রবধূর নামের পাশে দ্বিতীয় বন্ধনীভুক্ত প্রথম সাহেবের নাম বসাতে

হবে। আমার গ্রন্থাগারে সীতাহরণ পালাব শেষ পৃষ্ঠায় ক্রমানুসারে তিন সাহেবের নাম লেখা আছে। প্রপিতামহীর বিবৃতিতে সিংহবাড়ির সন্তানদের পিতৃপরিচয় এলোমেলো হয়ে যায়। বিশেষত তৃতীয় সাহেবের সঙ্গে সুধর্মার সম্পর্ক সম্ভোগের না বাৎসল্যের এ বিষয়ে ঘোর তর্ক লাগে। কেলো যাকে বলে। স্বল্পকালের মধ্যে পরিবারের দুই পুরুষকে বাঘে খায়। বাঘ কীভাবে এল এ প্রশ্ন ছিলই, তবে তার চেয়ে অনেক বড় ঘটনা বাঘটি বিশাল। তার ৭ হাত ছাল ও রাজকীয় হিংস্রতার সিলমোহর স্বরূপ পেল্লায় মুণ্ডু এখনও আছে। এরকম কাহিনি তো প্রচুরই চালু যে, স্ত্রীর উপেক্ষা বা চক্রান্তে স্বামী সন্ন্যাসী হয়েছে, স্বামীর শীতলতা বা অতি-উত্তাপে স্ত্রী কৃষ্ণাশ্রয় নিয়েছে। ছাপা বই ও সিনেমা-টিনেমায় এইসব কাহিনি নানাভাবে পাওয়া যায়, মধ্যবিত্তের আলস্য উপাদেয় হয়। যে বাড়ি যত প্রাচীন, তার কিংবদন্তি তত বেশি, যে বাড়ি যত বড়, তার কেচ্ছার বাঁক তত জটিল, এসব কথা হয়ত প্রাজ্ঞজন বহু আগেই বলে গেছেন।

সিন্দুকবাড়ি সম্পর্কে, বিহানের মনে হয়, অন্যরকম কিংবদন্তি আছে। সিন্দুক শব্দটির আবহে আছে সঞ্চয়, গোপনীয়তা, অর্থকৌলীন্য, লোভ, ঔদ্ধত্য, অন্যায়, অবিশ্বাস। সিন্দুকে শুধু টাকা থাকে না, অন্যের সোনা থাকে, জমি থাকে, জাল কাগজ থাকে, মিথ্যে হিসেব থাকে। এজন্য সিন্দুক খুব ভারী হয়। বিহান দেখেছে, পয়লা বৈশাখের আগে জগৎ স্যাঁকরার ছোট্ট সিন্দুকটা নড়াতে দুটো লোকের দম ছুটে যেত। কোনো পরিবারে একবার সিন্দুক বসানোর পর নাকি নড়ানো যায়নি, ক্রমে স্থাপিত হয়ে গেছে। সিন্দুকের ওজন ও আয়তন নাকি প্রাচীনতা ও কৌলীন্যের মাত্রা। চিনিদিদিমা কি এই অর্থেই সিন্দুকবাড়ি বুঝিয়েছিলেন? বিহানের চিন্তায় তড়িৎ-স্ফুরণের মতো একটি তথ্য সর্বব্যাপী হয়। সিন্দুকের দরজা বাইরে থেকে খোলা যায়, ভেতর থেকে যায় না। ভেতরে যারা থাকে তারা খোলার কথা ভাবতেই পারে না। কিন্তু তাতে কী হল? এরকম অনেক কিছুই আছে যা শুধু বাইরে থেকে খোলা যায়। শিশি, বোতল, কৌটো, বাক্স, ট্রাঙ্ক, স্যুটকেস। জেলখানার সেলও বাইরের দিক থেকে আটকানো হয়। তবে তফাত আছে, এসব দরজা বা ঢাকনা কোনোটাই সিন্দুকের মতো ভারী নয়। সিন্দুকের দরজা খুব ভারি হয়। মজার ব্যাপার, বিহান সেই থেকে সিন্দুকের পাল্লাকে দরজা ভাবছে। একসঙ্গে তার মাথায় দুটো আয়তন পারস্পরিক হয়ে কাজ করছে। সিন্দুক ও বাড়ি। চিনিদিদিমা কি অত্যন্ত ভারী দরজাওয়ালা বাড়ির কথা বলেছেন? যা বাইরে থেকে খুলতে হয়, যে দরজা কিংবদন্তির ওজনে ভারী? যে কিংবদন্তি গৌরব সূচিত করে, তার ওজন অপেক্ষাকৃত বেশি ভারী হয়। অনিন্দ্যকান্তি রূপ, বিদেশে বিদ্যার্জন, বহুতর বিদেশ ভ্রমণ, কলানুরাগ, দানধ্যান, ধার্মিকতা, আন্দোলনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগ, বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ, শাসক শ্রেণীর সঙ্গে সদ্ভাব ইত্যাদি এই পর্যায়ে পড়ে। এই প্রতিটি বিষয়েরই আখ্যান বা উপাখ্যান পাওয়া যায়। এইসব আখ্যান-উপাখ্যানের কাছে সাধারণ মানুষ বিনত হয়। আখ্যান-উপাখ্যান দিয়েই বাড়িটি চিনতে হয়, জানতে হয়, বাড়ির অন্তরঙ্গ হতে হয় এবং বাড়িতে ঢুকতে হয়। ক্ষোভ থাকলেও সিন্দুকের সামনে মানুষ বিনয়ী, প্রার্থী। সিন্দুকের ভেতবে থাকে অন্ধকার, থাকে হিম, আর সব কিছুই উত্তেজনাহীন, আলোড়নহীন, পরিপাটি, স্তরে স্তরে সাজানো,

সংগ্রামের ঐতিহ্যে ভারী, কারও কৃষক আন্দোলনের, কারও পরোপচিকীর্ষার বৃত্তান্তে। বিহানের মনে হয়, চিনিদিদিমা প্রতিষ্ঠানের কথা বলেছেন।

শামাইয়ের পেটে স্নিকার পায়ে সুন্দর মাঝি বাড়িটা দেখিয়ে দিল, ওই তো এখেনে। চোখের মাথায় কি নিশেন উড়িয়েছ যে নিজেকে ছাড়া দেকতে পাও না? তা কেমন থাকা হচ্ছে? সুন্দর এখন ভিনরাজ্য থেকে মাছ এনে এলাকার বড় বড় হোটেলে সাপ্লাই দেয়। মরা নদীর পাড়ে পর্যটনের হাট খুলছে। ব্যবসার কাছে প্রায়ই সদরে যায় সুন্দর। নিজেই জানাল, সদরে ফ্ল্যাট কিনেছে। একটা মেয়েমানুষ রেখেছে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য। সুন্দর এখন বড়-মানুষদেরও সালাম পায়। ডুবির চড়ায় হোটেল বানানোর কথা ভাবছে। ওকানে অ্যাতো মালের ভাঁটি হল যে পরিবেশ বাঁচানোর কর্মসূচি নাই। ই শালার দ্যাশ বটে, নদীর জলে টান পড়ে, মালের জল সরকার জোগায়।

বাড়িটা একদমই খোলামেলা। আকাশ থেকে মেঝের ফাটলে সাপের খোলস দেখা যায়। কুলুঙ্গিতে মরা চামচিকে ও বটতলার ধর্মপুস্তকের গায়ে বৃষ্টি ও জ্যোৎস্না লাগে। জানালা-দরজা এখানে ওখানে পড়ে আছে। খেজুর গাছে কব্জা অটকে ঝুলছে পোড়া পাল্লা। খরখরে পাতাওয়ালা বুনো গাছের ডালে জড়ানের সুতো এ-ঘর ও-ঘর পেরিয়ে কোথায় থেমেছে কে জানে। বারান্দা থেকে বাঁদিকের ঘরে ঢোকার মুখে বিশাল উইঢিবি। পাঁচটা ইটের ঠেকনায় ল্যাংড়া খাট। আধখানা নিপুণ বিছানা, আধখানা প্রকাশ্য পাঁজর। বালিশের পাশে পেতলের পানের বাটা, চন্দ্রাবলী জাঁতি, জর্দার কৌটো, খোপার কাঁটা। ডানদিকের ঘরের উই-খাওয়া দরজায় জম্পেশ তালা। চাবির ফুটো ঢাকনা-দেওয়া। দেওয়ালে মস্ত ফোঁকর। কুঁজো হয়ে পাশের ঘরে ডিঙোনো যায়। বারান্দার বেশির ভাগটাই জঙ্গল। থাম ফাটিয়ে বট উঠেছে। শিকড়ের কঠোর বিনুনির ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে ইট। বারান্দা থেকে উঠোনে নামলে শিরশির ঝোপঝাড়। এদিক সেদিক তাকালে আরও কিছু ভাঙা দেওয়াল, হেলে-পড়া ফোয়ারা, মুণ্ডুহীন মায়ের কোলে হাত-পা-কাটা শিশু এবং অবলুপ্ত দ্বিতলের ছায়া।

এতদিনে তবে এলে।

যেন বহুকাল আগেই আসার কথা ছিল বিহানের। কথা দিয়ে আসেনি। যেন আসা নিয়ে টানাপোড়েন চলেছে। না আসায় কেউ কষ্ট পেয়েছে। যেন বিহান আগে এলে ছবিটা অন্যরকম হতে পারত। না-আসার বেদনা ও অবশেষে আসার মলিন সুখ জড়ানো ছিল সেই স্বরে।

ভাঙা পাঁচিলের গায়ে দাঁড়ানো শামাইয়ের শুষ্ক শূন্য জীর্ণ একটুকরো বুকের দিকে তাকিয়ে থাকে বিহান। মনে হয়, সত্যি তার আসার কথা ছিল। এ বাড়ি তার চেনা নয়, অচেনাও নয়। এই বাড়িতেই তার নিকট আত্মীয় থাকতে পারেন। এই বাড়ি হতে পারে তার ভালোবাসা। কেউ কোনোদিন তাকে চায়নি, ডাকেনি, কেউ খেয়ালই করেনি তার একা থাকা। প্রাচীন দুর্গের পরিত্যক্ত কামানের বুকের মতো স্তব্ধতায় সেই স্বর বারুদ ও আগুনের বেতাল

খেলা নিয়ে এগিয়ে আসে। ঝোপ থেকে উঠে একটা ছায়া দূরে কোথায় মিলিয়ে যায়। রোদের মটরদানা পাতার ফাঁকে ছোটাছুটি করে। সেই অবাধ সুতোর ওপর হাওয়ার কাটা আঙুল একতারা বাজিয়ে যায়।

এত অভিমানী তুমি, নিজেরও সর্বনাশ করে দিতে পার?

স্বরটা চেনা নয়, অচেনাও নয়। কিন্তু এভাবে কেউ তাকে কখনও বলেনি। বলতেই পারত। এতটাই ঠিক সে-কথা যে বিহান তার অভিমানের স্বীকৃতি পেয়ে অনেক কষ্ট, অনেক বঞ্চনা, ন্যায্য পাওনা, মৌলিক অধিকার ভুলে থাকতে পারত।

তুমি খাটে বোসো। দুটো চিঁড়ে ভেজে দিই। পা তুলে বোসো। মেঝেয় সাপের বাসা আছে।

অনেক কাল পরে কারও কথা শুনে চলতে বিহানের ভালো লাগে। সে খাটে বসে। দেখতে পায় একটা কাপড়ের পুঁটুলি দূরে ঝোপের ভেতর ঢুকে গেল।

খানিকক্ষণ কথাবার্তা নেই। পাতলা নীলাভ ধোঁয়া বাতাসের টানে নদীর দিকে যেতে দেখে বিহান। ভাগাড়ে লাশ পড়ার আগে শান্তি ও স্তব্ধতা শকুনের ডানায় যেভাবে হঠাৎ হঠাৎ বিঘ্নিত হয়, ঠিক সেভাবেই এখানে অতিকায় জীবের পাঞ্জার মতো নড়ে ওঠে পাতা, খা খা খা রবে উড়ে গেল হাড়গিলা। ভূপাতিত দরজার কড়ার ওপর দাঁড়িয়ে ঠকঠক ঘাড় নাড়ে গিরগিটি।

মাসিমা কেমন আছে? ঝোপ থেকে জানতে চাওয়া হয়।

নেই। বিহান জানায়।

মেসোমশাই?

নেই।

রাঙাদা?

নেই।

নয়নখুড়ো?

চোখ গেছে।

সুধা মাসি?

এবার যাবে।

সাধনমাস্টার?

বদ্ধ উন্মাদ।

সুধন্যদর্জি?

রেলে গলা দিয়েছে।

আবার চুপচাপ। বিহানের চোখে পড়ে, দেওয়ালের গায়ে চুল বাঁধার ফিতে উড়ছে। মৌলিক লাল।

২০৯. চিনিদিদিমা

বিহান জানতে চায়, বাড়ি এবার কতটা সরেছে?

জবাব আসে, মড়া ছুঁয়ে বসে আছে। পোড়া শেষ হলেই নিজেও ফুরোবে। সহমরণে বিশ্বাসী। বড্ড ভালোবাসে যে।

জল কি থাকেই না?

বিহান, রানীবালাকে মনে আছে? সেই সাগরকূলের নাইয়া, ও মাঝি, অপরবেলায় ....

তুমি রানীবালা নও।

ঝোপ থেকে একটা সাদা লম্বা কাপড়ের পুঁটুলি উঠে দাঁড়ায়। না গো। ওকে চিনি। ও কী করে এত ভালোবাসে! নির্জলা দেশে মাঝি চাওয়া যে পাপ, ও জানে না?

বিহান দেখে, বারান্দার ভাঙা রেলিং গলে, বুনো গাছের পাঞ্জা এড়িয়ে ভূতপূর্ব জানালার পাশে দাঁড়াল আগাপাশতলা কাপড়-মোড়া যেন পথ-দুর্ঘটনার মড়া।

খাটের ওপর বিহান পানের বাটা, জর্দার কৌটো দেখে।

রানীবালাকে তুমি ভয় পাও?

বিহান বলে, পাই। আর কোনো মিথ্যেয় বাঁচতে চাই না।

কাপড়ের পুঁটুলিতে দু-একটা লজ্জার ভাঁজ পড়ে। দু-একটা সৌন্দর্যের ভাঁজ। দু-একটা শারীরিক ভাঁজ। ভেতর থেকে কাপড়ের পরত যে খুলছে! সেই আলোড়নে ফুটে ওঠে গ্রীবা, চিবুক, স্তনের রেখা।

বিহান বলে, চিনিদিদিমা, কেন এত ভালোবাসা শেখাও?

ভালো থেকো

তোর কপাল জ্বালা করছিল। আমরা মজা পাচ্ছিলাম। গম্ভীর মুখে বসেছিল হীরেন, নিখিল, সত্য, যে আমাদের পয়সা ডবলের জাদু দেখাত, আর রেল কোয়ার্টারের সেই ডবল ফুসফুসের সাঁতারু পার্থ, মনে আছে, ক্লাসে আমরা এই পাঁচজন। টিফিন ফুরনোর ফার্স্ট বেল বাজল। আমরা তোকে তাড়াতাড়ি হাত চালাতে বললাম। ভগবান দেখবি বলে দুই ভুরুর মাঝখানে তখনও তুই আঙুল ঘষছিস। সত্য বলল, জাস্ট ইঞ্চে স্ টু রিচ ইয়োর প্রেয়ার। তোর বন্ধ চোখ থেকে জল গড়াচ্ছে। হীরেন বলল, ভগবান নামছেন। আ লিটল মোর ডেডিকেশন। তুই পারবি। পার্থ বলেছিল, তোকে পারতেই হবে। আরেকটু জোরে রাব্ কর। তোর মুখে তীব্র যন্ত্রণা আমরা দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি, কপালের ছাল উঠে গেছে। আমাদের তুই-ই সেরা, বিহান আমি বলি, হালকা কোনো ছায়া দেখতে পাচ্ছ? কোনো দাড়িওলা মুখ? এত কষ্ট বৃথা যেতে পারে না, বিহান। জটাওলা কোনো মাথা? কিংবা কালো আলখাল্লা? তুই বললি, আমি আর পারছি না। ভীষণ জ্বলছে। তবু তুই চোখ খুলিসনি। আমি বললাম, নিজের কষ্ট ভুলে যা। তোর সরলতা, তোর ভক্তি এই ক্লাসরুমে ঈশ্বর নামাবেই। তুই আমাদের গর্ব। হীরেন বলল, ইউ রিচ্‌ড্ দা ফাইনাল মোমেন্ট। বেল রিংস্। গড ডিসেন্ড্‌স্। সিঁড়ি ভেঙে ছেলেরা উঠে আসছে। শেষ ঘণ্টা বাজিয়ে দিল বিপিনদা। আমরা প্রশ্ন করি, তুমি কী দেখছ বিহান? তুই জবাব দিলি, অন্ধকার। আমরা বলেছিলাম, জাস্ট ওয়েট। আমরা দেখতে পাচ্ছি। ছাদ ফুঁড়ে দুটো সাদা পা নেমে আসছে। করিডরে ছেলেদের কথাবার্তা স্পষ্ট হতেই আমি তোর ওপর ঝুঁকে পড়ে বলি, আঙুল সরিয়ে নে। তোর চামড়া উঠে যাওয়া কপালের লাল জায়গাটা আমার বুড়ো আঙুল দিয়ে সমস্ত জোরে ঘষে দিলাম। রক্তে আঙুল পিছলে গেল।

শোভন থামে। হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসেছিল বিহান।

দীপা হিসহিসিয়ে বলে, তুমি এত বোকা!

খানিক বাদে বিহান বলে, শোভন, তুমি আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলে। বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলে। এক সপ্তাহ তোমাকে সাসপেন্ড করা হয়। তুমি কারও নাম বলোনি।

বিহানকে থামিয়ে দীপা একইভাবে শোভনকে, তুমি এত হিংস্র। ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে শোভন গান গায়। উই শ্যাল ওভারকাম সামডে, ও ও ও ডিপ ইন মাই হার্ট .....। হাসতে হাসতে গড়াতে থাকে।

এখন দিনাবসানের আলো। দূরে দূরে গাছ। পাখিদের দ্বীপপুঞ্জে মুখরতা, শূন্যে দলবদ্ধ ওড়াউড়ি, এখানে বাংলোর বাইরে অসীম শান্তি পুষ্পিত হয়ে আছে, দক্ষিণ আকাশে পাহাড়ের রেখা, পৃথিবীর কিছু উদাসীনতা জমাট বেঁধেছে, সবুজ মাঠের উপর অবসবপ্রাপ্ত পাতারা নেচে বেড়ায়, নিজস্ব গাছের সঙ্গে তাদের আর সংলাপ নেই। এখানে এমন কিছু কথা বেরিয়ে যায় যা অনেকদিন বলতে চাওয়া হয়নি, কিংবা এটাও হতে পারে, চাওয়া হল বলেই জায়গাটা এত ভালো।

দীপা ও শোভন এটুকুই মনে করতে পারে গত বিকেলে তারা তিনজন কী করেছিল। এভাবেই যে মনে পড়ে তা নয়। স্মৃতির বিবরণে মনের নিজস্ব চলনের ছায়া যে পড়েই।

দীপার মনে পড়ে : শোভন আসার আগে একটা দলছুট সময় সে কাটিয়েছিল, বিহানের সঙ্গে। দৃশ্যত চুপচাপ বসে ছিল বিহান।

দীপা জিজ্ঞাসা করে, আপনি এত তর্ক করেন কেন?

ঘাসের রং-লাগা চোখেই বিহান জবাব দেয়, আমি যে প্রার্থী নই। আমার দাঁত কারও জুতোর ফিতে ছোঁয়নি।

তাহলে আপনি এলেন কেন? অন্যদের দাঁত মেজে দিতে, নাকি সততার খালি পেটের ঢেকুর তুলতে?

পুরনো শোভনের ভগ্নাবশেষ আছে কিনা জানতে লোভ হল।

কী লাভ!

তাই! কৃষিবিপ্লবের হাঁকদাররা জমিখোর-ভেড়িখোর হয়ে গেছে। সশস্ত্র বিপ্লবের ইজারাদাররা নানাধরনের দুর্বৃত্ত হয়েছে। মহাকরণ-থানা-বিশ্ববিদ্যালয়-পঞ্চায়েত তক্ দখল করে আরও একটা পার্টি প্রতারকের ভূমিকায় দেখা দিল। সমাজবদলের বইপত্তর এখন আর পুজোয়ও বিক্রি হয় না।

এইসব বাস্তবতার মধ্যে আরও অনেকের সঙ্গে দীপাদের বেঁচে থাকতে হয়। তারা জানেই না অন্যরকম বাস্তব কী হতে পারত। কীভাবে মানুষ এর চেয়ে ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারে। বিহানকে সে বলে, আপনি বড্ড রাজনীতি করেন। সকালে সীতেশবাবুকে চটিয়ে দিলেন। ঝগড়া করে সেই যে খিল তুলল, এখনও খোলেনি। ট্যুরটা মাটি করার জন্যে অমিত আপনাকে যাচ্ছেতাই বলেছে।

দীপার কথা যেন শুনতেই পায়নি, বিহান বলে, তুমি তখন সম্ভবত খুব ছোট, একদল যুবক-তরুণ নতুন সমাজ গঠনের যে স্বপ্ন দেখে তাতে দেহোপজীবিনীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। শুধু সামাজিক স্বীকৃতির দাক্ষিণ্যে বেঁচে থাকা নয়, পৃথিবীর আদিম জীবিকা থেকে বেরিয়ে এসে এইসব মেয়ে সামাজিক উৎপাদনে অংশ নিয়ে মানুষের মন নতুন ভাবে গড়তে সাহায্য করবে। ফাজলেমি মনে হচ্ছে কি তোমার? আমারও মনে হয়। আমাদের যাঁরা এসব বলেছিলেন, তাঁরা জানতেন না কীভাবে হবে! আমরা প্রশ্ন করিনি, করলে দু-একটা দেশ ও দু-চারজন বড়

মানুষের নাম শুনতে পেতাম। আজ সেইসব শিক্ষকদেরই শাসনকালে তোমাকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে নিজের মাংস দিয়ে-থুয়ে।

শেষটা ভালোভাবে নিতে পারেনি দীপা, বলেছিল, কথা বলতে জানেন না, ছিঃ।

বিহান বলে, তোমাকে আঘাত করতে চাইনি, দীপা! তোমার অপমানে আমার মান বাড়ে না। সত্যিটা তো স্বীকার করতেই হবে। মোসাহেব প্রচুর আছে। ইতিহাসের নৃশংসতম শাসকেরও মোসাহেবের অভাব হয়নি। আমার জীবিকা তোমার চেয়ে ভিন্ন নয়, কিন্তু তাই বলে বিরোধিতা করব না?

দীপা বুঝতে পারে, বিহানের আক্রমণ ব্যক্তিগত নয়। সে প্রশ্ন করে, কী করা যায় বলুন? প্রত্যেকে ভালোভাবে বাঁচতে চায়। একটা জীবনে বারবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যায় না। বারবার ভুল করে সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকা অসম্ভব।

বিহান জিজ্ঞাসা করে, বাঁচা সম্পর্কে তোমাদের ভাবনাটা ঠিক কী?

দীপা জানায়, অত কিছু আমি বুঝি না। আমার ভাইয়ের একটা চাকরি দরকার ছিল। কবে দাদামশায় উদ্বাস্তু কলোনির নেতা, বাবা শ্রমিক নেতা ছিলেন, কিন্তু আমাদের বাড়িটাই ছিল পাড়ার সবচেয়ে দুঃস্থ। ভগবান আমাকে রূপ দিয়েছেন। ব্যবহার করলাম। সব হয়ে গেল। প্রতিবেশীর সঙ্গে টক্কর দিয়ে চলা যায়। ভালো থাকা মানে কি গরিব হয়ে বাঁচা, অপমানিত হয়ে বাঁচা? আমার বরটা বোকা আর জেদি। আমাদের ঊর্মিদি, মানে নারী সমিতির বেগমসাহেবা, পার্টির রাজ্য কমিটির সঙ্গে শুয়ে-বসে সল্ট লেকে নার্সিংহোম করবে বলে জলের দরে কুড়ি কাঠা জমি বের করে নিল। তা কী ক্ষতি হল ঊর্মিদির? ন্যায়নীতি নিয়ে তার স্বামী তো তাকে কাঠি করেনি। না খেয়ে, চিকিৎসা না পেয়ে মৃত্যুর পাকা ব্যবস্থা যারা করতে চায় করুক, আমি সেই বোকাদের সঙ্গে নেই।

দীপা মনে করতে পারে, বিহান ওর দিকে তাকিয়েছিল। কিছু বলেনি। দীপাই বলেছিল, ভুল-বিলাস তোমাদের মানায়, বিহান। ইচ্ছে করেই 'তুমি' বলে দীপা। বিহানকে আক্রমণ করার এটাও একটা অস্ত্র। বিহান তাকে অবজ্ঞা করেছে। লাইনের মেয়েদের দলে ফেলেছে। ভুল-বিলাস থেকে তোমরা আত্মহত্যার আনন্দ পাও। কেউ যদি জীবনটাকে ভালোবাসে তাকে দোষ দেবে?

নিরুত্তর বিহানের কাছে সরে দীপা। তোমারও কি ইচ্ছে করে না? এখানে নদী নেই, নৌকা নেই। তবু কি আমরা ভাসতে পারি না, বিহান? চাইলেই পারি। চাওয়াটাই বড়।

সে-সময় দূর থেকে চিৎকার করে উঠেছিল শোভন, মারছে! বিহানটা আলুবাজি করতাছে! কাইল রাতে আইসক্রিম হইয়া কাটাইলা ক্যান? রিয়েলি বিহান, ইউ আর পুয়োর অ্যান্ড উইক। আই কান্ট বাট ফিল ফর ইউ।

দীপা এ পর্যন্ত মনে করতে পারে, যা হুবহু এরকম হয়ত নয়, সময় ও বুদ্ধি কিছু মুছে তো দেবেই।

২১৩. ভালো থেকো

বিহান সম্পর্কে অদিতির জমাট ধারণা নেই। লোকটা এদের সঙ্গে এসেছিল। শোভনের ছেলেবেলার বন্ধু বলে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। কথাবার্তা হয়নি বললেই চলে। সীতেশের সঙ্গে ঝগড়া হয়। এরপর সীতেশ বিহান সম্পর্কে কয়েকটা মন্তব্য করে, যা বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কোনোটাই করার প্রয়োজন বোধ করেনি অদিতি। মাঝরাতে সবাই মিলে যখন শিকারে যাওয়া হল, যতদূর মনে পড়ে, প্ল্যানটা দীপার, ও নাকি শুনেছে ঝরনার জল খেতে আসে হরিণ, এবং এই ঝুপঝুপ জ্যোৎস্নায়, শব্দটাও দীপার, জ্যোৎস্না যেন বৃষ্টি, হরিণ না এসে পারে না। 'শোভন, আমাকে হরিণ দিতে হবে' বলে এমন গা ঘষতে লাগল যে যেতেই হল সবাইকে দল বেঁধে শিকারে। ঝরনাটা আদৌ আছে কি নেই কেউই তা ঠিক জানে না। চৌকিদার নাকি দুপুরে দীপাকে বলেছিল। এই চৌকিদারের অস্তিত্বটাও রহস্যময়। সন্ধে নাগাদ ওরা বাংলোয় পৌঁছলে চৌকিদার সব ঘরের দরজা জানালা খুলে দেয়। বিদ্যুৎ ছিল না। হ্যারিকেন জ্বেলে দিয়ে দেওয়ালে ছায়া হেঁটে সে অন্ধকার হয়ে যায়। বলে, বাবুরা দরকার পেলেই ডাকবেন। রাতে ডাইনিং রুমে খাবার সাজানো ছিল। চৌকিদার ছিল না। দিনমানে চৌকিদারকে অদিতি দেখেনি। দেখলে অন্তত ওর একটা আবছা চেহারা অনুমান করতে পারত। আজ দুপুরে তাদের ঘরের দরজায় যে দুমদুম ধাক্কা মেরেছিল, সবাই বলছে, সেটা চৌকিদার, অদিতির কিছু মনে পড়ে না। এই চৌকিদারের চেয়ে সামান্য বেশি স্পষ্ট বিহান। অদিতি মনে করতে পারে, হরিণ শিকারে বিহান হাঁটছে, শিকার-সঙ্গীত গাইছে। সবার পেছনে, একা।

প্রয়োজনের খাতিরে আরও মনে করতে হয় এবং কয়েকটা মুহূর্ত উঠে আসে যা এভাবেই টুকরো যে জোড়া দিলে ফোঁকর থেকে যায়।

১. বিহানের পরনে ছিল ব্লু জিনস। হোয়াইট শার্ট। কভার্ড বুক পকেট দুটো। বাঁ পকেটে কোনাকুনি পড়ে ছিল কলম।

২. টুথব্রাশ কিনতে গাড়ি থেকে নেমেছে। পায়ের টোকায় সরিয়ে দিল কলার খোসা।

৩. চায়ের গ্লাস নামিয়ে কারও ঠিকানা লিখে নিল শোভনের কাছ থেকে।

৪. সীতেশকে বলে, অনাথ দত্তকে চেনেন? ট্রেড ইউনিয়ন করার দায়ে যাঁকে নুলো করে দেওয়া হয়।

৫. গড়ানদহের কালীবাড়ি যায়নি। শোভনের গাড়ির পেছনের সিটে শুয়ে ঘুমোল।

৬. অমিতের সঙ্গে ঝগড়া করছে।

৭. বাংলোর গেটে দুটো ফুল গুঁজে দিল।

৮. অন্ধকার বারান্দায় একা বসে আছে। অদিতি যেন কথা বলার যোগ্য নয়।

৯. সীতেশকে বলে, রুগ্ন কারখানার জমি বেচে ইউনিয়ন লিডাররা কত কমিশন পায়?

১০. ডাইনিং টেবিলে কয়েক ফোঁটা জল ফেলে টুথপিক দিয়ে লিখল বি বি।

১১. দীপাকে বলল, সীতেশবাবুরা গানকে ভয় পান।

১২. মদ খেতে খেতে কোনো এক দিলীপের কাটা পাঞ্জার কথা বলেছে।

বিহান সম্পর্কে এ ছাড়া অদিতি যা জানে, তা সীতেশের ভয়-ধরানো ডায়ালগ। যেমন, বুকে পা দিয়ে লতি ফাঁক করে ষোলো ইঞ্চি ভরে দেব। অত্যাচারটা অস্পষ্ট বলেই যেন আরও ভয়াবহ। রুগ্ন ও বন্ধ কারখানার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ইউনিয়ন নেতাদের সমৃদ্ধি বাড়ছে এ ধরনের মন্তব্য করেছিল বিহান। মন্তব্যে মিথ্যে নেই, অদিতি জানে। সবাই জানে। কিন্তু আপত্তি এখানেই যে বেড়াতে এসে এসব বলা কেন? দু-রাতের জন্য ফুর্তি করতে আসা। শোভন-সীতেশ-অমিত দুটো মেয়েমানুষ নিয়ে এসেছে। দীপা ও অদিতির কিছু বাধ্যতা আছে। দুজনেই যে স্থিতিশীলতা ও মর্যাদা পেয়েছে, তা এদেরই দয়ায়। সুতরাং এখানে যা হবে, সেটা জেনেই আসা। বিহান এই দলে দুখিয়া হয়ে এল কেন? অদিতির কাপড়-চোপড় খুলতে খুলতে সীতেশ শোভনের পেটি-বুর্জোয়া মেন্টালিটির বাপান্ত করে, বলে যে, চাঁদা তুলে কারখানা চালানো যায় না, মড়া পোড়ানো যেতে পারে, এবং একটা তীব্র ক্রোধ ও অপমান ও হতাশা সীতেশের মধ্যে যে বিকারগ্রস্ততা সৃষ্টি করে, তার মোকাবিলা অদিতি করতে পারেনি, সে শুধু যন্ত্রণায় কয়েকবার চিৎকার করেছিল, আর কিছু মনে নেই।

ট্যুরের স্পনসর জুটিয়েছিল অমিত। মানুষের মধ্যে ঈশ্বরত্ব উদ্বোধনের বিজ্ঞাপন দেয় যারা, সেই দ্রুত উন্নয়নশীল ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী কোম্পানি, যার মালিককে বিরোধী দলের এক নেতা 'সরকারের কুনকি হাতি' বলে থাকেন, তারাই সব ব্যবস্থা করে দেয়। শোভনের সঙ্গে চলা অমিতের আদর্শগত দায়। সে আদর্শে রাজনীতি নেই, আছে ব্যক্তি-সম্পর্ক, আছে কৃতজ্ঞতা। 'নবজীবনের গান' নামে যে বিরাট জলসা হল স্টেডিয়ামে, স্বদেশি যুগের লোকজনও পিঠ-খোলা নাচ দেখতে হামলে পড়েছিল, যে-অনুষ্ঠান শোভনের পোলিটিকাল কেরিয়ারে ব্রেক থ্রু, গোঁড়ারা শোভনকে প্রায় ফিনিশ করে দিয়েছিল, সেই জলসার টিকিট ব্ল্যাক করে অমিত। শোভনই সুযোগটা দেয়। কোনো স্কুলে আর মাস্টারি নেই, সুতি-খাদি-কালচারাদি সব ঠেসে গেছে, অমিত দু-মাস চরকি-হাঁটার পর মাত্র ৬ দিনে ২৫ হাজার টাকা রোজগার করে। ভাবা যায়! শোভন বলেছিল, বাজে খরচ করিস না। মায়ের চিকিৎসা করা, বোনের নামে ফিক্সড্ করে দে। আজ যারা মক্কায় ভিক্ষে করতে অন্ধ-পঙ্গু-বাচ্চা পাঠায়, তারাও অমিতকে বাড়িতে টাকা দিয়ে যায়। এতটাই সে নিজেকে ছড়াতে পেরেছে। শোভনের প্রতি কৃতজ্ঞতা তার সব স্মৃতির কথামুখ হয়ে আছে। সেই অমিতও শোভনদার বন্ধু বিহানের উপর চটেছিল। তোমার বন্ধু না হলে মালটাকে কখন নামিয়ে দিতাম। তোমার কনট্রিবিউশন নিয়ে মজাকি করে! কী করে যে অ্যালাউ করো?

অফিস থেকে বিহানকে আনতে গিয়েছিল অমিত। শোভনদার নির্দেশ, বেশি কথা বলবি না, অন্যরকম লোক। চটে গেলে আসবেই না। অমিতের অভিজ্ঞতায়, পার্টির লোকজনকে ট্যাক্‌ল করার একটা সুবিধা আছে, তা চরম বিরোধী পার্টির হলেও, তর্ক করে না, বুঝে নেয়, ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়, এমন কথা কখনোই হয় না যা পরে অস্বীকার করা যায় না, সব কথাই ক্যাজুয়াল অ্যান্ড হার্মলেস, আসলে মঞ্চে যা যা বলা হয়, উষ্ণ পরিবেশে সে সব ভুলেও কেউ তোলে না। কিন্তু বিহান কোনো পার্টিতে নেই।

২১৫. ভালো থেকো

ঝাড়া দু-ঘণ্টা অফিসের রিসেপশনে বসিয়ে রেখে মালটা এল। তারপর বাহানা কিনা আমি যাব না। অমিত বলেছিল, সে কি হয়, বিহানদা? দরকার হলে আপনাকে তোলা হবে। শোভনদার কাছে কথার খেলাপ করা যাবে না। অসুবিধে হচ্ছিল অমিতের, এভাবে সে কথা বলে না। কত কার্যকরভাবে সে বলতে পারে, উঠে পড়ো বদ্‌না। হাড়ে লাগবে। ফলা চুলকে দেবে। তাকে বলতে হল, একবার হাজির হয়ে শোভনদার রাগ থেকে আমাকে বাঁচিয়ে বাড়ি ফিরবেন, এর বেশি কিছু আমার বলার নেই। গালাগাল ছাড়া এতটা লম্বা বাক্য বলে ফেলার পর অমিত বিস্মিত হয়। সে-ও পারে!

বিহান জিজ্ঞাসা করে, কী নাম তোমার?

অমিত জানায়, অমিতাভ।

ফের বিহান, পদবি?

অমিতাভ বলে, বসু।

এক মিনিট ঘন চোখে অমিতের পা থেকে মাথা শুঁকে বিহান বলেছিল, তুমিই সেই বিখ্যাত অমিত বসু! ভেড়ি-মাফিয়ারা আধমরা করে ফেলে রেখেছিল! বাইপাসে রিসর্টগুলো থেকে মাসোহারা নাও! বিজয়া কটনে ধর্মঘট ভাঙতে গিয়েছিলে! তুমি 'সংস্কৃতির অন্যধারা'র সম্পাদকমণ্ডলীতে আছ তো! তৈরি ছেলে! তোমাদের সঙ্গে যেতেই হচ্ছে।

মাথার ভেতর শিরার শিরায় যখন আগুন দাপায়, জৈবিক নিয়মে হাত-পা বরফ করে বসে থাকা যায় না। কিন্তু শোভনদার মুখ অমিতের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া জ্যাম করে দেয়। গাড়ি থেকে নেমেই শোভনকে বিহান বলেছিল, কুড়ি বছরে কতটা সমাজবিরোধী হয়েছ দেখতে এলাম।

অমিতের চোখের দিকে একবার তাকিয়েই শোভন তাকে সরে যাওয়ার ইশারা দেয়।

লোকটা সম্পর্কে অমিত আর যা মনে করতে পারে তা হল, লোকটাকে বেঁচে থাকতে দেওয়া। শোভনদা যখন লোকটাকে গাড়িতে তার পাশে ডেকে নেয়, অমিত নেমে যায়। বাংলোয় লোকটার সঙ্গে এক ঘরে থাকতে বলেছিল শোভনদা। অমিত সরাসরি অস্বীকার করে।

সীতেশ বিহানকে আগে দেখেনি। ওর কাজকর্ম সম্পর্কে শুনেছে। একবার জয়দুর্গা কটনে ইউনিয়ন করতে যায়। কলেজের ছেলেপুলে এনে কারখানায় গেট মিটিং করে। কাগজের অফিসে ওকে-তাকে ধরে দু-লাইন খবর ছাপে। তাতে কী হল? ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর শ্রমিকরা কখনও ভরসা রাখে? অর্থনৈতিক অবস্থান থেকেই সেটা সম্ভব নয়। বিহানকে সীতেশ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছিল, ছাত্রদের মধ্যে একটা কেরিয়ারিস্ট ঝোঁক থাকেই। ইন প্র্যাকটিকাল পোজিশন ওরা কখনোই ডিক্লাসড্ হতে পারে না। তাছাড়া, ছাত্রদের অবস্থানটা ভাসমান। একটা আন্দোলন যখন রিপ্রেশনের মুখে পড়েছে, ওরা নিজেদের সরিয়ে নিতেই পারে কারণ, ওদের অস্তিত্বে ঘা

পড়েনি। বরং তখনও আন্দোলনে জড়িত থাকলে বিপদ ডেকে আনা হতে পারে। মোদ্দা কথা একটি শ্রমিকের জীবনের সমস্যায় একটি ছাত্রের নাড়ির যোগ থাকতে পারে না।

বিহান স্বীকার করেছিল যে ইমোশনের ব্যাটারি বেশিদিন কাজ করে না। ওকে ঠেকে-ঠুকে বাস্তববাদী ধরে নিয়েছিল সীতেশ। এখন এরকম প্রচুর আছে, যারা তাদের পুরনো কাজকর্মের জন্য অনুতপ্ত। এবং ফলে যে প্রগতিশীল আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সে-কথাও মানে। বিহান সম্পর্কে শোভনের একটা দুর্বলতা আছে। শোভনের মতে, বিহান জেনুইন ছেলে। কোনোরকম হিপোক্রেসি নেই। কথাটা মনে পড়েছিল সীতেশের। সে জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা, বিহানবাবু, আপনারা তো বিশ্বাস করেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বুর্জোয়াদের একটা আশ্রয়। তাহলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুলিস ঢুকলে আপনারা চেঁচিয়ে পাড়া মাত করতেন কেন? আপনারা স্কুলের ছাদ থেকে বোমা ছুঁড়বেন, আর পুলিশ মালা জপবে তা কি হয়? আপনারা থাকলে স্কুল বিপ্লবী ঘাঁটি, আর পুলিস ঢুকলেই বুর্জোয়াদের, এটা কি হিপোক্রেসি নয়? আপনারা যে বিপ্লবী সে-কথা কে বলল, আপনারাই! বিহান জবাব দেয়নি।

ওকে কোণঠাসা করতে আরেকটা প্রসঙ্গ তোলে সীতেশ। ধরা যাক, চিকিৎসার জন্য আপনাকে একটা ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে। ভালো পরিবেশ, পরিচ্ছন্ন। ডাক্তার, নার্স অ্যাক্টিভলি আছে। তবু আপনার পাশের বেডের রোগীরা পরপর মরছে। সকালে শুনলেন, আট নম্বর বেড গেছে। বিকেলে বারো নম্বর। সন্ধের মুখে তেরো যাই-যাই। মাঝরাতে ষোলো কেটে গেলে। আপনি কী করবেন? এখানে পড়ে থাকবেন, না পালাবেন?

বিহান জবাব দেয়, পালাব—

এই তো পথে আসুন। বুদ্ধিজীবীদের মতো শ্রমিকশ্রেণী মৃত্যুর বিলাস এনজয় করতে পারে না। দেখা যায়, কোনো আন্দোলনের চোটে যখন অনেক কারখানার কাজকর্ম বিপন্ন, তখন একটি সচল ও অপেক্ষাকৃত সুস্থ কারখানার শ্রমিকরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেবেই। সেই ওয়ার্ড থেকে সে পালাবে। সে বাঁচতে চায়, মৃত্যু নয়।

এরপর বিহান বলে, আচ্ছা, কারখানা মরছে, অথচ মালিক আর ইউনিয়ন লিডাররা ফুলছে কীভাবে? মৃতদেহ খেয়ে?

বিহান ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছিল সীতেশকে। অর্ধশিক্ষিত লোকের ঘনিষ্ঠতা সীতেশ কোনোদিনই পছন্দ করে না। কোনো স্যাক্রিফাইস নেই। কবেকার বাতকর্মের মতো একটা বিস্ফোরণের হ্যাংওভার নিয়ে সারাজীবন কাটিয়ে দিল। বয়স বাড়ছে, মাথা আটকে আছে মায়ের পেটে। শোভন নিজে একটা ফালতু এলিমেন্ট। তাই এসব টলারেট করে। ফালতু তো বটেই। ঠান্ডা ঘরে লড়াইয়ের নাটক করে কী হবে? গরিব মানুষ নিয়ে গল্প, কবিতা লিখে নাম কামানোর ধান্দা কি লোকজন বোঝে না? সীতেশের সন্দেহ হয়, শোভন এই লোকটাকে ইচ্ছে করে ঢুকিয়েছে। নিজে যা বলতে পারে না, এই লোকটাকে দিয়ে বলাবে। সীতেশকে ডিসটার্ব করতেই ওকে এখানে আনা হয়েছে। এক প্রস্থ ঝগড়াঝাটির পর সীতেশ অদিতিকে

নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়। অদিতি চমৎকার কোঅপারেটিভ, হবে নাই বা কেন, এত দ্রুত এত সমৃদ্ধি কোনোদিন ভাবতে পেরেছিল, বিহান প্রসঙ্গ ভুলিয়ে দিল।

সন্ধের পর ক্লান্ত অদিতি বাইরে বসতে চাইল বলেই সীতেশ বেরল। শিকারে যেতে চায়নি। অদিতির জন্যই যাওয়া। লোকটার মতলব ভালো ছিল না। পেছনে হাঁটছিল।

বিহানের সঙ্গে তর্ক করতে ভালো লাগে শোভনের। দুটো কারণে, বাস্তবতা থেকে ও দূরে থাকতে পারে এবং কবেকার একটা স্বপ্নের টিলায় দাঁড়িয়ে বিচ্যুতিগুলোকে আক্রমণ করতে পারে। বিহানের মুখোমুখি হওয়া মানে নিজেরই মুখোমুখি হওয়া, অন্যভাবে। বাকি সব তো ফাঁকি। ধরো, শিল্পে বেসরকারি ও বিদেশি লগ্নি, শ্রমিক ছাঁটাই এসব নিয়ে সীতেশকে প্রশ্ন করলে, কী জবাব মিলবে, শোভন তা জানে। ওইসব জবাব কিছু লোক পার্টিকে সাপ্লাই করে। পার্টি জনতাকে বিলি করে। আসলে ওগুলো জবাব নয়, প্রতিটি জবাবের পেছনে প্রশ্ন আছে। বিহান সেগুলো তুলে ধরতে পারে। বিহান পারে, কেননা ও বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে পারে, নষ্টস্বপ্ন ঘিরে ও আরও স্বপ্ন দেখতে পারে। আসার পথে, একটা চমৎকার যাত্রায়, দুটি বেপরোয়া রাতের সম্ভাবনা যখন এগিয়ে আসছে, পথের দু-পাশে আনমনা নিসর্গ যখন ব্যাপ্তির ইশারা দিচ্ছে, দীপা জানালায় স্থির হয়ে আছে, স্বাভাবিকই, পার্টি ক্লাস করতে তো আর এতদূর আসা হয়নি, শোভনের মনে হয় তারা দুজন একটু বেশি সততার মধ্যে, প্রৌঢ়তার মধ্যে ঢুকে পড়ছে। গড়ানদহের কালীতলা থেকে ফেরার পথে দীপা বলেছিল, বিহান এখনও বিশ্বাস করে পৃথিবীতে গরিব মানুষ থাকবে না, অসৎ থাকবে না, লোভ থাকবে না, পৃথিবীটাই এরকম থাকবে না, তাই না?

বিহান : অমিতের মতো অ্যান্টিসোশ্যালকে কীভাবে তোমরা আশ্রয় দাও?

শোভন : আমরা না দিলে অমিতের জায়গার অভাব হত না। অমিতরা এভাবেই বাঁচে, সম্মিলিতভাবে অমিতদের সঙ্গে কিছু পার্টি। থিয়োরিতে এসব কথা নেই, ইতিহাসেও থাকে না।

বিহান : নিজেদের সুবিধামতো তোমরা সবকিছু ব্যাখ্যা করতে চাও।

শোভন : সোশ্যালিস্ট স্কুলিং থেকে বেরনো টেকনোলজিকাল প্রোডাক্টগুলো দ্রুত কনডেমড্ হয়ে যায়। ক্যাপিটালিস্ট স্কুলিংয়ের প্রোডাক্ট ফার বেটার। আশি বছরের সমাজতান্ত্রিক দেশের মেয়েরা, ফ্রম সিক্সটিন টু সিক্সটি, একজন মার্কিন বা অস্ট্রেলিয়ান বা সুইডিশ মেল ট্যুরিস্টের সঙ্গ পাওয়ার প্রত্যাশায় লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে বিপুল পয়সা খরচ করে চান্স ডেটিংয়ে নাম লেখায়। এর চেয়ে খারাপ আর কী হতে পারে?

বিহান : তোমরা কিন্তু সোশ্যালিস্ট সিস্টেমকে কনডেম করোনি!

শোভন : একদমই নয়। চোদ্দপুরুষের ভিটেমাটির টানের আর্থিক মূল্য কম নয়।

বিহান : দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন দিয়ে কয়েক দশক দিব্যি কাটিয়ে দিলে!

শোভন : তুমি যদি কোনো বইয়ের নাম করে থাকো, হয়ত জানো, একদা অনুরাগীরাই ওই বইয়ের সত্যতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করছে।

বিহান : অন্ধ অনুরাগীরাই পরে সংশয়ী হয়।

শোভন : একে তুমি অপবিজ্ঞান বলে ঠাট্টা করবে?

বিহান : সমস্ত প্রশ্নহীনতার মধ্যে ভুলের ঘাঁটি গড়ে ওঠে। তবু তোমরা প্রশ্নহীনতাকেই লালন করতে চাও।

শোভন : প্রশ্ন তুললে যে বেরিয়ে যেতে হবে। এখন তবু একটা লোককে কথা দিতে পারি, রিটায়ারমেন্টের আগেই পেনসন পাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। বাইরে থাকলে কী করতাম? এখন একজনকে হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ করে দিতে পারি। কিছু ছেলেকে রোজগারের ব্যবস্থা করে দিতে পারি। তোমার মতো নিরাপদ জায়গায় থেকে প্রশ্ন তুলে নিজেকে মহৎ ভাবাই যেত। কারও জন্য কিছু করা সম্ভব হত না।

বিহান : ভালো বলেছ, শোভন। জনসেবার স্বার্থে অন্ধকার পালন।

শোভন : তুমি কোন বাস্তবের কথা বলো জানি না। কোনো কিছু না পাওয়ার বাস্তবতাকে আমি ঘৃণা করি। সেই বাস্তবতা আমি কখনও দেখিনি, যেখানে একটি লোক দাঙ্গা বাধিয়ে বা খুন-খারাবি করে বিধায়ক হলে মানুষ তাকে বর্জন করে। ক্ষমতাই শেষ কথা। বাকি কথা ক্ষমতাহীনদের জন্য।

এভাবে মীমাংসাশূন্য এক ধারাবাহিক তর্ক যা ক্রমে খেউড়ের দিকে নিয়ে যায়, যা বিপক্ষকে বিপর্যস্ত করার জন্য হিংস্র হয়ে ওঠে, শোভন জানে, সুতরাং সে থেমে যায়, থেমে যাওয়ার আগে বন্ধুকে বলেছিল, মেয়েমানুষে তোমার লজিকহীন আপত্তি শুধরে নিয়ে মদ্যপান করতে পারো।

ওরা মদ্যপান করে। ওরা গান গায়। বাংলোর বাগানে জ্যোৎস্না ওড়ে। জ্যোৎস্নার শরীরে লাগে নিমফুলের গন্ধ। নিমফুলের গন্ধের ভেতর ঢুকে পড়ে জ্যোৎস্না। কবেকার বন্ধুদের কথা মনে পড়ে। কবেকার তারা আসে। দেওয়ালে সেঁটে দেয় আন্দোলনের খবর। খবরের কাগজে লাল-নীল কালির হরফ। প্রতিটি হরফে সততা, শপথ, রক্তের অনুলিখন। পেয়ারার ডাল ভেঙে থেতো করা তুলির টানে বিশ্বাস ও স্বপ্ন ছবি পায়। মা যেভাবে পেতলের লক্ষ্মীনারান, নাড়ু গোপালের ছোট ছোট মূর্তিকে নাইয়ে গা মুছিয়ে দিত।

সেই জ্যোৎস্না ও মাদকতার ভেতর শিকারের প্রস্তাব দিয়েছিল দীপা।

চৌকিদার বলেছে, একটা নদী আছে, ঝুম রাতে তারাদের নিয়ে কুলকুল কথা বলে, ঝুপঝুপ জোস্‌নায় হরিণ জল খেতে আসে, নদীর গায়ে লেগে থাকা ছোট্ট পাহাড়ে ফুল ফোটে, তো আপনারা পাহাড়ে বসে একমনে হরিণ দ্যাখেন, ঈশ্বরের দান, অধর্মে নাই, অহিতে নাই, গায়ে কী সুন্দর চিত্র, গাছপালা আঁকি দিছে, তো রঙের হাট বুকে পিঠে, জোস্‌নায় দ্যাখেন আর গান শোনেন।

২১৯. ভালো থেকো

শিকারের গানটা তোমার মনে আছে? শোভন জিজ্ঞাসা করে দীপাকে। দীপা গায়, চলো চলো বনে যাই / বনের পাহাড়ে নদীর কিনারে / রাজা ব্যাসদেব কালো ঘোড়া চড়ে / গেদা ঘেন ধেগে নাটা ধেগে নাটা / কেরে ব্যাটা কেরে ব্যাটা .....। দীপা হেসে ফেলে। এবং হাসতেই থাকে। শোভনের মনে পড়ে, হুলা কাঁপে হুলি কাঁপে আকাশে ইন্দ্র কাঁপে দেবদেবীসুর। তারপর? তারপর? বলো না অমিত। অমিত মাথা নাড়ে। শোভন বলে, বিহান থাকলে ঠিক বলে দিত। ব্যাটা যে কোথায় গেল? জানো, ও আমাদের সঙ্গে চমৎকার গাইছিল। শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছিল। কী হবে মিছে তর্ক করে! সব ভোগে যা। সব খাগে যা। পাহাড়ে ওঠার মুখে ওকে শেষ দেখি, টলতে টলতে দীপার হাত ধরে হাঁটছে। দীপা আপত্তি জানায়, বিহান আমার কাছেই আসেনি। শোভন বলে, আমরা কি এখন ঠিকঠাক মনে করতে পারি, কে কার কাছে ছিল, কে কার নয়? হয়ত সীতেশকেই দীপা মনে হয়েছে। কিন্তু, এটা তো ঘটনা যে বিহানকে আমরা হারিয়েছি। সীতেশ বলে, পাহাড়ে ওঠার আগে আপনার বন্ধু আমার পেছনে ছিল। অদিতিকে টার্গেট করেছিল। অমিত জানায়, লোকটার নাম মুখে আনতে ঘেন্না করে। ভদ্দরলোকের ছানা বাংলোয় অম্বুবাচি করল। ফাঁকা জায়গা দেখেই ঠেটে গেল। শোভন আবার প্রশ্ন করে, আমরা সবাই কি ঠিকঠাক বলছি? অদিতি বলে, বিহান আমাদের পেছনে ছিল। সীতেশের কাঁধে ভর দিয়ে আমি হাঁটছিলাম। সীতেশ আবৃত্তি করে, মনতে হাংকিনু মনতে পাংকিনু/ এই বন হেলিবো, এই বন পেলিবো / চড়হাবো ঘাও / মোর বাড়ি বনকচু মোর বাড়ি হাড্ডিছু / মুছিবে দুই পাও। একজ্যাক্টলি সীতেশবাবু! শোভন চিৎকার করে ওঠে, হাত পা মুড়মুড় ন্যাংগুড় চালাও / আলিকাঠ পালিকাঠ মুখেতে জ্বালাও। অদিতি বলে, সীতেশ আমাকে শেষ করে দিয়েছে। দীপা গুনগুন করে, চলো চলো বনে যাই। শোভন বলে, পাহাড় থেকে আমরা হরিণ দেখলাম। অমিত বলে, স্পষ্ট দেখলাম। জল খাচ্ছিল। হঠাৎ গুলির শব্দ। দীপা বলে, আমাদের কারও আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না। শোভন বলে, আমরা হরিণটাকে টেনে বাংলোয় নিয়ে আসি। দীপা গায়, হুলা কাঁপে হুলি কাঁপে, আকাশে ইন্দ্র কাঁপে। অমিত বলে, কাঠ তৈরি রেখেছিল চৌকিদার। সীতেশ জানায়, অনেক সময় লেগেছে ঝলসাতে। অদিতি বলে, মাংসের কথা অস্পষ্ট মনে পড়ছে। সীতেশ বলে, উম্ হরিণের মাংস। শোভন বৃত্তাকার বন্ধুমণ্ডলীর কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন তোলে, আমরা কি বিহানের মাংস খেয়েছি?

হিংসা তোমাকে মানায় না

চিনিদিদিমার কাছ গল্পটা অনেকবার শুনেছি। কখনও খুব সোজাসিধে, যখন ছোট ছিলাম। পরে অন্যরকম, আমি বড় হয়েছি। গল্পটা পাল্টে পাল্টেও একই থেকে গেছে। যৌন আগ্রহ যখন আমার শৈশব-কৈশোরকে ছোঁয়নি, তখনও ভালো লাগত। সভ্যতার অগ্রগতির পথে মূল্যবোধের অসংখ্য শহিদ বেদি থাকে এরকম একটা ভাবনা যখন আমাকে স্বজনশূন্যতায় দাঁড় করিয়ে দেয়, গল্পটি আমার ভালো লাগে। গল্পে চিনিদিদিমার কথক ছাড়া কোনও ভূমিকা থাকার কথা নয়, কিন্তু তিনি একটি ভূমিকাহীন চরিত্র হয়ে যান। এটা লক্ষ করলাম যখন আমি দেশ-সমাজ নিয়ে স্ট্রিট কর্নার করছি।

চিনিদিদিমার নাম ইন্দুসুধা বসু। ময়মনসিংহের মেয়ে। বিয়ে হয় ঢাকার ছেলের সঙ্গে। বাঙালির ভূগোল-ইতিহাস ছুরিকাহত হওয়ার বছর আটেক আগের ঘটনা এই বিবাহ। ছুরিকাঘাতের প্রসঙ্গটি এল এই কারণে যে তা চিনিদিদিমার দাম্পত্য নষ্ট করেছিল। সরকারি ত্রাণ-খয়রাতের কিছু কার্ড যা স্বাভাবিকভাবে তাঁর হাতে এসেছে, তার বেশি আদায় করতে পারেননি চিনিদাদু। নিদেনপক্ষেএকটা আয়ের পূর্ণিমা-অমাবস্যা-একাদশী। ফলে তিনি দুরারোগ্য উদাসীনতায় আক্রান্ত হন। ক্রমে একটা বিশ্বাস তাঁকে স্থিতধী করে যে প্রতি রাতে সাপ তার যৌনাঙ্গ ভক্ষণ করে যায়।

গল্পটা প্রথম দিকে, যতদূর মনে করতে পারি, সাহসী যুবকের কথা ছিল। যে শাদাকে শাদা বলত, কালোকে কালো। যখন-তখন যাকে-তাকে বাবা বলত না। যে সীমান্ত এলাকায় বসবাস করত। রাজধানী ঘুরে এসে মন্ত্রী-কোটাল বা রাজার রথ দেখার গর্ব করত না। নদী-সমুদ্র পাহাড় তার বাধ্য ছিল। রাজা সেই যুবককে রাজকুমারীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে প্রাসাদে আনতে চায়। যুবক রাজাকে প্রশ্ন করে, যা কেউই করে না, এত মূর্খ সহজে মেলে না, তোমার প্রাসাদে পাহাড় আছে? তিনবার ভেরিধ্বনির আগেই রাজা জবাব দেয়, আমার রাজত্বে পাহাড় আছে। একটি-দুটি নয়, সহস্র। অবিন্যস্ত চুলে হাওয়ার খুনসুটি আঙুলে চেপে যুবক বলে, পাহাড় তোমার প্রজা নয়। ভেরিধ্বনির আগেই রাজা পুচ্ করে হেসে ফেলে। তবু তিনবার ভেরি বাজে। যে কণ্ঠস্বর দেশ শাসন করে তা পঞ্চম পর্দায় হুংকার হয়ে যুবককে জানায়, রাজা যাকে প্রজা করেন, সেই প্রজা। বলেই রাজদণ্ডে দুলিয়ে দেয় সূর্যের চিরিক-মিরিক। যুবক রাজাকে আরও প্রশ্ন করে, তুমি প্রমাণ দিতে পারো? রাজাকে 'তুমি' বলা বুনিয়াদি ব্যাকরণেও

অপরাধ। তবু রাজার ভালো লাগে। উদ্ধতদের শায়েস্তা করার আলাদা একটা মজা আছে। খ্যাংড়াকাঠি প্যাস্তামারাদের বকেও সুখ নেই। এই যুবককেই তার মেয়ের সঙ্গে ঠিকঠাক মানাবে। রাজা জেদি পুরুষ পছন্দ করে নিজেকে জেদি ভেবে। কীসের প্রমাণ? যুবক বলে, পাহাড় যে তোমার প্রজা? দড়িবাঁধানো মুখে কিঞ্চিৎ হেসে রাজা জিগ্যেস করে, কোন পাহাড়ের কথা বলছ? উদয়গিরি, পঞ্চকিরীট না মুণ্ডসই? যুবক রাজাকেই পছন্দ করার ভার দেয়। গোঁফ মুচড়ে রাজা তিনবার ভেরি বাজাতে বলে। ভেরি বাজে। রাজা জানায়, মুণ্ডসই দক্ষিণে ছিল। সে-ই তাকে উত্তরে যেতে বলেছে। উত্তুরে হাওয়ায় প্রজাদের শীত লাগে। প্রজারা দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকে। এতে চাষবাস-বাণিজ্যের ক্ষতি হয়। ঠিক সেইসময় একটা টুনটুনি যে কিনা রাজার উঠোনে রোদ দেওয়া মোহরের একটি নিয়ে পালিয়েছিল, যুবকের কানে কানে কিছু বলে। যুবক হেসে ওঠে। যুবক হাসলে পঞ্চকিরীটের পায়ে সারাক্ষণ সুড়সুড়ি দেওয়া সমুদ্র গর্জে ওঠে। হাওয়া মাতামাতি করে। টুনটুনি ছড়া কাটে: রাজা খায় ব্যাঙ ভাজা/সিংহাসনে ছেঁড়া মোজা। হতমান, ভূলুণ্ঠিত রাজা চটে ফায়ার, হাত-পা লাফিয়ে অর্ডার দেয়, দেশের শত্রুটাকে অর্ধেক শূলাহিত করে ওর বাপ-মায়ের কাছে ছেড়ে দিয়ে এসো। বাপ-মা শূল ছাড়াবে। এরিয়ার পাবলিক যেন ওর অ্যায়সা হাল দেখতে পায়।

চিনিদিদিমাকে আমি জিজ্ঞেস করতাম, ওর ঠাম্মা, দিদা খুব কেঁদেছিল?

একটু একটু করে পাল্টাতে পাল্টাতে গল্পটা শেষ দিকে মনে হয় এইরকম শুনেছি:

হাটে-মাঠে বাজারে উত্তরপাড়া-দক্ষিণপাড়ায় রাজার ঘোষকবাহিনী লাল কাপড়ে হলুদ বাঘমুখের রাজচিহ্ন দুলিয়ে চোঙ ফুঁকে বলে যায়।

শোনো শোনো প্রজাগণ, রাজার নিবেদন। দীর্ঘ, কৃষ্ণবর্ণ, অবিন্যস্ত কেশ, আয়তনেত্র উপরিভাগের দন্তপঙক্তি ঈষৎ উন্নত সেই যুবকের সঙ্গে রাজা কথা বলবেন।

যে যুবক রাজার উৎসবে যোগ দেয় না। যে যুবক রাজার প্রার্থনাসভায় হাজির থাকে না। যে যুবক রাজার সাপ্তাহিক জনসভার বক্তৃতা শোনে না।

সভাকবি-সভালেখক-সভাসাংবাদিকদের যে অবিশ্বাস করে।

রাজপতাকা আবার দোলে।

রাজার জন্মদিন পালন করে না। রাজ পরিবারের সমাধিতে মালা দেয় না। রানীর প্রসব সংবাদে খুশি হয় না।

যে কোনোদিন রাজার প্রার্থী হয়নি। যে কোনোদিন অমাত্যদের বাড়ি যায়নি। কোটালকে চিঠি লেখেনি।

মহামন্ত্রী সেই যুবককে স্নেহ করেন। প্রধান অমাত্য তার গুণগ্রাহী। রাজবৈদ্য তার স্বাস্থ্যের প্রশংসাকারী। রানী তার জন্য বাৎসল্য অনুভব করেন। রাজা ও রানীমাতা সেই যুবকের সঙ্গে কথা বলার জন্য অপেক্ষা করছেন।

সে যুবক পাখির কথা বোঝে, নদীর কথা বোঝে, গাছের ভাষা জানে, পাহাড়ের ইঙ্গিত চেনে।

সে যুবক ফসলের মাস জানে, সূর্যের ক্ষয়বৃদ্ধি জানে, মাটির গুণাগুণ জানে।

সেই যুবকের রাজ্যশাসন অধিগত, প্রজাপালন আকাঙ্ক্ষিত, রাজ্যবিস্তার তার ললাটলিখন।

নহবতে বাদকরা প্রস্তুত, অশ্বশাল-হাতিশাল প্রস্তুত, পুরোহিত প্রস্তুত, দেবতা প্রস্তুত, রন্ধনশালা প্রস্তুত।

সভাকক্ষে অপেক্ষা করছেন পারিষদবর্গ, অন্তঃপুরে রানীমাতা, বিশ্রামকক্ষে দ্যূতক্রীড়া, দক্ষিণ বাতায়নে রাজকুমারী, নাট্যশালায় নর্তকীরা।

এ পর্যন্ত একটানা বলার পর ঘোষক চামড়ার থলে থেকে সুশীতল বারি পান করে। ঠোঁট মোছে। গলা খাঁকরায়। ইস্তাহার আরও ক পাতা বাকি দেখে নেয়। ততক্ষণ ভেরিতে দেশগান বাজে।

এই যুবকের কুশল সংবাদ রাজসন্নিকটে যে প্রজা দিতে পারবে, রাজা তাকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দেবেন।

তীক্ষ্ণ স্বরে শিঙা ফোঁকা হয়।

এই যুবকের অবস্থানের সংবাদ যে প্রজা দিতে পারবে, রাজা তাকে মনসবদারি দেবেন।

শিঙা রাজার মহত্ত্ব বোঝায়।

রাজপ্রসাদে এই যুবকের উজ্জ্বল সমাগম যে ঘটাতে পারবে, রাজা তাকে অমাত্য সভায় আসন দেবেন।

জনতার একজন হাততালি দিলে হাতে হাতে তা সংক্রামিত হয়। রাজপতাকায় বাঘমুখ চোখ টেপে।

ঘোষণা প্রজাকুলের মুখস্থ হয়। দীর্ঘ, কৃষ্ণবর্ণ, অবিন্যস্ত কেশ, উপরিভাগের দন্তপঙক্তি ঈষৎ উন্নত, আয়তনেত্র যুবক যেহেতু দুর্লভদর্শন নয়, পথে পথে প্রশ্নগুলো ঘুরে বেড়ায়, তুই কি পাখির কথা বুঝিস? তুমি পাহাড়ের ভাষা জানো?

নানারকম খবর আসে। সূত্রগরিষ্ঠের ভিত্তিতে একটি খবর তৈরির চেষ্টা চলে। কিন্তু প্রতিদিন নতুন খবরের স্রোত আগের রাতের চূড়ান্ত খবরটি খারিজ করে দেয়।

রাজা পারিতোষিক দপ্তর খুলে কোমরের বেল্ট আলগা করে ঘুমোয়।

সভাকবি, সভালেখকদের কাজে ফূর্তি আসে। রাজপ্রশস্তি ছেড়ে ইদানীং স্বাধীনভাবে মুকাবলা, হাঙ্গামা, ধামাকা, তামাসা, প্রেতকথা, প্রেমকথা, প্রতিবাদী কথার চিত্রনাট্য ইত্যাদি লিখতে পারা যায়। রাজার অনুমোদন আছে।

প্রার্থনাসভায় জনতা বাড়ে। প্রার্থীসভায় জনতা বিশাল হয়। জনসভায় জোয়ার হয়। পারিতোষিক দপ্তরের ভিড় বিকেন্দ্রীকরণে পাড়ায় পাড়ায় শাখা খোলা হয়।

রাজ্যে অপহরণ বাড়ে, লুণ্ঠন বাড়ে, ধর্ষণকারী বাড়ে, নারীমঞ্চ প্রখর হয়। একদিন সেই যুবক এসে পড়তে পারে এই আশঙ্কায় কিছু লোক দ্রুত দুষ্কর্ম সেরে নেয়। যুবকের আশায় রাত জাগা কিছু লোক 'ঢপের চপ' বলে উজিরের বাড়ি রোজ ফোন করে, আর কিছু ভ্রান্তি-কীট শুঙ্গের সদ্ব্যবহার করে।

পুলিশ ও পারিতোষিকে বরাদ্দ সমান করে রাজা মৃগয়ায় যায়। কণ্বমুনির আশ্রমে প্রিয়ংবদাকে গন্ধর্ব বিবাহের প্রস্তাব দেয়। প্রিয়ংবদা আগেভাগে আংটি চাইলে রাজা অখুশি হয় না।

পারিতোষিকের কল্যাণে রাজ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটে। কথাবার্তা পরিশীলিত হয়। পোশাক সুন্দর হয়। খাঁটি-মেকির ভেদ থাকে না। দীর্ঘ লাইনে দাঁড়ানো প্রজারা একে ওকে বলে দু-একটি ধর্ষণ সেরে আসে।

রাজা নিঃসন্দিগ্ধ হয়, সেই যুবক আর আসবে না।

চিনিদিদিমা গল্পটা এভাবে শেষ করেন, মাথায় আঙুল বুলিয়ে একদিন সেই দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ যুবক বলবে, সুধা ঘুমাবে না?

২

চিনিদিদিমার গল্পটা মনে করিয়ে দিল বারীন। স্কুলে আমার সহপাঠী। এখন কনসালটেন্সির ডাকাবুকো নাম। আইডিয়ার আকালের দিনে বারীনের মাথা নাকি চিরহরিৎ অরণ্য। হোপ গ্রো ইন্ডাস্ট্রির সিস্টার কনসার্ন দ্য থিঙ্কার-এর চিফ একজিকিউটিভ। ওর তত্ত্বাবধানে থিঙ্কার এখন পোলিটিক্যাল মার্কেটিংও করছে।

মাস কী খাবে কী খাবে না বলা মুশকিল। খাওয়াতে হবে। খুব টাফ। একটা স্লোগান, সে পলিটিক্স বা কসমেটিক্স যাই হোক, খাওয়াতে দম বেরিয়ে যায়। ট্রাডিশনাল অ্যাপ্রোচ থিওরিতে কিছুটা সাফল্য পেয়েছি। যেমন ধরো, পুজো-আচ্চা। ইট ইজ অ্যান্ড উইল বি আ ডমিনেটিং পার্ট অফ আওয়ার ডেইলি লাইফ। কোম্পানি শুড ইউজ দিজ ফারটাইল সয়েল। পুরাণ-টুরান ঘেঁটে নতুন কোনও দেবী বের করে পপুলারাইজ করা যেতে পারে। একটা পার্টি এল, নতুন সাবান বাজারে নামাতে চায়। বললাম, মাল্টিন্যাশনালরা এসে গেছে। ক্যাম্পেন কস্টেই ঝাড় খেয়ে যাবেন। তার চেয়ে, যারা কোনোদিন সাবান মাখেনি তাদের টার্গেট করুন। হিরোইন দিয়ে সাবান মাখান একবার। তারপর মঙ্গলচণ্ডী, ওলাইচণ্ডী, শিবরাত্রি, নীল ষষ্ঠী, পুণ্যিপুকুর, যমপুকুর, বিপত্তারিণী ইত্যাদি মেয়েদের যত ব্রত আছে, সব নতুন ফর্মে রিভাইভ করতে হবে। হিরোইনকে দিয়ে ব্রত করাতে হবে। ব্রতকথার বই ছাপাতে হবে হিরোইনের নামে। বিনি পয়সায় বিলি করবেন গাঁয়ে-গঞ্জে। বইয়ের মলাটের এককোণে থাকবে সাবানের বিজ্ঞাপন। লোকাল গুরুদের আশ্রম থেকে সাবানের প্রচার হবে।

বিজ্ঞান মঞ্চে র স্পনসর হিসেবে বারীন কল্পতরু বা গুপ্তধন গোছের লটারি কোম্পানি ঠিক করে দিয়েছিল। সেটা ভেস্তে যায় মঞ্চে র অবাস্তববাদী তরুণ নেতার জন্য। কসমেটিক্সের বিজ্ঞাপন ফিরিয়ে দিয়েছিল নামী গার্লস স্কুলের বুড়ি হেডমিস্ট্রেস। এরকম কিছু স্পেসিমেন এখনও আছে। তবে এর জন্য অরগানাইজেশনকে সাফার করতে হয়। এরপরই বারীন জানান, ওর অফিসে দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ এক মধ্যবয়স্কের কথা। যার জন্য রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা বড় চোট খেল। একটা বাজারে আগুন লাগানো হবে। সব ঠিকঠাক। লোকটা কেচিয়ে দিল। পচাধরা মূল্যবোধের কেত্তন গেয়ে। আরে আগুন লাগানো যে অন্যায় তা কি আমরা জানি না? আমরা না দিলে অন্য কোম্পানি দেবে। সে-ই তো দিল! আগুন লাগালেই যেখানে পয়সা, কেউ বসে থাকে না? বোর্ডের মিটিং-এ তুললাম। লম্বা কালো দাঁত উঁচু লোকটা ড্যাবডেবে চোখে অসভ্যের মতো আমার দিকে তাকিয়ে থাকল।

তখনই আমার চিনিদিদিমার কাছে শোনা গল্পটা মনে পড়ে যায়।

— স্বদেশির কিছু লোক সময়ের খাঁজে আটকে গেছে, বেরতে পারেনি। দেশটা যে...

বারীনের লাইটারে সিম্ফনি শোনা যায়। জামার বুকপকেটে এক ফরাসি ভদ্রলোকের নাম। কথা বলা হাতঘড়ি জানায়, সিক্স ফর্টি পি এম।

— ইট মে বি ওয়র্স্ট অর বেস্ট, ইট ইজ চেঞ্জড থরোলি, হুইচ দে ডিনাই টু বিলিভ। দ্যাট ম্যান, টল অ্যান্ড ব্লাক, হ্যাভিং লার্জ অ্যান্ড ড্রেডফুল টিথ, উইথ পিকুলিয়ার আয়েজ, অদ্ভুত আম-ফাঁক চোখ, স্পেসিমেন অফ স্বদেশি জেড ইন ভিলেজ লাইফ।

সিগারেটের টানে বারীন অসহিষ্ণু।

— একটা লোক কিছু চাইবে না, অফার করলে ফিরিয়ে দেবে, মিথ্যে কথা বলবে না, তাকে নিয়ে এ যুগে আশ্রম বা মিশনও চালানো যায় না।

বারীন একসময় রাজনীতি করত। যখন দেওয়ালজোড়া স্বপ্নের হাতেখড়ি, টেনসিল ও বন্ধুদের কাটামুণ্ডু নিয়ে প্রতিদিন ভোর হয়। ছেনি সাধু. ফাটা টেপু, ঢালাই মাংগেরা থানারা কুটুম। দৈনিক নরবলির রিপোর্ট দিল্লি পাঠায় দেশবন্ধুর উত্তরাধিকার। ব্রডশিট, রেডিও পিকিং, সোশাল ইম্পিরিয়ালিজম, ডেভিয়েশন, উইলিয়াম হিন্টন ইত্যাদি শব্দ পাড়ায় পাড়ায় বিলি হয়। বারীন নয়া গণতন্ত্র না জনগণতন্ত্রের বিতর্ক ঝুলিয়ে রেখে বাঙ্গালোর যায়। পাক্কা দশ বছর পর রবীন্দ্রসদনে কবিপক্ষে হঠাৎই যেন চিনি-চিনির মধ্যে দেখা গেল, বারীনের বউ রাজ্যে রাজ্যে 'শ্যামা' নাচে, বারীন একটা বড় ফার্মের 'বেচুদা'। ওরই বাংলায় সেলস এক্সিকিউটিভ। পরবর্তী দশ বছরে গোটা ছয়েক প্রাইভেট ও পাবলিক সেক্টরের কুর্সি ঘুরে বছর তিনেক আগে সে এক প্রেসিডেন্ট ফাইনান্সের পার্সোনাল ফাইল ফাঁস করে দেয়, যে ওকে নানাবিধ সুযোগ করে দিয়েছিল। ইউনিয়নের লোক ফিট করে নিজেরই বিরুদ্ধে পোস্টার সাঁটিয়ে বারীন এখন সেই কোম্পানির ডিরেক্টর।

— জাস্ট আই ক্রসড দা বেরিয়ার। এক মহাপুরুষের ছবিওয়ালা লকেট কপালে ঠেকিয়ে বারীন সেবার বলেছিল।

এবার বারীনের গলায় কোনও মহাপুরুষ নেই। এখন ভেঙ্কটেশের ক্যাটস আই আছে।

— ইন দা কোয়েশ্চন অফ সারভাইভাল ডিজঅনেস্টি ইজ অলসো অ্যান ইডিওলজি। কিছু ভালো কথা সবসময়ই প্রিজার্ভ করা হয় সাধারণ মানুষের জন্য। এ তো সবাই জানে। লোকটা এতটাই ইউটোপিয়ান যে বিশ্বাস করতে চায় ওসব আমাদেরও জন্য।

— ইগনোরই তো করি। চেম্বারে ডাকি না। ওর জুনিয়রকে প্রোমোট করে ডিপার্টমেন্টের চার্জ দেওয়া হয়েছে। পলিসি ম্যাটারে ওর কোনও সে নেই। এত নতুন প্রজেক্ট হচ্ছে কোনও রোল নেই। ক্লাবে কোম্পানির পার্টিতে ইনভাইট করা হয় না। টোটালি করনারড।

— বোর্ডের মিটিংয়ে অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। মোটিভেট করতে বক্তৃতা দিচ্ছি। দেখি, ব্যাটা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। যেন আমার মাথার ভেতরে ফ্লপির প্রিন্ট বের করছে। সেই আম-ফাঁক চোখ। অসহ্য চাউনি। সব ওলট-পালট হয়ে যায়।

— একটা প্রজেক্টের জন্য সরকারি জমি সস্তায় পাওয়ার ব্যাপারে নিগোসিয়েশন চলছে। পার্টির নেতা, মিনিস্টার, সেক্রেটারিকে কনভিন্স করানো গেছে। সবাই অ্যাপ্রিসিয়েট করছে। শুধু ওই ব্ল্যাক বাস্টার্ড, ওর দাঁত-চোখ উপড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে!

— এম ডি-কে বললাম। বলে কিনা আমার কনসিয়েন্স! এ কি মা-মাটি-মানুষ না নবযুগের গান?

— এম ডি-র যুক্তি, মিনিস্ট্রিতে দু-এক পিস ভদ্রলোক থাকে, তাদের ট্যাকল করতে তোমার ওই কালোমাণিককে দরকার হবে। আমি বললাম, যে লোক কিছু না চাওয়ার দুঃসাহস রাখে, সে সাবোতাজ করতেই পারে।

বুঝলাম, বারীন ভালো থাকার চেষ্টা করছে। জানলাম, কালো লম্বা, দাঁত উঁচু লোকটার ব্যক্তিগত জীবনে গোলমাল আছে কিনা খোঁজা হচ্ছে। পুলিশ রেকর্ড দেখা হচ্ছে।

৩

যুবকটির সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। তাকে অনুসরণ করি। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে ও নির্জনে এগোয়। মাথায় দুপুর, গায়ে হলকা। গাছের নীচে দাঁড়ায়। পাতার জাফরি দিয়ে রোদের খুচরো পয়সা পড়ে ওর শরীর জুড়ে। বাতাস শুঁকে যুবক বলে, কী ব্যাপার, আজ পায়েস হচ্ছে যে বড়! পলাশের সময় এল বুঝি? তা তোমার পুত্রঞ্জীবের খবর কী? হেমন্তে বললে যে— বীজন্যাস হয়েছে বামুনপাড়ায়? বঁইচিগাঁয় রাজকরণটা মরে যাচ্ছে। তো বয়েস হল ঢের। ভেজা শাড়িতে কে সপ্‌সপ্ হেঁটে গেল যেন! তুমি যা ব্যস্ত, আজ কি আর সময় দেবে? তাহলে গানই শুনি। যুবক গাছে গা লাগিয়ে বসে। মাথা পেছনে হেলিয়ে দেয়। চোখ বোজে। যেন কেউ চুলের ভেতর আঙুল বুলিয়ে দিচ্ছে। না, ঘুমোচ্ছি না। গান শুনছি। কাল রাতে স্বপ্ন এল। দেখি

মধুমাঝির শালতি বেগমপুরী পরে ডাঙায় চলছে। চলতে চলতে পবনের ঠেকে হাজির। পবন খানিক অবাক। এত রাতে মেয়েমানুষ কেন? অল্প কুপি জ্বলছিল। ভাবলে মধুমাঝির বউ। হুঁশ নেই। মেঝেন কবেই সগ্‌গে গেছে। তা শালতি চোঁ চোঁ করে দু-ভাঁড় ধেনো টেনে চলতেই সবার ধন্দ হল মেঝেন একঠেঙে কেন? একা বিছানা থেকে গাল পেড়ে মধুমাঝি নদীতে গিয়ে সমচক্ষে দেখে, বেগমপুরী পরা একঠেঙে জেলেনি সাদা কাগজে গোটা গোটা করে লিখছে, মৌমাছিদের বৃত্তিকর দিতে হবে। গাছ খুব হাসে। আকাশ যখন নক্ষত্র পেয়েছে। হাসতে হাসতে হঠাৎ গাছ অভিমানী গলায় বলে, তুমি আমার কাছে কেন থাকো না?

সেদিন যুবকটি নদীর ধারে কিছু খুঁজছিল। মাটিতে কান পেতে কোনও শব্দ চাইছিল। এভাবে সে সিকি ক্রোশ হেঁটে যায়। বিদ্যাসাগর সেতুতে আলো জ্বলে। জলে অন্ধকার গাঢ় হয়। নৌকায় লণ্ঠন দোলে। বিচালির নৌকো ভাটায় ভেসে রাঁড়ি অথবা জেঁওচ নারীর গল্প বলে।

যুবকটির পাশে দাঁড়াই। জিগ্যেস করি, কী খুঁজছ?

দীর্ঘ, কালো, উড়োচুল, সেই চোখ আমাকে দেখে। বলে, কৃষ্ণশিরীষ।

নেই?

না।

কী করে বুঝলে?

শব্দ নেই।

লাগিয়েছিলে?

এসেছিল।

কে বললে?

শ্বেতকরবী।

নষ্ট ভ্রূণ?

গর্ভপাত।

অন্ধকার যুবককে অস্পষ্ট করে। জিগ্যেস করি, তুমি ফিরবে না?

তোমার সঙ্গে কী করে ফিরব?

কেন?

আমি তোমাকে চিনি।

আমিও তোমাকে চিনি।

তুমি রাজার সভাসদ ছিলে।

তুমি আসবে বলে মানুষ রাত জেগেছে।

নিজের স্ত্রীকে তুমি ধর্ষিতা হতে দেখেছ।

তোমার আশায় মানুষ বুক বেঁধেছে।
তুমি রাজার কাছে সুবিচার চেয়েছ।
তুমি আসোনি।
রাজা তোমাকে অন্ধকার নির্জন কারাগারে পাঠায়।
তুমি মানুষকে দুষ্কৃতী, আততায়ী করেছ।
কারাগারে একটি সাপ প্রতিদিন তোমার যৌনাঙ্গ ভক্ষণ করে।
আমি অস্বীকার করতে চাই। শব্দ ভাষা হতে না পেরে গোঙাতে থাকে।

৪

যুবক দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ মধ্যবয়সকে প্রশ্ন করে। বিছানায় তখন উৎসহীন দুটি আলো, কখনও সঙ্গম করে, কখনও সম্পর্কহীন। কখনও নিটোল বৃত্ত বা স্বপ্নের ভাঙচুর। তুমি বারীনদের হিংসা করো? পেঁপে গাছের পাতায় ভিড় করেছে নক্ষত্রের চেয়ে উজ্জ্বল জোনাকি! বাতাসহীন মধ্যরাতে ঝিঁঝির ডাক পাথর হতে থাকে। হিংসা তোমাকে মানায় না।

নদী নদী খেলা

অ্যাই, নদী নদী খেলবে।

শিউরে উঠে সুদীপ। চোদ্দ বছর অন্যের স্ত্রী হওয়ার পরও বিশাখার স্বরে এত প্ররোচনা। নাকি সুদীপেরই ভুল। পুরনো মুগ্ধতার চোরা টান। মিনিটের কিছু কম সময় পায় সুদীপ এসব নিয়ে ভাবার। তাহলে কি বিশাখা এখনও, এরকম একটা কুসুম কুসুম ঢালে গড়ান শুরুর মুহূর্তে, অ্যাই তোমার নদী নদী খেলবে-র সর্বজনীন ডাকে সুদীপ আহত ও স্থির হয়।

দারুণ হয় কিন্তু। ওয়ান্ডারফুল আইডিয়া। ফ্যানটাস্টিক। তুমি না, কী বলব বিশাখা, ইমাজিনেটিভের বাংলা কী হয়? ধূর্জটি, বিজন, শেখর, রানু সমস্বরে।

রানুর আবদার, আমি নদী হব।

বিশাখা সেই মেয়ে যার শরীরে বয়েস ও ব্যবহারের দাগ লাগলেও পরকীয়ার প্রচ্ছন্ন আমন্ত্রণ থেকেই যায়। সেই জন্যেই কি সুদীপ তাকে টিলার ওপর মন্দিরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল?

শেখর বলে, তা হলে আমি মাঝি।

ধূর্জটি ঝাঁপিয়ে পড়ে, ওরে পাজি! আমাকে বাঁধ বানাবে?

সবাই হাসে। ৬ ফুটের ওপর লম্বা, একশো কিংবা দেড়শো কেজি ওজন নিয়ে ধূর্জটিকে সত্যি বাঁধই মানায়। রানু গলায় অভিমান আনে, তা হলে আমি নদী হব কী করে? বিশাখাদির বাঁধ কেড়ে নিতে পারি না তো!

শেখর যেন অবাক, কেন একাধিক নদীর কি আর কমন বাঁধ হয় না? বিশাখার যদি অবজেকশন না থাকে...

রাগ দেখায় রানু, তবে রে! দেখাচ্ছি তোমায় কমনওয়ালা...

ধূর্জটি গম্ভীর স্বরে বলে, আইনে হয় না। বেআইনি অবশ্য খুব ভালো হয়।

ফোড়ন দেয় বিজন, সেটাই তো ন্যাচারাল ড্যাম। দুটো নদীর জল কলকল ছলছল সারাদিন। দু-দিক থেকে পাথরে জমছে। পাথরের গা বেয়ে দুটো ধারায় নেমে যাচ্ছে।

দু-দিন বাদে দেখব দুজনে পাথর ছোড়াছুড়ি করছে। নিজেরাই কখনও কখনও পাথর হয়ে যাচ্ছে। লে হালুয়া। আমি ওসবে নেই। ধূর্জটির জোরাল দাবি, আমিই নদী হব।

অত বড় চেহারা নিয়ে কি নদী হওয়া যায়? বিশাখা তর্ক তোলে।

ধূর্জটির জবাব, আলবাত হয়। আমি দামোদর নদ।

সবাই হেসে ধূর্জটির দাবি অনুমোদন করে।

না। বিশাখার দ্বিতীয় আপত্তি। গান না জানলে নদী হওয়া যাবে না।

মোক্ষম জায়গায় ধরেছে বিশাখা। ওর ভাষায়, গানের ব্যাপারে ধূর্জটি নৃশংস হন্তারক।

ধূর্জটি বলে, বুঝেছি ক্যান্ডিডেট আগেই ঠিক করা আছে। এই আনফেয়ার কম্পিটিশনে আমি নেই। সুদীপকে আমার জায়গা ছেড়ে দিচ্ছি।

সুদীপের ভাবতে ভালো লাগছিল যে বিশাখা স্বামীকে সরিয়ে ওর জন্য জায়গা করে দিচ্ছে। সুদীপ দারুণ রবীন্দ্রসঙ্গীত গায় একথা বিশাখা ইউনিভার্সিটিতে সহপাঠী থাকতেই নিজের অহংকারের মতো বলে বেড়াত। আজ যে ফের সুদীপের গানের জায়গাটাই তুলে ধরল এ কি নিছক ভদ্রতা না অন্য কিছু? সুদীপের সঙ্গে বিশাখার সম্পর্কে দাম্পত্যের ঘষটানি, চিড়ফাট নেই। কিন্তু দুজনের মন্দিরে যাওয়ার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছে বিশাখা। সুদীপ জানায়, ধূর্জটিই নদী হবে। আমি গান গেয়ে যাব।

থ্যাঙ্ক ইউ, সুদীপ। ফরটিন ইয়ারস আর এনাফ টু ওভারকাম দ্য হ্যাংওভার। সুদীপ গান গাইবে। আমি ঠোঁট নাড়ব। জয়েন্ট কোলাবরেশন।

ধূর্জটি কি মজা করছে? নাকি আঘাত করতে চাইছে? বিশাখা বলেছিল, ধূর্জটি কোনোদিন ও ব্যাপারে একটি কথা বলেনি। ও জানে আমরা খুব ভালো বন্ধু। মানুষটা একেবারেই অন্যরকম। সন্দেহ করতেও জানে না। এজন্যেই ভয় হয়।

গানের আগে আমি নদী বিষয়ক একটা বক্তৃতা দিই, কী বলো?

সবাই হ্যাঁ জানালে ধূর্জটি বিশাল শরীর তুলে দাঁড়ায়, আমি একটি মেয়েকে ভালোবাসতাম, তার নাম নদী।

রানু, শেখর, বিজন হেসে ওঠে। একী শুনি, পাঞ্চজন্যে বৃন্দাবনের বাঁশি! তুমি-আমি, আমি-তুমি, রিমিঝিমি, টোনাটুনি ব্যাপার যার ধাতে সয় না, একটা মেয়ের জন্যে হাফ ইঞ্চি ফোঁড়া আকাশের মতো মনটা বিষিয়ে দেবে বলে যে আঁতকে ওঠে, সেই লোক তার ভালোবাসার গল্প বলছে! বিশাখা সুদীপও গল্প বলেই বিশ্বাস করতে চায়।

নামটা আমিই দিয়েছিলাম। প্রথমে দিই ছুটি। মেয়েটির ঘোর আপত্তি। শব্দটার আসব মানে নাকি বিদায়। মেয়েটি রাগ করে। বলে, তোমাকে নাম দিতে হবে না। আমাকে ভালো না লাগলে নিজে ছুটি নিতে পারো। ঠান্ডা করার জন্যে বলি, তুমি হলে গিয়ে নদী। আমার ন-দী। খুশি তো? খুশি মেয়েটি আহ্লাদে কুটি হয়ে কোলে মাথা রেখে জিজ্ঞেস করে, আমায় কেন নদী ডাকলে? বলো না! জবাব দিলাম, শাস্ত্রে আছে, জলপ্রবাহের ৯ মাইল ১৬০ গজ না হলে নদী বলা যাবে না। তুমি তার চেয়ে ঢের বেশি।

রানু বলে, বিশাখাদিকে হিংসে করতেই হচ্ছে।

অন্য মত শেখরের, ধূর্জটির বউ-ভাগ্য ভালো।

বিজন সমস্তটাই উপভোগ করে।

এটা নিছক গল্প নয়। সুদীপের ধারণা, ধূর্জটি বিশাখার কথাই বলছে।

বিশাখা ধূর্জটির মধ্যে একটা অচেনা মানুষের ছায়া দেখে।

নদী নদী খেলার ভাবনাটা বিশাখা হঠাৎ-ই পেয়েছিল। ডুলুংয়ের বুকে পাথরের চাঁইয়ে দাঁড়িয়ে শেখর যখন ডাকল, রানু। জলহীন নদীখাতে বয়ে যাওয়া বাতাস সেই ডাক নিয়ে খানিকক্ষণ লোফালুফি খেলল। রানুর ডাক ছুটে গেল, শে-খ-র। দূরে, ভাঙা সাঁকো পেরিয়ে। এপার ওপার ছুঁয়ে ছুঁয়ে। মজা পেয়ে যায় ধূর্জটি। ডাকে, রা-নু। গমগমে গলা নদী পেরিয়ে শাল-পলাশের জঙ্গলে ঢুকে যায়। রানু ডাকে, ধূর্জটিদা। বিশাখা ডাকে, রানু! শেখর ডাকে, সুদীপ। বিজন ডাকে, শেখর! এইসব ডাক নিয়ে হাওয়া রোদ্দুর গাছপালা খেলা করে। একটি নামের সঙ্গে আরেকটি নাম জড়িয়ে নকশা বোনে। সুদীপের ভীষণ ইচ্ছে করে বিশাখাকে ডাকে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে ডাকতে পারবে কিনা এই ভয়ে আর ডাকা হয় না। ঠিক সেই সময় পাশে এসে বিশাখা বলে, অ্যাই নদী নদী খেলবে?

জল নেই। এক ফোঁটা জল নেই। মাইল মাইল টানা গভীর গর্ত রুখাশুখা। এখানে সেখানে বোল্ডার। অসংখ্য নুড়ি-পাথর বিছোনো শেষ বুকে। শুকনো জিভের মতো খরখরে মাটি। তবু নদী। নদীর নাম ডুলুং। এর গর্ভ জুড়ে জলের দস্যুতার ছাপ আছে। জল আসে তার সময় হলে। তাণ্ডব প্রেমে কয়েকটা দিন কূল হারায় নদী।

এরকম একটা নদীর কথা নিশ্চয় ভাবেনি ধূর্জটি, সুদীপ, শেখর, রানু, বিজন। মধ্য-ফাল্গুনে সরল আলপনা আঁকা মাটির বাড়ির লোধাগ্রামে গাড়ি থামিয়েছিল ধূর্জটি। নদীটা তার চোখে পড়েছে। জলহীনতার মধ্যে একদল ছেলেমেয়ে ছুটোছুটি করছিল। তখন ১০টা বাজে। হাওয়া, গাছ-গাছালির ছায়া, পাখির ডাক, উঁচু টিলা এবং ডুলুং— সবারই ভালো লেগে যায় জায়গাটা। পাতার নিবিড়তা মাটিতে ছড়িয়ে দেয় ঘড়া ঘড়া মোহরের মতো রোদ।

ডুলুংকে নদী বলা যায় কিনা তা নিয়ে তর্ক হয়। সুদীপ প্রশ্ন তোলে, জল নদীকে ছেড়ে গেলে নদী বলা যাবে কি? ধূর্জটি বলে, একদিন জল আনা হবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে কটা ভোট পার করে দেওয়া যাবে। খোলামেলা জায়গায় এলেই রানুর গান গাইতে ইচ্ছে করে। অবশ্য অন্য কেউ গাইলেই সুবিধে। ও মাঝেমধ্যে গলা মেলাতে পারে। বিজন বলে, রাত্রি গভীর হলে হরিণী জল খেতে আসে। আকাশে নক্ষত্র কাঁপে। গাছের পাতায় কথা বলে বাতাস। আরও সব কী যেন হয়, বল না?

দীর্ঘ মিলনের পর ঢুকঢুক জল খায় হরিণী। শেখর জুড়ে দেয়।

ওফ্। ফুঁসে ওঠে রানু।

নো ইন্টারাপশান প্লিজ। ধূর্জটি ততক্ষণে গুটিয়ে বসেছে। আজ কোনও বাধা নয় প্রিয়ে, কী লাভ ঢাকাঢুকি দিয়ে! দীর্ঘ মানে কতক্ষণ? হাউ লং ডু ইউ লাইক টু মেক লাভ?

শেখর জবাব দেয়, সব ঘড়ি ফেলে দেব।

ধূর্জটি অবাক হওয়ার ভান করে, রিয়েলি? ডু ইউ হ্যাভ দ্যাট পোটেনশিয়ালিটি?

রানু চেঁচায়, ধূর্জটিদা, থামুন না। অ্যাই বিশাখাদি তোমার বরকে থামতে বলো।

বিশাখা হাসে। তুমিই বলো।

রানু, এটা স্কুল নয়। বিজন জানায়।

শেখর বলে, ইস্কুলটা সেক্সলেস নাকি? বলব?

রানু চিৎকার করে ওঠে, না। তোমার মাথা ফাটিয়ে দেব।

বিজন চেপে ধরার চেষ্টা করে শেখরকে। ধূর্জটির চোখ সুদীপের দিকে, চুপচাপ কেন? কিছু বল।

গাড়িতে বিশাখার পাশে বসে সুদীপ সেই যে চোদ্দ বছর আগে অংশত ঢুকে গেছে, নিজেকে আর কিছুতেই বের করে আনতে পারছে না। তোমার সঙ্গে পিউ অ্যাডজাস্ট করতে পারেনি বলে বিস্মিত দুঃখিত বিশাখা যখন সুদীপের দিকে ঝুঁকে পড়ে, সুদীপের ভীষণ ইচ্ছে করছিল বিশাখাকে জড়িয়ে ধরে। প্রশ্ন করতে চায়, বলো আমি বাঁচব কী করে?

সুদীপ হাসে, ধূর্জটি, জানোই তো এসব আমার আসে না। স্বাতন্ত্র্যটা বোঝাতে গিয়ে ধূর্জটির সঙ্গেই তুলনা করে ফেলল সুদীপ।

এগিয়ে আসে বিশাখা। বিনায়কের জাঙ্গল স্টোরির একটা এপিসোড বল না। বাঘেদের প্রণয়-পর্ব।

ওটা বিনায়ককেই মানায়। লম্বা কাঁচাপাকা দাড়ি, পর্তুগিজ জলদস্যুর মতো পোশাক, চোখ গোলগোল করে বলত, ও নাকি গাছের মগডালে বসে দেখেছিল। ঘণ্টা চারেক ধরে বন কাঁপছে, মাটি কাঁপছে। আলো ঝলসে উঠছে।

তার মানে? বিস্মিত ধূর্জটি। আলো আবার কোত্থেকে এল?

বিনায়ক এরকমই বলত।

বিপুল হাসতে হাসতে ধূর্জটি, দারুণ বলেছ। বাঘের মিটিংয়ে আলো ঝলসায়! আগুন লেগে যাবে তো! ফাটাফাটি লোক তোমাদের বিনায়ক। এরপর বিশাখাকে উঁচু টিলার ওপর মন্দিরে একবারটির জন্য যাওয়ার প্রস্তাব দিয়ে সাহসী হয় সুদীপ। বিশাখা বলে, রানু বলছিল, শেখর নাকি ওকে একদম বোঝে না।

হঠাৎ রানুর প্রসঙ্গটা এল কেন? বিশাখা কি বলতে চায়, সুদীপ পিউকে বোঝে না? নাকি সুদীপ বিশাখাকে বোঝে না? নাকি এ রকম কোনও ইঙ্গিত, রানুকে প্রস্তাবটা দিতে পারে। সুদীপ মানতে না চাইলেও এই শেষ ব্যাখ্যাটাই তার মাথায় পেরেক ঠুকতে থাকে।

নদী, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?

দক্ষিণ কলকাতা হইতে।

নদী, বলো তো আমি সূর্য না চন্দ্র?

অতিদূর নক্ষত্র। নিজস্ব আলো সত্ত্বেও ব্যবধানে নিষ্প্রভ।

নদী, তুমি এত ভালো, তবু মাঝেমধ্যে এমন করিয়া রুষিয়া ফুঁসিয়া ওঠো যে তোমাকে দেখিলে ভয় হয়।

আমাকে ভয় না পাইলে ভালোবাসিবে কেন?

আহা, ভালোবাসিলে বুঝি ভয় পাইতে হইবে?

একটু হইবে বৈকি।

তুমি ঘর ভাঙো কেন, নদী?

না না, আমি কাহারও ঘর ভাঙি নাই। কেহ কেহ নিজের ঘর ভাঙিবার জন্য আমার তীরে আসিয়া বসে।

নদী, আমি তোমার তীর, তোমারই জলে ভিজিয়া আমি উর্বরা হই।

সারাক্ষণ, তুমি আমাকে জড়াইয়া থাকো।

নদী, আমি তোমার যাত্রী।

কোথা যাইতেছ?

মামার বাড়ি, শিমুরালি।

তোমার মাইমা বড় সুন্দর চিঠি লেখেন।

নদী, তোমার বড় অহংকার। সূর্য মেঘ বাতাস অপেক্ষা নিজেকে বড় ভাবো।

উহারাই আমাকে বড় ভাবিতে শিখাইয়াছে।

তোমার মন নাই, নদী?

দেখ, আমার জলে অপূর্ব এক রমণীর দেহ ভেসে আসছে। ধূর্জটি উঠে দাঁড়ায়। ভুলুংয়ের দূরে চোখ রেখে বলে, দেখ রমণী সিঁথিতে উজ্জ্বল সিঁদুর। আহা, সদ্য মারা গেছে। তীর ধরে ছুটে আসছে একদল লোক। বাঁকের মুখে বাঁশে জড়িয়ে গেল রমণীর দেহ। লোকগুলো জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কে আগে রমণীর কাছে পৌঁছবে তার জন্য দমবন্ধ সাঁতরাচ্ছে ওরা। ওরা কী চায় জানো?

কী?

রমণীর শাড়ি?

কেন?

নিজেদের লজ্জা ঢাকবে বলে।

সবাই লজ্জা ঢাকতে চায়।

হ্যাঁ। এবং সবারই এক দাবি।

কী?

প্রত্যেকে বলছে রমণী নাকি তারই উঠোনে আত্মহত্যা করেছে।